মুকুর

সৌমেন নাগ

প্রাপ্তিস্থান

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

MUKUR
A Bengali Novel
by
Soumen Nag

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি.
ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার মা ও বাবাকে—

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক মৃত বা জীবন্ত কোনো মানুষের কোনো ঘটনার সঙ্গে কোথাও কোনো মিল থাকলে তা নিছক কল্পনা প্রসূত।

| ১ |

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অসময়ের বৃষ্টি। একটা হালকা শীতের আমেজ। আকাশ জুড়ে যেন একটা লাজুক ভাব। খণ্ড খণ্ড মেঘ গুলি কি একটা করে ফেলেছি এমন একটা ভাব দেখিয়ে ডানা মেলে উড়ে চলেছে। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্য মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়াব আলপনা দিয়ে চলেছে।

কালো পিচের রাস্তাটা এখানে এসে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে। বৃষ্টির জল এখানে ওখানে জমে আছে। খুব একটা গাড়ি এই রাস্তায় চলে না। যানবাহন বলতে অবশ্য রিকশা ও সাইকেল। মাঝে মধ্যে একটা দুটো ট্রাক আর কালে ভদ্রে অ্যাম্বাসেডর অথবা ফিয়েট।

সবকিছু চেনা। সবই পরিচিত। এই রাস্তা, এই আকাশ, এই মাঠ, এখানকার গাছ, মাটি ও বাতাস সবই তো কতদিনের জানা। সর্বত্রই এক নিবিড় আত্মীয়তা।

প্রকৃতি তিলে তিলে তার বৈচিত্রের যে পেখম মেলে, তার রূপান্তরের ভেদরেখা প্রতিদিনের অভ্যস্ত চোখের দর্পণে ধরা পড়ে না। তাই যা কিছু বর্তমান তাই যেন চিরন্তন সত্য বলে মনে হয়। অতীতের প্রকৃতিকে বর্তমানের মাঝে আনতে মন সাড়া দিতে চায় না।

বসুন্ধরার জীবনের সাথে অতীত কেন তাহলে বার বার এভাবে উঁকি দেয়? বর্তমান কেন অতীতের ভ্রূকুটিতে এইভাবে আত্মসমর্পণ করে? বৃষ্টি হবার আগে এই রাস্তাটা ছিল শুকনো ঠনঠনে। কই, বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় এখানে ওখানে জমে থাকা জলকে এড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে সে দৃশ্য তো আর মনে পড়ে না। রাস্তার বর্তমান চেহারাটাই সত্যি মনে হয়। বৃষ্টির আগে চাঁপা গাছের পাতাগুলো নিশ্চয়ই সদ্য স্নান সেরে আসা অষ্টাদশীর পেলবতায় এখন যেমন হাসছে তেমন ছিল না। কিন্তু তার সেই ধূসর ম্রিয়মান চেহারাটা তো এখন মনে পড়ে না। বর্তমানই মনের পর্দায় উঁকি দিয়ে চলে।

বসুন্ধরা মন থেকে অতীতের শিকড়কে উৎপাটিত করে বর্তমানের বীজ বপন করতে চাইলেও তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটছে না। অতীত সর্বগ্রাসী আগাছার মতন বসুন্ধরাব মনের কর্ষণভূমিতে প্রভুত্ব কায়েম করে রেখেছে।

দীর্ঘ কয়েক মাস পরে বসুন্ধরা এই পথ ধরে হেঁটে চলেছে। এ পথ তাব অতি পরিচিত। সেই ছোটবেলা থেকে এ-পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। তখন অবশ্য এ-পথের এ রূপ ছিল না। মেঠো পথের উপর লাল সুরকি ছড়িয়ে দিয়ে এই রাস্তাটা করা হয়েছিল। বসুন্ধরা দিদুর হাত ধবে এই পথে হেঁটে প্রথম স্কুলে এসেছিল। বাড়ি থেকে বাজারে এসে ডানদিকে একটা মাঠের উপর দিয়ে কুমারী মেয়ের সিঁথির মতন এই রাস্তা সোজা স্কুলের গেট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। পথের দুধারে লাগানো হয়েছিল কৃষ্ণচূড়া, আকাশমণী, চাঁপা আর নিম গাছ। তখনও তারা হাতের স্পর্শে বিনম্র ভঙ্গিতে নুইয়ে পড়ত। বসুন্ধরা ছোটো কচি হাতে তাদের নরম ডালগুলিকে টেনে নিতে পারত। কচি পাতার পেলব স্পর্শে এক মিষ্টি ঘ্রাণ পেত। আজকের এই যৌবনদীপ্ত গাছগুলির মধ্যে অতীতের কোনো চিহ্ন নেই। যেন ঘোষণা করেছে আমার আর অতীত কী? আমি যা আছি তাই আমার বর্তমান। অতীতে কে আমার ডাল ভেঙ্গে ছিল, কোন গবাদি পশু আমার মাথাকে মুড়ে খেয়েছিল সে ইতিবৃত্ত আমার শরীরে লেখা নেই। আমি আছি এটাই আমার পরিচয়। অনাগত দিনে কোনো কসাই ধাতব দাঁতের আঘাতে

আমাকে ভূমি থেকে উৎপাটিত করবে তা আমার ভাবনার বিষয় নয়। কারণ অস্তিত্বই যদি না থাকে তবে আমার ভাবনা কী?

বসুন্ধরা চাঁপা গাছটার পাশে এসে দাঁড়ায়। এ গাছটার সাথে তার এক আত্মীয়তার টান অনুভব করে। এই গাছটি তার দাদুর হাতে লাগানো। কত বয়স তখন বসুন্ধরার? কিছুটা দাদুর কোলে কিছুটা দাদুর হাত ধরে টলমলে পায়ে এসেছিল বসুন্ধরা। সেও তার ছোটো কচি হাতে চারা গাছের গোড়ায় মাটি দিয়েছিল। সারা মুখে কাদা মেখে দাদুর কোলে মুখ লুকিয়েছিল। দাদু তাকে কোলে তুলে নিয়ে পাঞ্জাবির কোনায় মুখের কাদাগুলো মুছে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'এই গাছটা তোর বোন, কী নাম রাখবি এর বলত?'

বসুন্ধরা বলেছিল 'হাসি'।

গাছটার নাম হয়েছিল হাসি চাঁপা।

বসুন্ধরা গাছটার গায়ে হাতে রাখে। ডাকে হাসি।

পঞ্চদশী তরুণী হাসির শরীরে সদ্য স্নানের মোহময়ী আবেশ। পেলব শরীর বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল যেমন পঞ্চদশীর সারা অঙ্গে মুক্তো ছড়ায় হাসি চাঁপার শরীর জুড়ে সেই মুক্তোর মালা। বসুন্ধরার স্পর্শে সে রোমাঞ্চিত হয়, তার ডাকে পাতাগুলো সাড়া দিতে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে।

কয়েক ফোঁটা জল এসে পড়ল বসুন্ধরার হাতে। ওপরে তাকাল। কলি এসেছে পাতায় পাতায়। সারা শরীর জুড়ে চাপা হাসি।

বসুন্ধরা হাত বোলায় গাছের গায়ে। হঠাৎ এক পশলা জল ভিজিয়ে দেয় তাকে। বসুন্ধরা গভীর আয়ত চোখে চাঁপার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তার গায়ে গালটা চেপে ধরে। মনে হয় গাছের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন তার হৃদপিণ্ড অনুভব করছে। বসুন্ধরার শরীর গাছের ভিজে শরীরে ভিজে যায়। হাসি চাঁপাকে আরো নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে তার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত সিক্ত করতে চায়।

চাঁপার গায়ে ঠোঁট লাগিয়ে বসুন্ধরা বলে, তুই আমার জন্য কাঁদছিস? তোর নাম তো হাসি চাঁপা। কোনো দুঃখই তো তোর গায়ে লাগে না। তবে দিদির ভাবনায় কাঁদবি কেন? তার থেকে তোর হাসি থেকে আমায় একটুকরো হাসি দে। আমি যে বহুদিন ধরে হাসতে ভুলে গেছি, হাসি চাঁপা।

এই গাছটার সাথে সে এক নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে। এর কারণ এটা নয় যে সে এর চারা রোপনের সময় এর মূল স্থাপনে তার কচি হাতে মাটি লেপে দিয়েছিল। তার জন্মের দু'বছর পর তার একটা বোনের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু দশদিনের মাথায় সে মারা যায়।

বসুন্ধরা তখন ডুয়ার্সের চা বাগানের কোয়ার্টাসে থাকে। বাবার সাথে গিয়েছিল হাসপাতালে, নামেই হাসপাতাল। আসলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, একজনই ডাক্তার। ম্যালেরিয়া হলে তিনিই কুইনাইন দেন। দাঁতের ব্যথায় অ্যাসপিরিন। আবার গর্ভবতী মহিলার প্রসব কালে তিনিই একাধারে ধাত্রী ও নারী রোগ বিশেষজ্ঞ। বসুন্ধরা তখন দু বছরের শিশু। আলো আঁধারের আবছা দাগকাটার মতন তার মনের পর্দাতে সেই ছোটো বোনের কথা যদিও বা ভেসে ওঠে তা বোধহয় তার বোনকে সে দেখেছিল বলে নয়। এর কারণ মাঝে মধ্যে তার সেই বোনের কথা মায়ের কোল ঘেসে শুয়ে শুয়ে কল্পনার বুননে সেই ছোট্ট বোনটির একটা ছবি তার মনের পর্দায় উঁকি দিত। মাকে জিজ্ঞাসা করত, বোনটাকে মা কেন বাড়িতে নিয়ে এল না? নিয়ে এলে সে তার সব পুতুলগুলি এমন কি পুতির মালাগুলিকেও বোনকে দিয়ে দিত।

মা শুধু তার মাথাটাকে বুকের মাঝে চেপে ধরত। বলত, সে যে চাঁপা গাছে ফুল হয়ে ফুটে আছে।

বসুন্ধরা মায়ের বুক থেকে মুখটাকে তুলে এনে বলত, আমি কেন চাঁপা ফুল হই না মা?

মা তাকে আরো নিবিড় করে বুকের ভিতর টেনে নিত, বলত ও কথা বলতে নেই সোনা। তুমি যে আমার বুকের চাঁপা। আমার দুঃখের বাগানের আনন্দের চাঁপা ফুল।

বসুন্ধরা বলত, তবে বনু কেন গাছের চাঁপা ফুল হয়ে গেল?

মায়েব চোখের জলের উষ্ণ স্পর্শ পেত বসুন্ধবা। চুপ করে মায়ের কথা শুনত। মা-বলত বনু ছিল ভগবানের চাঁপা ফুল। তাই সবার মনে আনন্দ দিতে ভগবান তাকে বাগানের চাঁপা ফুল করে দিয়েছেন। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম আমার এই মা মণিকে তুমি শুধু আমার ফুল করে দেও। তাই তো তুমি কেবল আমাব মা-মণি।

সেই বয়সেই বসুন্ধরা মায়ের বুকেব কান্নার আওযাজ টেব পেত। বুঝত মাব শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মার গলা জড়িয়ে নিজেব তুলতুলে শরীরের কবোষ্ণ উত্তাপে মাব শরীরের সেই অব্যক্ত কান্নার ঢেউকে শুযে নিতে চাইত।

সেই চাঁপা গাছের চারাটা যখন দাদু এসে এখানে পুতেছিল, তখন বসুন্ধরা যেন তার সেই চাঁপা ফুল হযে যাওয়া বোনকেই কচি হাতেব মুঠোয় ধরতে চেয়েছিল। দাদুকে জিজ্ঞাসা কবেছিল, এই গাছের মধ্যেই তো আমার চাঁপা ফুল বোন ঘুমিযে আছে না দাদু?

দাদুর একটা দীর্ঘশ্বাস চারাগাছের কচি পাতাগুলিকে আন্দোলিত করেছিল। বলেছিলেন হ্যাঁ, দিদি, একে যত্ন করো। এই গাছের ডালেই তোমার বোন জেগে উঠবে।

চাঁপা গাছের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সেদিন থেকেই স্থাপিত হয়েছিল। স্কুলে যাবার পথে প্রতিদিন বোতলে করে আনা জল ঢালত। কানাকেই দিয়ে চারিপাশে কঞ্চির বেড়া দিয়েছিল। অন্য গাছগুলির প্রায় সবকটা মরে গেলেও চাঁপা গাছটা বেশ তরতর করে তার ডালপালা প্রসারিত করে কয়েক মাসের মধ্যেই কঞ্চির বেড়ার উপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিল।

কেটে গেছে একে একে একুশটা বসন্ত। মৃত্যু কি বসুন্ধরা জেনে গেছে। জীবনের বসন্তের বাগানে শকুনের কর্কশ ধ্বনি যে কালের নিয়মের গণ্ডিতে বাধা সেই চরম সত্যটিও তার জানা হয়ে গেছে। তবু শৈশবের সেই চাঁপা গাছ তার চাঁপা ফুল হয়ে যাওয়া বোনই থেকে গেছে।

বাড়ি থেকে যে রাস্তাটা একটু বাঁদিকে বেঁকে বেশ কিছুটা সোজা হয়ে চলে গিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছে তার পূর্বদিক বরাবর চলে গেলে পড়ে বেলতলা। এখান থেকে একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে। আরেকটা রাস্তা খানিকটা পশ্চিমে গিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। এরই ডান পাশ দিয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে স্কুলের গেটে।

জায়গাটার নাম বেলতলা। অথচ কোনো বেলগাছ নেই। তবে একসময় ছিল। তখন বুলবুল চণ্ডি আজকের মতন আধা শহর ছিল না। ছিল একেবারেই অজ গ্রাম। গ্রামের জমিদার বলতে যা বোঝায় সে রকম কোনো বড় জমিদারও এই গ্রামে কেউ ছিল না। তবে বসুন্ধরার দাদু সতীনাথ সামন্তই ছিলেন এই গ্রামের জমিদার। তখনও ল্যান্ড সিলিং হয় নি। নিজের নামে শ দুয়েক বিঘা ধানী জমি ছাড়াও গোটা ছয়েক পুকুর ও মাঝারি আকারের দুটি আমবাগান আর চাষের বলদ ছাড়াও ডজন খানেক গরু ইত্যাদি নিয়ে তিনিই ছিলেন গ্রামের ধনীতম ব্যক্তি।

সামন্ত বাড়ি অবশ্য নিছক গ্রামের বাড়ির মতন মাটির বাড়ি ছিল না। দু বিঘা জমির মাঝখানে দ্বিতল বাড়ি। ওপর নীচে মিলে চৌদ্দটি ঘর। সামনে নানা বাহারী ফুলের গাছ। পেছনে নারকেল, সুপারী, বাতাবিলেবু, পেয়ারা ও জামরুলের বাগান। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরেই ঠাকুর দালান। দেবোত্তর সম্পত্তি। কাছে কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে বয়ে চলেছে ট্যাঙ্গন নদী। বর্ষায় দুর্দমনীয়। শীত ও গ্রীষ্মে সূতিকাগ্রস্ত রমণীর মতন কোনো মতে জীবনের স্পন্দনকে বজায় রাখে।

বেলগাছ থাকলেই যে জায়গাটির নাম বেলতলা হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তবু এর নাম যে বেলতলা হয়েছে তার পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বেলগাছটা আপনা থেকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। গাছটা কত বছরের পুরানো সেই কথা কেউ মাথায় আনে নি। গ্রামে বেলগাছ তো কতই আছে। কিন্তু হঠাৎই সে বেলতলায় হাজির হয়েছিলেন এক সাধু। তাকে ভগবান শিব স্বপ্নে বলেছেন, এই বেলতলায় মাটির নিচে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। সাধু যেন তাকে মাটি খুঁড়ে বের করে এনে এখানে তার মন্দির স্থাপন করেন। এই সাধু সারারাত ধরে মাটি খুঁড়ে পেয়েছেন শিব-লিঙ্গ। এখানেই তিনি শিবের আদেশানুসারে স্থাপন করবেন বিগ্রহ। গ্রামের ভীড় জমতে সময় নেয় নি। সবাই এসেছে শিবলিঙ্গে দুধ দিতে। সাধু তার সিঁদুর লেপা ত্রিশুল হাতে নিয়ে নির্বাক হয়ে বসে আছেন। চোখ জবাফুলের মতন লাল। লম্বা জটা। কাঁচাপাকা দাড়ি।

দুধের সাথে চাল ও ফলের নৈবেদ্য। বেলগাছের তলাটা সতীনাথ বাবুই চুন সুড়কি দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। গাছের তলায় শিবলিঙ্গ মন্দিরের পাশেই গড়ে উঠল সাধুর একচালা ঘর। বেলতলা শিব মন্দির।

সাধুর নাম কেউ জানত না। সে বাঙালি না পশ্চিম দেশীয় সে পরিচয়ও বোঝা যেত না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় পশ্চিমী টান। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত, সাধু সন্ন্যাসীর নাম থাকতে নেই।

প্রথম প্রথম সাধুকে ঘিরে বেশ কৌতূহল দানা বেঁধে উঠেছিল। মাঝে মধ্যেই কেউ খবর আনত সাধু নাকি কট্টর বিপ্লবী। অন্ধ্রের জেল ভেঙ্গে এখানে এসে সাধু হয়ে গেছে। কেউ খবর আনত সাধু বাঙালি। হিমালয়ের নির্জন পাহাড়ে তপস্যা করে শিবের আদেশে এখানে মন্দির স্থাপন করেছে। এই আলোচনা একদিন এমনিতেই থিতিয়ে এসেছিল। গ্রামের জীবন প্রবাহে বেলতলা আর বেলতলা মন্দিরে এক স্বাভাবিক যাত্রী বলেই চিহ্নিত হয়ে গেল।

দিনের বেলায় স্বাভাবিক থাকলেও সূর্য ডোবার পর ভাঙের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত সাধু। তাতে অবশ্য গ্রামের জীবনে মন্দের থেকে ভালোই হতো। রক্তচক্ষু আর নেশাতুর দৃষ্টি শিবের ভর বলেই চিহ্নিত হতো। শিবের প্রসাদ পেতে সন্ধ্যার পর নিয়মিত কিছু সদস্যদের আনাগোনাও হতো

জীবন তরঙ্গে প্রকৃতির ভ্রূকুটি কোনোদিন বর্ষিত হবে না—এ আশা ঠিক নয়। মানুষ তা জানে বলেই প্রকৃতি ও নিয়তিকে আত্মীয় করে ঘর বাঁধে। সুখে হাসে দুঃখে কাঁদে। আবার হাসি-কান্নাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জীবনের জোয়ালকে টেনে চলে।

প্রকৃতি যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে বুলবুল চণ্ডির প্রবীনদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতেও তার কোনো চিহ্ন ছিল না। যে ট্যাঙ্গন বাধ্য কিশোরীর মতন গ্রামের বুকে কুল কুল সুরে বয়ে চলেছে, বর্ষার জলে যৌবনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে চাইলেও কোনোদিন বিদ্রোহিনী মূর্তিতে হাজির হয়নি সেই ট্যাঙ্গনই যে তার বুকের ভিতর এত রাগ তিল তিল করে পুষে রেখেছিল তার বিন্দুমাত্র আভাষ বুলবুল চণ্ডির মানুষেরা খুঁজে পায় নি।

একনাগাড়ে বৃষ্টি। ট্যাঙ্গনেব জল বাড়ছিল। কিন্তু সে তো এই গ্রামের মেয়ে। কত ভালোবাসা তাকে নিয়ে। তার বুকে দাপাদাপি—আনন্দ কল্লোল। নির্জন দুপুরে গ্রামের বৌ-মেয়েদের উদাম গায়ের শীতল আবরণ। সুখ দুঃখ, পরনিন্দা কুচক্রী শাশুড়ী আর দজ্জাল বৌ-এর আলাপ কুঞ্জ। পুরুষেব হাতে নৌকার বৈঠা আর জাল টানার নিপুন ধৈর্য—সব কিছুতেই এই ট্যাঙ্গনের নীরব প্রশয়।

বৃষ্টির জল ট্যাঙ্গনের বুকের উপর দিয়েই গড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে দুষ্টু মেয়েব মতন এদিক ওদিক ছুটে গিয়ে সাজানো ঘর যে লণ্ডভণ্ড করে না তা নয়, তবে ঘরের মেয়ের এই দুষ্টুমি বুলবুল চণ্ডির মানুষের কাছে কোনোদিনই তাণ্ডব বলে মনে হয়নি। বরং এই গ্রামের মানুষেরা ট্যাঙ্গনের এই উচ্ছল যৌবনেব জন্য অপেক্ষা করত। কারণ যৌবন মানেই তো সৃষ্টি। যৌবনের উন্মাদনার পরেই আসে অমৃতের কুঁড়ি। বুলবুল চণ্ডির মাঠে জমে পলি। বাতাসে তোলে সবুজ ঢেউ-এ হলুদ শীষেব হিল্লোল।

ট্যাঙ্গন রাক্ষুসী। ট্যাঙ্গন বিধ্বংসী—একথা কারো মনে হয়নি। ট্যাঙ্গন শুধু দিতে জানে, মানুষ শুধু পেয়ে থাকে এটাই তো এতদিনের বিশ্বাস। মানুষের অবিচার ও অত্যাচারের বিষ জ্বালা সইবারও যে একটা সহ্য সীমা আছে এ ধারণাটাই যে মনের কোনে জায়গা পায় নি।

অহমিকাকে তাও সহ্য কবা যায়। কিন্তু সেই অহমিকা যদি হয় স্বার্থ সর্বস্বের অহমিকা তবে তাকে সহ্য করা কঠিন। বুলবুল চণ্ডির মানুষেরা ট্যাঙ্গনকে যখন মাটিব বাঁধে বেঁধে ফেলেছি বলে অহমিকার দর্পে ট্যাঙ্গনেব বুকে দাপাদাপি করেছিল তখনও ট্যাঙ্গন অবোধ মানুষ বলে তাকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু তাব বুক নিংড়ে শুধু টেনে নেওয়ার স্বার্থপরতা—ট্যাঙ্গন যে মেনে নিতে পারেনি তারই প্রমাণ মিলল শ্রাবণেব মিশকালো রাত্রে।

কী আক্রোশই না স্তরে স্তবে জমা ছিল ট্যাঙ্গনের বুকে। মাটির বাঁধ মুহূর্তের মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিল ট্যাঙ্গনের স্রোতে। প্রকৃতির সাথে প্রকৃতিরই আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। নিচে ট্যাঙ্গনের স্রোত ওপরে প্রবল হাওয়া—বরুন ও পবন দেবতা সেই রাতে একযোগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। খড়কুটোর মতন ভেসে গিয়েছিল গ্রামের কাঁচা বাড়িগুলো, গবাদি পশু ও মানুষের মৃতদেহের স্তূপ ধ্বংসের সাক্ষী রূপে খোলা আকাশের তলে পড়েছিল। সেই বটতলার বটগাছটিকে কে যেন সযত্নে মাটি থেকে উপড়ে নিয়েছিল। কোথাও তার চিহ্ন নেই। সেই সাথে মন্দির ও সাধুর ঘরেরও কেউ কোনো খোঁজ পায়নি। যুক্তিবাদীরা এখানে প্রবল ঘূর্ণী জোয়ারকে-এর কারণ বললেও সেদিন গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ছিল ভগবান শিব যেমন স্বপ্নে আদেশ দিয়ে এখানে বাস করতে এসেছিলেন, তেমনি ভোলানাথ যাবার সময় প্রলয় নৃত্যের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে সময়ের পলির তলায় তার দুঃখ চাপা পড়ে যায়। তার উপর জন্ম নেয় বর্তমানের ফসল, ভবিষ্যতের সবুজ পত্র। বুলবুল চণ্ডির সেই ভয়াবহ রাত্রির সবহারানোর দুঃখের উপর সময়ের পলির আবরণে আবার ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছিল বুলবুল চণ্ডির জীবন। ট্যাঙ্গন আবার সেই বিনম্র কিশোরীর মতন এখানকার মানুষের ভিড়ে বয়ে চলেছে। বটগাছ নেই। বটতলা নামটি বহাল তবিয়তে টিকে আছে।

[২]

বাড়ি থেকে একটা রিকশা নিয়েই বেরিয়েছিল বসুন্ধরা। বেলতলায় আসতেই রিকশাকে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই রাস্তা, সেই বাড়িঘর, সেই গাছপালা। সবকিছুতেই তার চেনা স্পর্শ।

এখানকার প্রতিটি জিনিসের ঘ্রাণ নিতে তার মন তৃষিত হয়ে উঠেছিল। বটতলার বটগাছকে সে দেখেনি। তার কথা শুনেছে। তবু আজ সেই বটতলায় দাঁড়িয়ে সে যেন সেই বটগাছটিকেই দেখতে পেল। মনে হল বটগাছটি তাকে বলছে অতীত কখনও হারায় না। কই আমাকে তুমি ভুলতে পারছ? আমি নেই তবু কি তুমি আমার স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছ? তবে তুমি কীভাবে তোমার অতীতকে এড়াতে চাইছ; এর অর্থ তুমি তোমার অতীতকে আরো আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছ।

ঝাপসা দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হতেই দেখল বটতলার শূন্য চাতালের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। ছেড়ে দেওয়া রিকশাটা চলে গেছে। আঁচলের কোনা দিয়ে চোখ দুটি মুছে বসুন্ধরা সামনে এগিয়ে চলল। এ রাস্তায় এর আগে গাড়ি যেত না। এখন এই রাস্তা দিয়ে চলে গেলে পড়ে বাংলাদেশের সীমান্তের চেক পোস্ট। ফলে বি. এস. এফের জীপ আর অটো বিক্সার দাপাদাপিতে রাস্তাটা এখন হাঁফিয়ে ওঠে। মাঝে মধ্যেই ঘটে দুর্ঘটনা।

বড়দিকে লিখেছিল, স্কুল ছুটি হলে সে তার সাথে স্কুলে দেখা করতে যাবে। বড়দি যেন তাকে তার বাড়িতে যাবার জন্য চাপ না দেন। আজকেই এসেছে কলকাতা থেকে। স্নান করে দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছিল। সেখান থেকে এখনও ট্যাঙ্গনকে দেখা যায়। কোনো কিছু খায় নি—খেতে ইচ্ছেও করেনি। একটা বমি বমি ভাব খিদেকে গলা টিপে ধরে রেখেছে।

শনিবার। স্কুল দুটোর মধ্যে ছুটি। দুটোর পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বসুন্ধরা। বড়দিকে রেজিস্ট্রি ডাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিল তা যে তিনি পেয়েছেন তা সে জানে। আসার আগের দিনই অ্যাকনলেজমেন্ট রসিদটা পেয়েছে। স্কুলের কারো মুখোমুখি হতে চায়নি বসুন্ধরা। সে কথাও সে বড়দিকে চিঠিতে জানিয়েছিল। বসুন্ধরা জানে বড়দি তার জন্য অপেক্ষা করবেন।

চার মাস বাদে স্কুলের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল বসুন্ধরা। সময়ের হিসেবে খুব বেশি দিন নয়। সেই ঝড়ো রাতে শরীরের প্রতিটি অনুতে যে তাণ্ডবের চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছিল তারপর থেকে সে আর স্কুলে আসে নি। এই চার মাস যে এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান বলে মনে হতে পারে তা স্কুলের গেটে হাত রেখে আবিষ্কার করল। সময়ের এই ব্যবধান যে এত পরিচিত গেটের পাল্লা দুটোকেও এত ভারী করে দিতে পারে তা আগে কখনও ভাবতে পারেনি। মনে হয় এই গেটের পাল্লাকে ঠেলে ভিতরে ঢোকার শক্তি তার নেই।

অবশ শরীরের হাতের চাপে গেটটাকে ধীরে ধীরে খুলে ভিতরে ঢুকল বসুন্ধরা। সব কিছুই তো আছে। সেই লাল সুরকির পথ সোজা চলে গেছে বড়দির ঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত, বা পাশে সেই চতুষ্কোণ মাঠ। কোনায় কদম গাছটা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তবে তখন সে ছিল অনেক বিবর্ণ। এখন তার সারা অঙ্গ জুড়ে কদমফুলের দেমাকী হাসি। রাস্তার দুপাশ ধরে উইপিং দেবদারু গাছের সারি, একইভাবে মাঠের ওধারে লম্বা টানা ক্লাসঘর 'দ' এর মতন দাঁড়িয়ে আছে। সামনে টানা বারান্দা। মাঝখান দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। বড়দির ঘরের পাশের ঘরটি অফিস ঘর। তার পরে টিচার্স রুম।

দুটো ঘরই বন্ধ। হাতের ঘড়িটা দেখতে গিয়ে দেখল ঘড়ি পরে আসতেই ভুলে গেছে। শনিবার হলে অবশ্য শিক্ষক ও স্কুল কর্মীদের বাড়ি যাবার একটা তাড়া থাকে। বেশীর ভাগই আসেন বাইরে থেকে। শনিবার বাড়ি গিয়ে সোমবার ফিরে আসেন, তবে বড়বাবু আর দপ্তরি কানাই বড়দি না যাওয়া পর্যন্ত স্কুলেই থাকে। বড়দির ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে। বসুন্ধরা বুঝতে পারে বড়দি তার ঘরে অপেক্ষা করছে। বড়দি চলে গেলে কানাই দরজার পর্দাটা খুলে ভিতরে ভাঁজ করে রেখে দরজা বন্ধ করে দেয়। বড়দি যতক্ষণ ঘরে থাকেন কানাই দরজার বাইরে টুলে বসে থাকে।

কানাইকে বড়দিই নিয়ে এসেছিলেন। একসময় ডাকাতি করত। পুলিশের গুলি পায়ে লেগে ধরা পড়েছিল। বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচে থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। ছ'বছর জেলের জীবনে লাঠিতে ভর দিয়েই তরতর করে হাঁটতে শিখেছিল। ফলে হাতের পেশীগুলি হয়ে উঠেছিল লোহার মতন শক্ত। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা বড়দির বাবার কাছে চলে এসে বলেছিল, একটা কাজ দ্যান বাবু।

অচেনা একটা খোঁড়া লোক কাজ চাইতে এসেছে দেখে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কে? তোমাকে তো চিনি না। তাছাড়া আমি তোমাকে কী কাজ দেব?

কানাই বলেছিল, আপনি আমাকে কীভাবে চিনবেন বাবু? তবে আপনার বাড়িতে ডাকাতি করতে আসার পথেই তো পুলিশের গুলিতে পা ভেঙ্গে ধরা পড়ে গেলাম।

তুমি ডাকাতি করতে এসেছিলে? আমার বাড়িতে?

হ্যাঁ বাবু, হাতের লাঠিটা এক পাশে রেখে মাটিতে বসে কানাই বলেছিল, আপনার বোনের বিয়ের গয়নাগুলি স্যাকরার দোকান থেকে আনার খবর আমাদের সর্দার পেয়েছিল। আমার ইচ্ছে ছিল না আপনার বাড়িতে ডাকাতি করতে। বিয়ের গয়না ডাকাতি করতে বুকে বড্ড বাজে বাবু। আমার মেয়েটা দশ বছর বয়সে মারা গেল। গ্রামের ডাক্তার ওর রোগ ধরতেই পারল না। বড় ডাক্তার দেখালে হয়ত বাঁচত। কিন্তু সে ক্ষমতা আমাদের হয় না। মেয়েটা বেঁচে থাকলে তারও বিয়ে হতো। তাই আপত্তি করেছিলাম এই ডাকাতিতে। কিন্তু আমাদের নিয়ম তো খুব কঠিন। এ লাইনে কেউ যদি না যায় তবে তাকে বাঁচতে দেয় না। আপনার বাড়িতে আসার পথে বাঁ চোখ বার বার নাচছিল। বুঝতে পারলাম অমঙ্গল ধেয়ে আসছে। তবু দলের নিয়ম মান্য করতে হবে। হলও তাই। সর্দার রাস্তাতেই গুলি খেয়ে মরল। আমি হলাম পা কাটা। জেল থেকে ফিরে এসে দেখলাম, বৌ আরেক জনের সাথে ঘর বেঁধেছে। বুঝলাম আপনার বাড়িতেই আমার নিয়তি বাঁধা আছে।

বড়দির বাবা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কানাই-এর কথায়—বলেছিলেন, আমার বাড়িতে ডাকাতি করতে এসেছিলি আর আমার বাড়িতেই কাজ করতে চাও?

কানাই বলেছিল হ্যাঁ বাবু, আমি ডাকাত ছিলাম কিন্তু বেইমান না। যে কাজ দেবেন তাই করব। এক পা নিয়ে কোথায় যাব বাবু? শুধু দুবেলা দু থালা ভাত দেবেন। আর বারান্দার এক কোণে একটু শুতে দেবেন। সারা দিন দু হাতে কাজ করব আর রাতে কুকুরের থেকেও সাবধানে পাহারা দেব। ডাকাতি রাত্রে করতাম। অই অন্ধকারেও দেখতে পাই। বিড়ালেব পায়ের শব্দ ঘুমিয়ে থাকলেও টের পাই। পা একটা নেই। কিন্তু দুটো হাত লোহার শিককে একটানে বেঁকিয়ে দিতে পারে বাবু।

সেই থেকেই কানাই বড়দির বাড়ি। এখানে আসার সময় কানাইকে নিয়ে এসেছিলেন। তারই সুপারিশে স্কুলের দপ্তরি।

কানাই টুলে বসে নেই। বড়দি তাকেও হয়ত ছুটি দিয়ে চলে যেতে বলেছেন।

বড়দির ঘরের কাছে যেতেই চোখে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছটিকে শেষ যখন সে এসেছিল তখন গাছটি তার সবুজ পাতায় কিশোরীর লজ্জাবনত দৃষ্টির প্রলেপ এঁকে দাঁড়িয়েছিল। আজ তার সর্বাঙ্গ রক্ত রাঙা ঘন রঙিন গালিচায় ঢাকা কিশোরীর সেই বিনম্র সঙ্কোচের পরিবর্তে যৌবন মদমত্ত সৃষ্টির অহঙ্কারে বসুন্ধরাকে অভ্যর্থনা করতে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

বড়দির ঘরের দরজার পর্দাটায় হাত লাগাতেই গম্ভীর আহ্বান ভিতবে আয়।

পা দুটি যেন হঠাৎই পাথরের মতন ভারী হয়ে উঠল। মাত্র চারমাস আগেই তো কত

সহজে এই ঘরে এসেছে। কোন দিনই সে বড়দির অনুমতিও চায় নি। পর্দাটিকে দুহাতে ধরে পা দুটোকে ঘরের চৌকাঠের ওপারে আনতে গিয়েও পারল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি এক অদৃশ্য শক্তির টানে পা দুটোকে মেঝের সাথে গেঁথে দিয়েছে।

বড়দি তার চেয়ারেই বসে আছেন। বসুন্ধরার দুহাতের মোচড়ে পর্দাটা মোটা দড়ির মতন হাতের তালুতে বন্দি। বড়দি ও বসুন্ধরার মাঝে নেই কোন আবরণ। বড়দি তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে। একটা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির ধারালো তরঙ্গে বসুন্ধরাকে জরীপ করতে চাইছেন। একই গম্ভীর ডাক, ভিতরে এসে বোস, বসুন্ধরা।

অর্ধচন্দ্রাকার টেবিল। বড়দি দুটো হাতের তালুতে মুখটা রেখে বসে আছেন। টেবিলের বাঁপাশে কয়েকটা ফাইল। মাঝখানে শঙ্খের তৈরি পেন স্ট্যাণ্ড। ডান দিকের কোণে কয়েকটা পেপার ওয়েট।

বসুন্ধরার মনে পড়ে গত বছর ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের সাথে পুরী গিয়েছিল। সমুদ্রতীরের এক দোকানে পঞ্চমুখী শঙ্খের উপর এই পেন স্ট্যাণ্ডটা বড়দির জন্য নিয়ে এসেছিল।

এই স্কুল থেকেই পাশ করেছে বসুন্ধরা। বরাবরই মেধাবী ছাত্রী। স্কুলের পরীক্ষায় কোনো দিন দ্বিতীয় হয়নি। স্কুলের সবার আশা ছিল বুলবুল চণ্ডির এই অখ্যাত স্কুলটি শহরের নামী স্কুলের সাথে বসুন্ধরা যুক্ত করতে পারবে। তাদের আশা নিছক আকাশ কুসুম কল্পনা ছিল না। আন্ত জেলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় মহানগরীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের টপকে খবরের কাগজে জায়গা করে নিয়েছিল। তার আবৃত্তি দূরদর্শনের পর্দাতেও উপস্থিত হয়েছিল।

অপূর্ব সুন্দরী বলতে যা বোঝায় সেই কাব্যিক ছন্দের ব্যাকরণে বসুন্ধরাকে ফেলা যায় না। তবে তার শ্যামলা রঙ, গভীর কাজল টানা চোখ তার মুখমণ্ডলে এক দৃষ্টি নন্দন সৌন্দর্য সুষমা এঁকে দিয়েছে।

কচি কমলালেবুর কোয়ার মতন দুটি পাতলা ঠোঁট, ছোট্ট কপাল আর মরাল গ্রীবার সাথে ধনুকের ছিলার মতন ছিপ্‌ছিপে তনুমঞ্জরীর মধ্যে প্রকাশ পেতনা রূপের কোন অগ্নিবর্ষী দহন। বরং তার সারা অঙ্গে প্রকাশ পেত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না স্নাত স্নিগ্ধতার অবগাহন।

বড়দি, অমিয়া দেবী তার হাতের তালুর বন্ধন থেকে মুখটিকে মুক্ত করে বসুন্ধরার চোখে চোখ রেখে বললেন, তোকে আমি আমার সামনে এসে বসতে বলেছি।

বসুন্ধরা পর্দা থেকে খুব ধীরে ধীরে তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতটিকে ছাড়িয়ে নেয়। গুটি গুটি পায়ে এগ্রিয়ে এসে অমিয়া দেবীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

অমিয়া দেবী মৃদু স্বরে বলেন, চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার কাছে বোস বসুন্ধরা।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে হাতলটাতে দু হাতে ভর দিয়ে নিঃশব্দে বসে বসুন্ধরা।

দিদুর হাত ধরে স্কুলে যখন প্রথম ভর্তি হতে এসেছিল বসুন্ধরা তখন বড়দি অমিয়া দেবীকেই প্রথম দেখেছিল। ঘন কালো চুলের রাশি মাথা জুড়ে। মেদ বর্জিত স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য তার লম্বাটে গড়নে এনে দিয়েছিল স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব। তার কপালের ডান পাশে সরু কাটা দাগ তার মুখমণ্ডলে একটা আলগা শ্রী এনে দিয়েছিল।

এই কাটা দাগের ইতিহাস অমিয়া দেবীর মুখেই শুনেছিল বসুন্ধরা। গ্রা[illegible]এড়িতে ছোটবেলায় বাবার সাথে বড়শিতে মাছ ধরা দেখতে গিয়েছিলেন। বাবা বড়শি পেতে তা প্রতি মগ্ন হয়েছিলেন। মেয়ে যে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সে কথা একেবারেই ভু[illegible] গিয়েছিলেন। ফাৎনায় টান পড়তেই বড়শিটাকে সজোরে টান দিলেন। খালি বড়শি স[illegible]

এসে বিঁধল মেয়েব কপালে। সদর হাসপাতালে এসে ছোটো একটা অপারেশন করে বড়শিটাকে কপাল থেকে ছাড়াতে হয়েছিল।

সেদিনের দেখা বড়দিকে মেলাতে চেষ্টা করে বসুন্ধরা। মাথার সামনের চুলে রূপালী ঢেউ বয়সের নিশানা ঘোষণা করছে। ভারী চিবুকের নীচে মেদের ভাঁজ জানিয়ে দিচ্ছে মহাকালের নিয়মের ঘন্টা।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীব ডাকটা যেন বহু দূব থেকে ভেসে আসে।

সারা শরীর কেঁপে ওঠে বসুন্ধরার। কথা বলার শক্তিটুকুকে কে যেন ব্লটিং পেপারের মতন শুষে নিয়েছে।

উঠে আসেন অমিয়া দেবী। বসুন্ধরার মাথাটাকে নিজের কোলের দিকে টেনে নেন। গলার স্বরে মমতার সুর বলেন কে এই সর্বনাশ করল?

শুধু ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে বসুন্ধরার। কণ্ঠস্বর নিশ্চল। দুহাতেব মাঝে মুখটাকে ঢেকে বসে থাকে।

অমিয়া দেবী বলেন, তুই তো আমার নিজের সন্তান থেকেও প্রিয়। আমার কাছে কিছু লুকোস না। আমিই তোর মা। তোর মুখ থেকে শুনতে চাই সেই স্কাউন্ড্রেলটার কথা।

বসুন্ধরা নীরব। নিশ্চল।

অমিয়া দেবী বলেন, তুই তো আমাকে চিঠিতে লিখেছিস আমার কাছে সব খুলে বলবি। তুই বাড়িতে যাবি না বলে লিখেছিস। আমি জোর করিনি। এখানেই অপেক্ষা করেছি। তুই যদি আমাকে সব খুলে না বলিস তবে আমাকে যে দুঃখজনক ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা গ্রাম। মেয়েদের স্কুল। আগুনের ফুলকির মতন নানা কথা ছড়িয়ে পড়বে। আমি যে তোর মুখেই সব কথা শুনতে চাই। সমস্ত ঘটনা যদি তোব ইচ্ছের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তুই যদি তার পাশব শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ না হয়ে থাকিস তবে আমি ব্ তার প্রতি তোর সামান্যতম করুণার জায়গা নেই। মেয়ে হয়েছিস বলে কলঙ্কের কালি তে মুখে থাকবে আর সে হাঁসের মতন জল থেকে শুধু দুধটাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে সে ত পারে না। হতে দেব না, আর যদি তোদের সম্মতিতেই সব হয়ে থাকে তবু সে তার য়িত্ব এড়াতে পারে না।

রা নীরব। নিথর।

মিয়া দেবী বসুন্ধরার মাথাটা নিজের বুকের ভিতর গাঢ় মমতার টানে টেনে নিলেন। র কপালে হাত রেখে বললেন, বসুন্ধরা, মা আমার সেই পশুটার নাম বল।

মুখটা অমিয়া দেবীর বুকে গুঁজে দিল বসুন্ধরা। অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ-এর মতন তার সারা শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি ওর নাম বলতে পারব না বড়দি।

'কেন পারবি না? বসুন্ধরার ঘাড়ে এক বিশাল ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন া দেবী।

ল ফাঁকা। সমস্ত ঘরের দরজা বন্ধ। অমিয়া দেবীর তীব্র চিৎকার বন্ধ দরজাগুলিতে প্রতি নিত হয়ে ফিরে এল।

আমি ওর নাম বলতে পারব না। অমিয়া দেবীর কোল থেকে মুখ তুলে নিয়ে বলে বসুন্ধরা। তারপর চেয়ার থেকে উঠে দু হাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

একটা মমতা মাখা গভীব সহানুভূতি কান্নায় রূপায়িত হয়ে অমিয়া দেবীর দৃষ্টিপথে একটা ঝাপসা আবরণ টেনে দেয়। স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে সেদিনকার ছবি।

[৩]

ছোট্ট ছিপ্‌ছিপে শ্যামলা মেয়েটি তার দিদার হাত ধরে স্কুলে এসেছিল। মাথায় এক রাশ চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। স্কুলের পরিচালক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির নাতনি বলে নয় মেয়েটার শ্যামলা মুখের ঘন কালো চোখের চাউনির মধ্যে একটা অপূর্ব স্নিগ্ধতার ছোঁওয়াই অমিয়া দেবীকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বসুন্ধরার ছোটো কচিহাতটিকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে ক্লাসের বেঞ্চে বসিয়ে দিয়ে এসেছিলেন।

শশীকলার পূর্ণ বিকাশের ক্রম প্রতীয়মান প্রকাশের মতন বসুন্ধরাও বিকশিত হতে শুরু করেছিল। ক্লাসের পরীক্ষার নম্বরগুলি স্কুলের মধ্যে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর এই গ্রামের স্কুলটিকে সে বছর রাজ্যের দশটি স্কুলের তালিকায় জায়গা করে দিয়েছিল। সংবাদ পত্রে বসুন্ধরা মিত্রের যে ছবি ছাপা হয়েছিল তা আজও বড়দির ঘরে বাঁধানো ফ্রেমে টাঙানো আছে।

এর বছর দুয়েক আগেই এখানে স্থাপিত হয়েছিল কলেজ। জমি দিয়েছিলেন সতীকান্তবাবুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা। সেই সাথে পঞ্চাশ হাজার টাকা। শর্ত একটাই কলেজটা হবে বসুন্ধরার মার নামে। বৈশাখী মহাবিদ্যালয়।

কলকাতার যে কোন নামি কলেজে ভর্তি হতে পারত বসুন্ধরা। কয়েকটি নামি কলেজ থেকে সরাসরি ভর্তির আমন্ত্রণ পত্রও এসেছিল। বসুন্ধরার জিদ সে তার মায়ের নামের স্কুলেই পড়বে। কাকারা এসে অনেক বুঝিয়েছিলেন। দিদিমা স্বর্ণপ্রভাও বলেছিলেন, কলকাতাতেই পড়। কাকা কাকীমার কাছে থাকবি আর ছুটি হলেই আমার কাছে চলে আসবি।

বসুন্ধরা অনড়। সে বলেছিল, না, দিদা আমি আমার মার কলেজেই পড়ব। আমিই যদি না পড়ি তবে অন্যেরা কেন এই কলেজে পড়বে? এতে তো আমার মা দুঃখ পাবে।

স্বর্ণপ্রভা মুখে কিছু বলেন নি। শুধু ওর মুখটা নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়েছিলেন।

অমিয়া দেবী মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। বসুন্ধরা যে তার মনের গভীরে এক লুকানো ক্ষতের উপর একটা শীতল প্রলেপ দিয়ে রেখেছিল তা বসুন্ধরার কলকাতা যাবার সম্ভাবনার সময় টের পেয়েছিলেন। তবু বলেছিলেন, প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলেই তো ভালো করতিস বসুন্ধরা।

বসুন্ধরা বলেছিল, তুমিও আমাকে তাড়াতে চাও বড়দি?

বুকের ভিতরটা একটা তীব্র ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল অমিয়া দেবীর। কি করে এই অভিমানিনীর কাছে নিজের হৃদয়ের অবরুদ্ধ ঢাকনাটিকে উন্মোচন করে দেবেন বুঝতে পারেন নি। শুধু বসুন্ধরাকে আবেগের স্পর্শে কাছে টেনে এনে অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন 'তুই এখানে থাক বসুন্ধরা।'

সেবারেই কলেজে ইকনমিকস অনার্স চালু হয়েছিল। বসুন্ধরার ইচ্ছে ছিল ভূগোলে অনার্স পড়বে। তাহলে এই কলেজে পড়া হয় না। তাই ইকনমিকস অনার্স নিয়েই ভর্তি হল।

বসুন্ধরাকে নিয়েই ছোট্ট কলেজটা গুনগুনিয়ে উঠল। অনেকেই শহরের কলেজে ভর্তি না হয়ে ওর দেখা-দেখি গ্রামের কলেজেই ভর্তি হল।

ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে নাটক। তাও আবার প্রকাশ্য মঞ্চে এ গ্রামে এর আগে কেউ দেখেনি। কলেজের মাঠে মঞ্চ তৈরি করে সেই অসাধ্য সাধন করে দেখাল বসুন্ধরা। খোলা মাঠে সারা গ্রাম ভেঙে পড়লেও কোনো কোণ থেকেও ইতর আওয়াজ ভেসে আসে নি।

সেবার গ্রামে কলেরা দেখা দিতেই তা যাতে মহামারীর রূপ না নিতে পারে তার জন্য ছেলেদের জুটিয়ে পুকুর ধারে পাহারা বসিয়েছিল যাতে কেউ কলেরা রোগির জামা-কাপড়

পুকুরের জলে ধুতে না পারে। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে জল ফোটাতে বলেছে। জেলা সদরে গিয়ে জেলা শাসকের সাথে দরবার করে গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের জন্য ডাক্তার আর কলেরার প্রতিষেধক ওষুধ নিয়ে এসেছে। সারা দিন রোগির বাড়ি বাড়ি ঘুরে দিনের শেষে যখন রোদে পোড়া অভুক্ত ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে বাড়ি ফিরত তখন তার সেই চেহারা দেখে স্বর্ণপ্রভা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতেন।

বসুন্ধরা হেসে দিদাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে তিনি পিছিয়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠতেন বলতেন, হতভাগি, সারা রাজ্যের নোংরা গায়ে মেখে আমাকে ছুঁতে এসেছিস। যা, স্নান করে তবে ঘরে ঢুকবি।

বসুন্ধরার জন্য শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, বাথরুমে রেখেই ছুটতেন রান্না-ঘরের দিকে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাবারগুলি রাঁধুনিকে দিয়ে গরম করাতেন। স্বর্ণপ্রভা অমিয়া দেবীকে ডেকে পাঠাতেন। বলতেন, ওকে তুমি একটু শাসন কর। মেয়ে মানুষ কি কখনো ব্যাটাছেলে হতে পারে?

অমিয়া দেবী বলতেন, সে কথা তো সত্যি। তুমি যাও আমি ওকে বকে দিচ্ছি।

স্বর্ণপ্রভা বলতেন, ভালো করে বকবি। দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাবি। আমি ছু বললে তো খিলখিল করে হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, এই পেত্নীর সাজ দেখিয়ে সে কি তার জন্য আমার কাছে সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্র নিয়ে আসবে।

অমিয়া দেবী বলতেন, আমি ওকে খুব বকে দেব। এরকম করে চলবে কী করে? নিজেই একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বসবে।

স্বর্ণপ্রভা খুশি হতেন। বলতেন, যার মরার কথা নয় সেই হতভাগী আমার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিব্যি চলে গেল। আর আমি ঘাটের মড়া হয়েও যক্ষের মতন সব আগলে বসে আছি।

[৪]

আঁচলের কোনা দিয়ে চোখ দুটো মুছতেই আবছা দৃষ্টিটা আবার স্বচ্ছ হয়ে আসে। অমিয়া দেবী দেখতে পেলেন, বসুন্ধরা ধীরে ধীরে গেটের ওপারে যাচ্ছে। কানাই তার পাশে পাশে চলেছে।

একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন অমিয়া দেবী। স্বামীকে হারাবার যন্ত্রণার মাঝে আরো একটা ক্ষত তার যন্ত্রণাকে তীব্র করে তুলত।

স্বামী বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর এরিয়া ম্যানেজার। উঁচুদরের চাকুরি। ভাল মায়না, সুন্দর ফ্ল্যাট। কিন্তু স্বামী প্রতুলকে সপ্তাহে চার দিনই ট্যুরে কাটাতে হয়। বিয়ের পরেই চলে এসেছিলেন শিলিগুড়িতে। পাহাড়ের নিচে জমজমাট শহর। সকালে উঠেই চারতলা ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে তুষারে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা। সন্ধ্যায় জানালা দিয়েই দেখা যায় তিনধারিয়া আর কার্শিয়াং স্টেশনের আলো। মাঝে মাঝেই পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা মোটর গাড়ির আলো উজ্জ্বল হয়ে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে যায়। শহর থেকে কয়েক পা দূরেই দুটি পাতা একটি কুড়ির তরল সোনার সবুজ চাদর। আবার হিলকার্ট রোড় সেভোক রোড, বর্ধমান রোড, বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেট, এয়ার কন্ডিশন মার্কেট ঘিরে নগর সভ্যতার উপকরণ।

সেই উদ্দাম দিনগুলির কথা মনে পড়লে আজও অমিয়াদেবীর গণ্ডদেশে সিঁদুরের আভা দেখা দেয়, নতুন জায়গায় বিশাল ফ্ল্যাটে একা। প্রথম প্রথম খুবই ভয় পেতেন। কিছুদিনের

মধ্যে সেটাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বরং কলকাতায় এলে যৌথ বাড়িব হৈ-চৈতে হাঁফিয়ে উঠতেন।

বিয়ের বছর ঘুরতেই ভালোবাসার ফসল তমাল তাদের দুজনের মধ্যের জায়গাটুকুতে জায়গা করে নিল। প্রতুলের কপট হিংসুটেপনায় মজা পেতেন। তমাল ঘুমিয়ে আছে দেখে প্রতুলবাবু স্ত্রীর প্রতি তার অনুরাগ জানাতে গেছেন এমন সময় তমাল জেগে উঠে কান্না শুরু করল। ছেলেকে শান্ত করে স্বামীর প্রতি মনোযোগ দিতে গিয়ে দেখতে পেতেন এতক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রতুলবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভোরের ট্রেনেই ট্যুর। স্বামীর ঘুমশ্রান্ত শরীরটাকে আর জাগাতেন না। আবার যখন প্রতুলবাবু তার কয়েক দিনের ট্যুর সেরে বাড়ি ফিরতেন ছোটো তমাল বাবার কোলে আঁকড়ে থাকত। যখন ছাড়া পেত তখন দুটি উষ্ণ হৃদয় পরস্পর পরস্পরকে শুষে নিতে চাইত। দুটি শরীরের উন্মাদ কম্পন ফ্ল্যাটের প্রতিটি বস্তুকেই যেন লজ্জার ঢাকনার আড়ালে যেতে বাধ্য করত।

শত সাবধানতা সত্ত্বেও অমিয়া দেবী আবিষ্কার করলেন তিনি আবার মা হতে চলেছেন, কোনো অসতর্ক মুহূর্তে ভালোবাসার উদ্দামতা যে লোহার বাসর ঘরেব ছিদ্র বেয়ে জঠরে নতুন প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করেছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তমালের বয়স তখন তিনেব চৌকাঠ পেরিয়ে চারের দরজায় পৌঁছাতে চলেছে।

অমিয়া দেবী ভেবেছিলেন প্রতুলবাবু নিজে থেকেই এর একটা ব্যবস্থার কথা বলবেন। অথচ এই খবরে তিনি আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন। তার আশা এবার তাদের ঘরে নিশ্চয়ই কন্যারত্নের আবির্ভাব হচ্ছে। তার নামও ঠিক করে ফেলেছিলেন।

অমিয়া দেবী তার এই দ্বিতীয়বারেব গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাকে মেনে নিতে পারছিলেন না। একদিকে তমালের দেখা শোনার ব্যাপার, অপর দিকে স্বামীর সহকর্মীদের স্ত্রীদের সাথে মাঝে মধ্যে নানা ধরনের পার্টির ঘূর্ণীতে একটু একটু করে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছেন। ফলে গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাকে আধুনিকাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়াকে লজ্জাজনক বলে মনে করেছিলেন। প্রতুলবাবুর পরিচিত ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত করিয়ে এসেছিলেন।

প্রতুলবাবু ঘটনাটিতে বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। তার অমতে তাদের চিকিৎসক বন্ধুটির একাজ আইন বিরুদ্ধ হলেও এ নিয়ে তিনি কোনো কথা বলেন নি। অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন, ঘরে একটা কচি মেয়ে না থাকলে ঘরটাই ফাঁকা লাগে।

অমিয়া দেবী বুঝতেন কথাগুলি তার উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে। স্বামীর পাশে একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে বলতেন, তুমি কি করে জানলে আমাদের এবার মেয়ে হতো?

অভিমানে কোনো জবাব দিতে চাইতেন না প্রতুলবাবু। অমিয়া দেবীকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো। প্রতুলবাবু বলতেন, আমার মনে হয়।

অমিয়া দেবীর মনেও ক্রমে ক্রমে কেমন একটা অপরাধ বোধ জায়গা নিতে শুরু করেছিল। নিজেকে মাঝে মধ্যে খুনি বলে মনে হতো। কোনো কোনো দিন স্বপ্ন দেখতেন, অন্ধকার থেকে দুটি কচি হাত তার দিকে বাড়িয়ে আছে। তিনি তার শরীরের কোনো অংশ দেখতে পাচ্ছেন না অথচ তার কান্না শুনতে পাচ্ছেন। ঘুম ভেঙে যেত। দেখতেন তার সাবা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। প্রতুলবাবুকে বলতেন, তুমি আমাকে আরেকবার সুযোগ দাও। আমি তোমার মেয়ের মা হতে চাই।

সেদিন কোম্পানীর জরুরী মিটিং-এ প্রতুলবাবুর দিল্লি যাবার কথা। সঙ্গে কোম্পানীর বড় কর্তা। আজকের দিনটা স্ত্রীর কাছে থাকার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্বামীর

মনের ভাষা পড়তে অমিয়া দেবীর অসুবিধা হয় নি। স্বামীর সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা তার মনেও তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বড়কর্তা ছুটি দিতে রাজি নন এমন কি স্ত্রী খুব অসুস্থ এই কারণও তার সিদ্ধান্তকে টলাতে পারেনি। বড় কর্তা জানিয়ে দিলেন, শেষ মুহূর্তে এই প্রোগ্রাম বাতিল করা সম্ভব নয়।

অমিয়া দেবী স্বামীর বুকে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যাও, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। তাছাড়া আজকে তোমার মেয়ে আসবে না। এখনও তিনদিন বাকি আছে।

নারীর ঋতুচক্রের হিসেব প্রতুলবাবুর অজানা নেই। যাবার সময় স্ত্রীর কপালে একটা গাঢ় চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের মেয়ের জন্ম এই ফ্ল্যাটে হবে না। ওর জন্ম হবে ডাল লেকের বোটে। ওর ঠোঁটে থাকবে গোলাপের হাসি। সারা শরীর জুড়ে থাকবে কাশ্মীরী সৌন্দর্যের সুবাস। তুমি তৈরি থেক। দিল্লি থেকে ফিরে এসেই রওনা দেব।

দিল্লি থেকে বাগডোগরায় ফ্লাইট আসাব কথা দুপুরে। তমালকে স্কুলের বাসে তুলে দিয়ে এসে আজ তাড়াতাড়ি স্নান পর্বটা সেবে নিলেন অমিয়া দেবী। রান্না আগেই করে রেখেছেন। একটা মুহূর্তও ব্যয় করতে চান নি। আবাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিজেকে ফুলের ডালির উপকরণের মতন সাজিয়ে তুলেছিলেন। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই প্রতুলবাবুর এসে পড়ার কথা। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এ ফোন করে জানতে পেরেছেন দিল্লির ফ্লাইট পাটনাতে ল্যান্ড করেছে। কিছুক্ষণেব মধ্যেই বাগডোগবাব উদ্দেশে উড়বে। টিভিটা চালিয়ে দিলেন। একটা হিন্দি সিরিয়াল হচ্ছে। অন্য সময় হলে টিভিটা সাথে সাথে অফ করে দিতেন। এই প্যান প্যানে সিরিয়ালগুলি তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু আজ তার কাছে সব কিছুই সুন্দর লাগছে। এমন কি সিরিযালের নাযক নায়িকার লম্ফ-ঝম্পের দৃশ্য আজ খারাপ লাগছিল না। হঠাৎ সিরিয়ালে মধ্যেই ঘোষিকার বিশেষ ঘোষণা। আমরা গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি দিল্লি বাগডোগরা গামী ফ্লাইট পাটনা থেকে ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে পাইলট ও ক্রু সমেত সমস্ত যাত্রী এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন....।

এরপব আর কিছু মনে নেই অমিয়া দেবীর। হাসপাতাল, মর্গ, বিমান বন্দর কিভাবে গিয়েছিলেন, কে নিয়ে গিয়েছিল কিছুই মনে করতে পাবেন নি। প্রতুলবাবুকে সনাক্ত করেছিলেন তার বিয়েব আংটি দিয়ে। দেহের আব কোনো অংশই চেনার উপায় ছিল না।

অর্থাভাব কী তা কোনোদিন বোঝার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। বাবা নামি কলেজের অধ্যক্ষ। বাজারে তার লেখা বেশ কয়েকটা পাঠ্য বই-এর দারুণ কাটতি। এছাড়া দেশে বিদেশে নামি পত্র-পত্রিকায নিয়মিত লেখেন। প্রিয়তোষ সেন বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত নাম। দুই পুত্র, এক কন্যা। ছোট পুত্র আই. এ. এস. সচিব পদে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আছে। বড় জন এন. এইচ. পি. সির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। অমিয়া দেবী কনিষ্ঠতম সন্তান।

কন্যা সন্তানেব জন্মের তিনি বছরের মধ্যেই ধরা পড়ল ক্যান্সার তার স্ত্রীর লিভারে পাকাপোক্তভাবে বাসা বেঁধেছে। চিকিৎসার ত্রুটি রাখেন নি। বড় শ্যালক নিজেই ডাক্তার। দেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। তবু চোখের সামনে তিল তিল করে স্ত্রী চলে গেলেন। শেষবারের মতন মাথার কাছে বসা মেয়েব হাতটা স্বামীর হাতে দিয়ে চোখ বুঁজেছিলেন। গলা দিয়ে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল। প্রিয়তোষ বাবু বুঝতে পেরেছিলেন তিনি অমিয়াকে দেখতে বলে গেলেন।

মায়ের মমতা দিয়েই মানুষ করেছেন মেয়েকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত কৃতিত্বের

সাথে উত্তীর্ণ হবার সব উপকরণ হাতের কাছে সাজিয়ে রেখেছেন। বিয়ের জন্য খুব একটা চেষ্টাও করতেও হয়নি। নিজের মেধাবী ছাত্র, সচ্ছল পরিবারের প্রতুলবাবুকে নিজেই পছন্দ করেছিলেন। বিয়েটাও দিয়েছিলেন বেশ ঘটা করে। মেয়ে-জামাই যখন একসাথে আসত একটা সুখের ঘ্রাণ অনুভব করতেন। অথচ বিয়ের দশ বছরের মধ্যেই মেয়েকে বিধবার বেশে ফিরিয়ে আনলেন।

দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, জীবনবীমা ও কোম্পানী থেকে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তার সুদ থেকেই মা ছেলের ভালভাবে চলে যেত। কোম্পানীর পক্ষ থেকেও অমিয়াদেবীকে তাদের কলকাতা অফিসে ভাল অঙ্কের একটা চাকুরী দেবার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অমিয়া দেবী স্বামীর অফিসে চাকুরী করতে চান নি।

আরো একটা জিনিস তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আত্মীয় স্বজনের ভিড় ও তাদের অযাচিত উপদেশ। কিছু স্বঘোষিত শুভানুধ্যায়ীদের তার প্রতি অতিরিক্ত মনযোগ—তার প্রতি সত্যিই আত্মীয় সুলভ আন্তরিকতা, না তার নামে গচ্ছিত ব্যাঙ্কের অর্থের প্রতি তাদের দুর্বলতা, কোনটা আসল কারণ তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একটা নির্জনতার খোঁজে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সব হারানোর যন্ত্রণা কাতর হৃদয়টিকে নির্জনতার কোলে সঁপে দিয়ে একটু হালকা হতে চেয়েছিলেন।

বাবার কাছে যখন অমিয়া দেবী কলকাতা থেকে প্রায় তিনশ কিলোমিটার দূরের এই গ্রামের স্কুলের চাকুরির কথা বলেছিলেন, তখন প্রিয়তোষ বাবু শুধু বলেছিলেন, ওখানে থাকতে পারবি তো মা?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোমার হাতেই তো আমি গড়ে উঠেছি বাবা। তুমি সাহস দিলে কেন পারব না?

প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, তোর যদি ভালো লাগে আমি আপত্তি করব না। তবে তুই তো কলকাতার কোনো কলেজেই অধ্যাপকের কাজ পেতে পারিস।

অমিয়া দেবী বাবার মুখের দিকে একটা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, আমি কটা দিন এই শহরের হৈ-চৈ থেকে একটু দূরে থাকতে চাই। তুমি আছ। ভালো না লাগলে তোমার কাছে ছুটে আসব।

প্রিয়তোষ বাবু অমিয়া দেবীর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, তাই কর মা, আমি তোকে তোর দাদা-বৌদির সংসারে থাকতে বলব না। আবার তোর দেওর জা-এর মাঝে থাকতে পারবি বলে মনে হয় না। আজকের এই সহানুভূতি যে কালকে ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না, একথা কে বলতে পারে? তবে তোর এই বুড়ো বাবাটাকে যখনই দরকার হবে তখনই কিন্তু ডাকিস।

কলকাতা থেকে এই পাড়াগাঁয়ের স্কুলে আসার খবরে অনেকেই নানা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। মধ্য যৌবনে এভাবে একাকী এক অচেনা জায়গায় চলে আসার প্রস্তাবে আত্মীয়-স্বজন প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু কোনো আপত্তিই অমিয়া দেবীর ঋজু ব্যক্তিত্বের [illegible] মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি।

তমালকে নিয়েই সমস্যা হয়েছিল। তিনি তাকে এখানকার [illegible] করতে চাইলেও শ্বশুর বাড়ি থেকে তীব্র আপত্তি উঠেছিল। প্রিয়তোষ বাবুই [illegible] তুই জিদ করিস না। ওকে কেন তুই শোকের নির্জনতায় [illegible]। তুই মা ওকে পিতৃহীনতার পরিবেশের ছায়া থেকে মুক্ত রাখ। সমস্ত দুঃখ মাতা [illegible]র মতন তুই শুষে [illegible]লের পড়ার ব্যবস্থা কলকাতাতেই কর।

অমিযাদেবী বলেছিলেন, তবে তমাল হোস্টেলে থাকবে। আমি চাই না ও সহানুভূতি নিয়ে বড় হক।

কলকাতার নামী স্কুল ও হোস্টেল কোনট্য পেতেই কোন অসুবিধা হয়নি। প্রিয়তোষ বাবুর নাম ও সচিব বড়ছেলের সুপাবিশ সব কিছুই অতি সহজে হয়ে গেল।

প্রথম দিন তমালের কান্নায় সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কাপড়ের আঁচল থেকে ওর কচি আঙ্গুলের মুঠিকে ছাড়াতে নিজের হৃদয়টাকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছিলেন। একটা সময় মনে হত তিনি হেরে যাবেন। তমালের সেই কান্নার আওয়াজ তার কানে ভেসে আসত। তার সেই কান্না ভেজা কচি মুখটাকে মনে মনে লক্ষ চুমায় ভরিয়ে দিতেন। বহুদিন ঘুমের মধ্যে তমালেব ডাক শুনে উঠে বসতেন। জানালা খুলে রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দুচোখের জলে গন্ডদেশ ভেসে যেত। অনেক রাতে পদত্যাগ পত্র লিখে ফেলতেন। ভাবতেন ভোর হলেই এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তমালকে বুকে টেনে নেবেন।

সকালেব পুব আকাশে সোনালী আভার সাথে সাথে ট্যাঙ্গনের বুকে ভাটিয়ালিব সুরে ঘুম ভেঙ্গে যেত। রাতের লেখা পদত্যাগ পত্রটি ছিঁড়ে ফেলে একা বেরিয়ে পড়তেন মেঠো পথ ধরে ট্যাঙ্গনেব তীরে। গ্রামের অলস সকালেও মাঠে নেমে পড়েছে কৃষক। বড়দিমনিকে দেখে হাল থামিয়ে প্রাণ খোলা হাসিতে প্রণাম করে। ট্যাঙনের মুক্ত হাওয়ায় প্রাণ ভবে নিশ্বাস নিতেন। মাঝিরা দূব থেকে প্রণাম করত। ফেরার পথে আঁচল ভবে আনতেন শিউলি, যুঁই, টগব। দু-একজন সমাজ পিতা অযাচিতভাবে যে গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসেনি তা নয। তবে তার কঠিন চাউনির ছোবলে কুঁকড়ে গেছে।

স্কুল ছুটি থাকলে চলে আসতেন কলকাতায়। প্রথম প্রথম মাকে দেখতে পেয়ে তমাল ছুটে এসে তাব কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। অনেক সময় সেই বেগ সইতে না পেরে মাটিতে বসে পড়তেন। শুরু হত মা-ছেলের লুটোপুটি। হাঁফিয়ে উঠতেন ছেলের আদরের চোটে। সারা মুখ ভরে যেত ছেলেব চুম্বনের লালায়।

তমালের পরিবর্তনটা টের পেতে শুরু করেছিলেন অমিয়া দেবী। আর সেটা দূরে থাকেন বলেই এত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতেন। নাকের নীচে সরু কালচে রেখা। গলার সেই আধো আধো স্বরেব পরিবর্তে গম্ভীর আওয়াজ। কপালে ও গালে দু একটা ব্রণের উঁকি ঝুঁকি।

এখন আব মায়ের কাছে সেই উচ্ছ্বাসে ছুটে আসে না তমাল। অমিয়া দেবী এলে ধীরে ধীরে হোস্টেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। মনের উচ্ছ্বাস এখন হিসেবী হাসিতে ঢেকে রাখে। বুকের কাছে টেনে নিতে গেলে সঙ্কোচে সরে যায়। অমিয়া দেবী তার সেই ছোট্ট তমালকে খুঁজতে গিয়ে বার বার হারিয়ে ফেলতেন। ছুটি ফুরিয়ে গেলে তমালকে যখন হোস্টেলে রাখতে যেতেন তখন মনে মনে চাইতেন তমাল হোস্টেলের গেটে ঢোকার আগে তাকে সেই আগের মতন জড়িয়ে ধরে কাঁদুক। বলুক, মা আমি তোমাকে ছেড়ে থাকব না।

তমাল হোস্টেলের গেটের ভিতর সোজা চলে যেত। বন্ধুদের দেখে তাদের সাথে আনন্দে মেতে উঠত। ভিতরে ঢোকার সময় একবার শুধু এদিকে তাকিয়ে মার দিকে টা-টা করে মিলিয়ে যেত। তবু দাঁড়িয়ে থাকতেন অমিয়া দেবী। মনে হতো তমাল হয়তো আবার আসবে, বলবে, মা তুমি কেঁদো না, আমি ভালো আছি। হোস্টেলের গেট থেকে চলে আসার সময় বার বার ফিরে তাকাতেন। তমাল কী তাকে দেখতে আরেক বার উঁকি দেবে না? বুঝতে পারতেন তার সেই তমাল ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

বসুন্ধরা এসেছিল দিদিমা স্বর্ণপ্রভার সাথে। সবে তখন স্কুল বসেছে। অমিয়া দেবী প্রথম ক্লাসটা নেন না। স্পোর্টসের নোটিশটা কানাই-এর হাত দিয়ে ক্লাশে ক্লাশে পাঠিয়ে দিয়ে বসেছেন। স্বর্ণপ্রভা বসুন্ধরাকে নিয়ে সোজা তার ঘরে ঢুকেছিলেন। কোন অনুমতি না নিয়ে সোজা তার ঘরে ঢুকে পড়াকে অমিয়া দেবী পছন্দ করেন না। হোক না গ্রাম। সৌজন্যবোধ সবার জন্য। তাই একটা বিরক্তি নিয়ে তাকাতেই বসুন্ধরার দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্রই কেমন একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন।

বসুন্ধরার পরনে নেভি ব্লু স্কার্ট। পায়ে সাদা মোজার উপর কালো জুতো। ঘাড় পর্যন্ত ঘন চুল। বুঝতে পারলেন এ কোনো অভিজাত স্কুলের ড্রেস। এই স্কুলেরও একটা ড্রেস চালু করার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গ্রামে যেখানে দুবেলা ভাতেরই অভাব সেখানে স্কুল ড্রেসের কথা ভাববে কে?

সুন্দর মানিয়েছিল বসুন্ধরাকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনের গভীরে কেমন একটা যন্ত্রণার মোচড় অনুভব করেছিলেন অমিয়া দেবী। তার জঠরের ভ্রূণও তো প্রায় এ বয়সীই হতো। ডাল লেকের স্বপ্ন ভেঙ্গে না গেলে এমন একটা মেয়ে তার ঘরেও থাকত। এই কি সেই বসুন্ধরা যাকে অঙ্কুরে হত্যা করে আবার তাকেই ফিরিয়ে আনার আকুল প্রতীক্ষায় দিন গুনে চলেছিলেন? কথাটা মনে হতেই সারা শরীরে কেমন একটা কম্পন অনুভব করেছিলেন।

এই আমার নাতনি বসুন্ধরা। স্বর্ণপ্রভার কথায় চমক ভেঙ্গে ছিল অমিয়া দেবীর।

কাছে ডেকেছিলেন—আমার কাছে এস। জড়তা শূন্য বসুন্ধরা তার কাছে এসে কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল।

ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেখে চমকে উঠেছিলেন অমিয়া দেবী। কার্শিয়াং শহরের ভারত খ্যাত এক স্কুল। মার্কস-সীটের নম্বরগুলি বার বার দেখার মত।

চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাঁপ ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ও এই স্কুলে পড়বে?

স্বর্ণপ্রভা মৃদু স্বরে বললেন, ওকে যদি ক্লাসে পাঠিয়ে দাও তবে তোমাকে কটা কথা বলব মা।

শুধু কথা বলার ভঙ্গিতে নয়, স্বর্ণপ্রভার চেহারার মধ্যে আভিজাত্য ও সৌজন্য প্রকাশের এক সেতু-বন্ধন অমিয়া দেবীকে মুগ্ধ করেছিল। বসুন্ধরাকে টেনে নিয়েছিলেন নিজের কোলে। কপালে স্নেহের চুম্বন দিয়ে বলেছিলেন, চল তোমাকে ক্লাসের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি।

বড়দিমনিকে দেখে ক্লাস টিচার সহ সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। বসুন্ধরাকে সামনের বেঞ্চে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ও তোমাদের সাথে পড়বে। ওকে তোমরা তোমাদের বন্ধু করে নিও।

অমিয়া দেবীর নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখেছিলেন স্বর্ণপ্রভা চেয়ারের হাতলে দুহাত প্রসারিত করে বসে আছেন। বসার এই ভঙ্গিমার মধ্যে এক আভিজাত্যের প্রকাশ থাকলেও আজ কেন জানি তা মেনে নিতেই অমিয়া দেবীর ভালো লাগছিল।

এখানে এসে এ বাড়ির কথা বহুবার শুনেছেন। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই বাড়ির বিশাল ফটকের পাশ দিয়ে অনেক বার গেছেন। এ অঞ্চলের জমিদারের বাড়ি। জমিদারী নেই। তবে জমিদারী পতনের সাথে এদেরও আর্থিক পতন ঘটেনি। শুনেছেন এ বাড়ির সব ছেলেরাই কৃতি। তবে তারা কেউ এখানে থাকেন না। এখানকার স্কুলের জমিটি এদেরই দান।

অনেক বার ভেবেছেন এ বাড়িতে এসে নিজেই স্বর্ণপ্রভার সাথে পরিচয় করে যাবেন। কিন্তু এক অব্যক্ত অহংবোধ সেই ইচ্ছেকে বার-বার বাধা দিয়ে এসেছে। মনে মনে ভেবেছেন জমিদার বাড়িতে অযাচিত ভাবে তার যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এবারের পুজোর

ছুটির পর ফিরে এসে শুনতে পেয়েছিলেন, এ বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বাড়ির একমাত্র কন্যা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। গিয়েছিলেন স্বর্ণপ্রভার সাথে দেখা করতে কিন্তু দেখা পান নি। স্বর্ণপ্রভা দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই দুই ছেলেকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। পরে তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে পুত্রবধুরাও সেখানে গেছে।

অমিয়া দেবী নিজের চেয়ারে বসতেই স্বর্ণপ্রভা হাত দুটো হাতল থেকে গুটিয়ে এনে নিজের কোলের উপর রাখলেন। সারা মুখে বিষাদের ছবি। বললেন, আমার মেয়ে বেঁচে থাকলে তোমার বয়সী হত।

তুমি শব্দটা কোন অপরিচিতের কাছ থেকে বহু দিন বাদে শুনলেন বলেই হয়ত কানে বেজেছিল। বোঝার চেষ্টা করলেন এটি গ্রাম্য আভিজাত্যের কোন প্রকাশ ভঙ্গি কিনা।

মনে হয় তুমি বলাতে রাগ করনি। স্বর্ণপ্রভার কথায় চমকে ওঠেন অমিয়া দেবী। একটা অপরাধ বোধ মনের কোণে উঁকি দেয়। স্বর্ণপ্রভা কি মনের ভাষা পড়তে পারেন? বলেন, আমি তো আপনার মেয়েব মতন। তুমিই বলবেন। তবে আপনি না এসে আমাকে খবর দিলেই পারতেন। আমি নিজে গিয়ে বসুন্ধরাকে নিয়ে আসতাম।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, তা কি হয় মা? আমি তো তোমাদের মতন লেখা পড়া জানি না। তবে এটা জানি শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্মান সবার উপরে। তুমি আমাদের এই গ্রামে এসেছ আমি শুনেছি। আমারই তোমার কাছে যাবার কথা ছিল। সে সুযোগ পেলাম কোথায়? মেয়েটা যে আমার সব শক্তি নিংড়ে নিয়ে চলে গেল। এখন শুধু কর্তব্যের তাগিদে আর জিদের উপব বেঁচে আছি।

একটা অনুশোচনাব স্রোত অমিযা দেবীর মনের গহনে বয়ে যায়। বাড়ির উঁচু প্রাচীর দেখেই ভিতরের মানুষটাকেও অহংকারের প্রাচীবের বাসিন্দা বলে ধরে নিয়েছিলেন। বললেন, না মাসিমা মায়েব কাছে মেয়েই তো যায়।

স্বর্ণপ্রভা শুধু অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। দু-চোখের কোনায় জমে থাকা অশ্রুকে আঁচল দিয়ে মুছে বলেছিলেন, মেয়ে যখন বললি তবে তোর এই হতভাগিনী মায়ের কথা শোন। বসুন্ধরার মা আমার একমাত্র সন্তান না হলেও একমাত্র মেয়ে। ওকে বিয়ে দিয়েছিলাম অনেক দেখে শুনে। তখন মনে হয়েছিল একেবারে খাঁটি হীরেই তুলে এনেছি। যেমন দেখতে তেমনি তার চলন-বলন। পড়াশোনাতেও ভালো। কুলীন ঘর। দার্জিলিং-এর নামি সাহেব কোম্পানীর চা বাগানের ম্যানেজার। বিশাল কোয়াটার্স। কোম্পানীর গাড়ি, চাকর, রাধুনী। আর কি চাই? বিয়েব পর যখন অষ্টমঙ্গলে বাড়ি এল, আত্মীয়স্বজনদের প্রশংসায় আমার পছন্দের গর্বে বুক ভরে যেত।

বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বসুন্ধরা এসেছিল ওর মা বৈশাখীর কোল আলো করে। আমার দুই ছেলের ঘরে দুই নাতি। তাই এ বাড়িতে কন্যাসন্তানের আগমন আনন্দের ঢেউ তুলেছিল। বসুন্ধরার অন্নপ্রাশনে আমার ছোট ছেলে পর্যন্ত বোস্টন থেকে তার ডাক্তারি বন্ধ রেখে উড়ে এসেছিল।

বৈশাখী প্রতি পূজাতেই আসত। প্রথম তিন বছর জামাই সাথে এসেছে। তারপর একাই আসত। জামাই-এর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাগানে ভীষণ কাজের চাপ তাই আসতে পারল না। তবে মাঝে মধ্যে যে আসত না তা নয়। দু ছেলের একজন তো বিদেশে মেম বিয়ে করে সেখানকার বাসিন্দা হয়ে গেছে। বড় ছেলে দিল্লিতে। সবসময় ব্যস্ত। তাদের আসার কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না। স্বামী তো এই বিশাল বাড়িতে আমাকে যক্ষের মতন বসিয়ে দিয়ে নিজে অনন্ত বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন। আমি এই বিশাল পুরিতে একা। পূজার

দিনগুলির অপেক্ষায় বসে থাকি। এ দিনগুলিতে মা আমার কাছে মৃন্ময়ী রূপে আসেন না, আসেন চিন্ময়ী সত্তা নিয়ে।

লক্ষ করতাম বৈশাখীর সেই উচ্ছল উচ্ছ্বাসে যেন কেমন একটা ভাটার টান। সারা মুখে একটা মলিনতার ছাপ। যে মেয়ে ছিল কথার ঝরনা—বেশি কথা বলার জন্য ধমক খেয়েও আরো বেশী করে কথা বলত, সেই মেয়ে কেমন গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, কি যে বল মা, এখন আমার বয়স হয়েছে না? কথা বলবে তো বসুন্ধরা।

সত্যি তাই। মার স্বভাবই পেয়েছিল বসুন্ধরা। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার মেয়ে ছিল না। ওর কথা আর প্রশ্নের বন্যায় সবাই পালাই পালাই করত। কাউকে হাতের কাছে না পেলে বারান্দার রেলিং গুলোর সাথেই বক বক করে চলত। সেই বসুন্ধরাই একদিন আমাকে বলেছিল, জানো দিদা, বাবা না মাকে মারে।

বিশ্বাস করিনি ওর কথা। তবু একদিন বৈশাখীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হ্যাঁরে, বসুন্ধরা এসব কী বলছে?

কী যে বল মা? বসুন্ধরা যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চেয়েছিল। বলেছিল, ও কি দেখতে কি দেখেছে। তুমি ওর কথা নিয়ে ভাবছ?

নিজের কাছেই লজ্জা পেয়েছি। স্বর্ণপ্রভা ধরা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, ভেবেছি স্বামী-স্ত্রীর সোহাগের কোনো বাড়াবাড়ি হয়তো অসতর্ক অবস্থায় বসুন্ধরার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেটাকেই সে তার মায়ের উপর বাবার অত্যাচার বলে ধরে নিয়েছিল।

একদিন আমি ওর পিঠে একটা পোড়া দাগ দেখতে পেয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল, পিছনে গরম ইস্তিরি ছিল। সে দেখতে পায়নি। তারই ছেঁকা লেগে পুড়ে গিয়েছিল।

আপনি ওর কথা বিশ্বাস করলেন? অমিয়া দেবী কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, মেয়ের কোনো কথাই অবিশ্বাস করতে পারিনি। পারবই বা কীভাবে? ও থাকলে জামাই-এর চিঠি কয়েকদিন পরপরই আসত। আর মেয়েও যে আমার পিয়নের আশায় বসে থাকত। পিয়ন এলেই ছুটে যেত। কারো হাতে চিঠি পড়তে দিত না। চিঠি হাতে নিয়েই ছুটে যেত ওর শোবার ঘরে। অনেকক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরত। মনে মনে হাসতাম। ভাবতাম আজকালকার ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। বিয়ের এতদিন পরেও এদের অনুরাগের উত্তাপ এতটুকুও কমেনি। একদিন একটা খাম ওর ঘরের খাটের নীচে পড়ে থাকতে দেখে সেটি তুলে এনে একটা বই এর মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। লোভ হয়েছিল খুলে দেখি। পরক্ষণই নিজের উপর ঘৃণায় নিজেই মরমে মরে গেলাম। মা হয়ে মেয়ে-জামাইয়ের চিঠি পড়ার লোভ—এ লজ্জা রাখব কোথায়?

গত বছর পুজোর পর তার শেষ যাওয়া। যাবার আগের দিন বৈশাখী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা মা, বাবা যে আমার নামে ক্যাশ সার্টিফিকেট করেছিল তা কি এখন ভাঙান যাবে?

বৈশাখীর কথায় বেশ অবাকই হয়েছিলাম। আমার স্বামী ছিলেন খুব হিসেবী। ছেলে মেয়েদের জন্য টাকা ভাগ করে দিয়েছিলেন। তবে তা রেখেছিলেন আমার সাথে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে। আমার মৃত্যুর পরই যে যার টাকা তুলতে পারবে। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত সে টাকার খোঁজ করে নি, তাই অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কেন বলত? তোর কি টাকাটা লাগবে?

বৈশাখী একটা গভীর সঙ্কোচে বলেছিল, না মা, এমনি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দরকার হলে বলব।

ওরা পরের দিনই চলে গেল। আমার মনের মধ্যে একটা কাঁটা যেন ফুটে রইল। ভাবলাম একবার যখন টাকা পয়সার খোঁজ পড়েছে এবার সবার টাকা যার যার নামে ভাগ করে দিয়ে আমি হালকা হব।

বৈশাখীর চিঠি আসত। তবে সামান্য কয়েক লাইন। ও ভালো আছে, জামাই ভালো আছে। এটুকুই। বসুন্ধরা লাইন টানা কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে পাতা ভরে চিঠি লিখত। কত কথাই না থাকত। ওদের ডালসিশিয়ান কুকুরটার কানে ব্যথার কথাও বাদ পড়ত না। অথচ সেই চিঠিতে ওর বাবার সম্পর্কে একটা অক্ষরও থাকত না। কেন জানি মাঝে মাঝে মনে হতো কোনো অদৃশ্য শাসন বসুন্ধরার কলমকে শাসন করতিছে।

অমিয়া দেবী নিঃশব্দে স্বর্ণপ্রভার প্রতিটি শব্দ তৃষিত মরুভূমির মতন প্রতিটি স্নায়ুকোষ দিয়েই শুষে নিতে চাইছিলেন। ঘটনাটি যে করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তা বুঝতে কোনো অসুবিধার কারণ ছিল না।

স্বর্ণপ্রভা বলে চলেছেন, প্রতিবারের মতন এবারও পূজার আয়োজন চলেছে। তবে এবারের আয়োজনটা ছিল অন্যবারের তুলনায় বেশি। বাড়ির পূজার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হবে। ছেলেদের আসতে লিখেছি। অন্য আত্মীয়রাও আসবে। গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি। তোমার বাড়িতেও গিয়েছিলাম। তুমি ছিলে না। কলকাতায় চলে গিয়েছিলে। ভেবেছিলাম বৈশাখী এলে ওকে পাঠিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব। আমার মতন মূর্খ বুড়ির সঙ্গ তো আর তোমার ভাল লাগবে না।

অমিয়া দেবী বাধা দেন, মাসীমা!

স্বর্ণপ্রভা ম্লান হেসে বলেছিলেন, রাগ করিস না মা। কথাটা এমনিই বললাম। আসলে সবার কাছে শুনতাম তোর কথা। কত বিদ্বান, সুন্দরী কিন্তু গম্ভীর, রাগী। মনে হতো, থাক বাবা, কি বলতে কি বলে ফেলব। বৈশাখী আসুক, তাকে নিয়েই তোর কাছে আসব।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন আমিও যে সব হারিয়ে এখানে এসেছি মাসীমা। যদি জানতাম এখানে আমার মা আমার জন্য অপেক্ষা করছে তবে কি আমিও এত যন্ত্রণা বুকে বয়ে বেড়াতাম। তোমার কাছে গিয়ে সব ব্যথা ঢেলে দিতাম।

স্বর্ণপ্রভা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে অমিয়া দেবীর দুটো হাত তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, আয় মা, তুই আমার বৈশাখী হয়ে ফিরে আয়।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, হ্যাঁ, মা, আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া বৈশাখী। তুমি আমার সেই বোনের কথা বল।

স্বর্ণপ্রভা আবার বলতে শুরু করেছিলেন। পূজোর দুদিন বাকি। বাড়ি ঘর [illegible] সেজেছে। বড় ছেলে, বড় বৌ ও নাতি আগেই এসে গেছে। ছোট ছেলে এসেছে তার মেম বৌকে নিয়ে। তাকে শাড়ি পরা শেখাতেই আমার সারা দিন চলে যায়। ইংরেজি বুঝি না, ওর কথা খাঁটি বাংলাতেই আন্দাজ মতো জবাব দি। আম বললে জাম ভাবি, আকাশ বললে মাটি ভাবি, তাই নিয়ে ছেলে বৌমা নাতিদের হাসাহাসি। বাড়ি জুড়ে আনন্দের জোয়ার। তবু দিন গুনি বৈশাখীদের জন্য। এবার জামাইকে খুব করে আসতে লিখেছি। বৈশাখী জানিয়েছে জামাই আসবে। ওদের ঘরটা তাই নিজেই গোছাতে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ একটা বইয়ের ভিতর থেকে একটা খাম মাটিতে পড়ে গেল। মনে পড়ল এটা আমিই বই-এর ভিতর রেখে দিয়েছিলাম। এবার কিন্তু সেই লোভটাকে দমাতে পারলাম না। কারণ, কেমন একটা অজানা আশঙ্কা মনের ভিতর কাঁটার মতন খোঁচা দিয়ে চলেছিল।

স্বর্ণপ্রভার গলাটা আবার ধরে এল। চোখের কোণ দিয়ে দুটি মুক্তোর ফোঁটা ঝরে পড়ে। আঁচলের কোনা দিয়ে চোখ দুটিকে মুছে নিয়ে বলেছিলেন, জানিস মা? যে চিঠিটাকে মেয়ের প্রতি জামাইয়ের অনুরাগ পত্র ভেবে সেদিন পড়তে লজ্জা পেয়েছিলাম তা যদি আগে পড়তাম তবে এই সর্বনাশা পরিণতিব যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে এভাবে বাঁচতে হত না।

অমিয়া দেবী নির্বাক শ্রোতা, স্বর্ণপ্রভার নীরবতা তার কাছে মনে হচ্ছিল কয়েক যুগের ব্যবধান।

জানিস মা, স্বর্ণপ্রভার গলার স্বর কেঁপে উঠল। যে চিঠি ওদের মধ্যে ভালবাসার গাঢ় প্রতীক বলে ধরে নিয়েছিলাম সেগুলি আসলে ছিল ভয় দেখানোর হুমকি। বৈশাখী ও আমার নামে অন্য দুই ছেলের মতন ওর বাবা দশ বছরের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশ সার্টিফিকেট করে রেখেছিল। সেই টাকা দাবি করে জামাই চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিটা পড়ে বুঝতে পারলাম জামাইয়ের সাথে অন্য কোনো একটা মেয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। টাকা না পেলে বিবাহ বিচ্ছেদের হুমকি দেওয়া আছে। বুঝতে পারলাম বৈশাখী কেন পিয়নের আশায় বসে থাকত। জামাইয়ের কোন চিঠি যাতে আমার হাতে না পড়ে, ওর উপর এই অত্যাচারেব খবর যাতে আমরা জানতে না পারি তার জন্য পিয়ন এলেই ওর চিঠি নিয়ে সোজা ওর ঘরে চলে যেত।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, চিঠিটা পেয়েই তোমরা কেন বৈশাখীর কাছে চলে গেলে না?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন একেই বলে নিয়তি মা। মৃত্যু মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেও মানুষ তাকে চিনতে পারে না। আর তো মাত্র দুদিন, তাই চিঠিটাব কথা ছেলেদেব বলিনি। ভেবেছিলাম, মেয়ে জামাই দুজনেই তো আসছে। এবার ওদের সাথে কথা বলব। টাকাটা ওদেরই। জামাইয়ের হাতে নিজেই তা তুলে দেব। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পবিত্র বন্ধন। তাকে ভাঙার পরিবর্তে জোড়া লাগানোই ধর্ম। পুরুষ মানুষের কিছু দুর্বলতা থাকে। ওদের সাথে কথা বলে মিটিয়ে দেব। দরকার হলে আরো টাকা দিয়ে জামাইয়ের মনকে ফিরিয়ে আনব।

পূজামণ্ডপে দেবীর বোধন। এ বাড়িতে কুমোব পাড়া থেকে মূর্তি আনা হয় না। ঠাকুর বাড়ির মণ্ডপেই পালমশাই এসে মূর্তি গড়েন। আমার মেম বৌমাব ভক্তিতে অনেকেই বেশ কৌতুক অনুভব করছে। বাড়ির প্রথা অনুসারে বোধনের সামগ্রী আমাকেই সাজাতে হয়। সে দিন প্রতি পদক্ষেপেই ভুল হচ্ছিল। মন আর চোখ পড়ে ছিল বাড়ির ফটকের দিকে। খালি ভাবছিলাম ওরা কেন এখনও এল না।

স্বর্ণপ্রভা একটু থেমে বললেন, তোমার সময় নষ্ট করছি মা। কী হবে আমার দুঃখেব কথা বলে তোমার মনটাকেও খারাপ করে দিয়ে?

অমিয়া দেবী চেয়ার থেকে উঠে এসে স্বর্ণপ্রভার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে মুখ উঁচু করে বললেন, কানাই দা, আমার ঘরে কাউকে এখন আসতে দিওনা। তারপর স্বর্ণপ্রভার গা ঘেসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, তুমি বল মা, আমার বোনের কথা বল।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, সেদিন সকাল থেকেই নির্জলা উপবাস। আর এতো সেই পঞ্চাশ বছর ধরেই করে আসছি। প্রথম কয়েক বছর খিদেয় ছটপট করেছি। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই উপবাসের দিনটার জন্যই অপেক্ষা করতাম। সারা শরীর ও মন পাখির পালকের মত হালকা লাগত। অথচ সেদিন সারা শরীর জুড়ে কেমন এক অসহনীয় ক্লান্তির বোঝা চেপে বসেছিল। গ্রামের সবাই এসেছে দেবী বোধনে, আমার পাশেই বসেছিল আমার দুই পুত্র-বধূ। লক্ষ করলাম আমার বড় ছেলে ইশারায় বড় বৌমাকে ডেকে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ও আমার হাত ধরে বলল,. মা একটু ঘরে চলুন।

লক্ষ করলাম ওর কথায় কেমন একটা চাপা কান্নার সুব। চোখ দুটি ভেজা। সারা দিনের অবসন্ন মনে কোনো ভাবার ক্ষমতা ছিল না। যন্ত্রচালিতের মত বড় বৌমার হাত ধরে উঠে এলাম। আমার ঘবে দু ছেলে ছাড়া আবো কয়েকজন ছিল। বুঝতে পারলাম কোথাও কিছু হযেছে। তবে অনুমান করার ক্ষমতা ছিল না।

বড় বৌমা এক গ্লাস দুধ এনে দিয়ে বলল, বোধনের কাজ মিটে গেছে মা। আপনি কিছু না খেলে আমরাও কিছু মুখে দিতে পাবছি না।

অন্য সময় হলে হাজার প্রশ্ন তুলে বৌমাকে ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু সেদিন যেন আমি আমার মধ্যে ছিলাম না। কী করেছি, কার কথা শুনেছি, কিছুই যেন বুঝতে পারছিলাম না। বড় বৌমার হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকেই শেষ করে খাটের ওপর অবসন্নের মত বসে পড়েছিলাম। মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল, হ্যাঁবে, খুকিব কিছু হয় নি তো?

বাইরে বত্রিশ ঢাকীর আওযাজ। মা দুর্গা পিতৃগৃহে পদার্পণ করছেন। বড় ছেলে আমার কোলে মুখ রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, মা খুকি আর আমাদের মধ্যে নেই। ও সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

স্বর্ণপ্রভা অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, জানিস মা, সেদিন কে যেন আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিল। বড়ছেলের মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নিযে বলেছিলাম, খোকা সবই কি শেষ হযে গেছে? না, সেই জানোয়ারটা শেষ দেখাটা দেখার জন্য খবর দিয়েছে?

বড়ছেলে কোন জবাব না দিয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজে পড়েছিল। বড় বৌমাই বলেছিল আমরা সব খবর এখনও পাইনি। কিছুক্ষণ আগেই টেলিগ্রাম এসেছে। ও নেই। কাপড়ে আগুন লেগে সব শেষ হয়ে গেছে।

ছোটছেলেকে বলেছিলাম তুই তো গাড়ি এনেছিস, ওটা বের কর। বৌমারা সব এখানে থাকবে। তোরা দুই ভাই আমার সাথে যাবি। বৌমা শুধু একবার বলেছিল, এবপরেও এবার পূজা কি হবে মা?

বলেছিলাম, হবে বৌমা। তোমার উপর সব দায়িত্ব দিয়ে গেলাম। এ পুজো শুধু আমাদের পুজো নয় আমার শ্বশুর মশাই মৃত্যুর আগে বাড়ির সিন্দুকের চাবির সাথে এই ঠাকুর বাড়ির চাবিটিও দিয়ে বলেছিলেন, এ পুজো যাতে কোনো দিন বন্ধ না হয়।

সারা রাত ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে কাক ভোরেই পৌছেছিলাম বাগানে। কার্শিয়াং ও ঘুমের মাঝখানে একটা ঢালু পথ বেয়ে নেমে গেছে সরু রাস্তা। ভুলে গিয়েছিলাম কি ঝুঁকিই না নিয়েছি। ছোটো ছেলে লন্ডনের রাস্তায় দুরন্ত বেগে গাড়ি চালায়। কিন্তু এই পাহাড়ি রাস্তায় অনভ্যস্ত হাতে গাড়ি চালিয়ে যদি কিছু ঘটত বৌমার কাছে কি জবাব দেব সে কথা ভাবার কথাও মনে ছিল না। তবু যখন পৌঁছালাম তখন সব শেষ। আগেই ওরা দাহের কাজ শেষ করে ফেলেছে। আমাদের জন্য পড়ে ছিল শুধু এক চিমটে অস্থি ভস্ম।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কবে অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন বসুন্ধরা তখন কোথায় ছিল?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, বসুন্ধরাকে আমার জামাই সে ঘটনা ঘটার আগের দিন শিলিগুড়িতে তার এক আত্মীয়র বাড়িতে রেখে এসেছিল। তাই ওর চোখের জল ছাড়া ওর কাছ থেকে আমরা কিছুই পেলাম না। জামাই বাঁ হাতে একটা ব্যান্ডেজ দেখিয়ে বলেছিল, ও বাথরুমে ছিল। বেরিয়ে এসে দেখেছিল খুকির সারা গায়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কলের জল এত জোরে পড়ছিল যে ও নাকি বাথরুম থেকে খুকি চীৎকার করে থাকলেও শুনতে পায়নি।

অমিয়া দেবী স্বর্ণপ্রভার কথার মাঝখানেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ম্যানেজারের বাংলোতে তো অনেক চাকর থাকে। তারা কেউ এগিয়ে আসেনি কেন?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, সেটাই তো রহস্যজনক। জামাই বলেছিল বাগানের মেলাতে সবাই একসাথে বেড়াতে গিয়েছিল। ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আগুন নেভাতে গিয়েছিল। তাই ওর হাত পুড়ে গেছে। আমার ছোট ছেলে ডাক্তার। ও প্রায় এক রকম জোর করেই হাতের ব্যান্ডেজ খুলে দেখেছিল একটা মামুলি ফোস্কা ছাড়া ওর হাতে পোড়ার কোন চিহ্ন নেই।

অমিয়া দেবী ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি স্কুলের ঘরে বসে আছেন। তীব্র ক্রোধে নিজের টেবিলের উপর ঘুসি মেরে চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন, সেই জানোয়ারটাকে এমনিই ছেড়ে দিলেন?

অমিয়া দেবীর চীৎকারে কানাই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। লজ্জা পেয়েছিলেন তিনি। ক্লাস চলছে। টিচার্স কমন রুম ফাঁকা। নয়ত শিক্ষিকারাও এই চীৎকারে চলে আসতেন। কানাইকে হাতের ইশারায় বাইরে যেতে বলে স্বর্ণপ্রভাকে বলেছিলেন, আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি বলে তুমি রাগ করলে মা?

স্বর্ণপ্রভা আঁচল দিয়ে চোখ দুটি মুছে বলেছিলেন, না। তোর উপর রাগ করব কেন মা? আমি যে তোর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছি খুকির কথা শুনেই তুই তাকে কতখানি ভালোবেসে ফেলেছিস। আর তুই তো বলেছিলি, জামাইটা আমার মানুষ ছিল না। তবে ওকে জানোয়ার বলব না। কারণ কোনো পশু বা জানোয়ার অকারণে কাউকে মারে না। অত্যাচার করে না। ও ছিল একটা নর-পিশাচ।

স্বর্ণপ্রভা টেবিলের উপর থেকে জলের গ্লাসটা টেনে নিয়ে এক নিশ্বাসে জলটা পান করলেন। গ্লাসটা টেবিলে উপর রেখে বললেন, আমি ভেবেছিলাম ঐ পিশাচটার শাস্তি চেয়ে কি আর হবে? যে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না। কিন্তু আমার ছোটো ছেলে ওকে ছাড়তে রাজি নয়। ওর কথা, আমাদের খুকি ফিরে আসবে না। কিন্তু আর কারো খুকি যাতে এরকম করে মায়ের কোল আর ভাই-এর বুক খালি করে এত যন্ত্রণা নিয়ে চলে যেতে বাধ্য না হয় তার জন্যেই ওর শাস্তি হওয়া দ[illegible]

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোমার ছোট ছেলে সত্যি কথা বলেছিলেন।

স্বর্ণপ্রভা একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলেছিলেন, হাঁ মা, ছেলে আমার ঠিক কথা বলেছিল। কিন্তু দেশের নেতারা তো এই সব নরপিশাচদের বাঁচার রাস্তাগুলি সব খোলা রেখে দিয়েছে। খুকির কথাই বলি। থানার বড়বাবু তো প্রথমে কোন অভিযোগই নিতে চাইছিল না। ম্যানেজার নাকি দেবতুল্য। হবেই না বা কেন? প্রতি সন্ধ্যায় মদের আসরে বড়বাবু ছিল জামাই-এর নিত্য সঙ্গি। প্রথমেই তার জিজ্ঞাসা, আপনার মেয়েকে যে জামাই মারধর করত তার কোন সাক্ষী আছে?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, বাংলোর চাকরদের জিজ্ঞাসা করলেই তো তারা বলে দিত।

স্বর্ণপ্রভা ম্লান হেসেছিলেন। বলেছিলেন, শহরে মানুষ হয়েছিস। শহর থেকে অনেক দূরে বাগানের চেহারা তুই জানিস না মা। ম্যানেজারই বাগানের সব। পুলিশের সাথে তার গলায় গলায় ভাব। কে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে? শহরের কথাই ভাব। দেবযানী বণিক এই খোদ কলকাতাতেই মরল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ওদের খুনীর শাস্তি হয়েছে।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, তা ঠিক, তবে তার জন্য সংবাদ পত্রকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তারা

যেভাবে জনমত সৃষ্টি করেছিল তাতে ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া যায়নি। এছাড়া বণিক দেবযানীর বাবার পরিবারও সমান ধনী। তবু এর বিচারে যে সমস্ত সূক্ষ্ম আইনী কৌশলে দেবযানী বণিকের হত্যাকারীরা পার পেতে চেয়েছিল তার মোকাবিলা এই কলকাতা বলেই সম্ভব হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা চন্দ্রকান্ত বণিকের বাড়ির কোন চাকর এই হত্যার খবর গোপনে পৌঁছে না দিলে, দেবাযানী বণিকের বাবা যতই ধনবান হন না কেনো তার মেয়ের কোন সন্ধান পেতেন কিনা বলা মুশকিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন তবে কি এব জন্য কোনো শাস্তি হবে না বলতে চাও?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, তার জন্য আইনের ব্যাখ্যার পরিবর্তন দরকার। বলত, যে মেয়েটাকে তার শ্বশুর, শাশুড়ি, জামাই যদি অত্যাচার কবে, তবে কি তারা পাড়া প্রতিবেশীকে সাক্ষী রেখে এই অত্যাচার করবে? অথবা কটা মেয়ে স্বামীব বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে তার উপর অত্যাচারেব ঘটনাকে জানিয়ে এসে সে শ্বশুর বাড়িতে মাথা উঁচু করে বাস করে?

বড়ছেলে দিল্লির সরকারী দপ্তরের উঁচুপদে আছে। রাজ্যের প্রধান সচিব তার খুব জানাশোনা। একটা অভিযোগ জানাতেই সেই পরিচয় কাজে লাগাতে হল। জামাই গ্রেপ্তার হল বটে কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেযে গেল, তবে কোর্ট বসুন্ধরাকে আমাদের কাছে থাকার অনুমতি দিল। এতে অবশ্য জামাইয়েব আপত্তি থাকার কারণ ছিল না। কারণ ওর নতুন সংসারে বসুন্ধরাব উপস্থিতি উৎপাত বলেই মনে হতো।

নতুন সংসার? উঃ, কী বলছ মা? অমিযা দেবী আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, হ্যাঁ মা সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানিস? দার্জিলিং জায়গাটা তো ছোট। এখানে সবাই সবার খবব বাখে। জামাইয়ের বিরুদ্ধে এই মামলায় দার্জিলিং আদালতে প্রচুর ভীড় হতো, ওর চরিত্রেব খববও অনেকেব অজানা ছিল না। তবু জজসাহেব উপযুক্ত প্রমাণেব অভাবে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পরের দিনই এখানকার এক আইনজীবিব মেয়েব সাথে ওর রেজিস্ট্রী বিয়ে হয়ে গেল।

অমিয়া দেবী যেন কথাটা শুনেও তার কোনো অর্থ বোধগম্য করতে পারলেন না। শুধু বলেছিলেন, এও সম্ভব?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, তাই তো হল মা। এই মেয়েটির সাথে নাকি ওর সম্পর্ক অনেক আগে থাকতেই গড়ে উঠেছিল। খুকি তা জানত, তাই ও আমার এখানে ঐ পুজোর দিন কয়টি ছাড়া আসত না। ভাবত স্বামীকে শেষ পর্যন্ত ভালবাসার টানে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোমবা এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অ্যাপীল করলে না কেন মা? ঐ নর পিশাচটা যে কোন শাস্তি পেল না।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, আমরা তাই করতে চেয়েছিলাম মা। আমাদের উকিল বলেছিলেন, হাইকোর্টে মামলা হলে ওব শাস্তি হবেই। খুকিকে অনেকেই ভালবাসত। ঐ বাগানের কয়েকজনকে জামাই মালিকের সাথে বন্দোবস্ত করে রাতারাতি তাদের অন্যবাগানে বদলী করে দিয়েছিল। তাদের সে সময় হাজির করা যায়নি। তাদের কয়েকজন আমাদের কাছে এসে বলেছিল তারা জানে ম্যানেজারবাবু মেমসাহেবকে কেমন মারধর করত। উকিল বলেছিলেন হাইকোর্টের কাছে মামলাটি পুনঃ বিবেচনার আবেদন জানাবার সুযোগ আছে।

তবে করলে না কেন? অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, সব কিছু তৈরী করেও পারলাম না, মা।

কেন?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, হাইকোর্টে মামলা উঠার কয়েকদিন আগে একটা মেয়ে কোলে একটা

মাস দুয়েকের শিশুকে নিয়ে আমাদের কলকাতার বাসায় সকাল বেলায় এসেছিল। খুকির বয়সী হবে। তবে ওর রঙটা খুকির থেকে ফর্সা। মুখটা বেশ মিষ্টি। আমি কিছু বলার আগেই ও ওর বাচ্চাটাকে আমার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে বলল, ওকে আপনি বাঁচান। ঠাণ্ডা মেঝেতে শোয়ানো মাত্রই কচি বাচ্চাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিতেই বাচ্চাটা কান্না থামিয়ে আমাব মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তুলতুলে কচি বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে মা? তোমার বাচ্চাকে আমি বাঁচাব কেন? কি হয়েছে ওর? আমি কিছু করলে তোমার বাচ্চার যদি কোন উপকার হয় তবে নিশ্চয়ই করব।

অমিয়া দেবী টান টান হয়ে বসলেন। বললেন, মেয়েটি কে মা? ওর সাথে তোমাদের অ্যাপিলের সম্পর্ক কী?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন সেটাই যে সবচেয়ে দরকারি কথা মা। প্রথমে ভেবেছিলাম মেয়েটির সন্তান হয়ত খুব অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য টাকা চাইতে এসেছে। আবার মনে হয়েছিল এটা হয়ত টাকা জোগাড় কবার কোনো নয়া ফন্দি। কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে এব কোনটাই মনে হল না। ওব মাথায় সিঁদুর। হাতে ভারী সোনার বালা। ঘড়িটাও দামী। পরনে একটা লাল পাড়ের সাদা গরদ। হাতে আংটি। কানের দুলে হীরের ফুল। এবেশে কেউ অর্থ রোজগারের ফন্দি করতে আসে না।

মেয়েটা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। পাশের ঘব থেকে আমার ছেলে ও বৌমা বেরিয়ে এসেছিল। দশটার মধ্যে কোর্টে যেতে হবে। নাম করা ব্যারিস্টার এই মামলাটি হাতে নিয়েছেন। ওনার ছেলে আর আমার ছোট ছেলে এক সাথে ডাক্তাবী পাশ কবেছে। ফলে অতিবিক্ত যত্ন নিয়েই মামলাটা সাজিয়েছেন।

বাচ্চাটা তখনও আমার কোলে। স্বর্ণপ্রভা বলে চলেছিলেন, আমি মেয়েটাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বল মা, আমি কি করতে পারি?

মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিল। আমি রতনেব স্ত্রী। ও তারই ছেলে।

মনে হল আমার পায়ের নীচে কোন মাটি নেই। মাথার উপর নেই কোন ছাদ। আমি যেন কোন এক অতল খাদের তলায় তলিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত কিছু শূন্য হয়ে যাচ্ছে। চারিপাশ চক্রাকারে আমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। পড়েই যাচ্ছিলাম। কিন্তু হাতটা শিথিল হতেই বুক থেকে বাচ্চাটা পড়ে যাচ্ছিল। ওকে বাঁচাতেই যেন আমি আবার শক্তিকে ফিরে পেলাম। দেখলাম আমার বড়ছেলে ও বৌমাব মুখেব পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠেছে। ওরা আমি কিছু বলার আগেই একসাথে চিৎকার করে বলে উঠল, বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে। তুমি আর রতন মিলে আমাদের বোনকে খুন করেছ। আর আমাদের বাড়িতে এসেছ আমার মার কাছে?

বৌমা আমার কোল থেকে বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে ওকে দিতে আসলে বৌমাকে হাতের ইশারায় নিবস্ত করে বাচ্চাটাকে নিজেব বুকে রেখেই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি রতনেব স্ত্রী?

ও শুধু ঘাড় কাত করল।

তুমি বৈশাখীকে চিনতে?

চিনতাম।

কেন এসেছ এখানে? রতনের শাস্তি হওয়া উচিত। তুমি তো জানতে রতন বিবাহিত। তার স্ত্রী আছে। মেয়ে আছে। তবু একটা ঘর ভাঙতে গেলে কেন?

মেয়েটা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

ওর কোলে বাচ্চাটাকে দিয়েই বলেছিলাম, রতন যে বৈশাখীকে খুন করবে তা তুমি জানতে?

ও জবাব দিয়েছিল, না।

জানলে কি করতে?

বৈশাখীদিকে খুন করতে দিতাম না।

ও খুন করেছে জেনেও তুমি ওকে বিয়ে করলে কেন?

মেয়েটি ওর দুটি ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। বলেছিল, আমার উপায় ছিল না।

কেন?

মেয়েটি তার সন্তানকে দেখিয়ে বলেছিল, ও আমার গর্ভে চলে এসেছিল।

অমিয়া দেবী নির্বাক। বড় ছেলেকে স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, উকিলকে ফোন করে বলতে আমরা আর অ্যাপিল কবব না। বড় ছেলে তীব্র আপত্তি তুলে বলেছিল, তুমি কি বলছ মা? খুকির খুনি এই নরপিশাচটাকে ছেড়ে দেবে?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, আমি বড় ছেলেকে বলেছিলাম খোকা, তুই আমার কাছে আয়। আমি যে মা। তাই এই মেয়েটা যতই পাপী হোক, ওতো এসেছে মায়ের পরিচয়ে মায়ের কাছে। ও বুঝুক মায়ের স্নেহ কাকে বলে। খুকি যে আমাদের দেবী ছিল। যীশুকে কি কেউ হত্যা করতে পেরেছে? করুণার সাগরকে কেউ হত্যা করতে পারে না। হত্যাকারীরা নিজেরাই নিহত হয়। যীশু ক্রশ বিদ্ধ না হলে কি তার হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে বলতে পারতেন? —হে পরম পিতা এদের ক্ষমা কর।

মেয়েটি যে কখন আমাব পায়ের তলায় হাঁটু মুড়ে বসেছিল জানতে পারিনি। পায়ের পাতায় তপ্ত জলের ফোঁটায় তাকিয়ে দেখি ও সেখানে মাথা-নীচু কবে বসে আছে।

অমিয়া দেবী চেয়ার থেকে উঠে এসে স্বর্ণপ্রভার চেয়ারের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তার কোলে মাথা বেখে বলেছিলেন, তুমি যে সত্যিই করুণাময়ী।

স্বর্ণপ্রভা অমিয়া দেবীর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, নারে আমি শুধু মা। ঐ মেয়েটার মায়ের মনকে পড়তে পেরেছিলাম। তাই ওকে বলতে পেরেছিলাম, তুমি যাও মা। ছেলেটাকে মানুষ করো। খুনীর ছায়া যেন ওকে স্পর্শ না করে। যদি পার বছরে একবার সেই শ্মশান ঘাটে যেও। যেখানে সেই দেবীর দাহ হয়েছিল সেখানে তোমার ছেলের হাতে একটা শ্বেত গোলাপ রেখে দিও।

অমিয়া দেবীর দুচোখে জলের ধারা। স্বর্ণপ্রভার কোলে মুখ রেখেই বলেছিলেন, খুব ছোটোবেলায় মাকে হারিয়েছি। তার কথা মনে নেই কিন্তু আমার মাকেই যে ফিরে পেলাম। বসুন্ধরার সব দায়িত্ব আমাকে দাও মা। ও যে আমারই মেয়ে।

[৬]

স্বর্ণপ্রভা যে চেয়ারে সেদিন বসেছিলেন বসুন্ধরা সেই চেয়ারেই বসেছিল সেদিন বসুন্ধরার দায়িত্ব স্বর্ণপ্রভার কাছ থেকে তিনি নিজেই চেয়ে নিয়েছিলেন। বসুন্ধরাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। স্কুলের গেটের ওপারে বসুন্ধরার শরীরটা মিলিয়ে যেতেই একটা গভীর শূন্যতা অমিয়া দেবীকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে। ভাবতে চান কেন বার বার তার স্বপ্নের সৌধ এভাবে মাঝপথেই লুটিয়ে পড়ে? ভাগ্যকে তিনি জেতার ধৃষ্টতা দেখান বলেই কি ভাগ্যদেবী তাকে বারবার এত নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেন?

বসুন্ধরার মধ্যেই তো তিনি তার স্বপ্নের সৌধটি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। প্রতুলের আকাঙ্ক্ষা আর নিজের হাতে উৎপাটিত প্রতুলের দেওয়া উপহারটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুপ্ত বাসনাটিকে বসুন্ধরার মাঝে দেখতে চেয়েছিলেন। বসুন্ধরা আসার পর তিনি আর রাত জেগে পদত্যাগপত্র লেখেন নি। বুলবুল চণ্ডির এই মাটিতেই তার মনের অহল্যাভূমিতে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন।

অমিয়া দেবীর নিস্পন্দ জীবনে বসুন্ধরা যে আবার কখন তরঙ্গের কলধ্বনী তুলেছিল তা নিজেও বুঝতে পারেন নি। বাড়ি থেকে স্কুলে আসার পথে বসুন্ধরাকে তাব বাড়ির গেট থেকে নিয়ে আসতেন। স্বর্ণপ্রভা তাকে এই বাড়িতে চলে আসার জন্য বহুবার অনুরোধ করেছিলেন। এ নিয়ে অভিমানও কম করেন নি। কিন্তু অমিয়া দেবী বলেছিলেন মেয়ে বড় হলে তো মা তাকে পরের ঘরেই থাকতে হয়। সেটাই হয় তার ঘর। আমাকে তুমি তোমাব ঘরে আটকে রেখ না। তাহলে তোমার এই মেয়ের বৈধব্য রূপটাই বারবার করে ধবা পড়বে। তার থেকে মনে কর তোমার এই মেয়ে স্বামী হারালেও সে ঘর হারায়নি। আমি প্রতিদিনই আসব। শুধু যে ঘরটা এখন আছে সেটা থাকতে দিও।

অমিয়া দেবীর মনে পড়ে, সেদিন তিনি যখন বলেছিলেন বসুন্ধরার সব দায়িত্ব আমার, তখন স্বর্ণপ্রভার মুখ থেকে সেই বিষাদের পর্দাটা মুহূর্তেব জন্য অন্তর্হিত হয়েছিল। অশ্রুসিক্ত চোখের কোন দুটিতে খুশির চমক ভেসে উঠেছিল। তার হাত দুটি নিজের দু'হাতের তালুতে বন্দি করে বলেছিলেন আমার আর কোনো ভাবনা নেই। এবার তোর হাতে ওকে বেখে মরতে আমার কোনো ভয় নেই।

অমিয়া দেবী তার মুখটা দুহাতে ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেললেন। আমি যে পারলাম না আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে।

দিদিমণি,

চোখ দুটি থেকে হাত সরিয়ে তাকালেন অমিয়া দেবী। কানাই ডাকছে।

অমিয়া দেবী বললেন, বসুন্ধরা চলে গেছে?

হ্যাঁ, দিদিমণি। দিদিভাইকে রিক্সায় তুলে দিয়েছি।

ওকে এভাবে কেন যেতে দিলাম? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন অমিয়া দেবী। ভাবেন একটা অজগর যে ওর দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছিল তা কি একেবারেও টের পান নি? নিজের কাছেই অমিয়া দেবী জবাব চাইতে চাইছিলেন। সেই অজগব সাপটিকে কি তিনি প্রশয়ের ইন্ধন যোগান নি?

দিদিমণি বাড়ি যাবে না? কানাইয়েব কথায় আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসেন অমিয়াদেবী।

কানাইকে একটা রিক্সা ডেকে দিতে বলে বলেন, কানাইদা নীভাদিকে বলে দিও আমি আজ বসুন্ধরার ওখানে থাকব। ও ওর মত করে খেয়ে যেন শুয়ে পড়ে।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার ঘরে ঢুকে দেখলেন, ও বালিশে মাথা বেখে টানটান হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত দিয়ে চোখ দুটি ঢাকা। বাঁ পায়েব পাতাটি ডান পায়ের পাতার উপব জোড়া সাপের মতন তোলা। মাথার খোলা চুলগুলি বালিশের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। টানটান শরীরে বুকের নীচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা মোটা চাদরে ঢাকা। মাথার উপরে সিলিং ফ্যানটা বন বন করে ঘুরে চলেছে।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার হাতটা তার চোখের উপর থেকে ধীরে ধীরে তুলে নিজের হাতে নিয়ে ওর পাশে বসে গাঢ় স্বরে ডাকেন, বসুন্ধরা।

বসুন্ধরা উঠে বসে, অমিয়া দেবীর পিঠে মুখ রাখে।

অমিয়া দেবী বলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলি?

বসুন্ধরা তার পিঠের উপর মুখ রেখেই বলে, না, তারপর মুখটা তুলে নিজের হাঁটুর উপর রেখে বলে, আমি জানতাম তুমি আসবে।

অমিয়া দেবী বলেন, বাড়িতে এসে কিছু খেয়েছিস?

বসুন্ধরা হাঁটু থেকে মুখটা তুলে সোজা হয়ে বসে, বলে খেতে কিছু ইচ্ছে করছে না।

অমিয়া দেবী বলেন, আমার ক্ষিধে পেয়েছে। তুই যদি না খাস তবে তো আমারও খাওয়া হবে না।

বেশ, অনুকে বলে দাও তোমার সাথে আমাকেও যেন খেতে দেয়।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, তুই কেন ওর নামটা আমাকে বলছিস না।

বসুন্ধরা বলে, কী লাভ তাতে?

কী বলছিস তুই? ঐ পশুটা তোর সর্বনাশ করে পালিয়ে যাবে? তুই তার কথা নিজে থেকে না বললে তাকে ধরে আনব কি করে?

আমি যে তাকে ধরে আনতে চাই না। সে নিজে থেকে এসেছিল। আমারই তো তাকে বাধা দেবার কথা ছিল। আমি যদি তাকে সত্যিকারের বাধা দিতাম তবে সে আঁচড়ের দাগ ছাড়া আর কোন কিছুর চিহ্ন রেখে যেতে পারত না। তাকে সব জানিয়েছিলাম। সে যদি আমাকে মন থেকে মেনে নিতে না পারে তবে তার কাছে আত্মসমর্পণের ভিক্ষা চাইতে যাব কেন, বড়মা?

বসুন্ধরা! অমিয়াদেবীর গলা থেকে যেন একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। বলেন, তুই জানিস না তোর কথার অর্থ কী। সমাজের কথা ভেবেছিস? এই সমাজে তার সামাজিক বিধানে তোর এই ভাবনার কোনো মূল্য নেই।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর চোখে চোখ রেখে বলে, আমি যে সমাজের এই চোখ রাঙানীকেই অগ্রাহ্য করতে চাই, বড় মা।

অমিয়া দেবী এবার একটু গম্ভীর হল। গলার স্বরে একটা কর্তৃত্বের সুর ফুটে ওঠে। বলেন, তুই আমার সাথে কালকেই কলকাতায় যাবি।

কেন?

তোর বুদ্ধিকে আমি এতদিন প্রশংসা করে এসেছি। এর কারণ তোকে স্পষ্ট করে বলতে হবে? এখনো কোনো জানাজানি হয়নি। তোর শরীরের লক্ষণ গুলি এখনো স্পষ্ট হয়নি। তবে আর দেরি হলে অনেক অসুবিধা হবে।

না, তা হয় না। উঠে দাঁড়ায় বসুন্ধরা।

কি হয় না?

তুমি যা বলছ তা আমি করতে পারব না বড়মা।

এর অর্থ তুই জানিস?

জানি। কিন্তু যে আসছে তার তো কোন অপরাধ নেই। তাকে আমি কেন শাস্তি দেব?

হঠাৎ যেন মনের সেই অতীত ক্ষতের ব্যথাটা আবার অনুভব করেন অমিয়া দেবী। একটু থমকে যান। বলেন, তোর যুক্তি আমি মেনে নিলাম বসুন্ধরা। কিন্তু যাকে তুই আনতে চাইছিস তার কি পরিচয় দিবি?

কেন? আমার সন্তান এটাই হবে তার পরিচয়।

না, বসুন্ধরা, সমাজ তা মেনে নেবে না।

সমাজের বিধান নামে পুরুষের কর্তৃত্বের বোঁড়তে বেঁধে রাখাকে মেনে কেন নেব বড়মা?

কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলাকে তুই কি করে অস্বীকার করবি?

তুমিও সেই বস্তাপচা সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছ বড়মা। বসুন্ধরা উত্তেজিত ভাবে খাট থেকে নেমে পড়ে। বলতে থাকে, উপনিষদের কে এক শ্বেতকেতুর নামে তোমরা বিবাহ নামে বন্ধনের দায়ভার চাপিয়ে দিচ্ছ। সে নাকি তার মাতাকে তার পিতার চোখের সামনে এক অজ্ঞাত পুরুষের সাথে আড়ালে চলে যেতে দেখে বাবার কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উত্তর পেয়েছিলেন, নারী জাতি গাভীর মতন স্বাধীন। যে কোনো পুরুষ আহ্বান করলে সে তাকে সাড়া দেয়। তাই শ্বেতকেতুই নাকি নারীকে সাতপাকে বাঁধাব রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু বড়মা, তোমরা এই গল্পকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করনা কেন এ সম্পর্কে আমার একটা ব্যাখ্যা আছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাব পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবার পর কৃষিজ ও গোসম্পদের সেবার জন্য পুরুষের প্রয়োজন হয়েছিল বহু পত্নীর। গৃহপালিত পশুকে ক্রয় করার পর তার মালিকানার পরিচয় দিতে যেমন তার গায়ে একটা ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তেমনই পুরুষ যখন অন্য গোষ্ঠীর নারীদের লুণ্ঠন করে আনত তখন আজকের এই গবাদি পশুর মালিকানা চিহ্নিত করার মতন সেই নারীর হাতে ও মাথায় তার পুরুষ মালিক তাকে তার সম্পত্তিব পরিচয় স্বরূপ কোন বেড়ি বা রঙ পরিয়ে দিত। অর্থাৎ সেই নারী যে এই পুরুষেব সম্পত্তি তা চিহ্নিত হতো। সেই বেড়িকে আজ হাতের শাঁখা আর সেদিনকার সেই রঙকে সিঁথির সিঁদুরে রূপান্তরিত করে তোমরা আজ সতী-সাধ্বীর গৌরব অনুভব কর। একবাবও ভাব না এই শাঁখা সিঁদুব পরিধানের মধ্যে নারীত্বের কত বড় অবমাননার ইতিহাস ঢাকা আছে।

অমিয়া দেবী বলেন, তুই কি স্বেচ্ছাচারী জীবনকে নারীর স্বাধীনতা বলতে চাস?

বসুন্ধরা জবাব দিল, স্বেচ্ছাচারী বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ তা আমি জানি না বড়মা। আমি কিন্তু বলতে চাইছি না নারী বা পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল যৌন আচরণ করবে। আমি বলতে চাইছি নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক হবে বিশ্বাস ও ভাল লাগার। এই দুটি নারী ও পুরুষকে একত্রিত রাখবে। কিন্তু বিশ্বাস বা ভাললাগার মধ্যে যদি ফাটল ধরে তবে বিবাহ নামক রীতি যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জন্ম দেয় তার অর্থ মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

অমিয়া দেবী বলেন, স্বামী-স্ত্রীর এই শাশ্বত বন্ধন যা একটা পরিবারকে কাপড়ের সুতোর বিন্যাসের মতো ধরে রাখে, সন্তানের নির্দিষ্ট পরিচয় দেয় তাকে অস্বীকার করা আর পশুর জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

বসুন্ধরা বলে, বড়মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি সেই উদ্দাম বাধাহীন জীবনযাত্রার ওকালতি করছি না। আমি বলতে চাইছি সেই বিশ্বাসের কথা। যে বিশ্বাসে একটা নারী একজন পুরুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। যে বিশ্বাসের মর্যাদায় একজন পুরুষ তাব পৌরুষত্বকে নারীর কোমল সান্নিধ্যে আত্মসমর্পণ করায়। কিন্তু সেই বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণাকে তিল তিল করে বুকে বয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বয়ে চলার যান্ত্রিক জীবনকে আমি অস্বীকাব করতে চাইছি।

অমিয়া দেবী বলেন, বেশ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বাঁধন নিয়ে তোর কথাগুলি না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন একটা সন্তানকে সামাজিক পরিচয় কিভাবে দিবি?

বসুন্ধরা বলে, আমার সন্তান এটিই হবে তার পরিচয়।

অমিয়া দেবী বলেন, সমাজ যে তা মেনে নেবে না।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর পাশে এসে বসে। কপালের উপর উড়ে বসা চুলগুলিকে সরিয়ে নিয়ে বলে, বড়মা, তুমি উপনিষদের জবলা-সত্যকামের উপাখ্যান জান? সত্যকামের পিতার

পরিচয় তো দরকাব হয়নি। তার জন্মদাত্রী জবলা তো দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছিলেন যৌবনে তাকে দারিদ্রবশত বহু পুরুষের সাথে সহবাস করতে হয়েছিল, তাই সত্যকামের জন্ম কার ঔরসে হয়েছে তা তিনি জানেন না। পিতৃপরিচয়হীন সত্যকামকে সমাজ কিন্তু শ্রদ্ধার সাথে বরণ করেছিল।

অমিয়া দেবী বললেন, সমাজ বিবর্তনের ধারায় উপনিষদের সামাজিক বিন্যাস যে এখন অচল। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদেব সেই উদার চেতনাকে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার কাছে বিসর্জন দিয়েছি। এখন হয়ত মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে উঠে এসেছি, কিন্তু আমরা যে এখনো পশ্চিমের সমাজের মতন সংস্কারমুক্ত হতে পারি নি। সেখানে নরনারীর সাময়িক দৈহিক ভালবাসাও লজ্জাকর বলে গণ্য হয় না। আমাদের সমাজে তোর সন্তানের পিতৃপরিচয়টিই যে সবার আগে খোঁজ পড়বে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন উদার সমাজেও পিতৃপরিচয়েব সন্ধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানা প্রতিষ্ঠান। পথে পথে ব্যানার, হু ইজ দ্য ফাদার? ৬০০ ডলারের বিনিময়ে জিন পরীক্ষা করে সঠিক পিতার সন্ধান পাওয়ার লাইন পড়ে। সেখানে পিতৃপরিচয় এখন আর সামাজিক দাবি না হলেও প্রবঞ্চক বা পলাতক পিতার দায়িত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন হয়।

বসুন্ধরা বলে, আচ্ছা বড়মা, তোমরা তো প্রকৃতির কোথাও পিতৃপরিচয় খোঁজ করতে যাও না। তুমি কি আমাদের স্কুলের মুকুলিত কৃষ্ণচূড়া গাছটির পরাগের পরিচয় খুঁজতে চেয়েছ? প্রকৃতি জগতেব কোন প্রাণী যখন সন্তান প্রসব করে তখন কি সেই পুরুষ প্রাণীটির খোঁজ কর? যে মহান সমাজ পিতারা নারী সম্পদকে গো সম্পদের সাথে তুলনা করে তার সন্তানের পিতৃপরিচয় জানতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন তারাও কিন্তু তার পালিতা গাভীর বাছুরটিকে তার জন্মদাত্রী গাভীটির পরিচয়ের মধ্যেই তার নামকরণ কবেন। ষাঁড়ের খোঁজ রাখে না।

অমিয়া দেবী বলেন, তুই বলতে চাস আমাদের পিতৃ পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই?

প্রয়োজন ছিল না। বসুন্ধরার দ্বিধাহীন জবাব।

তবে হল কেন? অমিয়া দেবী যেন নিজেই ছাত্রী।

বসুন্ধবা বলে, যেদিন থেকে আমাদের পুরুষের ক্রীতদাসে রূপান্তরিত করা হল। বলতে পাব বড়মা কোন পুরুষ মানুষ কি নিজের বুকে হাত রেখে বলতে পারে এ তারই ঔরস জাত সন্তান?

অমিয়া দেবী শরীরে কেমন একটা কম্পন অনুভব করেন। গলাটা কেঁপে উঠে। বলেন, কী বলতে চাইছিস তুই?

বসুন্ধরা মুখে একটা চাপা হাসি খেলে যায়। বলে, ভয় পেওনা বড়মা। যা সত্যি তাই বলছি। পুরুষেরা ভাবে তারা খুব চালাক। অথচ আমরা যদি একটু সাবধানী অবিশ্বাসী হই তবে পুরুষ যে তার পিতৃত্ব নিয়ে গর্ব করে তাকে উপহাসের সামগ্রী করে তুলতে পারি। একমাত্র আমরাই বলতে পারি কার সন্তান আমাদের গর্ভে মুক্ত পৃথিবীতে বাবা ডাকার জন্য আমাদেরই রক্তমাংসে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা যদি একজনের পিতৃত্ব আরেকজনের ঘাড়ে চাপাতে চাই কোন পুরুষের কি তা বোঝার সাধ্য আছে?

অমিয়া দেবী বললেন, সেই জন্যেই তো আমাদের বিশ্বস্ত থাকা এত প্রয়োজন। আর মেয়েরা বিশ্বস্ত থেকেছে বলেই পুরুষেরা এভাবে আত্মসমর্পণ করেছে।

বসুন্ধরা বলল, বড়মা বিশ্বস্ততার প্রশ্নে পরস্পর পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ। ব্যাপারটা কোনোভাবেই একতরফা হতে পারে না। এই একতরফা অনুশাসনই আমাদের সমাজে সৃষ্টি করেছে ব্যাভিচারের লাইসেন্স।

তোর কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। অমিয়াদেবী বসুন্ধরাকে যেন নতুন করে দেখছেন।
বসুন্ধরা স্মিত হেসে বলে, তুমি বোধহয় লক্ষ করনি, আমি বলেছি একতরফা কথাটি। সমাজের এককোণে একটা জায়গা আছে তার নাম নিষিদ্ধপল্লী। ব্যাপারটা ভেবে দেখ, পল্লীটার নাম নিষিদ্ধপল্লী। সেখানে কোনো মেয়ের প্রবেশ ঘটলে সে পতিতা। তাদের আর ঘরে ফেরা চলে না। কোনো পুরুষের উপর সমস্ত বিশ্বাসকে অর্পণ করে কোনো মেয়ে যদি তার প্রতি সেই পুরুষটির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এই পল্লিতে প্রবেশ করে সেই মেয়েটি হয় পতিতা। অথচ সেই পুরুষটির চরিত্র থাকে রাজহাঁসের পালকের মতো। তার চরিত্রে কোনো কলঙ্কের দাগ কাটে না। যে পুরুষটি গতরাতের নিষিদ্ধপল্লীতে কোনো পতিতাকে পাশবিক উল্লাসে তিল তিল করে ভোগ কোরে, মুখে এলাচ চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বাড়িব বাইরে কেন গিয়েছিল বলে কৈফিয়ৎ তলব করে সেই পুরুষদের জন্য তো কোনো পতিতপল্লী হয় না।
অমিয়া দেবী বসুন্ধরাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আমরা মেয়েরা যদি পুরুষের মতো বেপরোয়া হয়ে উঠি তবে ওদের পায়ে শান্তির শেকল কে পরাবে? ঝড়েব তাণ্ডব পৃথিবীর মাটি মাথা পেতে নেয় বলেই তো এখানে এত সবুজের মেলা। এই মাটি যদি বলত আকাশের তাণ্ডব আমি মেনে নেব কেন তবে যে পৃথিবী হত বন্ধ্যা।
বসুন্ধরা বলে, তুমি ঠিক বলেছ বড়মা। আমিও যে এই কথাটাই বোঝাতে চাইছি। এখানে আকাশের মেঘ ও মাটির ফসলেব সম্পর্ক পরস্পবের পরিপূরক। কই তোমবা তো বলোনা, এটা আকাশের ফসল। আমরা জানি এটা মাটিব ফসল।
অমিয়া দেবী বলেন, সন্তানের পরিচয়ে তার পিতার পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই বলে তুই বলতে চাস?
বসুন্ধরা আঁচলটাকে পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে, আমি সে কথা বলিনি। শুধু বলতে চেয়েছি সেটাই প্রধান পরিচয় নয়। মার পরিচয়েই সন্তানের পরিচয় হওয়া প্রযোজন।
তুই কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলাকে এক ঝটকায় উপড়ে ফেলতে চাইছিস। তাছাড়া সন্তানের জন্মপরিচয়ে যদি পিতার পরিচয় প্রধান না হয় তবে পুরুষ তার দায়িত্ব এড়াবার সুযোগ পাবে।
তুমি কোন সমাজের কথা বলতে চাইছ বড়মা? বসুন্ধরা সাপের ফণার মতন মুখটা উঁচু করে। তোমার নিশ্চয়ই অজানা নেই, মানব সভ্যতার উন্মেষের প্রারম্ভে পারিবারিক বা গোষ্ঠী পরিচয়ে মায়ের পরিচয়ই ছিল মুখ্য।
অমিয়া দেবী বসুন্ধরার চোখে চোখ রেখে বললেন, তাহলে তুই বলতে চাস সামাজিক বন্ধনের কোনো প্রয়োজন নেই?
তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ বড়মা। বসুন্ধরার মুখটা একটু মলিন হয়। আমি স্বৈরিণী হবার পক্ষে ওকালতি করছি না। কিন্তু বিয়ের অর্থ তো পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করা নয়। বিয়ে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার বন্ধন। যদি সেই বোঝাপড়াই না থাকে তবে এই বন্ধনই যে পায়ের বেড়ি বলে মনে হবে। আমরা সেই বেড়ি যাতে ভাঙতে না পারি তার জন্য নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনে আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখার কৌশল চলছে। আর এই সামাজিক অনুশাসনের প্রধান শিকার হচ্ছে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের মেয়েরা।
তোর কথা আমার কাছে স্পষ্ট হল না। অমিয়া দেবীর চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।
বলছি, বসুন্ধরা একটু হাসে। আমাদের মতো সমাজের মেয়েরা যেদিন থেকে আর্থিক

স্বাধীনতা হাবিযেছে, সেদিন থেকেই ধর্মীয় কুসংস্কারেব গণ্ডিতে তাদেব বন্দি কবাব অবাধ সুযোগ নিযেছে পুরুষেবা। অথচ আমাদেব দেশে বহু উপজাতি সম্প্রদায় আছে, যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভযেই বোজগাব কবে, সেখানে মেযেবা সামাজিক জীবনে অনেক বেশি স্বাধীন। বিদ্যাসাগব মহাশযেব বিধবা বিবাহ আন্দোলনেব কথাই ভাবনা কেন? এ সমস্যা তো সমাজেব তথাকথিত উচ্চবর্ণেব সমস্যা। নিম্নবর্ণেব মধ্যে এটি কোনো সমস্যাই ছিল না। কাবণ স্বামীর মৃত্যুব পব অপব কোনো পুরুষ সঙ্গীকে জীবনসাথি কবাব স্বীকৃতি নিম্নবর্ণেব মধ্যে এব অনেক আগে থাকতেই চালু ছিল।

অমিযা দেবী জিজ্ঞাসা কবেন, তুই কি মনে কবিস আর্থিক অবস্থাব উন্নতি ঘটলেই মেয়েরা এই সামাজিক বন্ধনকে অস্বীকাব কবতে পাববে?

না, বসুন্ধবাব চোযাল দুটি দৃঢ় হয। বলে, এব সাথে দবকাব সমাজ-পিতাদেব বোপণ কবা সেই সংস্কাববোধেব শিকড়কে উৎপাটিত কবাব মানসিকতা। আমাব মাব তো আর্থিক স্বচ্ছলতাব অভাব ছিল না। কিন্তু অভাব ছিল মনেব সেই বেড়িটাকে ভেঙ্গে ফেলাব সাহস। তাই আমাব বাবাব কাছে প্রতিদিন শাবীবিক লাঞ্ছনা সহ্য কবত আব সেই লোকটাকেই তাব ইহকাল ও পবকালেব যে মন্ত্র শেখানো হযেছিল সেই বিশ্বাসেব জগদ্দল পাথবটাকে সবাতে মনেব জোব ছিল না বলেই মাকে জীবন্ত পুড়ে মবতে হল।

অমিযা দেবী বসুন্ধবাব মুখেব দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিযে থাকেন। সেই নম্র, লাজুক মেযেটা কোথা থেকে এই বিদ্যুতেব চমক পেল বুঝতে চাইলেন।

বসুন্ধবা অমিযা দেবীব একটা হাত দুহাতে আঁকড়ে ধবে বলে, বড়মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমি বলতে চাইছি সামাজিক অনুশাসনে আমাদেব অবস্থানেব কথা। তুমিই বল, সন্তান উৎপাদনে পুরুষেব ভূমিকা কতখানি? ক্ষণিকেব উত্তেজনা প্রশমিত হওযাব পব তাব অস্তিত্ব তো মানসিক সান্ত্বনা আব আর্থিক দাযিত্বেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ মেযেবা দশমাস দশ দিন শবীবেব প্রতিটি বক্তবিন্দু দিযে যাকে জঠবে পালন কবি, প্রতি মুহূর্তেব ক্লান্তি দিযে যাকে অনুভব কবি, আব সেই অমোঘ মুহূর্তে হৃদয নিঙড়ানো যন্ত্রণাব মধ্যে দিযে যাকে পৃথিবীব আলো দেখাই তাব পবিচয হবে সেই পুরুষেব পবিচযে—এত বড় অপমান কেন আমাদেব সইতে হবে?

অমিযা দেবী বসুন্ধবাকে কোনো বাধা দেন না। বসুন্ধবাব প্রতিটি কথাই তাব হৃদয তৃষিত মরুভূমিব মতন শুষে নিতে চাইছিল।

বসুন্ধবাব কথায এখন আব কোনো জড়তা নেই। সে বলে চলে, সংস্কাব আমাব নেই। ভ্রূণ-হত্যা আমি পাপ বলে মনে কবি না। আমাকে কেউ বলাৎকাব কবেনি। যা কিছু ঘটেছে তাব পিছনে আমাব প্রত্যক্ষ সায না থাকলেও অবচেতন মনেব সাড়া ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুটো দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চাবণ কবে তাকে স্বামীত্বে ববণ কবে নিলেই আমাব গর্ভস্থ সন্তান মানুষ বলে স্বীকৃতি পাবে, আব তা নাহলে তাকে আবর্জনা বলে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দেবে—এটা আমি মেনে নিতে পাবব না।

বাইবে সূর্যেব আলো ম্লান হযে এসেছে। ঘবে নেমে এসেছে ছাযাঘন অন্ধকাব। বসুন্ধবা সুইচটা অন কবে দিযে জানালাব পর্দাটা একপাশে টেনে এনে টানটান হযে দাঁড়ায। পশ্চিম আকাশে তখনও লাল আভা। সেদিকে তাকিযে বলে, আমি কুন্তি হতে বাজি নই। সবাই জানে পাণ্ডু ছিল যৌনসঙ্গমে অক্ষম। তবু কুন্তিব গর্ভেব পাঁচপুত্র পাণ্ডব বলে তোমাদেব কাছে পবিচিত। পান্ডু এদেব পিতৃপবিচযেব শিখণ্ডি মাত্র। অথচ একইভাবে কর্ণ কুন্তিব গর্ভে এলে সে হয অবাঞ্ছিত। কাবণ কুন্তিব কুমাবী পবিচয হবণ কবতে তখনও পাণ্ডুব আবির্ভাব ঘটে নি।

বসুন্ধরা নির্বাক অমিয়া দেবীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। চোখের দৃষ্টিটাকে তার মুখের উপর স্থাপন করে বলে, আমার কথাই ভাব বড় মা। আমার গর্ভস্থ সন্তান যার ঔরসে জন্ম তার থাকা বা বেঁচে থাকার উপর সেই সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়া নির্ভর করছে না। কিন্তু আমার কিছু ঘটলে তারও তো একই পরিণতি হবে। অথচ তোমরা তার পিতৃপরিচয় নিয়েই ভেবে চলেছ। কেন তোমরা বলতে পারবে না ও বসুন্ধরার সন্তান? কেন তোমরা চাইবে কুন্তির ছেলেদের মিথ্যা পিতৃপরিচয়ের মতন আমার সন্তানেরও একটা পরিচয়?

অমিয়া দেবী বসুন্ধরাকে বুকের ভিতর টেনে নেন। কপালের উপর থেকে চুলগুলিকে আঙ্গুলের ছোঁয়ায় সরিয়ে দেন। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে। মুক্তোর মতন স্বেদ বিন্দুগুলি ওর কপাল ও নাকের ডগায় ফুটে উঠেছে। নিজের আঁচল দিয়ে বসুন্ধরার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে ডাকেন, বসুন্ধরা।

বসুন্ধরা সে ডাকে সাড়া না দিয়ে অমিয়া দেবীর ঘাড়ে নিঃশব্দে মাথাটা রাখল। অমিয়া দেবী বসুন্ধরার মাথায় হাতটা রেখে বললেন, তোর কথার সব যুক্তিই আমি মেনে নিলাম বসুন্ধরা। তবে মা হলে সন্তানের ভালোমন্দের দায়িত্বতো তোকেই নিতে হবে।

বসুন্ধরা মাথাটাকে একইভাবে রেখে বলে, আমি তাই চাই বড়মা।

অমিয়া দেবী বলেন, তুই তাই চাস বলেই যে তোকে হতে হবে বাস্তববাদী। তোকে হয়তো কেউ কিছু বলতে সাহস করবে না। করলেও তুই তোর মোক্ষম জবাব দিতে পারবি। কিন্তু তোর এই সন্তান নিশ্চয়ই ঘরে বসে থাকবে না। সে বাইরে যাবে। স্কুলে ভর্তি হবে। সেখানে আর যারা আসবে তারা এই সমাজের ছাঁচে তৈরি। সামাজিক সংস্কার তাদের সহজাত ভাবনা। তারা যে তোর সন্তানের সাথে সহজে মিশতে পারবে না।

বসুন্ধরার সারা শরীরটা যে কেঁপে উঠল তা অমিয়া দেবী টের পান। ওকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অমিয়া দেবী আবার বলতে শুরু করেন, তুই আরেকটু চিন্তা করে দেখ বসুন্ধরা ধর, তুই ছেলের মা হয়েছিস। তাকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। মেনে নিলাম স্কুলের হেডমাস্টার খুব প্রগতিশীল। তোর যুক্তি মেনে নিয়ে তোর পরিচয়েই তাকে স্কুলে ভর্তি করে নিল। কিন্তু শিশুদের জগৎ আলাদা। তারা নিশ্চয়ই সামাজিক বিপ্লবের নিবেদিত সৈনিক নয়। সেখানে তোর ছেলেকে তার বাবার কথা বলতে হবে। শিশুদের মধ্যে বাবা মাকে নিয়ে আলোচনা হবে। যখন তোর শিশুপুত্র বন্ধুদের বিদ্রূপ শুনে চোখের জলে গাল ভাসিয়ে তোর কাছে আসবে তুই তাকে তখন কী জবাব দিবি?

তুমি আমাকে দুর্বল করে দিতে চাইছ, বড়মা, বসুন্ধরা উঠে দাঁড়ায়।

না, তুই আমাকে ভুল বুঝেছিস। অমিয়া দেবীর মুখে একটা ম্লান হাসি। আমি কঠিন বাস্তবের কথা বলছি। তুই ভেবে দেখ, যে সমস্ত শিশু তোর সন্তানকে ঘিরে রাখবে তারা যে তাদের পারিবারিক ধ্যান-ধারণার বাহক। সেই শিশুদের এই বৈপ্লবিক ভাবনার স্তরে পৌঁছে দিয়ে তোর পুত্রকে তাদের কৌতূহলি প্রশ্নের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারবি?

তবে? বসুন্ধরার গলাটা যেন ধরে আসে। জবলার প্রতিরোধ কি মিথ্যা? আমার পুত্র কেন সত্যকাম হতে পারবে না বড়মা? আর আমরা কেন মাতৃত্বের অধিকারকে তুলে ধরতে এগিয়ে আসব না?

নিশ্চয়ই এগিয়ে আসতে হবে। বসুন্ধরাকে বুকের কাছে টেনে এনে অমিয়া দেবী বলেন, তবে কী জানিস? একবার কেউ যখন কারো রাজ্য গ্রাস করে তখন সে সেই অধিকৃত রাজ্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় না। আর পরাভূত জাতিকে চরম মূল্যের বিনিময়ে তা অর্জন করতে হয়। আমরা মেয়েরা যে কখন পুরুষের ভাবনার ক্রীতদাসী হয়ে গেলাম তা বুঝতে পারিনি।

আমাদের এই মহান ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের কথাই চিন্তা কর। তিনি নিরাকার সর্বশক্তিমান ব্রহ্মাকে জানার জন্য চরম ত্যাগের প্রচার করেছিলেন, বিদেহ জনক পরিষদে তর্কে বিজয়ী হলে তার শিষ্য সোমশ্রবা তাকে হাজার গাভী ও এক শত সুন্দরী নারী উপহার দিয়েছিলেন। চিন্তা কর, গার্গীর যুগেও নারী, গাভীর মতো উপহার সামগ্রী। সেই একশ নারী এক ব্রহ্মবাদী ঋষির ঘরে যেতে চায় কিনা সেই মত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তার থেকেও বড় প্রশ্ন, সেই উপহার সামগ্রী নিয়ে ঋষি কি করেছিলেন জানিস?

না।

হাজার গাভী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন।

ত্যাগের স্বীকৃতি?

মোটেই নয়। অমিয়া দেবী ঋজু ভঙ্গিতে বসেন। তার স্বর গম্ভীর। বলেন, ভেবে দেখ বিদেহ থেকে কুরু পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ হাজার গাভী নিযে অতিক্রম করতে কত সময় ও লোক-বলের প্রয়োজন হতো। পথে পড়ে ঘন অরণ্য। তাই ঐ গাভীগুলিকে ব্রাহ্মণদের মাঝে দান করে নিজের ত্যাগের বিজ্ঞাপন তুলে ধরাটাই যে অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ মজাটা দেখ, উপহার রূপে পাওয়া সেই সুন্দরী যুবতীদের নিয়ে তার অন্তঃপুরের রক্ষিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার সময় ত্যাগের মন্ত্র একবারের জন্যেও তার মনে আসে নি। তিনি তো বলতে পারেন নি, আমি জিতেন্দ্রিয় ঋষি। আমার জীবনে সুন্দরী যুবতীর প্রয়োজন নেই। এই কন্যারত্নদের তাদের পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দেও। এরাও সেই অমৃতের সন্তান।

বসুন্ধরা বলে, তখনও তো প্রতিবাদ ছিল।

নিশ্চয়ই ছিল। অমিয়া দেবী উঠে দাঁড়ান। আমাদের মতন নারীরাই সেই প্রতিবাদের বাণীকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

তুমি গার্গীর কথা বলছ, বড়মা?

হ্যাঁ, বসুন্ধরা। কিন্তু তাকেও তো চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গার্গী যখন ব্রহ্মবাদ নিয়ে যুক্তির জালে যাজ্ঞবল্ক্যকে নাস্তানাবুদ করছিলেন তখন যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে চরম সাবধান বাণীতে বলেছিলেন, 'সাবধান গার্গী, আর একটা প্রশ্ন করলেই তোমার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।'

কত বড় অবিচার! গার্গীর উচিত ছিল প্রশ্ন করা।

অমিয়া দেবী হেসে বলেন, মৃত্যুভয় তো সবারই আছে। আর একটা প্রশ্ন করলে গার্গীর মাথাটা যে সত্যিসত্যিই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতো।

বসুন্ধরা বেশ উত্তেজিত স্বরেই বলে, বড়মা তুমিও বিশ্বাস কর, এ দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে গার্গীর দেহ থেকে মস্তককে বিচ্ছিন্ন করে দিতেন?

অমিয়া দেবী বলেন, দেবতার ক্রোধে গার্গীর মস্তকচ্যুত হতো না। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মতেজে গার্গীর মাথার একটা চুল ও ভস্মীভূত হতো না। গার্গীর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতো সমাজ পিতাদের তরবারির আঘাতে। এইভাবেই যে দুনিয়ায় বহু মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

আরো ভয়ঙ্কর ঘটনা কি জানিস বসুন্ধরা? অমিয়া দেবী বসুন্ধরার ঘাড়ে হাত রেখে বলেন, এই সমস্ত ঘাতকদের জনরোষের আড়ালে রাখার জন্যই সৃষ্টি করতে হয়েছিল নানা অলৌকিক ঘটনার বাক্যজাল। তাই গার্গী সাহস করে আরেক ধাপ এগোলেই সেই ঘাতকেরা নিপুণ যাদুকরের মতন তার মস্তকটি তরবারির আঘাতে ছিন্ন করে ব্রহ্মতেজের ক্ষমতার গল্প ফাঁদত। আবার গার্গী যখন যাজ্ঞবল্ক্যের চাতুরী ধরতে পেরেও প্রাণের ভয়ে আর কোনো প্রশ্ন না করেই বিতর্ক মঞ্চ থেকে নেমে এসেছিলেন, তখন সুনিপুণ ভাষ্যকারের মতন বাক্‌চাতুর্যের

ছটায় ব্রহ্মবাদের প্রতি গার্গীর আনুগত্যের মিথ্যে গল্পকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হল।

বসুন্ধবাব সারা মুখে-চোখে একটা তীব্র উত্তেজনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। নিজের নিশ্বাসের উত্তাপ সে নিজেই অনুভব করে। অমিয়া দেবীর চোখে নিজেব দৃষ্টিকে স্থাপন কবে বলে, এত বড় একটা প্রবঞ্চনা কি আমরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব বড়মা? গার্গী থেকে শুরু হযেছিল। আজও চলছে। স্ত্রী নামক এক গৃহপালিতা নারীকে সুখী গৃহকোণেব শোভাব পুতুল করে তাব স্বামী তার নারী-সত্তাকে অবমাননা করে পুরুষত্বেব তৃপ্তি খুঁজতে অন্য পাড়ায় অন্য রমণীব কাছে নিশি যাপন করছে। তার লালসার শিকার সেই মেযেটি হচ্ছে পতিতা আর পুরুষটি বাড়ির চৌকাঠেব মধ্যে ফিবে এসে আদর্শ স্বামী ও পিতাব পোযাকটি পরে গত রাতের ঘটনাকে ভুলে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেউ কি বিদ্রোহী হবে না?

নিশ্চয়ই হবে। সেই আশাতেই যে পৃথিবী বেঁচে আছে। বসুন্ধবাব মাথাব চুলগুলিব মধ্যে আঙুলের আঁকি-বুকি এঁকে অমিয়া দেবী বলেন, নারীর স্বাধীনতা শুধু শ্লোগানের মধ্যেই অর্জন করা যাবে না। শুরু কবতে হবে সমষ্টিগতভাবে। এখন তো অধিকাংশ নাবী সে সম্পর্কের চাপেই হোক বা পুরুষের পক্ষপুটে থাকার মানসিক আত্মতৃপ্তির তাগিদেই হোক সামাজিক ভ্রূকুটিকে মেনে চলেছে। মনে কর যোগবাশিষ্ঠেব সেই কথাগুলি,

"তববোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।"

অর্থাৎ তরুলতা যেমন জীবনধারণ কবে হরিণ পক্ষিরাও জীবনধাবণ কবে। কিন্তু প্রকৃতরূপে জীবিত যে মনেব দ্বাবা জীবিত থাকে। আমাদেব যে সেই মনকে সৃষ্টি কবতে হবে। তার জন্য চাই প্রস্তুতি। তাব জন্য প্রয়োজন রণকৌশল।

কিছু না বোঝার বোবা চাউনি নিয়ে অমিযা দেবীব মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকে বসুন্ধবা।

বসুন্ধরা, মা আমার। অমিযা দেবীর ডাকে বসুন্ধরাব দুটি চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। চোখেব দু কোণে মুক্তোর ফোঁটা টলটল কবতে থাকে। বসুন্ধরার চোখেব উপব ঠোঁট দুটোকে নামিযে নিয়ে মুক্তধারাকে শুষে নিতে চান অমিয়া দেবী। গাঢ় আবেগে বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে এনে বলেন, বসুন্ধরা একটু ভেবে দেখ, তোব ছেলে যখন খেলাব মাঠ থেকে চোখেব জলে সারা মুখ ভাসিয়ে ফিবে এসে তোব কোলে মাথা গুঁজে জিজ্ঞাসা কববে, মা ওবা আমার বাবার নাম নেই বলে এত খাবাপ কথা কেন বলে? তখন কি তুই পাববি ঐ ছেলেগুলি যে সংস্কারের নাড়ি বন্ধনে আবদ্ধ তাকে কেটে বাদ দিয়ে মুক্ত হাওয়ায় তোর ছেলের সাথে ঐ ছেলেগুলোকে মিশিয়ে দিতে? মা হয়ে কি আমবা পারি নিজের সন্তানকে নিরস্ত্র অবস্থায় এই হিংস্র পরিবেশে ছেড়ে দিতে?

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে বসুন্ধরা। অমিয়া দেবীর দুটো হাঁটুর মাঝে নিজের মুখটা গুঁজে দিয়ে হুঁ হুঁ করে কেঁদে ফেলে। মনে হয়, এই কান্নাব জন্যই যেন তার সমগ্র চেতনা অপেক্ষা করছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের উচ্ছ্বাসে সমুদ্রের ঢেউ যেমন পাড়ে এসে ভেঙ্গে পড়ে তেমনি অবরুদ্ধ আবেগের ঢেউ বসুন্ধরার স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন আছড়ে পড়ছিল। তাব গলা থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে, বড়মা, আমাকে আর একথা শুনিও না।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার হাত দুটো ধরে তাকে ধীরে ধীরে তুলে আনেন নিজের বুকে। ওর কপালে এঁকে দেন গভীর চুম্বনের রেখা। ডানহাতের বেষ্টনীতে বসুন্ধরার শরীরটাকে নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে দিয়ে ওর দেহের উত্তাপকে যেন শুষে নিতে চাইছিলেন, বাঁ হাতটা ওর পিঠের উপর গভীর মমতার স্পর্শের টানে ওঠানামা করছিল।

বসুন্ধবার মাথাটা নিজের কাঁধে টেনে এনে অমিয়া দেবী বললেন, তোর কোনো ভাবনার কাবণ নেই। আমি তো আছি। যে আসছে তুই যদি চাস তবে সে আসুক। ওর জন্মদাতা যেই হোক সে যদি তোর চোখে মৃত হয় তবে সে আমাব কাছেও মৃত হয়ে থাকুক। ও পিতৃহীন হয়েই আমাদের কাছে মানুষ হবে। তবে এই নিষ্পাপ শিশুর কথা ভেবে ওর জন্মদাতার নামটা আমাব কাছে বল। মার কাছে কিছু লুকোস না মা।

বড়মা, অমিয়া দেবীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসুন্ধরা। বলে আমাকে একটু সময় দাও বড়মা। তোমাব কাছে তো কিছুই অজানা থাকবে না। তোমার কাছে তার নামটা যে অজানা নেই তা আমি জানি।

তবু তোর মুখ থেকেই যে তাব নামটা আমার শোনা দরকার।

তোমাকে আমি সব বলব, বড়মা।

অমিয়া দেবীব বুকে মুখ গুঁজে দেয় বসুন্ধবা।

| ৭ |

বড়দির ওখান থেকে ফিরে এসে চোখে মুখে জল দিয়ে প্রথমে বাবান্দায় বসেছিল বসুন্ধরা। সারা মন জুড়ে কেমন একটা অবসাদ। কোনো পরিচিত মুখেব মুখোমুখি হতে ভাল লাগছিল না। ঘরেব ভিতব এসে ফ্যানেব সুইচটা অন করে দুহাত দিযে চোখ দুটিকে ঢেকে শুয়ে পড়ল।

বড় মামাকে বলে এসেছিল সে স্কুলে জয়েন করেই চলে আসবে, সেখানকার একটা নামী কলেজ তাকে তাদেব কলেজে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। বসুন্ধরা বড় মামাকে বলেছে, ও একবাব তাব স্কুলে দেখা করে আসতে চায়।

এম এ পরীক্ষাব রেজাল্ট বেরবার পরপরই কলেজ সার্ভিস কমিশনে তার নামটা মোটামুটি ভাল জায়গাতেই ছিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ভাল কলেজে সুযোগ পেলে অতি অবশ্যই জয়েন করবি।

বসুন্ধবা বলেছিল, তুমিও তো ইচ্ছে কবলে কোনো নামী কলেজের অধ্যাপিকা হতে পাবতে। এই গ্রামের স্কুলে পড়ে আছ কেন বড়মা?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এখানে এসে তোকে পেয়েছি। এব থেকে বড় পাওয়া যে আব আমার কিছুই হতে পারে না।

বসুন্ধবা জবাব দিযেছিল, এই গ্রামে আমিও তো আমাব বড়মাকে পেযেছি, তাকে ছেড়েও আমি কোথাও যেতে চাই না।

কিন্তু দিদা? তার কথা ভাবলেই যে বুক ঠেলে একটা কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। মা চলে যাবাব পর এই দিদাই তো ছিল তার সব। স্নেহেব সাগর অথচ কর্তব্যে অবিচল। প্রয়োজনে এই দিদাই কত কঠোর হতে পারে তা সে দেখেছে। মার মৃত্যুর একদিন আগে তার বাবা তাকে শিলিগুড়ির এক পিসির বাড়িতে রেখে এসেছিল। দিদা ঠিকানা খুঁজে তাকে মার শ্রাদ্ধেব দুদিন আগে নিয়ে এসেছিল। পিসি বাধা দেওয়ার কথা ভাবতেই সাহস করে নি। দিদা তাকে বুলবুল চণ্ডিতে নিয়ে এসে পাখির ডানার মতন আগলে রেখেছিল। শরীরে সামান্য পরিবর্তন হলেই দিদার চোখে তা ধরা পড়ে যেত। দিদা ছিলেন এক চলমান থার্মোমিটার। দূর থেকেই ডাকতেন, বসুন্ধরা আমার কাছে আয় তো, কাছে এলেই নিজের গাল দিয়ে তার কপালটা স্পর্শ করতেন। শরীরে তাঁপ দেখার এটাই ছিল তার পদ্ধতি। আরো

আশ্চর্য, দিদা এভাবেই বলে দিতেন তার কত জ্বর। বসুন্ধরা অনেকদিন থার্মোমিটার বগলে দিয়ে তাপমাত্রা মেপে দেখেছিল দিদার গাল দিয়ে মাপার সাথে মিশে গেছে।

বসুন্ধরা বলত, আচ্ছা, দিদা তুমি ডাক্তার হলেই তো পারতে।

হাসতেন স্বর্ণপ্রভা বলতেন, ডাক্তার না হই, জানিস কত বড় কবিরাজের মেয়ে ছিলাম আমি? আমার বাবার নাম এক ডাকে দশটা গ্রাম চিনত। সবাই বলত কবিরাজ মশাইয়ের নামেই রোগের অর্দ্ধেক ভালো হয়ে যায়। একবার আমার শাশুড়ির খুব অসুখ করেছিল। আমার শ্বশুরমশাই গ্রামের জমিদার। ভীষণ প্রতাপ তার। শহর থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে সাহেব ডাক্তার আনিয়েছিলেন। তিনি এসে শাশুড়িকে জবাব দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তখন নায়েব মশাই বলেছিলেন, একবার কবিরাজ মশাইকে দেখালে হতো না?

আমার শ্বশুরমশাইয়ের সাথে বাবার যে শুধু পরিচয় ছিল তা নয়, তার সাথে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। অনেকবার তাকে চিকিৎসার জন্য ডেকেও নিয়ে গেছেন। কিন্তু সেবার শাশুড়ি ঠাকুরুনের অসুখটা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে পড়েছিল। বাবার উপর ভরসা রাখতে পারেন নি। তাই সাহেব ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলেন। নায়েবের কথা শুনে তিনি নায়েবকেই পাঠিয়েছিলেন বাবাকে ডেকে আনতে। কিন্তু বাবা নায়েবকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

কেন দিদা? বসুন্ধরা ঘেঁসে বসত।

বাবা যে বড্ড জেদি ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, দিদু। বসুন্ধরাকে কোলে টেনে নিয়ে স্বর্ণপ্রভা বলতেন, শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসাতে বাবার খুব অভিমান হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল নায়েব কে ফিরিয়ে দিয়েছে এবার না জানি কী হয়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে জমিদারবাবু মানে আমার শ্বশুরমশাই নিজেই আমার বাবাকে ডাকতে বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। আসলে বাবা আর আমার শ্বশুর দুজনে ছিলেন সহপাঠী। বন্ধুত্বও ছিল গাঢ়। দুই বন্ধু মুখোমুখি হতেই বাবার অভিমান জল হয়ে গেল। বাবা কোনো কথা না বলে তার ওষুধের বাক্স নিয়ে রওনা হলেন। আমার শাশুড়ি বাবার ওষুধ খেয়েই ভালো হয়ে গেলেন।

দিদা, তোমার বিয়ে দাদুর সাথে কি করে হল? বসুন্ধরার চোখে মুখে কৌতূহল।

মুখটা যেন এই বয়সেও রাঙা হয়েছিল স্বর্ণপ্রভার। বসুন্ধরাকে টেনে নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে বলেছিলেন, তোর বয়সেই তো আমি মা হয়ে গিয়েছিলাম। আর তুই আমার কোলে বসে আমার বিয়ের গল্প শুনতে চাইছিস। দাঁড়া, এবার তোর একটা বিয়ে দিয়ে দি।

আমি তো আর তোমার মতো এত অসভ্য নই। লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল বসুন্ধরার।

হেসে বলেছিলেন স্বর্ণপ্রভা, ওরে পাগলি, আমার যখন তের বছর বয়স তখনই আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরমশাইয়ের ধারণা ছিল কবিরাজের মেয়ে ঘরে এলে বাড়ি থেকে সব রোগ আপনা থেকেই পালাবে।

দাদু তখন কেমন ছিল দিদা?

সেই বাইশ বছরের তাগড়াই জোয়ান চেহারা। বিশাল ঝাঁটার কাঠির মতন দুই গোঁফ, আমার মুখের কাছে আনলেই ওর খোঁচায় আমি খালি হেঁচে ফেলতাম।

তুমি তো বড্ড অসভ্য ছিলে দিদা। বসুন্ধরার চোখ দুটিতে দুষ্টুমির ঝিলিক, তোমারই বা দাদুর গোঁফের কাছে মুখ আনার দরকার কি ছিল?

বসুন্ধরার গালদুটো আদর করে টিপে দিয়ে স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, দাঁড়া নাতজামাই আসুক। ওকে আমার কাছে শুতে বলব। নাতজামাইকে জানিয়ে দেব নাতনী আমার কারো মুখের কাছে মুখ আনা একদম সহ্য করতে পারে না।

ইস্, বসুন্ধরা দিদার হাত থেকে গালদুটো ছাড়িয়ে নিয়েছিল।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন মেয়ের আমার হিংসা দেখ, তোব দাদুকে আমি কেমন জব্দ করেছিলাম জানিস?

বল, দিদার কোল ঘেঁসে বসে বসুন্ধরা।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, একদিন দুপুরে শাশুড়ি কী একটা জিনিস আনতে আমাদের ঘরে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখি তোর দাদু চিত হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আর তার সেই ঝাঁটা গোঁফ দুটি নিশ্বাসের তালে তালে নাচছে। তখন তো আর এখনকার মতো দিন দুপুরে স্বামীর ধারে কাছে যাওয়া যেতনা, কেউ দেখে ফেললে লজ্জার একশেষ। তাকিয়ে দেখি কাল বাতে কাপড় কাটতে যে কাঁচিটা এনেছিলাম সেটা মেঝের এক পাশে তখনো পড়ে আছে। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলাম। সাবধানে কাঁচিটা হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তোর দাদুর শিয়রেব কাছে গিয়ে কাঁচি দিয়ে তার একপাশের লম্বা গোঁফটা একেবারে মুড়িয়ে কেটে দিযে কাটা গোঁফটা আঁচলে লুকিয়ে ফেললাম। কাঁচিটা ঐ একই জায়গায় রেখে হামাগুড়ি দিয়ে দরজা পর্যন্ত এসে দেখি কেউ কোথাও নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে এক ছুটে শাশুড়ির ঘবে গিয়ে দেখলাম তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। গুটি গুটি হযে তার পাশে শুযে পড়লাম।

ও দিদা, তোমার কোনো জবাব নেই। বসুন্ধরা স্বর্ণপ্রভাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তাবপব কি হল?

কী আব হবে? স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, ঘুম কি আর আসে? ঘুমের ভান কবে শুযে রইলাম। শাশুড়িব ঘুম ভাঙলে, আমি ঘুমিয়ে আছি ভেবে আমাকে না জাগিয়ে উঠে গেলেন। আমি মিটি মিটি চোখে দেখতে থাকলাম কী হয়। শাশুড়ির ঘর থেকে তোর দাদুব ঘরের ভিতর খোলা দবজা দিয়ে দেখা যেত।

আরে দিদা, তোমার কাছে দাদুর ঘরেব বর্ণনা কে শুনতে চাইছে? বসুন্ধরা অধৈর্য কণ্ঠে তাড়া লাগায়। দাদুর কি অবস্থা হয়েছিল, তাই বল না।

স্বর্ণপ্রভা নাতনীর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, দাঁড়া, এক্ষুণি তো বলবি তোমার শাশুড়ির ঘর থেকে দাদুর অবস্থা দেখলে কী করে?

বসুন্ধরা বলেছিল, না দিদা, তোমার কোনো কথাই অবিশ্বাস করব না। তুমি, দাদুর চেহারা কী হয়েছিল তাই বল।

স্বর্ণপ্রভা হেসে বলেছিলেন, হঠাৎ ঝনঝন করে কাপ-প্লেট ভাঙ্গার শব্দে ধরমর করে উঠে পড়লাম। ভয়ে বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ কবতে লাগল। ভাবলাম তোর দাদু বোধ হয় তার এক পাটি গোঁফের শোকে কাপ-প্লেট ভাঙ্গতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এলাম। দেখলাম আমাদের চাকর শিবরাম তোর দাদুকে চা দিতে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকেই তোর দাদুর মুখের নতুন চেহারা দেখে সে এত চমকে উঠেছিল যে সে তার হাসির ধাক্কা সামলাতে না পেরে হাতের ট্রে শুদ্ধ কাপ প্লেটগুলি ফেলে দেয়। আমার শাশুড়ি শব্দ শুনে সেখানে এসে ছেলের মুখের চেহারা দেখে প্রথমেই হা করে তাকিয়ে থাকেন। তারপরেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালান। আমার শ্বশুরমশাই খুব রাশভারী ছিলেন। তিনি হৈচৈ শুনে সেখানে এসেছিলেন, না শাশুড়ি পাঠিয়েছিলেন তা এখন মনে নেই তবে তোর দাদুর চেহারা দেখে তিনি সবার সামনে হাসিকে লুকোতে সেখান থেকে সরে গিয়ে চাকরকে পাঠিয়েছিলেন নাপিত ডেকে আনতে।

আঃ দিদা, দাদু তখন কী করছিল? সেটা আগে বলতো। বসুন্ধরা তাগাদা দেয়।

স্বর্ণপ্রভা হেসে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন এই মেয়ে, এত তাড়া দিবি না। তোর দাদুতো

কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে সবাইকে হাসতে দেখে নিজেও হাসতে শুরু করেছিল। আর সেই হাসির তালে তালে তার এক পাটি গোঁফটা যে ভাবে আরশোলার একটা ভাঙ্গা পায়ের মতন উঠানামা করছিল তাতে সবার হাসিকে আবো তাতিয়ে দিচ্ছিল।

বসুন্ধরা হাসিতে লুটিয়ে পড়ে বলেছিল, একটু দাঁড়াও দিদা। হাসতে হাসতে যে পেটে খিল ধবে গেল।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, তবে থাক, তোর পেটে খিল ধবিয়ে লাভ নেই।

দিদা, লাফিয়ে উঠেছিল বসুন্ধরা। বল, বল।

নাপিত তোর দাদুর চেহারা দেখে হতভম্ব। সে তার বাক্স হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর তোর দাদুও নাপিতকে দেখে অবাক। সে তাকে ধমকে উঠে ব্যাটা, সকালে কি করেছিস? এখন এসে কি করবি? নাপিত ভয় পেয়ে পালাতে যায়। ওভাবে সকালে ওর খুরের টানে ছোটো কর্তার গোঁফটা উড়ে গেছে। প্রাণের ভয়ে তাড়াহুড়ো কবে পালাতে যেতেই ওর হাত থেকে বাক্সটা খুলে গিয়ে আযনাটা পড়বি তো পড় তোর দাদুব সামনে। আর সেই আয়নায় চোখ পড়তেই—

স্বর্ণপ্রভার কথা তার মুখেই থেকে যায়। বসুন্ধরা তাকে জড়িয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল। ও দিদা. তোমার জবাব নেই। হাসির দমকা স্রোত থেমে এলে বলেছিল, দাদুকে তোমার এই কীর্তিব কথা কোনোদিন জানাও নি?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, আমার শাশুড়ি বুঝেছিলেন, কে এটা করেছে।

তুমি বলেছিলে?

না, তোর দাদুর সেই গোঁফটা যে আমি যেখানে শুয়েছিলাম সেখানে পড়েছিল। আমাব শাশুড়ি আমার বেণী ধবে টান ' যে বলেছিলেন, ওটা জানালা দিয়ে ফেলে—দে।

আর দাদু?

মুচকি হেসে স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, তোব দাদুব একটা মেয়ের খুব শখ ছিল। তোব মা আমার কোলে আসার পর যেদিন তাকে তোর দাদু কোলে নিতে এসেছিল সেদিন বলেছিলাম।

তারপর?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, তুই তোর দাদুর হাসির আওয়াজ শুনিস নি। তোর দাদুর অট্টহাসিতে দালানের দরজা জানালাগুলি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আমার তো ভয় হচ্ছিল সেই আওয়াজে তোর মা আবার কালা না হয়ে যায়।

দিদার ঘরের দিকে তাকায় বসুন্ধরা। দরজা খোলা। ঘর অন্ধকাব। দিদা নেই। এই প্রথম দিদাকে ছাড়া এই বাড়িতে রাত কাটাচ্ছে।

এই দিদা শুধু তার অভিভাবিকা ছিল তা নয়। এই দিদাই ছিল তার খেলার সাথী। তার বন্ধু। মনে পড়ে যে দিন সে নিজেকে নারী বলে চিনতে পেবেছিল। ব্যাপারটা ওর কাছে ছিল একেবারেই আকস্মিক। বাথরুমে স্ত্রীঅঙ্গ থেকে রক্ত দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল। ভেবেছিল তার নিশ্চয়ই কোনো শক্ত অসুখ করেছে। নয়ত এত রক্ত আসবে কেন? মনে হয়েছিল সে আর বাঁচবে না। তার সেই আর্ত চিৎকারে দিদা ছুটে এসেছিল। বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করেছিল। বাইরে দিদা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ভিতরে সে ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। এত রক্ত। তার মনে হয়েছিল সে আর বেঁচে নেই। দরজায় দিদার ভয়ার্ত ডাক, বসুন্ধরা, বসুন্ধরা। কিন্তু সে উঠে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খোলার শক্তি পাচ্ছিল না। এমন কি দিদার ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে দিদার ডাকে বাড়ির সবাই জড়ো হয়েছিল সেখানে। তাদের ধাক্কায় দরজা ভাঙ্গার উপক্রম

হতে বুঝতে পেয়েছিল সে মরে নি, বেঁচে আছে। কোনোমতে দরজা খুলে দিদিমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সেদিন দিদিমাই জানিয়েছিল এটাই নিয়ম। ঋতুচক্রের মতন এটাও নারীর ঋতুচক্র। এই ঘটনাই টেনে দেয় নারী ও পুরুষের ভেদ রেখা। মানুষ হলেও সে নারী। সে একাধারে ধারক ও দাতা। সৃষ্টির বাহক। তাব পদক্ষেপ সামাজিক অনুশাসনেব গণ্ডিতে বাঁধা। পুরুষের জীবন অবাধ হলেও নারীর জীবনের চারিপাশে লক্ষণের গণ্ডি টানা আছে, এর ওপারেই আছে রাবণদের আনাগোনা। তার জীবনের প্রতিটি স্তরই আবর্তিত হবে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথের মধ্যে। সামান্য ব্যতিক্রম হলেই কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো সামাজিক ভ্রূকুটির তপ্ত স্পর্শে ভস্মে পবিণত হবার আশঙ্কা।

দিদিমার কাছেই জেনেছিল, নারী জীবনের অর্থ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে বাড়ির তীব্র অনুশাসনেব পাহারা, বিবাহিত জীবনে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সেবা, মাতৃজীবনে সন্তানের জন্যে প্রতিটি আনন্দঘন মুহূর্তকে অকাতবে বিলিযে দেওয়া, আর শেষ জীবনে সবার অনুকম্পায় বেঁচে থাকা।

দিদিমা তাকে সাবধানী পদসঞ্চারের কথা বলেছিল। সে সাবধান আরেক মানুষ থেকে। সে মানুষ পুরুষ। সে জেনেছিল পুরুষের ঔরসে গর্ভধারণ করা নারীত্বের যে পূর্ণতা দেয় সেই গর্ভধারণই আবার নারীর জীবনে ডেকে আনে বিপর্যয়।

স্বামীই নারীর জীবনে সব। দিদিমা বলতেন।

না, বসুন্ধরা জ্বলে উঠত।

ও কথা বলতে নেই মা।

তোমার মেয়েরও তো স্বামী ছিল, দিদা।

কি বলছিস তুই? দিদা তার মুখটা চেপে ধরতে চাইত।

বসুন্ধরার চোখ দুটি জ্বলে উঠেছিল। বলেছিল, আমি ছোটো হলেও অনেক কিছু বুঝতে পারতাম দিদা। বাবা রাত্রিবেলায় টলতে টলতে বাড়ি ফিরত। মা জেগে বসে থাকত মাতাল পতি দেবতাকে প্রায় ঘাড়ে করে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিত। বাবার জুতো মোজা খোলারও ক্ষমতা থাকত না। মা মাতাল স্বামীর অশ্রাব্য গালাগালি শুনতে শুনতে তার জুতো মোজা খুলে দিত। বাবার চিৎকারে আমাব ঘুম ভেঙ্গে যেত। প্রথম প্রথম আমি ভযে চিৎকার করে উঠতাম। এতে বাবার মাতলামি আরো বেড়ে যেত। আমাকে মারত। আর আমাকে বাঁচাতে এসে মার পিঠের উপর এসে পড়ত বাবার কিল, চড় এমন কি লাথি। মা যখন তোমার কাছে আসত তখন আমাকে দিয়ে বারবার প্রতিজ্ঞা করাত আমি যেন বাবার কথা তোমাকে না বলি। ভয় দেখাত প্রতিজ্ঞা ভাঙলে মা মরে গিয়ে আকাশের তারা হয়ে যাবে। তুমি জাননা দিদা, বাবা একদিন মার পিঠে গরম ইস্ত্রি চেপে ধরেছিল। আর সেদিন বাতেই মা আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিল যে আমরা সবাই ভাল আছি।

উত্তেজনায় বসুন্ধরা লক্ষ করেনি স্বর্ণপ্রভা পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। অশ্রুর স্রোত তার গণ্ডদেশ বেয়ে চলেছে। অনুশোচনায় তার বুক ভারী হয়ে উঠেছিল। এতদিন দিদাকে যখন কিছুই বলে নি আজ এই বৃদ্ধার মনকে ভারী করে দিয়ে নিজে হাল্কা হতে চাওয়াকে বড্ড স্বার্থপরতা বলে মনে হয়েছিল। দিদাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, দিদা, পতি পরম দেবতার যে মন্ত্র মাকে শিখিয়েছিলে তা আমাকে শিখিও না। আমাকে শক্তি দাও নিজের সম্মানটুকু যাতে আদায় করে নিতে পারি।

ঠিক বলেছিস দিদু। দিদার চোখের জল যেন নিজে থেকেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, তোর মাকে যদি ও কথা শেখাতাম তবে আজ আমাদের ঘর শূন্য হত না।

আমাকে শেখাও দিদা।

তাই বলছি, মুখ গুঁজে কাঁদবি না। দরকার হলে পাল্টা মার দিবি। তোর গায়ে যেন কেউ আগুন না দিতে পারে।

বসুন্ধরা দিদার হাত দুটোকে চেপে ধরে বলেছিল, তুমি আমাকে সেই মন্ত্র দাও। শুধু আমাকে নয় আর কোনো বৈশাখীকে যেন পুড়ে মরতে না হয়। ওদের জন্য আমাকে দাঁড়াবার সাহস দাও।

সেই দিদা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, তোর মা আমার কাছে রামায়ণ শুনতে খুব ভালোবাসত। তাকে আমি প্রতিদিন রাতে শোবার সময় রামায়ণের গল্প শোনাতাম। আর বলতাম, সীতার মত হবি। সে যে সত্যি সত্যি তাই হয়ে যাবে সে কথা ভাবি নি।

বসুন্ধরা দিদাকে বলেছিল, সীতাকে তোমরা যতই দেবী বল না কেন, আমি কিন্তু সীতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

ছিঃ মা, ও কথা বলিস না। দিদা তার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল।

দিদা, তুমিই বল, যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার জন্যে রাজপ্রাসাদের সমস্ত সুখ ও ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়ে তার অনুগামিনী হল তাকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল একবার নয় দু-দুবার। তাও আবার প্রতিবেশীদের মান রাখতে। কই রাম তো একথা বলতে পারেন নি, আমার স্ত্রীকে আমার থেকে আর কারো বেশি জানার কথা নয়। তবে কি রামের মনেও সীতার প্রতি সন্দেহের যে কাঁটা উঁকি দিয়েছিল তা এইভাবে পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছিলেন? ভেবে দেখ দিদা, নারীত্বের প্রতি এত বড় অপমান সীতা নারী হয়েও মেনে নিলেন। তিনি তো প্রশ্ন করলেন না, রাম এই বনবাস জীবনে কোনো নারীর শয্যাসঙ্গি হয়েছিলেন কিনা।

বসুন্ধরা, আমাকে আর এসব কথা বলিস না। দিদা মুখ ঢেকেছিল। আমি যে তোদের যুগের মানুষ নই। তোদের মতন লেখা পড়া শিখি নি। আগে হলে তর্ক করতাম। বলতাম এসব কথা বলা পাপ। তোর মা আমার সব বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়েছে। তুই তোর মতো করেই নিজেকে তৈরি কর।

আচ্ছা দিদা, এর জন্যে তো আমাকে লড়তে হবে। অনেকে অনেক কথা বলবে। আমার নামে যদি কেউ খারাপ কথা বলে তবে কি তুমি তা বিশ্বাস করবে?

না।

কেন?

তুই যে আমার নাতনী। বৈশাখীর মেয়ে। তুই যে কোনো খারাপ কাজ করতে পারিস না।

দিদা তোমার বিশ্বাসের কথা রাখতে পারলাম না। বালিশে মুখ গুঁজে হুঁ হুঁ করে কেঁদে ফেলল বসুন্ধরা।

। ৮ ।

সেদিনের সেই ঝড় থেমে যাবার পরের দিনই স্বর্ণপ্রভাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল বসুন্ধরা। বড়মামা কলকাতাতেই ফ্ল্যাট কিনেছেন। গৃহপ্রবেশে সে আর দিদা গিয়েছিল। বেশ বড় ফ্ল্যাট। ড্রইং রুম ছাড়াও তিনটে বেড রুম। দক্ষিণ দিকে ব্যালকনি। বড়মামা বলেছিল,

তোর আর মার জন্য ব্যালকনির পাশের ঘর। দিদার বয়স হয়েছে। এবার বুলবুল চণ্ডীর থেকে দিদাকে নিয়ে এখানে চলে আয়। তোর ইউনিভার্সিটিও কাছে হবে। আমি রিটায়ার করে তোর মামীকে নিয়ে চলে আসব। সমর আমেরিকা থেকে ফিরবে কি না কে জানে। ওতো চিঠিতে লিখছে ওখানেই ভালো চাকরি পাবে।

সমর বড়মামা-বড়মামীর একমাত্র ছেলে। আগাগোড়া দিল্লিতেই মানুষ। বাংলা কথার মধ্যে হিন্দির টান। গত বছরে কানপুর আই আই টি থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেই আমেরিকার একটা কোম্পানীর ডাকে সে বিদেশে গেছে। বসুন্ধরা থেকে বছর দুয়েকের বড় সাগর ছোটোবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখত আমেরিকায় যাবে। বলত এদেশে কোনো উন্নতি করা যাবে না। যে দেশে মন্ত্রীর ঠাকুর ঘরে কোটি কোটি টাকা লুকানো থাকে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী হলে হাজার হাজার কোটি টাকা পশুখাদ্যের নামে লুঠ করা যায়, সেখানে দেশের ছেলে দেশে থাকার উপদেশ মেনে নেওয়ার কোনো অর্থ নেই।

গৃহপ্রবেশের পর পরই স্বর্ণপ্রভা চলে এসেছিলেন। বলেছিলেন, তোর এখানে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।

ভোরের দিকেই স্বর্ণপ্রভা বুকের বাঁ দিকে চিন চিন ব্যথাটা অনুভব করেছিলেন। ভেবেছিলেন অম্বলের ব্যথা। জল খেতে গিয়ে সব অন্ধকার দেখেছিলেন। এখানে ডাক্তার বলতে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ডাক্তার। তিনি এসেই বলেছিলেন মালদায় নিয়ে যেতে হবে। অমিয়া দেবী আগেই এসে পড়েছিলেন। দিল্লিতে ফোন করেই সেই ডাক্তারকে নিয়ে ট্যাক্সি করে মালদায় রওনা হয়েছিলেন। পিছনের সিটে স্বর্ণপ্রভা শুয়ে। তার মাথার দিকের সিটের নীচে বসুন্ধরা পায়ের কাছে অমিয়া দেবী। অ্যামবাসাডারের ছাদে তার দিয়ে স্যালাইনের বোতল বাঁধা। দিদার যন্ত্রণা কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে বসুন্ধরার মনে হচ্ছিল কলেজের থেকে একটা হাসপাতাল স্থাপনই বোধ হয় এখানে অনেক বেশী জরুরি ছিল।

দিল্লি থেকে কলকাতায় উড়ে এসে বড় ছেলে তার সাথে যে ডাক্তার নিয়ে এসেছিল তাকে দেখে হাসপাতালের ডাক্তার মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরূপে ভারতজোড়া নাম। সারা দেশ জুড়ে তার ছাত্র। দুদিন যমে মানুষে লড়াই করার পর স্বর্ণপ্রভাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

নার্সিং হোম বাড়ি। সে দিনের ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে ভাবার সুযোগ পায় নি। বাইরের ঝড় আর জীবনের উপর ঝড় যে আরেক জীবনের বীজ তার গর্ভে বপন করেছিল তার প্রকাশ এই ব্যস্ততার চাপে মাথা চাড়া দিতে না পারলেও প্রকৃতির নিয়ম চাপা থাকে নি। প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বমির মধ্যে। সন্দেহের খোঁচাটা তখনই মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে অন্য উপসর্গগুলি জাঁকিয়ে বসলেও তা লক্ষ করার মতন মহিলা বাড়িতে ছিলেন না। বড়মামী ব্যস্ত শাশুড়ির দেখাশোনায়। তবু জিজ্ঞাসা করেছিল, তুই খাওয়া-দাওয়া এত কমিয়ে দিয়েছিস কেন? মা তো এখন অনেক ভাল আছেন। বসুন্ধরা প্রথমে চমকে উঠেছিল। পরে বুঝতে পেরেছিল বড়মামী মনে করেছে দিদার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তায় তার খিদে হচ্ছে না।

বড়মামা কাছেই ছিল। বসুন্ধরাকে কাছে টেনে এনে বলেছিল, সত্যি মার অসুখের জন্য তোর দিকে আমরা কেউ একবারও নজর দিতে পারিনি। চল, আজকেই তোকে ডাক্তার দেখিয়ে আনি।

বসুন্ধরা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল কি যে বল বড়মামা। আমার আবার কি হয়েছে? একটু পরিশ্রম হয়েছে। সে তো সবারই হচ্ছে। বড় মামীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ? সারা কাজ তো বড়মামীই করে চলেছে।

অমিয়া দেবী ছিলেন অনেকদিন। স্বর্ণপ্রভার সাথেই কলকাতায় এসেছিলেন। বসুন্ধরা তাকে তাদের সাথে থেকে যাবার কথা বললেও অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এখানে তো বড়মামা আর বড়মামী আছেন। এ ছাড়া মা নার্সিং হোমে আছেন। আমি আমার বাবার বাড়ি থেকেই যাতায়াত করব।

অমিয়া দেবীর বাবা বাড়ির ভাগের কাজটা সেরে রেখেছিলেন। তেতলা বাড়ির নীচের দুটি তলা দুই ছেলের জন্যে। ওপরতলা মেয়ের জন্য। প্রতি তলায় চারটে করে ঘর। এছাড়া আছে ছাদের উপর দুটো ঘর। যখন যার প্রয়োজন সে তখন এই ঘর দুটোকে ব্যবহার করতে পারবে।

অমিয়া দেবী দাদাদের এই ঘরগুলি দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দাদা আপত্তি করে বলেছিলেন না, বাবার ইচ্ছেকে অসম্মান করা উচিত নয়। তাছাড়া, আমরা তো ভাই বোন। একই সাথে একই বাড়িতে বড়ো হয়েছি। এই বাড়ি আমাদের তিনজনের। ওপরের ঘর আমার দরকার পড়লে তুই কি আমাকে ব্যবহার করতে দিবি না?

আর কিছু বলেন নি অমিয়া দেবী। তমাল একটা ঘরে এসে থাকত। আর অমিয়া দেবী নিজের জন্য রেখেছিলেন আরেকটি ঘর। বাকি ঘরগুলি দাদাকে বলেছিলেন ব্যবহার করতে।

হায়ার সেকেণ্ডারীতে রেজাল্ট ভালোই হয়েছিল তমালের। তিনটে বিষয়ে লেটার। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে উপরের দিকে না থাকলেও মাঝামাঝি জায়গায় ছিল। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জায়গা পাবে না পাবে না করেও পেয়ে গেল। অমিয়া দেবী ভেবেছিলেন, তমাল পাশ করার পর ওকে বেঁধে ফেলবেন। এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেন, স্বর্ণপ্রভার কাছে বসুন্ধরাকে ভিক্ষা চাইবেন।

ভিক্ষা শব্দটাকেই তিনি মনে মনে বেছে নিয়েছিলেন। জীবনে কারো কাছে মাথা নিচু না করলেও বসুন্ধরাকে পুত্রবধূ রূপে পেতে মাথা নত করে ভিক্ষা চাইতে তার কোনো দ্বিধা নেই। বারবার মনে হতো সেদিন যদি ডাল লেকের হাউসিং বোটে যাবার সুযোগ পেতেন তবে বসুন্ধরা তার কোলেই আসত।

তমাল তার একমাত্র সন্তান। নিজের বিন্দু বিন্দু রক্তে তাকে জঠরে লালন করেছেন। তিল তিল করে তাকে স্বপ্নের সৌধ বানাতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তমাল হবে তার ভাবনার প্রতিষ্ঠান। তবে কি স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে যে বিশাল শূন্যতাকে ভরাট করতে তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেখানেই ছিল ভুল? প্রশ্নটা বার বার অমিয়া দেবীর মনে উঁকি দিতে চেয়েছে।

সুবোধ বালক নামক ভালো ছেলে হবার কথা অমিয়া দেবী ভাবেন নি। তিনি চেয়েছিলেন তমাল স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে শিখুক। জানুক, জীবন সমুদ্রের ঢেউ সব সময় শান্ত থাকেনা। এখানে ওঠে ঝড়। তেড়ে আসে ঢেউ। জানতে হয় দাঁড় চালনার কৌশল। চিনতে হয় হাল ধরার কায়দা। সাঁতরে পার হতে হয় তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রের বাধা।

স্বামী প্রতুলবাবু তখন বেঁচে। মাস তিনেকের জন্য সবাই মিলে দিল্লিতে ছিলেন। বিকেল হলেই প্রায়ই যেতেন বিদেশি দূতাবাসগুলির কাছে। মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতেন বিদেশি মায়েরা তাদের সন্তানের সঙ্গে কী রকম আচরণ করে। একবার ফরাসী দূতাবাসের সামনের মাঠের উপর দিয়ে হাঁটছিলেন। তমালের বয়স তখন বছর পাঁচেক। তমাল ছুটতে চাইলে তাকে বার বার সাবধান করছিলেন। কিছু দূরে তমালের থেকেও ছোট একটা ছেলে কী দেখে খুব জোরে ছোটা শুরু করেছিল। মাথার চুল সোনালি। গায়ের রঙ টকটকে লাল। তার মা নির্বিকার ভাবে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছিল। বিদেশী, তবে কোন দেশের তা বুঝতে পারেন নি। হঠাৎ সেই বাচ্চাটা পায়ে পা জড়িয়ে মাঠের উপর পড়ে গিয়েছিল। মনে হল

ওর খুব লেগেছে। কারণ বাচ্চাটি পড়ে আর উঠছিল না। মার দিকে তাকিয়ে শুয়ে শুয়েই কাঁদছিল। অমিয়া দেবী ভেবেছিলেন বাচ্চাটির মা নিশ্চয়ই সেখানে ছুটে গিয়ে তাকে মাটি থেকে তুলে কোলে টেনে নেবেন। গায়ের ধুলো পরিষ্কার কবে তার চোখ-মুখ চুমুতে ভরিয়ে দেবেন।

অমিয়া দেবী সেদিন অবাকই হয়েছিলেন। বাচ্চাটির মা যেমন হাঁটছিলেন তেমনি হেঁটে চললেন। ছেলের দিকে একবারও তাকালেন না। অমিয়া দেবীর মনে হয়েছিল সেই বিদেশিনী মহিলা নিশ্চয়ই ছেলেটিকে দেখতে পান নি। তাই তিনি ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে তার মার কাছে নিয়ে এলেন। বিদেশিনী মহিলাটি তার ছেলেটিকে অমিয়া দেবীর কোল থেকে নিয়ে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমাকে ধন্যবাদ। তবে তোমরা ভারতীয় মায়েরা বড্ড নরম। ওকে আমি ইচ্ছে করেই মাটি থেকে তুলি নি। কারণ ওকে বুঝতে হবে জীবনে চলতে গেলে ওকে এমনভাবে অনেকবার পড়তে হবে। আর পড়ে গেলে নিজেকেই উঠতে হবে। কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে না।

তমাল অমিয়া দেবীর আঁচল ধরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ অমিয়া দেবীর মাথায় কী যেন ঘটে গেল। এক ঝটকায় আঁচলটা টেনে নিয়েছিলেন। আচমকা টানে তমাল নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে ছিটকে পড়ে গেল। অমিয়া দেবী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সেই বিদেশিনী এগিয়ে এসে তমালকে হাত ধরে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করালেন। অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, তুমি হয়ত আমাকে ভুল বুঝেছ। তাই রাগ করেছ। আমি বলতে চেয়েছিলাম, কেউ নিজেই পা ফসকে পড়ে গেলে তাকে নিজেই উঠতে শেখাতে হয়। তাই বলে কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলার কথা হয় নি।

অনেকবার ভেবেছেন, অমিয়া দেবী তমালকে কি তিনি নিজেই ফেলে দিয়েছিলেন? না ও নিজেই তার পতনকে ডেকে এনে আর উঠতে পারে নি? এই হিসেব আজ পর্যন্ত মিলাতে পারেন নি।

তমালের ভিতরের পরিবর্তনটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় গেলে তার ভিতর আগের সেই উচ্ছ্বাস খুঁজে পেতেন না। হোস্টেলের ভিজিটিং রুমে বসে খবর পাঠাতেন, তমালের কাছে। মনে হতো তমাল বুঝি সেই আগের মতো ছুটে আসবে। তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ ঘষতে থাকবে। কেন আসতে দেরি হল এই অনুযোগে তাকে ব্যস্ত করে তুলবে। কিন্তু তমাল আসত ধীর পদে। যেন কোনো সাক্ষাৎ প্রার্থীর সাথে দেখা করতে আসছে।

স্যরি মা, একটু দেরি হয়ে গেল।

কেমন আছিস?

ভালো।

চিঠিপত্র লিখিস না কেন?

বারে, ক'দিন আগেই তো দিয়েছি।

সে তো প্রায় মাস খানেক হতে চলল।

তোমাকে প্রতিদিন চিঠি লিখতে হবে নাকি?

প্রসঙ্গ ঘোরাতেন অমিয়া দেবী। এতক্ষণ কী করছিলি?

বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলাম।

তোর বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলি না কেন?

তুমি আবার আমার বন্ধুদের সাথে কী করবে?

আমিও গল্প করতাম।

তুমি আবার কী গল্প করবে?

ও, আমি বুঝি তোর বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারি না।

ডোন্ট বি সিলি মাদার, তোমার সাথে আমাদের গল্প জমবে কেন? তুমি কি চে গুয়েভারের কথা বলবে? বলতে পারবে নার্গিসের সাথে রাজকাপুরের প্রেমের দিনগুলি? বিশ্বসুন্দরীদের শরীরের মাপ?

থাক বাবা, তোদের বন্ধুদের সাথে গল্প। তৈরি হয়ে নে। সুপারের কাছ থেকে তোকে নিয়ে যাবার অনুমতি নিয়ে এসেছি।

আমি আবার কোথায় যাব?

বারে, আমি এতদিন বাদে কলকাতায় এলাম তুই আমার কাছে কদিন থাকবি না?

তোমার মাথা খারাপ নাকি? আজ আমাদের হোস্টেলের ফিস্ট।

ও, থমকে গিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে গিয়েও গলার কাছে আটকে গিয়েছিল। বলেছিলেন, বেশ তবে কালকে আয়। আমি সুপারকে তাই বলে যাচ্ছি।

তারই রক্ত দিয়ে তিল তিল করে গড়া সন্তান। দশ মাস দশ দিন, প্রতিটি মুহূর্ত এই সন্তানের জন্য তার শরীরের প্রতিটি কোষ নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে গেছে। শরীর বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে সেই বিদ্রোহকে দমন করতে হয়েছে। শরীর বৃত্তের সেই ঋতুচক্রের বন্ধ হওয়ার সূচনাতে যে দিন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার গর্ভে সৃষ্টির স্পন্দন আত্মপ্রকাশ করেছে সেদিনের সেই অনুভূতি আজ-ও যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারেন। তিনি মা হতে চলেছেন। তার গর্ভে অমৃতের ফসল। তিনি সেই উর্বরা মেদিনী। তিনিই অমৃত ফসলের জন্মদাত্রী ও ধাত্রী।

প্রতুলবাবু বলেছিলেন এ সময়টা বাবার বাড়িতে থাকা উচিত। রাজি হন নি অমিয়া দেবী। মা নেই, বৌদির উপর নিজের বোঝা চাপাতে চান নি।

তখন তিন মাস। সকালে তলপেটে একটা চিনচিনে ব্যথা। বাথরুমে যেতেই শুরু হয়েছিল রক্তস্রাব। প্রতুলবাবু ট্যুরে, বাড়িতে একা। কোনোমতে শোবার ঘরে এসে ফোন করেছিলেন ডাঃ মিত্রকে। কোন এক পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল ডাঃ মিত্রের সাথে। প্রতুলবাবুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সৌম্য দর্শন ডাঃ মিত্রকে দেখে প্রথমেই তার বাবার কথা মনে পড়েছিল। সাধারণত যা করেন না, সেদিন তাই করেছিলেন। হাত জোড় করে প্রণাম না করে সবার সামনেই তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিলেন, আপনাকে দেখে আমার বাবার কথা মনে পড়ছে।

ডাঃ মিত্রের খ্যাতি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে আছে। তিনি অমিয়া দেবীর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, খুব ভালো লাগল মা তোমাকে। আমার মেয়ের কথাও তোমাকে দেখে মনে পড়ছে। ও এখন লন্ডনে আছে। এলে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।

এক দিনের মধ্যেই একটা আত্মীয়তার সুর খুঁজে পেয়েছিলেন অমিয়া দেবী ডাঃ মিত্রের মধ্যে। এ নিয়ে পরে অবশ্য কোনো কোনো মহল কটাক্ষও করেছে। দুঃখ পেয়েছেন। দেখেছেন, মানুষের সুন্দর ভদ্রপোষাকের নীচে নোংরামির বীজ কেমন জীবন্ত থাকে। আরো অবাক হয়েছেন চিকিৎসাশাস্ত্র মহান বৃত্তি হলেও এখানে ঈর্ষাওঅনৈতিক প্রতিযোগিতা কি ভাবে এই মহান বৃত্তিকে বাজারি প্রতিযোগিতায় টেনে আনে, বুঝেছেন ডাঃ মিত্রের বিরুদ্ধে এই কটাক্ষ তার খ্যাতির প্রতি বৃত্তিগত ঈর্ষারই প্রতিফলন।

ডাঃ মিত্র ফোন পাওয়ার সাথে সাথেই চলে এসেছিলেন। বলেছিলেন বিছানা থেকে একদম

নামা চলবে না। এমন কী বাথরুম পর্যন্ত যাওয়া বারণ। বেডপ্যান ব্যবহার করতে হবে। প্রতুলবাবুর কোম্পানীর ডিরেক্টর ডাঃ মিত্রের ঘনিষ্ট বন্ধু। তাকে ফোন করে অনুরোধ করেছিলেন তারা যেন প্রতুলবাবুকে ট্যুর প্রোগ্রাম না দেন। অমিয়া দেবীকে তারা নার্সিং হোমে নিযে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অমিয়া দেবী কিছুতেই রাজি হন নি। বলেছিলেন, কাকাবাবু আপনি যেভাবে চলতে বলবেন, সে ভাবেই চলব। শুধু বাড়িতে থাকতে দিন।

ডাঃ মিত্র বলেছিলেন, কিন্তু মা, তোমার কাছে তো সবসময়েব জন্য কাউকে না কাউকে থাকতে হবে। বেডপ্যান পরিষ্কার করতে হবে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি নীভাদিকে এখানে নিয়ে আসব কাকাবাবু। সেই আমার সব কিছু দেখাশোনা করতে পারবে।

ডাঃ মিত্র জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, নীভাদি কে?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, নীভাদি আমাদের বাড়িতে কাজ করে। কিন্তু আমার মায়ের মতন। আমার ছোটো বেলাতেই মা মাবা যান। তখন নীভাদি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। ওই তো আমাকে দেখাশোনা করত।

ডাঃ মিত্র বলেছিলেন, বেশ, আমি নার্সিং হোম থেকে একজন আয়াকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে দরকার হলে নার্সিং হোমে নিয়ে যাব। মনে রেখ চলাফেরা করলে বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যাবে।

কলকাতায ফোন করতেই বাবা নিভাদিকে পরের দিনই নিয়ে চলে এসেছিলেন। দীর্ঘ সাত মাস এক নাগাড়ে বিছানায শুয়ে ছিলেন অমিযা দেবী। পৃথিবী বলতে মাথার বাঁ দিকে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে খোলা আকাশ। শুয়ে থাকাব ক্লান্তি আর কামড়ের ব্যথা সারা চোখে-মুখে ফুটে উঠত। প্রতুলবাবু মাঝে মাঝে বলতেন, এত কষ্ট কেন তুমি সইছ অমিয়া? থাক না এবারের মতন। আমি ডাঃ মিত্রকে বরং বলি।—

ও কথা বোলো না গো, প্রতুলবাবুর মুখে হাত চাপা দিতেন অমিয়া দেবী। আমাদের সন্তান আসছে। আমি মা হতে চলেছি, তার জন্য কোনো কষ্টই আমার কাছে কষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। জান না? অভিমন্যু মায়ের গর্ভে থেকেও বাবা-মার কথা শুনতে পেয়েছিল।

অমিয়া দেবীর সাথে সাথে নিভাদি এই দীর্ঘ সাতমাস তার সাথে ছায়ার মতো সঙ্গী ছিল। আয়া থাকলেও নিজের হাতে সব কিছু না করলে তার শান্তি হতো না। কিছু বলেই বলত, চুপ কর তুই। মনে রাখিস তোকে পেটে না ধরলেও তোকেই আমি কোলে করে মানুষ করেছি। ছোটবেলায় আমার কোলে কতবার পেচ্ছাব-পায়খানা করেছিস তার কোনো হিসেব আছে? এখন আমার নাতি আসবে, আর উনি বেডপ্যানে হাত দিলেই রে রে করে তেড়ে আসছেন।

এই নিভাদির কত বয়স, তার আসল বাড়ি কোথায় ছিল সে ঠিকানা নিভাদিও এখন বলতে পারে না। নিভাদি যখন এ বাড়িতে এসেছিল তখন তার বয়স ছিল পনেরো বা ষোলো। একটা চোখ গুটি বসন্তে খুব ছোটো বেলাতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে মরে যাবে ভেবে তাকে তুলসি তলায় কলাপাতার উপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল। সেবার সারা গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছিল গুটি বসন্তের মড়ক। মানুষেরর জীবন খেতে খেতে যমেরও বোধ হয় মুখে অরুচির জ্বালা ধরেছিল। তাই কলাপাতায় শোওয়া শিশু নিভাদিকে এত হাতের কাছে পেয়েও যম মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। তবে সারা মুখে বসন্তের দাগের যে ছবি রেখে গিয়েছিল তার চিহ্ন আজ-ও অম্লান।

পনেরো বছর বয়সেই বিয়ে হয়েছিল নিভাদিব। তবে স্বামীব কথা তাব মনে নেই। শ্বশুব বাড়িতেও গিয়েছিল নিভাদি। বিয়ের প্রথম বাতেই বুঝেছিল যে লোকটা তাব স্বামী সে একটা নেশাখোব মূর্তিমান শযতান। পনেবো বছবেব কিশোবী হলেও দাবিদ্র তাদেব অনেক তাড়াতাড়ি অনেক বিষয়েই অভিজ্ঞ কবে তোলে। সেই লোকটা প্রথম বাতে তাব উপব ঝাঁপিযে পড়ে তার কিশোবী যৌনাঙ্গকে যে ভাবে বক্তাক্ত কবেছিল সেকথা ভাবলে নিভাদি আজ-ও আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলে। সেদিন সে যন্ত্রণায চিৎকাব কবে উঠেছিল। তাব সেই স্বামী নামক পশুটা তাব গালে প্রচণ্ড থাপ্পড কষে ঘাড়েব কাছটা কামড়ে ধবেছিল। নিভাদিব মনে হয়েছিল একটা ভযঙ্কব বাঘ তাব সমস্ত শবীবটা যেন তাব ধাবালো দাঁত ও নখ দিযে খুবলে খুবলে খাচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণায সে সেদিন জ্ঞান হাবিযে যেয়েছিল। পবপব সাত দিন সেই পশুটা তাকে এভাবে খুবলে খেযেছিল, তাবপব অষ্টমঙ্গলেব নামে তাব ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে বাপেব বাড়িতে এনে বেখে দিযে সে যে সেই হাওযা হযেছিল তাবপব আব এ বাড়িমুখো হযনি। মা ওটি বসন্তে আগেই মাবা গিযেছিল। একটা ভাই ছিল সেও ওযাগন ভাঙ্গতে গিযে বেলপুলিশেব গুলিতে মাবা পড়েছিল। তাবপব একদিন বাবাব হাত ধবে ভিক্ষে কবতে কবতে এসেছিল অমিযা দেবীব বাড়িতে। অমিযা দেবীব মা তখনো বেঁচে। বলেছিলেন, এতবড়ো মেযেকে নিযে ভিক্ষে কবছ কেন? ওকে কোথায কাজে দিতে পাব না?

নিভাব বাবা বলেছিল, কে ওকে কাজ দেবে মা?

তুমি যদি বাজি থাক তবে ওকে আমাব বাড়িতেই কাজ দিতে পাবি। ওব সব কিছু খাওযা -পবা, অসুখ হলে চিকিৎসা, সব আমিই দেখব, আব মাঝে মাঝে পঞ্চাশ টাকা কবে তুমি ওব মাযনা নিযে যেও।

নিভা এ বাড়িব কাজেব মেযে এ কথা কেউ আব মনে বাখে নি। আব ওব বাবা সেই যে ওকে বেখে গিযেছিল আব কোনো দিন আসেনি। নিজেব গ্রামেই ফিবে গিযেছিল। নিভা শুনেছিল তাব বাবা নাকি একটা বিযেও কবেছিল। আব কী একটা কাজও জুটিযে নিযেছিল। অমিযা দেবীব মা-ই নিভাব নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিযে ওব নামে মাসে মাসে টাকাটা জমা কবাব ব্যবস্থা কবেছিলেন।

নিভা বলেছিল, আমাব টাকা দিযে কী হবে? তোমবাই তো আছ।

অমিযা দেবীব মা বলেছিলেন, না নিভা, টাকাব দবকাব সবাবই আছে। তোব টাকা তোব কাছেই থাকুক।

নিভা যে কখন সবাব নিভাদি হযেছিল সে কথা কাবো মনে নেই। মা মবা মেযে অমিযা দেবী বাবাব প্রশ্রযে বেশ মেজাজিই হযে উঠেছিলেন। বাড়িব কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস কবতেন না। নিভাই ব্যতিক্রম। তাব মুখেব উপব বলত, মেযে মানুষেব এত তেজ ভাল নয়। এবাব খেযে দেযে আমাকে উদ্ধার কব।

প্রিয়তোষ বাবুকে নিভা বলত, তোমাব আস্কাবায মেযেব এত তেজ। আব একে এ বাড়িতে বেখো না দাদাবাবু। শাশুড়ির বাড়ি গেলে দেখবে মেযেব এই মেজাজ কোথায চলে গেছে।

অমিয়া দেবী যখন শিলিগুড়িতে প্রতুলবাবুব সঙ্গে চলে এসেছিলেন তখন নিভা বলেছিল, খুব দেমাক দেখিযে যে চলে যাচ্ছ। বলি, সোযামী তো খালি বাইবে বাইবে থাকে শুনি। তোকে দেখবে কে? আমাব জন্যেও একটা টিকিট কাট। জীবনে তো একটা ভাত টিপেও দেখিস নি। জামাইকে না খাইয়ে বাখবি। আবাব বান্না কবতে গেলে পুড়ে মববি। তোব সংসারটা সাজিযে দিযে আসি।

মনে মনে সত্যি ভয় পেয়েছিলেন অমিয়া দেবী। আজ পর্যন্ত কোনোদিন রান্না ঘরে ঢোকেন নি। রান্নার লোক আছে, কিন্তু স্বামীর পাতে নিজে রেঁধে কিছু দেবেন না সেটা ভাবতেই কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। তাই নিভার কথায় খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, তুই সত্যি যাবি নিভাদি?

তবে কি তোর সাথে মশকরা করছি।

বাবাকে বলেছিস?

তাকে বলে কি হবে? তিনি তো মহাদেব। কোথায় কী দরকার তার কোনো খোঁজ রাখেন?

বৌদি?

তাকে বলে দেব।

সত্যি, আমার যে কি ভাল লাগছে। খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠেছিলেন অমিয়া দেবী।

তোমার কি ভাল লাগছে তা ভাবতে আমার বয়ে গেছে। আমি ভাবছি সেই মানুষটার কথা। সেই তো আমার শত্রু।

শত্রু?

তবে আর কী? নিভা আঁচলের কোণা দিয়ে নিজের চোখ দুটিকে মুছে বলেছিল, তিনি তো সতি-সাধ্বী। শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে চলে গেলেন। আর আমাকে যম দেখেও দেখল না।

নিভা ওদের সাথে এসেছিল। দুজনের মাঝে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি নিয়ে প্রতুলবাবু একটু ক্ষুণ্ণ যে হন নি তা নয় তবে তা প্রকাশ করেন নি। শুধু বলেছিলেন, নিভাদি চলে গেলে বাবার কষ্ট হবে না?

প্রিয়তোষ বাবু সাথে সাথে বলে উঠেছিলেন না, না, বৌমা আছে। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। নিভাকে তোমরা যত দিন খুশি রেখে দিও।

নিভা বাড়িতে পা রেখেই নেমে পড়েছিল কাজে। আসার আগেই অমিয়া দেবীকে দিয়ে গৃহস্থালীর ফর্দ বানিয়ে এনেছিল। নেমেই বলেছিল, নতুন বৌ পেলেই তো আর পেট ভরবে না। যাও একছুটে এগুলি নিয়ে এস।

সেবার নিভা পনেরো দিনের বেশি থাকে নি। এই কদিনেই হাতে ধরে ধরে অমিয়া দেবীকে রান্না শিখিয়েছে। ঘর, বারান্দা আয়নার মতন চকচকে করিয়েছে। যেতে চাইলে প্রতুলবাবুই আপত্তি করে বলেছিলেন, তুমি থেকে যাও নিভাদি। তুমি গেলে তোমার মেয়ের খুব অসুবিধা হবে। আমারও খারাপ লাগবে।

নিভা বলেছিল, না জামাই, তোমাদের নতুন সংসার, তোমরা দুজনে থাকলেই তোমাদের ভালো লাগবে। তা ছাড়া দাদাবাবুর বয়স হয়েছে। তার ওখানে থাকা দরকার।

সেদিনটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারবে না অমিয়া দেবী। কোনো মেয়েই ভুলতে চায় না মাতৃত্বের গর্ভযন্ত্রণার সেই অনুভূতি। এ যন্ত্রণা যে সৃষ্টির সাফল্যের বিজয়কেতনের সুখানুভূতি। তাই প্রসব যন্ত্রণার দিনগুলির রোমন্থন যেন সব মায়েদেরই নিজস্ব সম্পত্তি।

সেদিন প্রতুলবাবু শিলিগুড়িতে ছিলেন না। কোম্পানীর জরুরী মিটিং-এ সকালের ফ্লাইটে একদিনের জন্য দিল্লিতে গিয়েছিলেন। অমিয়া দেবীকে নিয়ে খুব একটা ভাবনার কারণও ছিল না। দুদিন আগেই ডাক্তার মিত্র তাকে চেক্ আপ করে গেছেন। হিসেব অনুসারে তমালের এই মুক্ত পৃথিবীর নিশ্বাস নিতে আরো কুড়ি দিন বাকি।

দুপুরবেলা থেকেই সারা শরীর জুড়ে একটা অস্বস্তি জানান দিতে শুরু করেছিল। প্রথম দিকে খুব একটা আমল দিতে চান নি। তলপেটে এরকম চিনচিনে ব্যথা এর আগেও হয়েছে। ডাক্তার মিত্র ওষুধ দিয়েছেন। বলেছিলেন, প্রথম ইস্যুতে এরকম মাঝে মাঝে হতে পারে।

কিন্তু বিকেল হতেই বুঝতে পাবলেন, ব্যাপাবটা যেন অন্যবকম। টেলিফোনটা মাথাব কাছে থাকে। ডাক্তার মিত্র এসময় চেম্বাবে থাকেন। তাকে ফোন কবতেই তিনি দু-চাবটা প্রশ্ন কবেই ফোন রেখে দিয়ে বলেছিলেন, আমি এক্ষুনি আসছি।

মিনিট পনেবোব মধ্যেই একেবাবে প্রস্তুত হযে এসেছিলেন ডাঃ মিত্র। নিজেব গাড়িব পবিবর্তে অ্যাম্বুলেন্স নিযে এসেছিলেন। বলেছিলেন, প্রতুল কোথায়?

আজকেই দিল্লিতে গেছে। কাল বিকেলে ফিববে।

ডাঃ মিত্র অমিযা দেবীকে আবেকবাব ভালো কবে দেখলেন। কপালেব কুঞ্চন বেখাব মধ্যে চিন্তাব ছাপ স্পষ্ট, মাথা নেড়েছিলেন, বলেছিলেন, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কবা যাবে না। বেবীকে বাঁচাতে এক্ষুনি কিছু কবতে হবে।

কাকাবাবু আমাব জীবনেব বিনিমযেও যদি আমাব সন্তানকে বাঁচানো যায তবে আপনি তাই করুন। সেদিন তাব মিনতিব সুবে কী ছিল অমিযা দেবী জানেন না। তবে দেখেছিলেন ডাঃ মিত্রেব চোখেব কোণেও রূপালি বেখা।

ডাঃ মিত্র এখান থেকেই নার্সি[illegible]মে ফোন কবে ও টি ঠিক কবাব নির্দেশ দিযেছিলেন।

সেই নীলাভ বাতি। সূচ ফোটানোব যন্ত্রণা, এক থেকে দশ গোনা, আব কিচ্ছু মনে নেই। যখন চোখ খুলেছিলেন তখন আবছা ছাযাব মতন অনেককেই দেখতে পেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে বাবা ও দাদা কবে এল? পাশে প্রতুলবাবু, ডাক্তাব মিত্র। পাযেব কাছে নিভাদি।

এই প্রথম জানতে পাবলেন, হাসপাতালে আসাব পব দশদিন কেটে গেছে। তাকে চোখ খুলতে দেখে নিভাই প্রথম আনন্দে হাউ হাউ কবে কেঁদে বলেছিল, যম আমাদেব মণিকে ফিবিযে দিযে গেল।

কী হযেছে আমাব? অমিযা দেবীব ক্লান্ত গলাব স্বব সবাব কাছে যেন স্বস্তিব হাওযা এনে দেয।

তোমাব কিছু হয নি—বাবা ও প্রতুলবাবু একসঙ্গে বলে উঠেছিলেন।

তবে? আমাব সন্তান?

এই যে আমাব হাতে মা, ডাঃ মিত্র নার্সেব হাত থেকে ধপধপে সাদা তোযালেতে শোযানো তমালকে এনে অমিযা দেবীব পাশে শুইযে দিযেছিলেন। নিজেব সৃষ্টিব প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিযে ছিলেন অমিযা দেবী।

কালো কুচকুচে মাথা। আবীব বাঙা দুটি ঠোঁট। চোখ দুটি বোজা, গোলাপি হাতেব মুঠি। সেদিন মনে হয়েছিল সূর্যেব এক টুকবো কণা তিনি ছিনিযে এনেছেন। হাতে স্যালাইনেব কামড়, পেট জুড়ে সেলাইযেব যন্ত্রণা। দশ দিনেব জীবন মৃত্যুব দোলা সব সেদিন বিস্মৃতিব অতলে তলিযে গিযেছিল। হাত বাড়িযেছিলেন নাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মজেব সুখ স্পর্শকে বোমে রোমে ছড়িয়ে দিতে।

সেই তমালকে কি তিনি নিজেই সবিযে দিযেছিলেন? মাঝে মাঝে সেই হিসেবেব সমীকবণ তাকে উদাস কবে তোলে।

শিশু তমাল তাব একটা হাত জড়িযে না শুতে পাবলে ঘুমোত না। ঘুমেব মধ্যেও হাতটা সবিযে নিলে মাঝে মধ্যেই উঠে কাঁদতে শুরু কবত। এই নিযে স্বামীব অনুযোগে তাব প্রতি একটা সহানুভূতির ঢেউ অনুভব কবতেন। টেব পেতেন পাশে সে জেগে আছে তৃষিত চাতক পাখির প্রত্যাশা নিযে। কিন্তু পাশ ফেবাব উপায নেই। তমালেব হাতেব বন্ধনী থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেই ও জেগে উঠবে। একটা হাত দিযে স্বামীব মাথাব ঘন চুলে আঙুল বোলানো ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকত না।

তমালের এই অভ্যাস ছাড়াতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। সুন্দর করে আলাদা ছোট খাটো নানা খেলনায সাজিয়ে তৈরি করে এনেছিলেন প্রতুলবাবু। সহজে ভোলানো যায় নি তমালকে। সারাদিন সেখানে ঘুমোলেও রাত্রিতে সেখানে ঘুমোতে চাইত না। পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে অতি সাবধানে সেই খাটে শোয়াতে হোত। প্রথম প্রথম জেগে উঠলেই চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করত। তারপব হঠাৎই কান্নাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিছুদিন পর ঐ খাটটা ছাড়া শুতে চাইত না।

সেদিন একে নিজের সাফল্য বলে মনে হয়েছিল। ভেবেছিলেন শিশুদের এই ভাবেই শিক্ষা দিতে হয়। আজ কিন্তু মাঝে মধ্যেই ভাবতে বসেন সেই শিক্ষা দিতে গিয়ে তমালের অভিমানের ঠিকানাটি কি খুঁজতে ভুলে গিয়েছিলেন?

ঘুম থেকে উঠেই মাকে দেখতে না পারলে তমালের কান্না সামলানোর ক্ষমতা বাড়ির কারো ছিল না। ঘুমন্ত তমালকে নিভাদির হেফাজতে রেখে দুই-একবার প্রতুলবাবুর অনুরোধে সিনেমায় গেছেন। কিন্তু ফিরে এসে তমালের চেহারা ও নিভাদির কাছে যে বর্ণনা পেতেন তারপর তমালকে বাড়িতে রেখে কোথাও যাবার কথা উঠলেই আপত্তি করতেন। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই যে হতো না, তা নয়। স্বামীর অবুঝ মনকে প্রলেপ দিতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হতো।

ছোটোবেলায় বড্ড ভুতের ভয় ছিল তমালের, অন্ধকাব হলেই মায়ের আঁচলের কোণ ছিল তার স্থায়ী আশ্রয়। এর জন্য নিভাদিকে বকতেন অমিয়া দেবী, তোমার জন্যই ছেলেটা এত ভিতু হয়েছে।

আমি কী করলাম? নিভাদি অবাক।

সাবা দিন ওকে ঐ সব ভুত-প্রেতের গল্প না বললেই পার।

নিভাদি রেগে যেত বলত, রাখ তোমার বড়ো বড়ো কথা। কোন ছেলে রাক্ষস-প্রেতের গল্প শোনে না বল?

না নিভাদি, অমিয়া দেবী নিভাদিকে বোঝাতে চাইতেন, ভুত-প্রেত বলতে তো কিছু নেই। ওসব গল্প শিশুদের বললে ওরা ভাবে ওরা বুঝি সত্যিই আছে। তাতে ওদের মন দুর্বল হয়ে পড়ে। ভিতু হয়।

নিভাদি আরো রেগে যেত। তিনবার রাম নাম জপ করে বলত, তোমরা বাবু স্কুল কলেজে পড়াশোনা করা মেয়ে। আমার মতন মূর্খ মেয়ে-ছলে নও। তবে তুমি কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যের গল্প ছাড়া ঘুমোতে না।

না, নিভাদি তুমি আর ঐ সব ছাই-ভস্ম গল্প বোল না।

রাগে গজ গজ করত নিভাদি। বলত, আসলে কি জানো, তোমরা তো আজকালকার মা, তোমরা চাও তোমাদের বাচ্চারা তোমাদের কাছে আসবে না। তোমরা হেসে খেলে ঘুরে বেড়াবে। যখন ইচ্ছে হবে ছেলের গাল টিপে একটু আদর করবে। তারপর বলবে, যাও সোনামণি এবার যাও। কী দরকার বাপু তোমাদের মা হবার?

আর কথা বাড়াতেন না অমিয়া দেবী। নিভাদির কথায় দাঁড়ি কমার কোনো স্থান নেই। অফুরন্ত বাক্যধারা কোন জায়গায় শেষ হবে তা সে নিজেও জানে না। বেশি কিছু বললেও ধুপধাপ করে নিজের ঘরে চলে যাবে। সম্পত্তি বলতে বহুদিনের পুরানো একটা টিনের বাক্স। তার মাথার উপর বিশাল পদ্মফুলের বিবর্ণ ছবি। শিলিগুড়িতে আসার সময় একটা ভি. আই. পি. স্যুটকেস দিয়ে বলেছিলেন, তোমার এই টিনের বাক্সটা নিতে হবে না নিভাদি। এটা তোমার জন্য এনেছি। তোমার যা কিছু এতে ভরে নিও।

তোমাদের এই বড়লোক আমায় দেখিও না বাপু—নিভাদি জবাব দিয়েছিল।

এতে আবার বড়লোকি কি দেখলি নিভাদি? তুমি থেকে তুই—এটা নিভাদির প্রতি যখন নরম ভাব দেখাতে চান তখন ব্যবহার করেন, অমিয়া দেবী।

কেন? আমার এই ট্রাঙ্কটা কি দোষ করল?

তুই কেন বুঝতে পারছিস না নিভাদি, এই পুরানো টিনের বাক্সটা এত দূরে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

আমিও তো বুড়ি হয়ে গেছি। আমাকেও ফেলে দিবি তাহলে? নিভাদি গজগজ করত।

তুই বড্ড অবুঝ, নিভাদি।

চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল নিভাদির। বলেছিল তোদের বাড়িতে আসার দিন তোর মা আমাকে এটা তার নিজের হাতে দিয়েছিল। এটাকে তুই ফেলে দিতে বলিস না।

সেই নিভাদির রাগ হলেই ট্রাঙ্ক গোছাতে বসত। বাক্যস্রোত তখন কোনো বাধা মানত না। জামাইকে দিয়ে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিস—ট্রাঙ্কটা বারান্দার এক কোণে এনে রেখে বলত।

—না খেয়েই যাবি নিভাদি?

—এ বাড়ির ভাত যখন আমার কপালে নেই তখন আর অন্ন ধ্বংস করি কেন?

—তুই তাহলে সত্যি যাবি নিভাদি?

—এক্ষুনি যাব।

—যা তাহলে।

—দাদা বাবুকে একটা তার করে দিও।

—দেব। তবে মাকেও একটা খবর দেব।

—তাকে তুই পাবি কোথায়?

—কাল রাতে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল।

—সত্যি?

—তুই তো চলেই যাচ্ছিস। তোর সাথে ঠাট্টা করতে যাব কেন?

—সে কী বলল? মেঝেতে বসে পড়েছিল নিভাদি।

হাসিটাকে অতি কষ্টে চেপে অমিয়া দেবী বলেছিলেন। মা বলল, নিভা তোর কাছে থাকবে। তোর কোনো চিন্তা নেই।

বৌদিমণি বলল—সে কথা?

আমি কি তোকে বানিয়ে বলছি? তবে এবার মা এলে অন্য কথা বলব।

কেন?

গলার সুরে একটা কাঁদো কাঁদো ভাব এনে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, যার উপর ভার দিয়ে মা এত নিশ্চিন্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল সে যখন এই অবস্থায় আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারল তখন মাকে আর কি বলব?

ওরে আর বলিস না। নিভাদি ছুটে এসে অমিয়া দেবীকে জড়িয়ে ধরত। তার চোখের জলে অমিয়া দেবীর কপাল ভিজে যেত। বলত, ওরে ঐ জন্যই তো মরার ইচ্ছে থাকলেও মরতে পারি না।

সেই পদ্মফুল আঁকা টিনের বাক্সটা যথাস্থানে ঢুকে যেত।

নিরক্ষর নিভাদির কথাই আবার মনে পড়ে অমিয়া দেবীর। তবে কি নিভাদির কথাই সত্যি। তিনিই কি তমালকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন?

পড়তে বসলে তমাল আবদার করত, মাকে তার কাছে বসে থাকতে হবে। মা কাছে না থাকলে নাকি ওর পড়ায় মন বসে না। পড়ার মধ্যেই অজস্র জিজ্ঞাসা। বিরক্ত হোতেন অমিয়া দেবী। বলতেন, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিস না কেন? পরক্ষণেই বুঝতেন কথাটা কত ভুল বলেছেন। কারণ, প্রতুলবাবুর ট্যুর প্রোগ্রাম আগেব থেকেও বেড়ে গেছে। মাসে সাত দিনও বাড়িতে থাকতে পারেন না।

বাড়িতে অতিথি এলে তমালকে নিভাদির হেফাজতে বন্দি করে রাখতেন। প্রতুলবাবুর ট্যুর, মাঝে মধ্যেই এই চার দেয়ালের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠতেন। তাই নিজেও যেমন আশেপাশের বাড়িতে সময় কাটাতে যেতেন তেমনি তার বাড়িতেও তাদের আসা শুরু হয়েছিল। একটা মহিলা সমিতিও গড়ে উঠেছিল। নিয়ম হয়েছিল একেক দিন একেক বাড়িতে এই সমিতির সভা হবে। সেই বাড়ির কর্ত্রী সেদিন তাদেব আপ্যায়ন করবে। বাড়ির পুরুষদের সেই সভায় প্রবেশের অনুমতি থাকবে না।

তমাল থাকতে চাইত না নিভাদির কাছে। নিভাদিও ব্যস্ত থাকত রান্না-ঘরে। ছুটে আসত মার কাছে। কোলের কাছে বসে পড়ত। বলত ঘুমোব।

অমিয়া দেবী বিরক্ত হতেন। বলতেন, তোমার কি হোম টাস্ক হয়েছে?

তামল ঘাড় নাড়ত। বলত, নিয়ে আসব মা?

অমিয়া দেবী বলতেন, ঠিক আছে। পিসিমণির কাছে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

তমাল আবদার তুলত, তোমার কোলে মাথা বেখে ঘুমোব, মা।

অমিয়া দেবী অতিথিদের সামনে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসতে অস্বস্তি বোধ করতেন। তমালকে ধমক দিতেন। বলতেন, বড়দের কথা ছোটদের শুনতে নেই।

আমি তোমাদের কথা শুনব না মা। তোমাব কাছে শুধু বসে থাকব।

না, তুমি পিসিমণির কাছে যাও। অমিয়া দেবীর গম্ভীর স্বরে কেঁদে ফেলত শিশু তমাল। চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত।

সেদিন অতিথিদের কথায় পুলকিত হতেন অমিয়া দেবী।

—ওঃ, কি সুন্দর, ছেলেকে বাধ্য করেছেন।

—বাচ্চাদের মায়ের আঁচল থেকে বের করে এনে প্রথম থেকেই স্বাবলম্বী করা উচিত। অমিয়া দেবীর গলার স্বরে একটা গর্বের ছোঁয়া থাকত।

তমালকে তো তিনিই তার আঁচলের তলা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নিভাদি সে দিন ঘুমন্ত তমালকে কোলে করে তার ঘরে নিয়ে আসতে গজগজ করত। অনেক মেমসাহেব হয়েছ বাপু, আর বড় মেমসাহেব হওয়ার দরকার নেই। কচি বাচ্চাটা যে মা মা করে কেঁদে অনাথের মতন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে দিকে তো একবারের জন্যও নজর দাও না।

নিভাদির কথায় বিরক্ত হতেন অমিয়া দেবী। বলতেন, এত মা-মা করে কাঁদলে ছেলে কোনোদিন মানুষ হয় না।

নিভাদির রাগ আরো বৃদ্ধি পেত। বলত, তা তো বলবেই, তোমরা আজকালকার মা। অনেক লেখাপড়া জানো। বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে ভুলেই গেছ। বোতলে দুধ খাওয়াও। বাচ্চার উপর মায়া হবে কোনখান থেকে?

আজ ভাবেন নিভাদির কথাগুলি। তমাল তো তাকে আঁকড়ে রাখতেই চেয়েছিল। তিনি বরং বার-বার ওকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তিনি তমালকে হোস্টেলে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখনও নিভাদি তীব্র আপত্তি তুলে বলেছিল, বাপ মরা ছেলেটাকে এভাবে নির্বাসনে পাঠাস না।

অমিয়া দেবী বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, তুই সব ব্যাপারে নাক গলাস কেন বলত? তুই এসবের কি বুঝিস? আমার ছেলেকে আমি মানুষের মতন করতে চাই।

তবু নিভাদি আপত্তি তুলে বলেছিল, কেন মার কাছে থাকলে বুঝি ছেলে মানুষ হয না? মায়ের থেকে সন্তানের মনের খবর আর কে ভালো রাখে?

অমিয়া দেবীও গলা চড়াতেন। তুই কিছু বুঝবি না নিভাদি। তমালকে বড় হতে গেলে ওকে ভালো স্কুলে আর ভালো হোস্টেলে দিতে হবে।

কি জানি বাপু, নিভাদিও গলা চড়াত। তোমার বাবা তো শুনি খুব বিদ্বান। সবাই তাকে মান্যি করে। কই তোমার ঠাকুরদা তো তাকে কোনো হোস্টেলে রেখে পাস করিয়েছেন বলে শুনিনি। এই যে তুমি, তোমার দাদা—বাড়িতে পড়াশোনা করেছ বলে কী অপদার্থ হয়েছ?

প্রথম দিন যখন তমালকে স্কুলে দিয়ে এসেছিলেন তখন ওর বয়স ছিল তিন বছর। বেড়াতে যাবে ভেবে খুশিতে ডগমগ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু স্কুলের গেটে গিয়ে মায়ের আঁচলের একটা কোনা শক্ত মুঠিতে ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার দাবি মাকেও তার সঙ্গে থাকতে হবে। স্কুলের দিদিমণিরা অনেক চেষ্টা করেও তাকে ক্লাসের মধ্যে নিয়ে যেতে পারেন নি। পরপর দুদিন তাকে তমালকে নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল।

প্রতুলবাবু বলেছিলেন, এত কচি ছেলেটার উপর এরকম জোর না করলেই পার। আরেকটু বড়ো হলে ও নিজেই স্কুলে যাবে।

তার মানে তুমি বলতে চাও ও আমার আঁচল ধরে সারা জীবন কাটাবে?

অমিয়া দেবীর তীব্র প্রশ্নে গুটিয়ে যেতেন প্রতুলবাবু। বলতেন, সারা জীবনের কথা এর মধ্যে আসছে কিভাবে? একটা বয়স পর্যন্ত শিশুরা তো মা-বাবার আশেপাশেই ঘুরতে চায়। এ বয়সটা যে একেবারেই এদের নিজস্ব। এখানে কৃত্রিমতার পোষাক পরানোর কি দরকার? রবীন্দ্রনাথ তো লিখেছিলেন, "কাপড় জুতোকে একটা অন্ধ সংস্কারের মতো জড়াইয়া ধরা আমাদের এই দেশে ছিল না।. . বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর্যন্ত কাপড় জুতো না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে উলঙ্গ জগতের যোগ অসঙ্কোচে অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সঙ্গে রফা করতে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলাকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি সাত বছর। যে পর্যন্ত শিশুর সজ্জার কাজ নাই, লজ্জার কাজ নেই।'

অমিয়া দেবী প্রতুলবাবুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নমস্য। কিন্তু তার স্বপ্নের শান্তিনিকেতনেও আজ তার ভাবনার কোনো প্রতিফলন নেই। যুগের তালে, প্রয়োজনের তাগিদে তাকেও পাশ্চাত্যের অনুগামী হতে হচ্ছে।

প্রতুলবাবু চুপ করে যেতেন। তার স্বভাবই ছিল এরকম। কোনোদিনই তার মতামত স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করে নিজের ভাবনাকে আড়ালে নিয়ে যেতেন।

এখন মাঝে মধ্যেই সেদিনের সেই ঘটনাগুলিকে স্মৃতির পর্দায় নাড়াচাড়া করতে করতে অমিয়া দেবী ভাবতে বসেন, সেদিন তমালের কচি মুষ্ঠিটাকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়াতে না চাইলেই বোধ হয় ভালো করতেন। পা পিছলে পড়ে যাওয়া সেই শিশু সন্তানটিকে বিদেশিনী মা নিজে না তুলে তাকে দাঁড়াতে বলেছিলেন, কিন্তু তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দাঁড়াতে শেখাতে চান নি। সেই শিশু সন্তানের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে হয়তো ভরসা দিয়েছিলেন, তুমি হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেছ। ভয় কী? আমি তো আছি। তাই বোধ হয় তার মা যখন তাকে মাটি

থেকে না তুলে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তার শিশুপুত্রটি অভিমানে তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নি। মায়ের বুকে হাসির মুক্তো ছড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তমালের কাছে কী সেই ভরসা দিতে পেরেছিলেন? এই প্রশ্নের সমীকরণটিই যে সাজাতে পারছেন না।

আজ ভাবতে বসেন বিশাল দেহের অধিকারী, চোখে পুরু লেন্সের চশমায় পাথুরে গাম্ভীর্যে ঢাকা প্রিন্সিপালের বিশাল মুষ্টির মধ্যে যখন তমালের ভীত কম্পিত কচি মুঠিটা জোর করে গুঁজে দিয়েছিলেন তখন শিশুমনের আকুল চাউনীর মধ্যে তমালের মনের সেই গভীরত্বকে মাপার কোকোন প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতে পারেন নি। আজ তাই সেদিনের সেই দৃশ্যটাই তার মনে বার বার উঁকি দেয়।

তমালকে ছুটির পর স্কুল থেকে আনার জন্যে স্কুলের গেটের সামনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। ভেবেছিলেন, গেট খোলার সাথে সাথে তমাল তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তমাল আসছিল ধীর পায়ে। এক পা, দু পা গুণে। মাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

অমিয়াদেবী ডেকেছিলেন, তমাল।

তমাল সেই ডাক শুনে সেখানেই মাটির দিকে মুখটা নীচু করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পেছন থেকে ঝরনার কল কল ধ্বণী তুলে শিশুর দল গেটের দিকে ছুটে আসছে। তমাল তবু দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা ছুটন্ত ছেলের ধাক্কায় তমাল ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। অমিয়া দেবী চেয়েছিলেন তমাল নিজের থেকেই উঠে দাঁড়াক। তমাল তার দিকে তাকিয়ে পড়েই ছিল। স্কুলের এক শিক্ষিকা তমালকে হাত ধরে টেনে তুলে তার জামা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিয়েছিলেন। অমিয়া দেবী ভেবেছিলেন তমাল তার কাছে এসে তার বুকে মুখ গুঁজে দাঁড়াবে। কিন্তু তমাল তার কাছে এসে তার হাতে বন্দী হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অমিয়া দেবী দু-হাতের তালুতে তমালেব ছোট্ট মুখটা অঞ্জলির মতো তুলে ধরে নিজের তৃষিত ঠোঁটের কাছে তুলে এনেছিলেন। দেখেছিলেন তমালের চোখের কোনায় মুক্তার মতন অশ্রুবিন্দু টলটল করছে।

বাড়িতে এসে তমাল তাকে বলেছিল, আমি তোমার কাছে খুব মন দিয়ে পড়ব মা। আমি স্কুলে যাব না।

প্রতুলবাবু বাড়িতেই ছিলেন। ছেলের আধো আধো বুলির আকুতিতে বিচলিত হয়ে বলেছিলেন, এ বছরটা ও বাড়িতেই থাকুক না।

তুমি চুপ কর তো, অমিয়া দেবী প্রায় ধমক দিয়ে উঠেছিলেন। দেখে এসো, ওর মতো কত বাচ্চা ঐ স্কুলে পড়ছে।

সব শিশুর মানসিকতা তো সমান হয় না, প্রতুলবাবু মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন।

তোমাকে যে সেটাই বোঝাতে চাই। মানসিকতাকে তৈরি করতে হয়। আর সবাই যা পারে ওকেও সেইভাবে তৈরি হতে হবে সেটাই ওকে বুঝতে দাও।

বেশ স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন প্রতুলবাবু।

আশ্চর্যের ব্যাপার, তমালও স্কুলে যেতে আর আপত্তি করে নি। স্বামীকে ডেকে বলেছিলেন, দেখলে তো শিশুদের কথায় এত সহজে সায় দিতে নেই।

তমালকে তো আবার ফিরে পেয়েছিলেন তিনি। তার সেই সব হারানোর হাহাকারকে তমালের স্নিগ্ধ বাহুবন্ধনের মধ্যে সান্ত্বনার পোতাশ্রয় খুঁজে পেত।

প্রতুলবাবুর মৃত্যুর খবর তার জীবনে নিয়ে এসেছিল এক গভীর শূন্যতা। ভেবেছিলেন, এ জীবনের আর কোনো অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। দিন ও রাত্রির ব্যবধান ছিল তার কাছে নিছক এক কালের গতি। রূপ-রসহীন এই পৃথিবীর মাটির স্পর্শ তার কাছে অসহ্য হয়ে

উঠেছিল। তমালের মা ডাক তাকে আবার এই পৃথিবীকেই নতুন করে চিনিয়েছিল। এই একটা শব্দের মধ্যে যে এত বড় প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীর শক্তি লুকিয়ে আছে; এ ডাকের উৎস যে ঝরা পাতা, শীর্ণ শুষ্ক মনের চাবাগাছকেও সঞ্জীবনী সুধাব মতন মহীরূহতে পরিণত করতে পারে তা এই প্রথম উপলব্ধি কবেছিলেন।

শিশু তমালের সিক্ত কণ্ঠস্ববের মা ডাক তাকে সেদিন ধূসব পৃথিবীতে সবুজের রেখা দেখিয়েছিল। শোক স্তব্ধ পাথুরে বুকের গোপন ছিদ্র চুইয়ে বিন্দু বিন্দু জলের মতো বাঁচার তাগিদ আবার কোন ফাঁকে জমা হয়েছিল টেব পান নি। বাবা-দাদা-আত্মীয়-বন্ধুদেব সান্ত্বনা যা দিতে পারে নি, তমালের কচি হাতের প্রলেপ যখন তার কপালে, মুখে ঘুরে বেড়াত তখন তার কোষতন্ত্রগুলিতে সেই মৃত সঞ্জীবনী ধারা বইয়ে দিয়েছিল। তমালেব সেই ছোটো মুঠিটাই ছিল তার অবলম্বন।

তমালকে জোব কবেই আলাদা খাটে শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমে তীব্র আপত্তি জানালেও পরে সে তা মেনে নেবার পর আর তাব কাছে শুতে চায়নি। এমনকি প্রতুলবাবু ট্যুরে গেলেও তমালকে তার পাশে শোয়াতে পারেন নি। আজকে মনে হয় সেটা ছিল তমালেব শিশুমনের অভিমানের বহিঃপ্রকাশ। বাবাব মৃত্যুব সংবাদে তাব আঘাতের গভীবতাকে বোঝা যায়নি বা তাকে বুঝতে দেওয়া হযনি। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাশেব বাড়িতে। তবে এর পর থেকে মায়ের পাশে নিজেই শুতে এসেছিল। অমিযা দেবী যখন ছেলেকে জড়িযে ধরে চোখেব জলে নিজের পাষাণ-ভাবী মনকে হালকা করতে সাবারাত জেগে থাকতেন তখন তমালও তাব সাথে জেগে থাকত। মার আঁচল দিযে মার ভেজা চোখ মুছে দিযে তার মুখ গুঁজে শুয়ে থাকত।

তমালের কচি হাতটিকে শক্ত করে ধরেই শিলিগুড়িব পাট চুকিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। বাবার বাড়ি। সেই চেনা ঘর। দাদা-বৌদি নীচেব তলায থাকেন, উপরে বাবা। একই সাথে খাওয়া-দাওয়া। দাদা সরকারী দপ্তরেব সচিব। ছিমছাম সংসার।

অমিযা দেবীকে সবাই সাদবেই টেনে নিযেছিলেন, এখানে তার কোনো অসুবিধা ছিল না। তবে আত্মীয-স্বজনেব সহানুভূতির মাত্রাটা মাঝে মধ্যেই তার কাছে অসহনীয বলে মনে হতে শুরু করেছিল। আব এটাই ছিল তাব আপত্তিব কাবণ। এই বাড়িতে নিভাদিই তাব মুখের উপর কথা বলত। ঝগড়া কবত। সেই নিভাদিও চুপ কবে গেল। তিনি যা বলতেন তাই বিনা বাক্যে মেনে নিতে শুরু করেছিল।

সহানুভূতি শব্দটিব সাথে তাব যে এত বড় অ্যালার্জি ছিল আগে কোনোদিন বোঝেন নি অমিয়া দেবী। প্রতিদিন সকালে-বিকালে দল বেঁধে আত্মীয-স্বজনের ভিড়, সহানুভূতিব বাক্যবিন্যাস আর উপদেশেব অক্লান্ত বর্ষণ তার সেই অ্যালার্জিকে সহ্যসীমাব বাইবে ঠেলে দিয়েছিল। বাবার কাছে কথাটা বলে ফেলেছিলে। বাবা আমি একটা চাকবি করব ভাবছি।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, তোর এই বুড়ো ছেলেটাব উপর বুঝি আর ভরসা রাখতে পারছিস না।

ছিঃ বাবা, তুমি আমাকে এইভাবে ভাবতে পারলে? অমিয়া দেবী কেঁদে ফেলেছিলেন। অপ্রস্তুত প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, না মা, তোকে আমি ঐভাবে কথাটা বলিনি, শুধু বলতে চেয়েছিলাম অর্থের প্রয়োজনে তোর চাকবির দরকার নেই।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, না বাবা টাকার জন্যই চাকরি করতে চাইছি না। তুমি আছ, দাদা আছে, ওর কোম্পানী থেকে ওর পাওনা টাকা যা পেয়েছি তা খুব কম নয়। এছাড়া দুর্ঘটনার টাকা আছে। সব মিলিয়ে আমার তো ভালোভাবেই চলে যাবে। তবে আমি কোনো একটা কাজের মধ্যে সময়টাকে ভুলে থাকতে চাই। এতে কি তুমি রাগ করলে বাবা?

তুই কি তোর বুড়ো বাবাকে এই চিনেছিস? আমি তোর মনের কথা বুঝি। প্রতুলের কোম্পানী তো তোকে তাদের কলকাতা অফিসে চাকরি দিতে চেয়েছে। ওদের তাহলে তোর হয়ে চিঠি দিই?

না, বাবা, অমিয়া দেবী বলেছিলেন। ওর অফিসে তো সহানুভূতির চোখগুলি আমাকে তাড়া করে বেড়াবে।

প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, সি. এস. সি. প্যানেলে আসতে কিছুদিন সময় লাগবে। তবে আমাদের কলেজে পার্ট টাইম হিসাবে কিছুদিন কাজ কর। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, পরে এখানেই স্থায়ী হয়ে যাবি... ...

বাবা, মাঝপথেই বাধা দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

বল, মা।

আমি যদি কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে থাকি, তুমি কি খুব কষ্ট পাবে, বাবা?

এবার চমকে উঠেছিলেন প্রিয়তোষ বাবু, বলেছিলেন, সে কি রে? কোথায় যাবি?

বুলবুল চণ্ডি।

সেটা আবার কোথায়?

মালদা শহর থেকে আধঘন্টার পথ।

সে যে অনেক দূর মা। গ্রাম। কোনোদিন এর নাম শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

বেশি দূর কোথায় যাব? কলকাতা থেকে সাত-আট ঘন্টার পথ। তুমি ডেকে পাঠালেই চলে আসব।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন প্রিয়তোষ বাবু। মা মরা মেয়ে। স্ত্রী যখন মারা যান তখন কত বয়স ছিল ওর? ভাবার চেষ্টা করেছিলেন। বছর ছাড়িয়ে কয়েক মাসে পড়েছিল। বড় ছেলের বয়স সাত কি আট। অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন বিয়ে করার। নানা সম্বন্ধও আসতে শুরু করেছিল। শরীরের চাহিদাও মাঝে মাঝে মনের কোণে হামাগুড়ি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এ পথে আর এগোতে চান নি। বই আর লেখার মাঝেই নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। সেই নিভার হাতেই সঁপে দিয়েছিলেন সংসারের সব দায়-দায়িত্ব। লেখা-পড়া আর কলেজ, এ নিয়ে মগ্ন আপন ভোলা এই অধ্যাপকটি টেরই পান নি তার বাড়িতে তিনটি মাতৃ-হারা শিশুসন্তান শশীকলার মতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাঝে মধ্যে নিভার দাপটে বাস্তব জীবনে ফিরে আসতে হত। তিনি হয়তো তখন তার পড়ার ঘরে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে সমসাময়িক ঘটনাকে ধারালো লেখনীর নির্মম টানে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন, সে সময় হাজির নিভা।

দাদাবাবু, তোমার এই ছাই-ভস্ম লেখা বন্ধ করত।

কেন রে? তুই আবার খেপলি কেন? লেখা বন্ধ করে মুচকি হেসে জবাব দিতেন প্রিয়তোষ বাবু।

তোমার এই হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়।

এবার সাবধান হবার পালা প্রিয়তোষ বাবুর। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। বলেছিলেন, আহা, রাগ করছিস কেন? বল না, কি করতে হবে?

নিভা টেবিলের ছড়ানো বইগুলিকে একটার পর একটা রাখতে রাখতে বলেছিল, আমাকে উদ্ধার করতে হবে। এবার ওঠ। বড় ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।

কেন? প্রিয়তোষ বাবু উদ্বিগ্ন হন।

মেয়েটা যে দুদিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে সে খবর রাখ?

জ্বর? আমার জ্বর? কই জানি না তো?

তা জানবে কি করে? নিভার রসনা ধারালো হয়ে উঠে। ঐ ছাই, ভস্ম, বই আর কলম হাতে নিয়ে বসে থাকলে কি ছেলে-মেয়ের খবর রাখা যায়? দেব যেদিন মুদির দোকানে সব বিক্রি করে সেদিন সব জানতে পারবে।

তা তুই পারিস। চল অমিকে দেখে আসি।

সে দেখে এসো। তবে এক্ষুনি বড় ডাক্তারকে ডাকতে হবে।

বাড়ির পাশেই থাকেন ডাঃ কর। প্রবীন এল. এম. এফ.। তিনি খবর পেলেই চলে আসেন। আর এ ব্যাপারে নিভাই সব করে। কিন্তু নিভাই যখন বার বার বড় ডাক্তারের কথা বলছে তখন হয়ত ডাঃ কর নেই। নয়ত, মেয়ের কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাই টেবিলের উপর কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেই মেয়ের কাছে চলে এসেছিলেন।

অমিয়া দেবীর জ্বরের উত্তাপ কাছে যেতেই টের পেয়েছিলেন। এরপর পনেরোটা দিন কোথায় কলেজ আর পড়াশোনা। মেয়ের মাথার কাছ থেকে সরানো যায় নি। নিভার দাপটে উঠে গিয়ে কোনো মতে স্নান খাওয়া সেরে আবার মেয়ের পাশে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে থেকেছেন। অমিয়া দেবী প্যারা টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেও বাবাকে বোঝাতে পারেন নি যে সে এখন সুস্থ। দুজনে একসাথে বেরিয়ে একজন স্কুলে, আরেক জন কলেজে যাবাব সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাকে বাড়ির বাইবে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল।

এর পরের ইতিহাস কিন্তু আবার সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। কলেজ, বই আর কলম। দুই ছেলে যে কবে স্কুলের গণ্ডি পার হয়েছিল তা জানতে পেরে নিজেই যেন অবাক হয়েছিলেন। ছেলে-মেয়েকে পড়ানোর জন্য অবশ্য তারই সেরা ছাত্রকে নিয়োগ কবেছিলেন। তবে ঐ পর্যন্তই। মাস শেষ হলে নিভা এসে গৃহশিক্ষকের মাইনে দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিত।

মাঝে মধ্যে অবশ্য ছেলে-মেয়ের প্রতি তার এই অবহেলার কথা ভেবে নিজেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। তখন অমিয়া দেবী ও তার দাদাদের অবস্থা হত—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সব বিষয়েই পড়াতে বসে যেতেন। ঘন ঘন ডাক পড়ত গৃহশিক্ষকের। এটা পড়াও—ওটা লেখাও—প্রিয় ছাত্র তার শিক্ষকেব নির্দেশ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কদিনের মধ্যেই অবশ্য এই ঝড়ের তাণ্ডব থেমে যেত। পাশ দিয়ে গৃহ শিক্ষক চলে গেলেও নিজের পড়াশোনায় মগ্ন অধ্যাপকের নজর পড়ত না।

নিভার কথা ভেবেই প্রিয়তোষ বাবু কখনো কখনো বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। ভাবতেন, নিভার জীবনটা এই সংসারের খাঁচায় পড়ে বুঝি বন্দি হয়ে আছে। মনে হতো রূপটাই তো সব নয়। ওর মত গুণী মেয়ে কজন আছে? চেষ্টা করলে কি তার জন্য একটা ভাল পাত্র জোগাড় করা যায় না? কিন্তু সে কথা উঠতেই নিভা রাগে ফেটে পড়ত। বলত তুমি না হিন্দুর ছেলে দাদাবাবু, অনেক শাস্ত্র তো পড়েছ। হিন্দুর মেয়ের সিঁথিতে একবার সিঁদুর চাপলে তার কি আবার বিয়ে হয়?

অথচ এই মেয়েকেই তিনি অন্য মূর্তিতে দেখেছিলেন—

সেদিনটা কী বার ছিল আজ আর মনে নেই। তবে দিনটা ছিল ছুটির দিন। প্রিয়তোষ বাবু তার লাইব্রেরীতে গভীর মনযোগের সঙ্গে দিল্লির এক সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য তার লেখাটা সবে শুরু করেছেন, এমন সময় নিভার গলার সপ্তম সুরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নীচের বারান্দার সিঁড়িতে নিভা। আঁচলটা কোমরে জড়ানো। হাতে ঝাঁটা সামনে একটা মাঝে বয়স্ক রোগা বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে। দোতলার বারান্দা থেকেই বোঝা যায় লোকটা একটা বাউণ্ডুলে ব্যাপারটা কী জানার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রিয়তোষ বাবু নিভার উচ্চস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন।

সোয়ামীর পরিচয় দিতে এসেছে। লম্পট বদমাস কোথাকার। ফের যদি তোর এই পোড়া, মুখ দেখি তবে এই ঝাঁটার বাড়িতে তোর মুখ থেঁতলে দেব।

নিজের সোয়ামীকে তুই মানবি না—পুরুষ কণ্ঠের হুঙ্কার।

ফের সোয়ামী বলে মুখ থেকে একটা কথা বলবি না। এমন সোয়ামীর মুখে ঝাঁটা মারি। বাবাকে মিথ্যা কথা বলে আমাকে বিয়ে করে বাজারে মেয়ে ছেলের সাথে ঘর করে এখন আমাকে সোয়ামী দেখাতে এসেছে। এমন সোয়ামীর মুখে পেচ্ছাব করি।

তোকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাব হারামজাদি কানী। দেখি কোন পীড়িতের নাগর তোকে বাঁচায়। পুরুষ কণ্ঠের হিংস্র হিস হিস আওয়াজে আর স্থির থাকতে পারেন নি প্রিয়তোষ বাবু। দ্রুত নেমে এসে সেই লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন।

দড়ি পাকানো চেহারা। চোখ দুটি ঘোলাটে। সকাল বেলা থেকেই নেশা চড়িয়ে আছে। ঠোঁটে ও হাতে সিফিলিসের ঘা। রাগে প্রিয়তোষ বাবুর গৌর বর্ণ মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। তার কণ্ঠস্বরে সেদিন সারা বাড়িটাই যেন কেঁপে উঠেছিল।

বেরোও বলছি এই বাড়ি থেকে। আমার বাড়িতে ঢুকে আমার মেয়েকেই ভয় দেখাচ্ছ?

লোকটা দ্রুত পায়ে ঢিল খাওয়া রাস্তার কুকুরের মতন বেরিয়ে গিয়েছিল।

নিভা কেঁদে ফেলেছিল। দাদাবাবু, তুমি আমাদের ছোটোলোকের মধ্যে কেন নেমে এলে?

প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, নিভা তুই মনে রাখিস, তুই এই বাড়ির মেয়ে। তোকে আমার বড় মেয়ে বলেই জানি।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিল নিভা। প্রিয়তোষ বাবুর পায়ে মাথা রেখে বলেছিল, দাদাবাবু আমাকে তুমি এত বড় সম্মান দিলে? আমি কি তার যোগ্য হতে পারব?

নিভার হাত দুটো ধরে তাকে তুলেছিলেন প্রিয়তোষ বাবু, বলেছিলেন, ভালো করে এক কাপ চা করে নিয়ে আয় তো নিভা।

চা খেতে খেতে নিভার কাছে শুনেছিলেন এই লোকটার বৃত্তান্ত। চটকলের কর্মী বলে সে নিভার বাবার কাছে পরিচয় দিয়ে নিভাকে বিয়ে করেছিল। কানা মেয়ে তার উপর সারা মুখে গুটি বসন্তের দাগ। তাকে পাত্রস্থ করার তাগিদে নিভার বাবা হালের বলদ বিক্রি করে নগদ টাকা লোকটার হাতে গুঁজে দিয়ে তার বিয়ে দিয়েছিল। পরে জানা গেল লোকটা এইভাবে বিয়ের নাম করে নিষিদ্ধ পল্লীতে মেয়েদের চালান দিত। নিভার ভাগ্যেও একই ঘটনা ঘটত। সে তাকে তার বাপের বাড়িতে রেখে হয়ত খরিদ্দারের খোঁজে বেরিয়েছিল। কিন্তু সেবার নদীর বাঁধ ভেঙ্গে সব কিছু জলের তলায় চলে যাওয়ায় নিভা তার বাবার হাত ধরে শহরে চলে এসেছিল ভিক্ষার আশায়। তাই গ্রামে গিয়ে তাদের খোঁজ পায়নি, নিভার এই স্বামী রত্নটি। নিভার বাবার মরণকালে এই লোকটার সাথে দেখা হয়েছিল। সেখান থেকেই খোঁজ পেয়ে আজ এত বছর বাদে সে উপস্থিত হয়েছে স্বামীর দাবি নিয়ে।

এই ঘটনার কী বেশ কয়েক মাস বাদে নিভা তার টেবিলের উপর দু-হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর চোখ দুটো ভেজা। মনে হল কিছুক্ষণ আগে ও কেঁদেছে। প্রিয়তোষ বাবুকে বলেছিল, আমার মাইনের টাকা থেকে কটা টাকা দিতে হবে দাদাবাবু।

নিভা তার মাইনের টাকা চাইছে। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না প্রিয়তোষ

বাবু। কাবণ মাইনেব কথাটা নিভাব মুখে এই প্রথম শুনলেন। স্ত্রী বেঁচে থাকতেই নিভাব নামে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিযেছিলেন তাতে নিযমিত টাকাটা জমা পড়ে। তবে আজ পর্যন্ত সেই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনোদিন টাকা তোলা হয নি। প্রিযতোষ বাবু নিভাব হাতেই মাসেব খবচেব টাকা মাইনা পেযেই তুলে দেন। কোথায কি খবচ সব ও জানে। প্রিযতোষ বাবুকে মাথা ঘামাতে হয না। নিভাকে বলেছিলেন, তোব টাকা লাগবে তো নে। মাইনেব টাকা থেকে নেওযাব কথা বলছিস কেন? তোকে তো আমবা মাইনা দিই না। ওটা থাকে তোব নামে। অমিব জন্য যেমন বাখি তোব জন্যও সামান্য হলেও বাখি। তোব কাছে যে মাসেব খবচেব টাকা আছে তাব থেকে যা দবকাব নিযে নে।

—না, দাদাবাবু এই টাকাটা আমাব টাকা থেকেই নিতে হবে।

—যত টাকা লাগে নে। তোব কাছে না থাকলে ব্যাঙ্ক থেকে আনিযে নিচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ কি হল বলত?

—আমাকে হবিষ্যি কবতে হবে।

—হবিষ্যি?

হ্যাঁ, দাদাবাবু। এই মাত্র খবব পেলাম ঐ লোকটা ক'দিন আগে মাবা গেছে। খাবাপ পাড়ায যে মেযেটাব ঘবে যাতাযাত কবত সেই মেযেটাব ঘবেব পাশেই মবে পড়ে ছিল। সাবা গাযে ছিল পাপেব ঘা। শত হোক হিন্দুব মেযে। মন্ত্র পড়ে বিযে হযেছিল। নিযম তো মানতেই হবে। নিভাব চোখ বেযে দু ফোঁটা জল টেবিলেব উপব পড়েছিল।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিযে এতদিন ঘটনাকে বিশ্লেষণ কবে এসেছেন প্রিযতোষ বাবু। সেদিন ভাবতে বসেছিলেন কি ব্যাখ্যা দেবেন একে? এটাই কি যুগযুগান্তেব সংস্কাব? যাবে জীবনে কোনোদিন ভালোবাসল না, স্বামী বলে বুঝতে পাবল না, যাব লাম্পট্য তাব নাবীত্বেব উপব সবচেযে বড়ো আঘাত দিযে গেছে, সেই মানুষটা নিষিদ্ধ পল্লীব এক বক্ষিতাব ঘবেব পাশে মবে পড়েছিল, সেই সংবাদে এই নাবীব চোখে জল। এই মানসিক দাসত্বেব গভীবতা কোন তত্ত্বেব মূল্যাযনে পবিমাপ কববেন তাব সন্ধান তিনি খুঁজে পান নি।

মা-হাবা মেযে নিঃসঙ্গতাব মধ্যেই বড় হচ্ছিল। হযতো এই নিঃসঙ্গতাই মেযেকে কবে তুলেছিল জিদি। মেযেব জিদেব কাছে আত্মসমর্পণ কবে তাকে বোধ হয আবো আত্মকেন্দ্রিক কবে তুলেছিলেন। তাই অমিযা দেবী যেদিন প্রিযতোষ বাবুকে এসে বলেছিলেন, তিনি বুলবুল চণ্ডিব স্কুলে যোগ দেবেন, প্রিযতোষ বাবু জানতেন তাব মেযে স্থিব সিদ্ধান্ত নিযেই এসেছে। কথা বলতে গিযে গলাটা ধবে এসেছিল। তবু বলেছিলেন, শোনো মা। টাকাব জন্যে যে তুই যাচ্ছিস না তা আমি জানি। তবে তুই যদি নির্জনতাব মধ্যে শান্তি খুঁজে পাস তবে তাই যা। আমাকে যখনই ডাকবি তখনই পাবি। আব যখনই মনে চাইবি তখনই চলে আসবি।

তমালকে নিযে সমস্যা হযেছিল। বুলবুল চণ্ডিতে কোনো ইংবেজী মাধ্যমেব স্কুল নেই। তিনিও চান নি তমাল আঁচলেব ছাযায বড় হোক। কলকাতাব নামী স্কুলেই ভর্তি কবে দিযেছিলেন। বাড়িতে থেকে পড়াব যে অনুবোধটুকু প্রিযতোষ বাবু কবেছিলেন সেই অনুবোধটুকুও সেদিন বাখেন নি। তমালকে হোস্টেলে ভর্তি কবে দিযেছিলেন।

। ৯ ।

আজ তমালেব শূন্য ঘবে বসে আবাব জীবনেব হিসেব নিযে বসে ছিলেন অমিযা দেবী। ভাবেন তমালের অবদমিত অভিমানই কি শেষ পর্যন্ত তাব উপব চবম প্রতিশোধেব জন্য অপেক্ষা কবছিল?

কিন্তু বসুন্ধরা? প্রজাপতির মতন ডানা মেলা সেই উচ্ছলতাকে সে কেন আজ নিজেকে তার কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে? তার কাছে সবাই কেন তাদের মনের দরজাকে খুলে দিতে এত ইতস্তত করে? অভিমানে মনটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। নিজেই অবাক হয়েছিলেন, অভিমান নামক শব্দটাকে তো একসময় নিজেই তার মনের অভিধান থেকে উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন, তার কাছে এর অর্থ ন্যাকামি বলেই মনে হতো।

মনটাকে আয়নায় দেখার ছলে নিজের শরীরটাকেই আয়নায় দেখতে চেয়েছিলেন অমিয়া দেবী। অপূর্ব কথাটি যুক্ত না হলেও সুন্দরী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজন যে শুধু তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হয়েছিল তা নয়, একজন অধ্যাপকও অতিরিক্ত স্নেহের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তবে তার সেই দৃষ্টি আকর্ষণকারী তনুমঞ্জরী যে কঠিন গাম্ভীর্যের মোড়কে ঢাকা থাকত, তাকে উন্মোচন করে তারা এর বেশি এগোতে সাহস করেনি।

কালের নিয়ম হামাগুড়ি দিয়ে তার সেই সুঠাম দেহপল্লবীতে যে ছায়া ফেলেছে তা এখন আর সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রলেপে অনুভব করার প্রয়োজন হয় না। মোটা দাগের চাউনিতেই ধরা পড়ে। দামি বেলজিয়াম গ্লাসের আয়নাতে গালের সেই টোল খাওয়া ভাঁজকে অনেক চেষ্টা করেও আজ আর খুঁজে পান না। অথচ হাসির রেখার সাথে তার এই গালের টোল যে অনেকের হৃদয়কে রঙিন করত সে খবর বান্ধবীদের মাধ্যমে তার কাছে এসে পৌঁছোত। আয়নার পুরু কাঁচটাকে আঁচল দিয়ে বার বার ঘষে সেই স্ফটিক স্বচ্ছ কাঁচের প্রতিবিম্বে নিজের মুখটাকে মাঝে মাঝেই খুঁটিয়ে দেখেন। নানা কৌনিক অবস্থান থেকে মুখের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু ভারী গালের অবয়বে সেই পরিচিত টোলের চিহ্নকে এখন আর খুঁজে পান না। মহাকালের গতির চাকায় সে হারিয়ে গেছে।

আয়নার কাছ থেকে নিজেকে টেনে আনেন অমিয়া দেবী। বুঝতে পারেন কাল শুধু সে চেহারাকেই পাল্টায় তা নয় অনুভূতির স্পর্শ তলকেও পলি ভরাট নদী গর্ভের মতন অগভীর করে তোলে। একটুতেই অভিমান মনের তল থেকে উপচে পড়ে। তাই বসুন্ধরার এই এড়িয়ে যাওয়াকে আগের মতন উপেক্ষা করতে পারেন না। ভিখারির মতন ছুটে যেতে চান ওকে হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে আঁকড়ে ধরতে।

স্বর্ণপ্রভাকে নার্সিংহোমে দেখে এসে তমালের ঘরে তার বিছানার উপর চিত হয়ে শুয়েছিলেন অমিয়া দেবী। মাথার উপর ফ্যানটা অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরে চলেছিল। সেদিকেই সেদিন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

ফ্যানের তিনটি ব্লেডের মাঝে যে ফাঁক আছে চলমান ব্লেডে তা বোঝা যায় না। যেন এক অস্বচ্ছ পর্দা সেই ফাঁকা জায়গাটাকে ঘিরে রাখে। অমিয়া দেবী নিজের জীবনের এই প্রবাহমান আবর্তের কথা মনে করার চেষ্টা করেন। জীবনের চলার গতির ছন্দে তিনিও বুঝতে পারেন নি তার জীবনের ফাঁকা দিনগুলিকে।

স্মৃতির রোমন্থন সবসময় মধুর হয় না, বরং যন্ত্রণাকেই উসকে দেয়। সেদিন কলকাতায় তার চোখের চাউনী থেকে বসুন্ধরার ভীত চকিত প্রস্থান ও সেই সঙ্গে তার সারা মুখে যে ক্লান্তি ও কালিমার ছায়া তিনি দেখেছিলেন তা যে শুধু স্বর্ণপ্রভার অসুখের জন্য তার মানসিক ছায়া একথা তখনই কেন জানি মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। আশঙ্কার একটা কালো ছায়া মনের কোণে তখনই উঁকি দিতে চেয়েছিল। অশনি সঙ্কেতের ভাবনা সেদিনই আরেকটি ঘটনাকে তার মনের পর্দায় বার বার হাজির করছিল।

সেদিন প্রচণ্ড একটা বাজ পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি আর দমকা হাওয়া। কাঁচের জানালার ওপর থেকে ভারী পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছিলেন। অবিশ্রান্ত

বৃষ্টির ধারা। সারা আকাশ জুড়ে বিদ্যুতের আঁকি বুকি। বাড়ির গেটের সামনে ইউক্যালিপটাস গাছটা হাওয়ার দাপটে তার মাথাটাকে প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়ে আনছে। মনে হচ্ছিল এই বুঝি ভেঙে পড়বে। কিন্তু পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, হাওয়া আর বৃষ্টির এই উন্মত্ত কোলাকুলি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলন। গেটের সামনে গাড়ির তীব্র হেডলাইট ও তীক্ষ্ণ হর্নের একটানা শব্দে তার চমক ভেঙে গিয়েছিল।

কে হতে পারে এত রাতে? এই দুর্যোগ মাথায় কবে কেউ তো কোনো সুখবর আনে না। দ্রুত পায়ে দরজাটা খুলতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। এই অঞ্চলে মাঝে মধ্যেই ডাকাতির খবর আসে। তবে তারা এভাবে পাড়া জাগিয়ে আসে না। তাছাড়া কিছু পাবে সেই খোঁজ নিয়েই ডাকাতি কবে। আসার সময় হাতে শুধু দুটো চিকন বালা, গলায় সরু চেন আর কানেব দুটো দুল এনেছিলেন। বাকি সব কলকাতার ব্যাঙ্কেব লকাবে। মাসের শেষ বেতনেব টাকাও তলানীর মুখে।

হেডলাইটটা জ্বালানোই ছিল। সেই সাথে বিদ্যুৎ চমকের ঝলসানিতে দেখতে অসুবিধা হল না গাড়িটা একটা পুলিশেব জীপ। তার বাড়ির সামনে এত রাত্রে পুলিশেব গাড়ি। অবাক হবার পালা অমিয়া দেবীর। ভাবলেন কোথাও যাবার পথে হয়তো এখানে কাবো জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যেই চারজন পুলিশ বর্ষাতি চাপিয়ে টর্চ জ্বালাতে জ্বালাতে গেট খুলে ভিতরে ঢুকেছিল। জানালা থেকে সরে এসেছিলেন অমিয়া দেবী। পাশের ঘরে নিভাদি ঘুমিয়ে আছে। দুটি ঘরের মাঝেব দরজা খোলাই থাকে। তাকে ডাকবেন কিনা ভাবতে ভাবতেই দরজায় জোবে আঘাত। দরজা খুলুন।

নিভাদি ঘুম-চোখে ছুটে এসে অমিয়া দেবীর হাতটা দু-হাতে চেপে ধবেছিল। আতঙ্কে তার গলার স্বব বসে গেছে। কোনো মতে বলতে পাবল, ডাকাত এসেছে।

অমিয়া দেবী চাপা গলায় বলেছিলেন, ডাকাত নয়, পুলিস।

পুলিস?

পুলিস।

কেন?

জানি না।

দরজার ওপারে ধাক্কার আওয়াজটা আরো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। ভাবী পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ, দবজাটা খুলুন। আমরা পুলিসেব লোক।

নিভাদি বলেছিল, এত বাতে পুলিসের লোকের কী দরকার? জানেন না, এই বাড়িতে আমরা মাত্র দুটি মেযেছেলে থাকি?

বাইবের সেই ভাবী কণ্ঠস্বর ঝড়ের শব্দকেও ছাপিযে যায়। দরজাটা খুলুন। আপনাদের কোনো ভয় নেই। আমরা আমাদের কর্তব্য সেরে চলে যাব।

এত রাত্রে কিন্তু আমবা দরজা খুলতে বাধ্য নই। দরজায় মুখ লাগিয়ে অমিয়া দেবী বলেছিলেন।

মিসেস মিত্র, দেরি হলে আমরা দরজা ভেঙে ফেলতে বাধ্য হব। আমাদের উপর সেরকম নির্দেশ আছে, নয়ত তমালকে বের করে দিন।

তমালকে বের করে দিন—কি শুনছেন তিনি? এক ঝটকায় দরজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন অমিয়া দেবী। দাঁড়ান পুলিসের মুখোমুখি।

কিন্তু ওরা অমিয়া দেবীকে কথা বলার কোনো সুযোগ দেয়নি। বলতে গেলে এক রকম ধাক্কা দিয়েই তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছিল। স্তব্ধ অমিয়া দেবী

সেদিন খোলা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বৃষ্টির ছাট তার সারা শরীরকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু শরীরের ভিতরে উষ্ণপ্রবাহ প্রতিটি কোষে যে উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল তা তার ভিজে শরীরের শীতলতাকে শুষে নিয়েছিল।

প্রতিটি ঘর তন্ন-তন্ন করে পুলিস খুঁজে চলেছিল। সারা বাড়িতে তিনটি ঘর। একটিতে থাকেন অমিয়া দেবী, পাশেরটিতে নিভা। এর ডান দিকে এল প্যাটার্নের আরেকটি ঘর। তমাল এলে থাকে। ও নিজেই এই ঘরটি পছন্দ করে নিয়েছিল। বাইরের দিকে দরজা। কাউকে না জানিয়েই ঐ ঘরে আসা-যাওয়া করা যায়। বারান্দার বাঁ পাশে আট বাই ছ ফুটের আরেকটা ছোটো ঘর আছে। তাতে রাজ্যের আবর্জনা ঢুকিয়ে রেখেছেন। কালে ভদ্রে খোলেন। ফলে, বিশাল বিশাল ধেড়ে ইঁদুর অবাধে সংসার পেতে বসেছে। এদের ছোটাছুটিতে প্রথমে এ বাড়িতে এলে কেউ মনে করতে পারে ঘরের ভিতর কোনো মত্ত মানুষ দাপাদাপি করে চলেছে। নিভাদি ইঁদুরের কল বসিয়ে বেশ কয়েকটা ইঁদুর ধরেছিল। কিন্তু এতেও আরেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এত বড়ো বড়ো ইঁদুর মারবেন কিভাবে তার উপায় বের করতে মাথা ঘামানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল খাঁচায় আটক ইঁদুরগুলি নিয়ে খাঁচাটি নদীর জলে চুবিয়ে রাখা হবে। দু-একবার এটি করার পর পদ্ধতিটিকে বড়ো নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল অমিয়া দেবীর। এতগুলি প্রাণীকে এই ভাবে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা— মন থেকে সায় দিতে পারেন নি। ফলে ইঁদুরের সংসার কায়েম থেকে গেছে।

বারান্দার ডান পাশে তমালের ঘরটার দিকে চোখ পড়তেই অমিয়া দেবীর হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনটা যেন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। গত সপ্তাহেই তমাল এসেছে, কিন্তু এই তমাল যেন সেই তমাল নয়। চোখে মুখে উগ্র ছাপ। চলাফেরায় ব্যস্ততা। তবে যে ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে অবাক হয়েছিলেন তা হল তমাল ঘর থেকে বের হলেই ঘরের শেকলে তালা লাগিয়ে দিত। এমন কি বাথরুমে গেলেও তালাটা লাগাতে ভুলত না।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কী রে তমাল? ঘরে সব সময় তালা লাগাস কেন? কী এত সোনা-দানা এনে রেখেছিস?

তমাল গম্ভীর স্বরে জবাব দিয়েছিল, বাইরের দিকে ঘর। আমার সাথে দামি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। তাছাড়া আমি এখন বড়ো হয়েছি। আমার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকতে পারে।

কথা বাড়ান নি অমিয়া দেবী। তমালকে এবার থাকার জন্য অনুরোধ করতে হয় নি। ও নিজের থেকেই থেকে গেছে। ব্যক্তিত্বের সংঘাতকে এড়িয়ে তমালকে কিছুদিন কাছে পাবার আগ্রহটাই ছিল অনেক জোরদার।

তমালের ঘর বন্ধ। ঐ ঘরেই তো তমাল আছে। এত শব্দেও কি তমালের ঘুম ভাঙে নি? কিন্তু পুলিস কেন ওর পেছনে? একটা অজানা আতঙ্কের শিহরণ অমিয়া দেবীর সমস্ত শক্তিকে যেন শুষে নিয়েছিল। বারান্দা থেকে নড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। একটা বিদ্যুতের ঝলকে দেখতে পেয়েছিলেন তমালের ঘরের শেকল বাইরে থেকে তোলা। তবে তালা দেওয়া নেই। তমাল নিশ্চয়ই ঘরে নেই। অথচ শোবার আগে তিনি নিজে দেখে গেছেন তমাল এই ঘরে শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছে।

পুলিস অফিসারটি তরুণ। মনে হল তমালের থেকে বয়সে খুব বড়ো হবে না। চাকরিতেও নিশ্চয়ই নতুন। তবে ভবিষ্যতের সিঁড়ি টপকাবার উপর যে তার নজর আছে সেটা তার অতি উৎসাহের কর্মতৎপরতার মধ্যে স্পষ্ট। দুটি ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজে তারা অমিয়া দেবীর ঘরে জমা হয়েছিল। অমিয়া দেবী তখনও বৃষ্টির ঝাপটা সারা শরীরে মেখে একইভাবে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

তরুণ পুলিশ অফিসারটি বইয়ের তাকগুলি থেকে একটার পর একটা বই টেনে নিয়ে তার পাতাগুলি উল্টিয়ে যাচ্ছিল। একজন পুলিস কনেস্টবল অমিয়া দেবীর বিছানাটা খাট থেকে টেনে মাটিতে ফেলে দিল। তোষকের তলা থেকে দুটো একশ টাকার নোট আর কয়েকটা দশ টাকার নোট মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে সে নোটগুলি তার পকেটে চালান করে দিল।

হাসি পেয়েছিল অমিয়া দেবীর। গণতন্ত্রের প্রহরীদের অপূর্ব কর্তব্য নিষ্ঠায় নিজেকে আর চুপ করে রাখতে পারেন নি। বলেছিলেন, আর খোঁজার কষ্ট করার কি দরকার? যা খুঁজতে এসেছিলেন তা তো পেয়েই গেছেন।

মানে? তরুণ অফিসারটি একটা বই হাতে নিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

কনেস্টবলটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, সেটা আপনার ঐ সহকর্মীকেই জিজ্ঞাসা করুন।

কী বলতে চাইছেন আপনি; কনেস্টবলটি তার দিকে প্রায় ধেয়েই এসেছিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কী বলতে চাইছি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তোষকের তলায় তো কোনো মানুষ লুকিয়ে থাকে না। যা থাকে তা আপনার পকেটে চলে গেছে।

কনেস্টবলটি অমিয়া দেবীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল। হয়ত অবাকই হয়েছিল। সত্তরের দশকেও কোনো মহিলা পুলিসের পকেটে পোরা নিয়ে কিছু বলতে পারে একথা ভেবে অমিয়া দেবীকে কোন এক অচেনা দ্বীপের মানুষ বলে হয়ত মনে করেছিল। তাই বোধ হয় গলার স্বরটা আরো কর্কশ হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, পেটের ছেলেকে মানুষ করতে পারেন না আবার কথা বলছেন।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার মা বেঁচে আছেন?

—তাতে আপনার কী দরকার?

বেঁচে থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনাকে যখন তিনি গর্ভে ধারণ করার যন্ত্রণা সহ্য করতেন তখন কী এই আশা নিয়েই তিনি সেই কষ্ট করেছিলেন?

—কোন আশা?

—এই যে আপনার গায়ে একদিন পুলিসের পোশাক উঠবে। আপনি গভীর রাত্রে আপনার মার বয়সী দুজন মহিলার ঘরে ঢুকে তাদের তোশকের তলায় রাখা টাকাগুলি তল্লাসির নামে পকেটে পুরবেন।

—বাঃ, এই না হলে নক্সালের মা।

—পুলিসের মা হলে যদি অপরাধ না হয়, নক্সালের মা হলে অপরাধ হবে কেন?

পুলিস অফিসারটি কী যেন বলতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সবাই কীসের একটা শব্দে হঠাৎ বন্দুকের রাইফেল বাগিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

ব্যাপারটা কি বোঝার আগেই চারজন পুলিস শত্রুর একেবারে মুখের সামনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গি করে হামাগুড়ি দিয়ে রাইফেল তাক করে বারান্দার সেই চিলতে ঘরের দিকে অত্যন্ত সাবধানে এগিয়ে গেল। ওদের হুইসেলের আওয়াজ শুনে গাড়ি থেকে আরো কয়েকজন পুলিস ছুটে এসেছিল। ওরা তাদের সহকর্মীদের এইভাবে হামাগুড়ি দিতে দেখে বৃষ্টির মধ্যেই জল-কাদার উপর রাইফেল বাগিয়ে বসে পড়েছিল।

ছোট চিলতে ঘরের মধ্যে আবার একটা খচ্ খচ্ শব্দ। পুলিস অফিসারটি চীৎকার করে উঠেছিলেন, হল্ট।

অমিয়া দেবীর মনে হয়েছিল, চীৎকারটা যেন কোনো ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ। মনে

মনে হাসি পেল অমিয়া দেবীর। প্রাণের কী ভয় এদের। একজনের পিছনে এতগুলি সশস্ত্র পুলিস। অথচ কতই বা বযস হবে তমালেব? এই তো গত বছরের ২৮শে শ্রাবণ ওর বাইশ বছরেব জন্মদিনে কলকাতায গিযে জামা, প্যান্ট আর একটা সুন্দর বেল্ট কিনে দিয়েছিলেন।

তমালের এসব পছন্দ নয়, সে বলেছিল মা তুমি এসব আর কিনবে না। এগুলি আমার ভালো লাগে না।

মনের কোণে আঘাতের ঢেউটা বেশ জোরেই ধাক্কা দিয়েছিল। তবে তা প্রকাশ হতে দেন নি। শুধু বলেছিলেন, সবই তো একে একে কেড়ে নিয়েছিস। এই দিনটাকে কাড়িস না।

আজ তার আত্মজকে ঘিরে ধরতে চাইছে পুলিসের বেয়নেট। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তমালকে যদি এই ছোট্ট ঘরটাতে ওরা পায় তবে তাদের বুলেটের বর্ষণে ঝাঁজরা হয়ে যাবে। ওর তেইশ বছরের তাজা বক্ত-মাংসের শরীবটা। এই হামাগুড়ি দেওয়া পুলিসেব দিকে তাকিয়ে ভাববেন, এতবড় শক্তি তমালেরা কোথায় পেল যার ভয়ে এতগুলি সশস্ত্র পুলিসেব চোখে মুখে ভয়ের রেখাগুলি এত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে?

বারান্দার ঐ ছোটো ঘবটা বাইবে থেকে শেকল তোলা। আওয়াজটা আসছে ঐ ঘরের ভিতর থেকে। বাড়িতে তমাল বাদে প্রাণী বলতে ওবা দুজন। তমাল যে ঐ ঘরে লুকিয়ে নেই এতে অমিয়া দেবীর কোন সন্দেহ নেই। তাহলে বাইরে থেকে শিকল থাকত না। তবে ঘরের এই খুট খুট শব্দ তার অনেক দিনের পরিচিত।

পুলিস অফিসাবটির হাতে রিভলভার। উত্তেজনায় হাতটা থর থর করে কাঁপছে। গলার স্বরটা স্বাভাবিক রাখতে চাইলেও তা পারছেন না। কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার করে বলেছিলেন, তমাল বাবু, পুলিস আপনাকে ঘিবে ফেলেছে। পালাবার বা প্রতিরোধের চেষ্টা করবেন না। হাত মাথায় তুলে বেরিয়ে আসুন।

ঘর থেকে সেই খচ্ খচ্ শব্দ ছাড়া আর কেউ সাড়া দিল না।

তমালবাবু, দেরী করলে পুলিস গুলি চালাতে বাধ্য হবে। আবার সেই কাঁপা কণ্ঠের হুমকি।

ঘবের ভিতরে কি যেন পড়াব শব্দ হল। সাথে সাথে দুজন পুলিস বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়েছিল। পুলিস অফিসারটিও পাশের ঘরের দরজার আড়ালে চলে গিয়েছিলেন।

তীব্র বিদ্যুৎ চমকের ঝলকানিতে বন্ধ দরজার শেকলটা স্পষ্ট দেখা যায়। পরক্ষণেই অন্ধকার ও কান ফাটানো বাজ পড়ার আওয়াজ। বোঝা যায় ধারে কাছে কোথাও বজ্রপাত ঘটল।

তরুণ অফিসারটি আবাব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। পাশের কনেস্টবলটিকে দরজার শেকলটাকে খুলতে বলেছিলেন। কিন্তু তাকে এগোতে দেখা গেল না। সে পাশের সঙ্গিকে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে তাকে এগিয়ে দিতে চাইল।

ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছিলেন অমিয়া দেবী। এদের আঙ্গুলের চাপেই তো শয়ে শয়ে তরুণের বুকে তপ্ত সীসা ছুটে যায়। অথচ নিজেদের জীবনের প্রতি এদের মমতা কত গভীর। অমিয়া দেবী ভাবতে চাইছিলেন, খাকি পোশাকটার তলে আর সব মানুষের মতো এদেরও যে একই মানবিক আকৃতি—এত বড় সত্যটা এরা দ্রুত ভুলে যায় কী ভাবে?

পুলিশ অফিসারটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, আপনারা যদি কেউ দরজাটা খুলতে সাহস না করেন তবে আমি দরজাটা খুলে দিতে পারি।

আপনি খুলবেন?

আপনারা যখন কেউ মরতে চান না তবে না হয় আমিই মরি। আপনাদের হাতে মরার চেয়ে নিজের ছেলের হাতে মরাটাই ভাল। আপনি কী বলেন?

মাথা নীচু করে অফিসারটি বলেছিলেন, দেখুন, আপনি কিন্তু শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছেন। আমরা তো আমাদেব ওপরওলাব হুকুম তামিল করতে এসেছি মাত্র।

জানি।

অমিয়া দেবী বন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে একবাব তাকিয়েছিলেন। প্রায় পাঁচ জোড়া বন্দুকেব নল ঘরের দিকে তাক করে আছে। হাসি পেয়েছিল। এদেব হাতেই দেশের রাষ্ট্র কাঠামো টিকে আছে। আর পুলিসের রাইফেলের এই কাঁপুনি দেখেও দেয়ালে দেয়ালে লেখা হচ্ছে বন্দুকের নলই শক্তিব উৎস। অমিয়া দেবী ভাবছিলেন, যে মানুষগুলি মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে মানুষের ভাবনাতেই এই ভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে তারা কেন মানুষের শক্তির উপর ভরসা না রেখে বন্দুককেই শক্তির উৎস বলে আঁকড়ে ধরেছে? পুলিস অফিসারটির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, দরজা খুললেই ঘব থেকে ইঁদুব বেরিয়ে আসতে পারে। দেখবেন ইঁদুর মারতে আবার আমাকেই গুলি করে বসবেন না।

শিকলটা খুলে দিলেন। বাইরে সুইচ অন করতে গিয়ে দেখলেন ভিতবেব বাল্বটা ফিউজ হয়ে আছে। অফিসারটিকে বলেছিলেন, একটা টর্চ দিন। ঘরে আলো নেই।

একজন কনেস্টবল অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে অমিয়া দেবীর হাতে একটা পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ তুলে দিয়েছিল। আস্তে আস্তে দরজার কপাটটা খুলে দিলেন অমিয়া দেবী। ভিতরে একটা হুটোপুটির শব্দ উঠেই থেমে গেল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন রাইফেলেব মুখ গুলি তার দিকেই তাক করে আছে।

আমার পেছনে আসুন, ইনসপেক্টর। অমিয়া দেবীর ডাকে অফিসাবটি যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছিলেন। এক হাতে রিভলভার অপর হাতে টর্চ নিয়ে ঘবেব ভিতব অমিযা দেবীব ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মেরেছিলেন।

এতগুলি বুটেব আওযাজ ইঁদুবেব পরিবাবে নিশ্চয়ই বিবক্তির কারণ ঘটিযেছিল। কয়েক জন অসময়ের অতিথিদের দেখতে বেরিয়ে এসে অচেনা মুখ দেখেই বোধ হয় নিজেদেব দ্রুত লুকিয়ে ফেলেছিল।

পুলিশ অফিসারটি এবার অমিয়া দেবীকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিযে ছোটোঘবটাব নানা ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের মধ্যে টর্চের জোরালো আলো ফেলে দেখতে শুরু করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চোখে মুখে একটা হতাশার ছাপ।

স্যরি, আমাদের কাছে কিন্তু খবর ছিল তমাল এখানে এসেছে।

আমি ওর মা। আমার কাছে তো আসবেই।

ও এখন কোথায় আছে।

আমি জানি না। তবে এও জানি না, আপনারা কেন ওকে খুঁজতে এসেছেন।

সে কি? আপনার ছেলে যে উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত সে কথা তো আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

তমাল উগ্রপন্থী রাজনীতি করতে পারে বলে বিশ্বাস করি না।

কেন?

উগ্রপন্থী রাজনীতি বলতে আপনারা যা বলতে চাইছেন তা করতে গেলে যে মনবল, উদারতা ও আত্মত্যাগের মানসিকতার প্রয়োজন হয় তা আমার ছেলের নেই।

আপনি কি বলতে চাইছেন? অফিসারটির মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

আমি কিন্তু খুব সরল বাংলায় কথাটা বলেছি।

আপনি আমার উপর রেগে আছেন। আমি চাকরি করি। হুকুম তামিল করতে এসেছি মাত্র।

—আমি তো আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। শুধু বলতে চেয়েছি আমার ছেলের যে যোগ্যতা নেই, সেই যোগ্যতা আপনারা তাকে দিতে চাইছেন।

—আপনিও কি উগ্রপন্থী রাজনীতি করেন?

হাসি পেয়েছিল অমিয়া দেবীর। ভিজে কাপড় গায়ে বেশ শীত শীত করছিল। বলেছিলেন, সে সাহস বা যোগ্যতা আমার নেই। তারপরই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চা খাবেন? সবাই বৃষ্টিতে ভিজেছেন। আমি আপনাদের চা খাওয়াতে পারি।

চা খাওযাবেন? আপনি? মানে আমাদের পুলিস—কে? অফিসারটি তার বিস্ময়কে চেপে রাখতে পারেন নি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি মা। চা খাওয়াব আমার মত কোনো মায়ের ছেলেকে। পুলিসকে নয়।

অফিসারটি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে বলেছিলেন, আজ থাক আর একদিন আসব। তবে সেদিন সরকারি পোশাক পরে নয়। আপনার সাথে আমার দেখা না হলেও আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

টুপিটা আবার মাথায় চাপিয়ে ভারী বর্ষাতির কলারটি ঘাড়ের উপর তুলে দিয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গিয়েছিলেন। পুলিশের জীপটা স্টার্ট করে চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ব্যাক করে আসতে দেখে অমিযা দেবী ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। জীপটা বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়াতেই সেই অফিসারটি নেমে এসেছিলেন।

অমিযা দেবী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি ব্যাপার? আরো দেখার বাকি আছে নাকি?

অফিসারটি দুটো একশ টাকার নোট অমিয়া দেবীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এর জন্য আমি লজ্জিত।

টাকাটা যন্ত্রচালিতের মতন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অমিয়া দেবী। দেখছিলেন জীপের লাল ব্যাকলাইটটা কেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

[১০]

তুই মা, না পাষাণি? নিভাদির কথায় চমক ভেঙেছিল অমিয়া দেবীর।

—তুই আবার আমার উপর ক্ষেপে গেলি কেন?

—ক্ষেপব না। তুই যেভাবে ঐ ঘরের দরজাটা খুলে দিলি, এখানে যদি খোকা সত্যিই লুকিয়ে থাকত তবে তো ওরা ওকে মেরে ফেলত।

—নিভাদি, তুই সেই বোকাই থেকে গেলি। আমি জানতাম ও ঐ ঘরে নেই।

জানতিস?

জানতাম। তবে ও যদি সত্যিই ওখানে থাকত তবে ওকে আমি নিজেই পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিতাম।

কি বলছিস তুই? পুলিসের হাতে নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দিতিস?

হ্যাঁ, দিতাম।

ওরা খোকাকে মেরে ফেলত।

হয়ত ও পুলিসের হাতে মারা যেত। কিন্তু ও যে দলে গেছে সেই দলটা বেঁচে যেত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অমিয়া দেবী আবার বলতে শুরু করেছিলেন, নিভাদি, তুই বুঝবি না, তমালকে আমি সবার কাছে মানুষের মতো মানব করতে চেয়েছিলাম। হয়তো আমার পথটা ভুল ছিল। কিন্তু ও তার শোধ যে এমন ভাবে নেবে তা যে আমি বুঝতে পারিনি-রে, নিভাদি।

আমি তোর কথা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

তুই বুঝতে পারবি না নিভাদি। অমিয়া দেবীর কথাগুলি হাহাকারের মতন শোনায়। ও যে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকল। শুধু নিতে শিখল, দিতে জানল না। তাই বলছি, ও যদি সত্যি সত্যিই কোনো দলে ঢুকে থাকে, তবে ও দলকে কিছু দিতে ঢোকেনি। ঢুকেছে ঝোঁকের মাথায়। পুলিসের হাতে পড়লে দলের সব গোপন কথা ফাঁস করে দেবে।

গ্রাম্য নিরক্ষর নিভাদি অমিয়া দেবীর কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারেনি। তবে তার হৃদয়ের বেদনাকে অনুভব করতে পেরেছিল। তাই অমিয়া দেবীর পিঠে হাত রেখে বলেছিল, খুকি ঘরে চল। কাপড় ছেড়ে বোস। আমি বিছানাটা ঠিক করে তোর জন্য চা করে আনি।

কাপড় ছেড়ে বিছানার উপর গা ছেড়ে দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। মনটা আবার উড়ে গিয়েছিল সেদিনের ঘটনার উপর।

বি. ই. কলেজের ছাত্রদের সাথে অন্য এক কলেজের মারামারির খবর শুনে সেদিনের সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন অমিয়া দেবী। বাবা বা দাদার কাছে যোন করেন নি, পাছে তারাও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্টেশনে নেমেই সোজা হাজির হয়েছিলেন বি ই কলেজে। বুলবুল চণ্ডিতে বসেই খবর পেয়েছিলেন খেলার মাঠে গোলমালে দুপক্ষই হকি স্টিক, লাঠি, পাথর এমন কী বোমা ও সোডার বোতল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিল। উভয় পক্ষেরই আহতের সংখ্যা অনেক।

সারা রাস্তা দুশ্চিন্তার পাথর বুকে নিয়ে এসেছিলেন অমিয়া দেবী। মনে মনে কল্পনা করেছিলেন তমালের আহত চেহারাকে। মাথায় ব্যান্ডেজ, নয়তো হাতে বা পায়ে প্লাস্টার। হয়তো হাসপাতালে স্যালাইন চলছে।

কলেজের প্রিন্সিপাল অমিয়া দেবীর পরিচিত। এক সময় বাবার সহকর্মী ছিলেন। তার ঘরে ঢুকতেই তিনি বলেছিলেন, এসো অমিয়া। গোলমালের খবর তোমার কাছে পৌঁছে গেছে?

তমালের ভাবনায় অমিয়া দেবীর কণ্ঠস্বর বসে গেছে। কোনো মতে বলতে পেরেছিলেন, তমাল? ও কোথায় আছে?

প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, তমালের কিছু হয়নি। ও তো তোমাদের বাড়িতে চলে গেছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি স্টেশন থেকে নেমে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি.

আমি তোমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারি অমিয়া। তারপর গলা নামিয়ে বলেছিলেন, গোলমালটা কিন্তু ওকে নিয়েই। ও অন্য কলেজের কোন এক ছেলেকে প্রথমে মেরেছিল। সেখানে ঐ কলেজের ছেলেরাই ছিল দলে ভারী। ওকে ঘিরে ফেলেছিল। ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমার কলেজের দুটো ছেলে যখন ঐ দলের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মার খাচ্ছিল তখন ও বুদ্ধি করে ওখান থেকে পালিয়ে এসে কলেজের ছেলেদের খবর দিলে এরা হৈ হৈ করে ছুটে গিয়ে মারামারিকে এই কুরুক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। তবে তোমার ছেলে খুব চালাক। ও সোজা একটা নার্সিং হোমে গিয়ে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে বলে ভর্তি হয়ে তার সার্টিফিকেট এনে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে মারামারির সময় ও মাঠেই ছিল না। সে সময় নার্সিং হোমে ওর চিকিৎসা চলছিল।

বাড়িতে এসেই অমিয়া দেবী দেখতে পেয়েছিলেন তমাল চিত হয়ে শুয়ে থমাস ও হ্যারিসের 'আই অ্যাম ওকে ইউ আর ওকে' বইটা পড়ছে।

তমাল—।

মার ডাকে বইটা হাতে রেখে উঠে পড়েছিল তমাল। অবাক হয়ে বলেছিল, মা, তুমি? কখন এলে?

এই মাত্র, তোমার গুণ্ডামির খবর শুনে।

আমি আবার কোথায় গুণ্ডামি করলাম?

কেন? মারামারি তো তোকে নিয়েই।

এই মরেছে। তমাল টান টান হয়ে বসে বলেছিল, এসব খবর তোমাকে আবার কে বলেছে?

ঘরের শিলিং ফ্যানটা ফুল স্পীডে ঘুরে চলেছিল। কার্তিক মাসের শেষ বেলা। কেমন একটা শীত শীত করছিল অমিয়া দেবীর। স্পীড কমাতে রেগুলেটারটা ঘোরাতে চাইলেন। রেগুলেটারটা ঘুরলেও স্পীডটা কিন্তু কমল না। অথচ ফ্যানটা অফ করাও যাচ্ছে না। তাহলে গরম লাগে।

বিছানার ধারে বসে তমালকে বলেছিলেন, এত ছেলে মার খেল তোর জন্য আর তুই দিব্যি মজা করে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিস?

হেসেছিল তমাল। কৃতিত্বের হাসি, বলেছি—অভিমন্যু হওয়া কোনো ক্রেডিট নয়। লড়াইতে নেমে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, সেটা বোকামি। তাই সুযোগ পেয়েই পালিয়েছি। আমার বন্ধুরা বোকা তাই বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মার খেয়ে আমার উপর দায় চাপাতে চাইছে। তবে মারামারিটা এক তরফা হয়নি। বরং ওদের তরফেই আহত হয়েছে বেশি।

ছেলের কথায় চমৎকৃত হয়েছিলেন, অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এখন যদি তোকে একা পেয়ে ওরা মারধর করে, তোর বন্ধুরা তো আর তোকে বাঁচাতে আসবে না।

না, মা। সেদিকটাও ম্যানেজ করে ফেলেছি।

সেটা আবার কি করে করলি?

ওদের কলেজ ইউনিয়ানের জেনারেল সেক্রেটারির বাবা, মামার ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক, সামনেই ইউ. ডি. সি. হবে। মামাই তাকে দিয়ে তার ছেলেকে ডেকে এনে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি গোলমালের সময় আমি অ্যাপেন্ডিসসাইটিসের ব্যথায় নার্সিং হোমে ছিলাম। এখন তো ও আমায় দু-বেলা খোঁজ নেয়। ওর বাবার প্রমোশনটা মামার হাতে।

বেশ করেছিস। আর এই সব গোলমালের মধ্যে নিজেকে জড়াস না।

সেদিন কিন্তু অমিয়া দেবী অক্ষত তমালকে দেখে কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা মনের কোনায় অনুভব করেছিলেন। নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি মা, ছেলের সুস্থ চেহারা তাকে কেন আনন্দ দিতে পারছে না? অথচ তিনি তো সারা রাস্তা পুত্রকে সুস্থ দেখার কামনা নিয়ে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। সারা রাত দুটি চোখের পাতা একবারের জন্যও এক করতে পারেন নি। সেদিন কেন বার বার সুস্থ তমালকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি এই তমালকে দেখতে চান নি? তমাল যদি নিজেকে বাঁচাতে এইভাবে সুযোগ-সন্ধানী না হয়ে অন্য সব সহপাঠীদের সাথে হাসপাতালে যন্ত্রণায় ছটফট করত তবে কেন স্বস্তি পেতেন বলে মনে হয়েছিল? মা হয়ে পুত্রের এই অনিষ্ট কামনা কি তার মনের কোনো বিকৃত ভাবনা? অমিয়া দেবী সেই প্রশ্নের মীমাংসায় বহুদিন বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছেন।

যখন শিলিগুড়িতে ছিলেন তখন ও এরকম প্রশ্ন তার মনে বার বার ঘুরে এসেছে। অবশ্য তা তমালকে নিয়ে নয়। সেই সত্তর দশকের তপ্ত দিনগুলি তাকে নানা প্রশ্নের আবর্তে ঠেলে দিয়েছিল।

নক্সালবাড়ির স্ফুলিঙ্গ কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ যেন ঘুম ভাঙার ডাক। এই দুর্গন্ধময় সমাজ জীবনের আবর্জনাকে পুড়িয়ে দিয়ে এক নতুন সমাজ গড়ার আমন্ত্রণ। অমিয়া দেবীর মনেও সেই বিপ্লবের উষ্ণ উত্তাপ যে স্পর্শ করেনি তা নয়। গুটি গুটি পায়ে সমাবেশের এক কোণে দাঁড়াতেন। গতানুগতিক চর্বিত বাক্যের ভিড়ে তাদের কথাগুলি শুনে একটা শিহরণ অনুভব করতেন। নিজের ছাত্রজীবনে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেখানে ভালোলাগার মতন কিছু খুঁজে পান নি। কিন্তু নক্সালবাড়ির স্ফুলিঙ্গের উত্তাপে গনগনে এই মুখগুলির দিকে তাকিয়ে তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের একটা উন্মাদনার খোঁজ পেতেন। যে ছেলেগুলো নিজের আত্মসুখের প্রাসাদের সন্ধান না করে নতুন সমাজ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে রাস্তার ধুলোকে চিনতে নেমেছে তাঁদের প্রতি একটা চাপা মমতা অনুভব করতেন। এদের মিছিলের মাঝে তমালের মুখকে খুঁজতে চাইতেন। কিন্তু কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির ভূলুণ্ঠিত মস্তকের খবর শুনে সেখানে ছুটে এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাক্ষরতা সমিতির আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিদ্যাসাগরের এই মূর্তিতে মাল্যদান করে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। অসীম দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করে এক গ্রাম্য বালক কিভাবে বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন সে কথা ভাবতে ভাবতে তার পাদদেশে পরম শ্রদ্ধায় মালা রেখেছেন। ভারতীয় মেয়েদের প্রতি যার এত মমতা, তাদের দুঃখে যার হৃদয় আর্দ্র হয়ে পড়ে, সেই বেঁটে-খাটো মানুষটা সে যুগেই ইংরেজ প্রভুর নাকের ডগায় কোন দুর্জয় সাহসে নিজের পায়ের চটিজুতা নাচাতে পারতেন, সে কথা ভেবে তার মূর্তিতে প্রণাম করতেন। যিনি বাংলার মেয়েদের হাতে অক্ষর তুলে দিতে চেয়েছিলেন, যিনি সেই সময়কার বদ্ধ সামাজিক পরিবেশে বিধবা বিবাহের মত বৈপ্লবিক কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করতে পারেন, তার মস্তক আজ মাটিতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ভগ্নমূর্তির পাদদেশে হাঁটুমুড়ে বসেছিলেন অমিয়া দেবী। মনে মনে বলেছিলেন, তুমি তোমার অপরাধের শাস্তিই পেয়েছ বিদ্যাসাগর। তোমার যে জ্ঞানের পরিধি তাতে তো তুমি শকুন্তলা মহাকাব্যের মতন মহাকাব্য রচনা করতে পারতে। তা না করে তুমি নিরক্ষর মানুষের জন্য রচনা করলে বর্ণপরিচয়। তাই তোমার হাত ধরে যারা পৃথিবীটাকে চিনতে পেরেছে তারাই তোমার মস্তক চূর্ণ করে তোমার এত বড় আত্মত্যাগের প্রতিদান দিল।

মনের মধ্যে একটা ভারী পাথরের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। বার বার মনে হচ্ছিল তার চেনা সেই মিছিলের মুখগুলি কোনোভাবেই এ কাজ করতে পারে না। তারা যে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার শপথ গ্রহণ করেছে। তারজন্যই তো প্রয়োজন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়। নিরন্ন আর নিরক্ষর, সেটাই গ্রাম বাংলার ছবি, অন্নের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন অক্ষরের হাতিয়ার। মাও সে তুং লংমার্চের মিছিলে এক হাতে নিয়েছিলেন রাইফেল অপর হাতে অক্ষর পরিচয়ের পৃষ্ঠা। বাঁচাটা হবে বাঁচার মতন। দেখাটা শুধু চোখের দেখা নয়, অক্ষর জ্ঞানের আলোতেও দেখা। বার বার মনে হয়েছিল হো-চি-মিনের কথা। নির্দেশ দিয়েছিলেন সামনের মুক্তি যোদ্ধাদের পিঠে অক্ষরের পাতা ঝুলিয়ে দিতেন যাতে পিছনের মুক্তি যোদ্ধাটি বারুদের গন্ধের মধ্যেও নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত হতে পারে।

অমিয়া দেবীর মনে হয়েছিল তার চেনা মিছিলের হাত একাজ করতে পারে না। যারা গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার স্বপ্নে মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করতে পারে, তারা কখনো বীরসিংহের মতন এক অজ পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্রের এই নগর বিজয়কে খাটো করতে পারে না। কেমন একটা অজানা আশঙ্কা তাকে ঘিরে ধরেছিল। তবে কি সেই সৃষ্টির মিছিলে আত্মসর্বস্ব ধারণা সিঁধেল চোরের মতন সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছে?

উত্তরবঙ্গের বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ যখন একের পর এক গোপিবল্লভপুর, শ্রীকাকুলাম সৃষ্টি করে চলেছিল তখন আবার বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুরেব দেয়ালে যাবা কৃষি বিপ্লবের দেয়াল লিখন লিখে সেই উত্তাপে বিপ্লবী বিলাসিতার আমেজ উপভোগ কবতে চেয়েছিল, তারাই যে ধীবে ধীরে মিছিলের পাল্লা ভাবী কবছিল তা বুঝতে পেরেছিলেন বুলবুল চণ্ডিতে গিয়ে।

একদিন মালদা থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ডি আই অফিস থেকে ছাড়া পেতেই বেলা বয়ে গিয়েছিল। গ্রামের সন্ধ্যা। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। সঙ্গে কানাই। তাই ভেবেছিলেন বাড়িতে যাবার আগে স্কুল থেকে বাজেটের ফাইলটা নিয়ে এলে রাত্রিব মধ্যেই বাকি কাজগুলি সেরে রাখবেন যাতে কাল ভোরেই বড়বাবুকে দিয়ে মালদায় ডি. আই-এর কাছে ফাইলটা পাঠিয়ে দিতে পাববেন। অনেক লেখালেখির পব স্কুলের বিল্ডিং-এর প্ল্যান ডি. আই. অফিসে এসেছে। লাল ফিতাব ফাঁস এড়াতে কালকের মধ্যেই ফাইলটা পাঠিযে দেওযা দরকাব। স্কুলে ঢুকতেই দেখতে পেয়েছিলেন, স্কুলের বাবান্দার দেয়ালে গুটি কযেক ছেলে লিখে চলেছে "বুর্জোযা শিক্ষা ব্যবস্থা পুড়িয়ে ফেলার আহ্বানে দিকে দিকে বুর্জোযা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পোড়ানো অভিযানে সামিল হও"। তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন তারই স্কুলেব অঙ্কের শিক্ষক কৃযাণ বাবু। তাকে দেখেই কৃযাণ বাবু আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। অফিস ঘব থেকে ফাইলটা নিঃশব্দে নিযে চলে এসেছিলেন অমিয়া দেবী। গভীব রাত্রিতে আগুন আগুন চীৎকাবে ঘরের বাইবে এসে দেখতে পেয়েছিলেন তার স্কুলেই আগুন জ্বলছে। কানাইকে নিযে যখন স্কুলের গেটে পৌঁছেছিলেন, তাব আগেই গ্রামেব লোকজন এসে পড়েছিল। যে যা পাবছে তাই দিয়েই জল ঢালছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কেমিস্ট্রির ছোটো ল্যাববেটবি ঘব সহ মেযেদেব কমন রুম ও অফিস ঘরটা একদম পুড়ে গেছে। গত বছরই বাইটার্সে দৌড়াদৌড়ি কবে স্কুলেব বিজ্ঞান বিভাগের অনুমোদন পেয়েছিলেন। ল্যাবরেটরির জন্য যে টাকা পেয়েছিলেন তাতে ঘবেব জন্য কোনো ববাদ্দ ছিল না। ছোটো গ্রাম। তবু বাড়ি বাড়ি গিযে ল্যাববেটবি ঘবেব জন্য টাকা উঠিয়েছিলেন।

সেদিন আর বাড়িতে ফিরে আসেন নি অমিযা দেবী। যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা বুলবুল চণ্ডিতে থাকেন তাবা সবাই স্কুলে চলে এসেছিল। ছাত্রীদেব অনেকেই তাদের অভিভাবকের সাথে ভিড় করেছিল। শুধু কৃযাণ বাবুই উপস্থিত ছিলেন না। দুদিন বাদে স্কুলে এসেছিলেন কৃষাণ বাবু। বিশ্ববিদ্যালযের কৃতি ছাত্র। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। এক সময় সি. পি. এম.-এরই সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এখন নক্সাল-পন্থী। ব্যক্তি হিসাবে অত্যন্ত ভদ্র। জনপ্রিয় শিক্ষক বলে নাম করেছেন। পড়ানও ভাল। তার কাছে প্রচুর ছাত্র পড়তেও আসে। তাদের মধ্যে অনেককে বিনা পয়সাতেও পড়ান।

অমিয়া দেবী কৃষাণ বাবুকে একান্তে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, আচ্ছা কৃযাণ বাবু, এই স্কুলটা পুড়িয়ে কি লাভ হল বলুন তো?

কৃযাণ বাবু বলেছিলেন, আমি নক্সালবাড়ি রাজনীতি করি, তাই লুকোবার কিছু নেই। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা এভাবেই উচ্ছেদ করতে চাই।

কিন্তু কৃষাণ বাবু আপনি তো এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পেরেছেন। আমি শুনেছি আপনি অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। এম. এস. সি-তেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। রিসার্চ স্কলারও ছিলেন। আপনি কিন্তু আপনার বুর্জোয়া ডিগ্রিটা পোড়ান নি, এমন কী যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়তেন সেই ইউনিভার্সিটির ছাত্র-সংসদ আপনাদের দখলে থাকলেও আপনারা ইউনিভার্সিটি থেকে দলে দলে বেরিযে আসেন নি। বরং পরীক্ষা দিয়েছেন, ডিগ্রি নিয়েছেন।

কৃষাণ বাবু উত্তেজিত হন না। শান্তভাবেই কথা বলেন। তিনি বলেছিলেন, আপনি সংশোধনবাদীদের কথাগুলিকেই মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। সারা দেশ যে বিপ্লবের গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করছে সেই পরম সত্যটি আপনারা দেখেও না দেখার ভান করছেন। একথা সত্যি আমরা বুর্জোয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছি। সেইজন্য এই বুর্জোয়া শিক্ষাযন্ত্রের চাকাকে যদি সচল রাখতে হয় তবে তো ইংরেজ আমলে ইংরেজের নুন খেয়েছে বলে তখনকার মানুষদেরও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার কথা ছিল না।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি সংশোধনবাদী নই, নয়া সংশোধনবাদীও নই। কারণ আমি কোনো দিনই কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হইনি, বরং আপনাদের কথা শুনতে ভালো লাগল। তবে দ্বিচারিতা আমার ভালো লাগে না। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের একটা লেখা পড়ে খুব ভালো লেগেছিল। তিনি লিখেছিলেন পিকিং সফরে তার সাথে একটা মেয়ের দেখা হয়েছিল। সে চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর আহ্বানে গ্রামে গিয়েছিল। চেয়ারম্যান তাদের বলেছিলেন গ্রামে মশারি নিয়ে যাবেন না। এমনকী সাবানও নয়। কারণ গ্রামে এসবের চল নেই। তাই মশারির তলে ঘুমোলে বা গায়ে সাবান মাখলে গ্রামের মেয়েরা তাদের শহুরে শিক্ষিত মেয়ে বলে সহজে মিশতে চাইবে না। ফলে যে দূরত্ব রচিত হবে তাতে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সাথে গ্রামের মেয়েরা একাত্মবোধ করবে না।

কৃষাণ বাবু বলেছিলেন, আপনি কোন মণিকুন্তলা সেনের কথা বলছেন? জলি কলের স্ত্রী? জলি কলের বিরুদ্ধে দলের মধ্যেই তো অভিযোগ উঠেছিল।

অমিয়া দেবী জবাব দিয়েছিলেন, সে কথা আমার জানার কথা নয়। জানার কোনো কৌতূহল নেই। এটা আপনাদের চিরাচরিত ব্যাপার। আজকে যে বিপ্লবী, কালকে সে প্রতিবিপ্লবী। এগুলির মীমাংসার ভার আপনাদের। আমি শুধু বলতে চাইছি মাও সে তুং-এর সেই কথাগুলি। তবে মণিকুন্তলা সেন নিজে গ্রামে গিয়ে গ্রামের মেয়েদের সাথে মিশতে গায়ে সাবান দিতেন না, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতেন না। কারণ তিনি লক্ষ করেছিলেন, পুকুর পাড়ে যখন তিনি এসব ব্যবহার করতেন, তখন গ্রামের মেয়েরা তাকে অবাক হয়ে দেখত। তাই আমি বলতে চাই এই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিটা যে গড়ে উঠেছিল তার পেছনে ছিল ঐ সব মানুষদের আত্মত্যাগের থেকেও সাধারণ মানুষের ভাবনার সাথে একাত্মবোধ। তারা কিন্তু আপনাদের মতন জোর করে ভাবনাকে চাপাতে চান নি।

কৃষাণ বাবু বলেছিলেন, জল একশ ডিগ্রি উষ্ণতায় ফোটে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যখন তাকে প্রেসার কুকারে ফোটানো হয় তখন সেটা কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনা থাকে না। সামাজিক ভাবনা এই প্রেসার কুকারের মতন। বাইরের চাপ বৃদ্ধি করে সেই ভাবনার স্ফুরণকে দ্রুত ঘটানোর প্রক্রিয়াকেই বলে বিপ্লব। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা তো এর আগে মানুষকে এভাবে ভাবাতে পারেন নি। নক্সালবাড়ির ভাবনা আজ যেমন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এদেশে ভূমি সংস্কারের কথাগুলি কত বড় ধাপ্পা তেমনি সেই আগুনে এই বুর্জোয়া স্কুল যত পুড়বে ততই মানুষ এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফাঁকিকে ধরে ফেলবে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে আমার দুটি কথা আছে। প্রথমটি আপনারা যে ভাষায় কথা বলেন, যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে চান, তা এদেশের মানুষ কতখানি বুঝতে পারে? এই প্রসঙ্গে আমি যদি সেই মণিকুন্তলা সেনের একটা লেখার কথা উল্লেখ করি তাতে কি আপনি খুব বিরক্ত হবেন?

হেসে ফেলেছিলেন কৃষাণ বাবু। বলেছিলেন, ঐ মহিলা আপনার মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছেন দেখছি। বেশ, বলুন শুনি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, মণিকুন্তলা সেনের সাথে পরিচয় হয়েছিল লুৎ-সুই-এর সাথে। সে মাও-এর নির্দেশে গ্রামে গিয়েছিল, কৃষক মেয়েদের সংগঠিত করতে। একদিন বিকেলের রক্ত রঙীন সূর্যাস্ত দেখে ও বলে উঠেছিল, —বাঃ, কি চমৎকার লাল সূর্য। কৃষক মেয়েরা কোনো সাড়া দিল না। একটু বাদে একজন বলে উঠল কালকেও বৃষ্টি হবে না। ক্ষেত খামার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল। লুৎ-সুই বুঝেছিল, সৌন্দর্য উপভোগ কবার সময় এদের নেই। ওদের দুশ্চিন্তার ভাগ সেও কেন নিতে পারল না— সে কথা ভেবে খুব লজ্জা বোধ করেছিল।

কৃষাণ বাবু লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, বাঃ, একেবারে মোক্ষম জায়গাটাতে পৌঁছে গেছেন তো। আমরা সেই কথাই বলতে চাইছি। দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষই এই বুর্জোয়া শিক্ষার ভাষা বোঝে না। অথচ এর মাধ্যমে তারা এক তাঁবেদার শ্রেণী গড়ে তুলতে চাইছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আপনারা যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় মানুষকে এগুলি বোঝাতে চাইছেন, সেই ভাষা বোঝার ক্ষমতা কিন্তু এসব মানুষের নেই। তাই এরা আপনাদের শহুরে বাবু বলেই মনে করে। আর আপনারাও মধ্যবিত্ত সুলভ এক অহমিকায় এদের পরিত্রাতা বলে ভাবেন। ফলে ধৈর্যের পরিবর্তে বাহুবল দেখিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন।

কৃষাণ বাবু বলেছিলেন, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। মানুষের কাছে আরো সরল ভাষায় আমাদের লক্ষ ও পথকে উপস্থিত করা দরকার। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, না জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, অথবা সর্বহারা একনায়ক তন্ত্রের ব্যাখ্যা নিরন্ন-নিরক্ষর মানুষেব কাছে তাদের ভাষায় ব্যাখ্যা কবা কঠিন। তবু আপনাব মণিকুন্তলা সেনের লুৎ সুই-এব মতন অভিজ্ঞতায় তা আমরা অর্জন কবব এবাব আপনার দ্বিতীয় কথাটি বলুন।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কথাটি অপ্রিয। এতে আমি আপনাদের শ্রেণী শত্রুর তালিকার প্রথমদিকে জায়গা পেতে পারি। তবু না বলে পারছি না। কারণ আমার মনে হয়েছে আপনারা রাজনৈতিক দিক থেকে সততার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছেন না। এখানেও মধ্যবিত্ত সুলভ সুবিধাবাদ বেনোজলের মতোই ঢুকে পড়েছে।

কৃষাণ বাবু স্থির দৃষ্টিতে অমিয়া দেবীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। তবু বলছি, আপনি বোধ হয় শ্রদ্ধার মর্যাদা রাখতে পারছেন না। আমাদের অনেকে অনেক কথা বলে। কিন্তু আমাদের সততা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেনি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, সবাই তো কৃষাণ বাবু নন, আপনাদের সহকর্মীরা কি এইভাবে আমার মতন পার্টির বহির্ভূত এক মানুষকে এইভাবে কথা বলার সুযোগ দেয়? বলুন তো কৃষাণ বাবু মালদা শহরের দুটো বৃহত্তম স্কুলে কেন আঁচড় পড়ে না? সেখানে তো পড়ে শহরেব তাবড় তাবড় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছেলে-মেয়েরা। আব বুলবুল চণ্ডির ভিক্ষে করে গড়া এই স্কুলটাতে কেন আগুন লাগান হল? এখানে যারা পড়ে তাবা সব গ্রামের কৃষকের ঘরের ছেলে-মেয়ে বলে?

কৃষাণ বাবু বলেছিলেন, সেগুলিও রক্ষা পাবে না।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, না, কৃষাণ বাবু, তাদের গায়ে একফোঁটা আঁচড় লাগবে না। যেমন লাগে না প্রেসিডেন্সি, স্কটিশ, লেডি ব্রেবন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মতন অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েদের গর্বের প্রতিষ্ঠান গুলিতে। সেখান থেকে তো আপনারা সবাই বেরিয়ে আসেন নি। অথচ দেখুন গান্ধীর ডাকে দলে দলে মানুষ ইংরেজের স্কুল, কলেজ, আদালত থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

কৃষাণ বাবু বলেছিলেন, আপনি কিন্তু আপনাদের দ্বিতীয় কথাটা পরিষ্কার করে বলেন নি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, সেটাই তো বলতে চাইছি। কদিন আগে মালদায় দেখলাম আপনাদের এক ছাত্র মিছিলে বুর্জোয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে ফেলার আহ্বান জানান হচ্ছে। সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে আপনাদের সর্বভারতীয় নেতার কন্যা। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন? সেই নেতার কন্যা যে স্কুলে পড়ে সে স্কুলের নাম ডাক সারা জেলা জুড়ে। পড়ে শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের কন্যারা। সেখানে কিন্তু স্কুল পোড়ানোর ধ্বণী একবারের জন্যও উচ্চারিত হয় নি। আরো মজার কথা হচ্ছে, আপনাদের যে নেতার কন্যা বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুড়িয়ে ফেলার মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সে যে ডাক্তারি পড়ার জন্য বাড়িতে প্রাইভেট টিউটারের কাছে নিজেকে গভীর মনোযোগের সাথে প্রস্তুত করে চলেছে, সে খবর কিন্তু আপনাদের দলের সদস্যদের কাছে অজানা নয়। আর শহরের নামী স্কুলের গায়ে যে হাত পড়বে না তার প্রমাণ আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন সেই স্কুলে আপনার নেতার পুত্র পড়ে কিনা। আমি নিজে দেখেছি আপনারা যখন শহরের অন্য ভাঙাচোরা স্কুলগুলিকে পুড়িয়ে চলেছেন, বুর্জোয়া পরীক্ষা জোর করে ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন, তখন আপনার নেতার ছেলে সেই নামী স্কুলে নির্বিবাদে পরীক্ষা দিচ্ছে। আর সেই স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে কোনো গোলমাল না হয় তার জন্য স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই নেতার স্ত্রী।

কৃষাণ বাবু বলেছিলেন, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি না। তবে আমি নিশ্চয়ই খোঁজ করব। যদি এগুলি সত্যি হয়, তবে দলে আলোচনার দাবি করব।

। ১১ ।

বৃষ্টিটা শেষ রাতেই ছেড়ে গিয়েছিল। সারা রাত জেগে বসেছিলেন অমিয়া দেবী। সঙ্গে নিভাদিও। পুলিশের জীপটা অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু বুটের শব্দগুলি যেন তখনও তার কানে বেজে চলেছিল।

নিভাদি কখন যে চা করে এনেছিল টের পাননি। তার কথায় চমক ভেঙেছিল।

চা টা গরম গরম খেয়ে নেও। শরীরটা হাল্কা হয়ে যাবে।

সত্যি সারা শরীরটা ব্যথা ও ক্লান্তিতে টন টন করছিল অমিয়া দেবীর। মাথাটা মনে হয়েছিল কয়েক টন ওজন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চায়ের স্বাদ যে এত মধুর হতে পারে তা এর আগে কোনো দিন বোঝেন নি। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দেখেছিলেন নিভাদি তার মুখের দিকে একটা গভীর মমতা মাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। নিভাদির কথা ভেবে অমিয়া দেবীর মনটা আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। কি পেল এই মহিলা তার সারা জীবনে? হতে পারে সে সমাজের এক দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে তাদের মতন এক পরিচ্ছন্ন পরিবারে আশ্রয় পেয়েছে, হতে পারে সে কুৎসিত। কিন্তু সে নারী। রক্ত-মাংসের গড়া শরীরের চাহিদা তো আর সাধারণ নারী থেকে পৃথক হতে পারে না। কিন্তু অসামান্য আত্মসংযমের বাঁধনে নিজের জীবনের মধ্য-গগন পার করে দিল। দুবেলা দুটো আহার, মাথার উপর একটা নিরাপদ আশ্রয়, এতেই সে দুহাত ভরে সেবা করে গেল। নিভাদিই তো এ যুগের দধিচী।

ছেলেটির একবার খোঁজ নিবি তো? নিভাদির কথায় আবার নিজের জগতে ফিরে এসেছিলেন। অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এত বড় ছেলে নিজের থেকে হারালে কোথায় খুঁজতে যাব?

পুলিস আসার আগে তো ও ওর ঘরেই ছিল।

সে তো আমিও জানি, ও পুলিশস আসার অনেক আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

একবার ঐ বাড়িতে খোঁজ করলে পারতিস।

ঐ বাড়ি মানে বসুন্ধরার বাড়ি। এই কথাটা তার মাথায় একবারের জন্যও আসেনি। ওর ওখানেই তার যাওয়া প্রয়োজন। এই যেতে চাওয়ার পেছনে তমালের খোঁজ পাবার একটা তাগিদ তো ছিলই, এছাড়াও ছিল বসুন্ধরার সম্পর্কে কেমন একটা অজানা আশঙ্কা। পুলিশ যদি তমালকে বসুন্ধরার ওখানে খুঁজে পায় তবে বসুন্ধরাই যে পুলিসের জেরার কেন্দ্র-বিন্দু হবে। আর তা যদি হয় তবে তা গণতন্ত্রের প্রহরীদের সামনে শালীনতার আব্রুকে কতখানি ধরে রাখতে পারবে সে আশঙ্কায় তার মন দুরু দুরু করে উঠেছিল। অর্চনা গুহ, অসীমা পোদ্দারের সাথে বসুন্ধরার নামটিও যুক্ত হবার সম্ভাবনার কথা ভেবে মনটা অস্থির হয়ে পড়েছিল।

জানালা থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিতেই দেখতে পেলেন পুবের কোণে লাল আভা। নতুন দিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বেরোবার জন্য তৈরি হতে হতে মনে করার চেষ্টা করেছিলেন, কয়েক ঘন্টা আগেই এখানে যে ঘটনা ঘটে গেছে। ভাবছিলেন, কী আশ্চর্য কালের গতি। বর্তমান বলে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই, যা কিছু ঘটছে তা মুহূর্তের মধ্যে অতীত হয়ে যাচ্ছে। আর যা কিছু ভাবনা তাতো সব অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে। তাহলে বর্তমান কোনটি? এ প্রশ্নের জবাব পেলে বোধ হয় অনেক কিছুর হিসেব সুবিধা হয়ে যেত। কালের এই সূক্ষ্ম হিসাবে যদি বর্তমানকে বাতিল করা যেত তাহলে হয়তো মানুষের জীবনে অনেক ঘটনাকেই এড়ানো যেত। কারণ যা কিছু ঘটছে তা ঘটার মুহূর্তের মধ্যেই কাল প্রবাহের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কালাধারে সঞ্চিত হয়ে চলেছে। অথচ কালের এই ব্যাকরণ বুঝতে পারি না বলেই অতীত বার বার মরীচিকার মতন বর্তমানের অনুভূতিকেই ঘা দেয়। যে কারণেই গত রাতের ঘটনা যেন অমিয়া দেবীকে এক অস্থির ভাবনার দোলায় দোলাতে থাকে।

দূরে কোথায় কাকের ডাকে চমক ভাঙে অমিয়া দেবীর। বোঝেন ভোর হয়েছে। শুরু হবে কাকের ঝাড়ুদারী। আশ্চর্য পাখি বটে। মানুষের ঘৃণা আর অবজ্ঞা নিয়ে মানুষের আঙিনাতেই ঘোরা-ফেরা করবে। পরিষ্কার করে রাখে তাদের হাঁটার পথকে।

কাপড়টাকে ছাড়ার দরকার আছে বলে মনে হল না। চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরোতে যাবার মুখে নিভাদি চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, খোকা যদি আসে?

দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন অমিয়া দেবী। বলেছিলেন—ওকে বলিস, ওর চলার পথে আমি বাঁধা দেব না। তবে ও যেন নিজের গা বাঁচাতে সহযোদ্ধাদের একা ফেলে পালিয়ে না যায়।

অমিয়া দেবীর কোয়ার্টার্স থেকে বসুন্ধরাদের বাড়ি মিনিট বিশেকের হাঁটা পথ। কালকের ঝড়ো হাওয়ার দাপট যে কতখানি ছিল রাস্তায় এসে বুঝতে পেরেছিলেন। বহু জায়গায় জল জমে গেছে। সারা রাস্তা জুড়ে ভাঙা ডাল আর গাছের পাতা ছড়িয়ে আছে। কিছুটা যেতেই দেখতে পেয়েছিলেন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শিমুল গাছটার গুঁড়ি উপড়ে রাস্তা বরাবর পড়ে আছে। তখনও তার লাল রক্ত রাঙা ফুলগুলি উজ্জ্বল বর্ণছটার দ্যুতি নিয়ে সারা রাস্তাকে লাল সবুজের আলপনায় ঢেকে রেখেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই শিমুল গাছটার পাশ দিয়েই স্কুলে যেতেন। এই গাছটার বয়স কত কেউ জানে না। স্বর্ণপ্রভার কাছে শুনেছিলেন, তিনি এই বাড়িতে গৃহবধূ হয়ে আশার সময়ও দেখেছিলেন সে তার লাল ওড়না উড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার মনে পড়ে সেই দিনগুলির কথা। স্বর্ণপ্রভা বিকেল বেলায় খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। অপেক্ষা করতেন অমিয়া দেবীর জন্য। তিনি এলে তবে বিকালের জলখাবার তৈরি হতো। স্বর্ণপ্রভা অবশ্য বিকেলে এক গ্লাস শরবত ছাড়া আর কিছুই খেতেন

না। তবে বসুন্ধরাকে পাশে বসিয়ে তাকে নিজের হাতে না খাইয়ে ছাড়তেন না। স্বর্ণপ্রভার পাশে বসে অমিয়া দেবী শিমুল গাছের মাথাটার দিকে অনেক দিন তাকিয়ে থেকেছেন। গোধূলির সূর্যাস্তের রক্তিম আভার সাথে এর লাল ফুলের চাদর যে কাব্যিক মঞ্জুষা রচনা করত তা অপলক দৃষ্টিতে পান করতেন। মাঝে মধ্যেই তার বীজ সাদা প্রজাপতির মতন উড়ে এসে তার কোলে পড়ত। ভাবতেন এই গাছটাও তার মাতৃত্বের অহমিকায় সৃষ্টির বীজকে সারা পৃথিবী-ময় ছড়িয়ে দিতে চাইছে। কোল থেকে শিমুল বীজের ডানাটাকে পরম মমতায় ধরে এনে আবার হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতেন যাতে মাটির বুকে নতুন প্রজন্মের চিহ্ন রেখে যেতে পারে।

অমিয়া দেবীর মৌনতা ভেঙে যেত স্বর্ণপ্রভার ডাকে, কী দেখছিস এত তন্ময় হয়ে?

শিমুল গাছটাকে। ও যেন বিয়ের চেলি গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বর্ণপ্রভার দীর্ঘশ্বাস শুনে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি তার মনের গহনে কোন ক্ষত স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছেন। তাই প্রসঙ্গ ঘোরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে স্বর্ণপ্রভার জিজ্ঞাসা ভেসে এসেছিল। এই গাছটাকে তুই এত ভালোবাসিস কেন বলত?

ব্যক্তিত্ব যখন সৌন্দর্যের দুর্লভ আভরনে সজ্জিত তার দ্যুতি মনকে কী ভাবে মোহিত করে সেটা এর আগে এভাবে বুঝতে পারেন নি। তাই এক অনাত্মীয়া প্রৌঢ়ার সাথে সম্পর্কের চিহ্নটা যে কখন 'তুই' এর আপন স্নেহবন্ধনে ধরা পড়ে গিয়েছিল তা কেউ টের পান নি। স্বর্ণপ্রভার মন যেন ফল্গু নদীর ধারার মতন স্মৃতিব পলি ভেদ করে প্রকাশ পেতে চাইত, নিজেকে আবার সেই ছোট্ট শিশুর কল্পজগতে নিয়ে যেতে চাইতেন। মনে মনে মাতৃবক্ষের উষ্ণতার স্পর্শ নিজের হৃদ্স্পন্দন দিয়ে শুষে নিতে চাইতেন।

সেদিনটা ছিল বসুন্ধরার মার মৃত্যু-বার্ষিকী। স্কুলে যান নি অমিয়া দেবী। সারাদিন স্বর্ণপ্রভাব কাছেই ছিলেন। বসুন্ধরা তার কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে ছিল। মাঝে মাঝে ওর নরম তুল তুলে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বুঝতে পারছিলেন ওর চোখের জলে তার শরীরটা ভিজে গেছে। বসুন্ধরাকে তার বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বলেছিলেন, বসুন্ধরা তোর মা আকাশের তারা হয়ে তোর কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

স্বর্ণপ্রভা হাউ হাউ কবে কেঁদে উঠেছিলেন। সারা দিনে এই প্রথম তাকে কাঁদতে দেখলেন। সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান যন্ত্রচালিত মানুষের মতন করে গেছেন। অবাক হয়েছিলেন অমিয়া দেবী। ভাবছিলেন কী কঠিন হৃদয় এই বৃদ্ধার! এক মাত্র কন্যার বেদনা-ঘন স্মৃতির দিনেও এতখানি অবিচল থাকার মানসিকতা সত্যিই তাকে অবাক করেছিল।

স্বর্ণপ্রভার পিঠে তার একটা হাত রেখেছিলেন অমিয়া দেবী। বর্ষার জল যখন পাহাড়ের কোনো পাথরের গোপন খাঁজে জমা হয়, বাইরে থেকে খুব কাছে থাকলেও বোঝা যায় না। কিন্তু একবার যখন সে পথ খুঁজে পায় তখন সামনের বিশাল স্থূরীভূত শিলাও তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। রুদ্ধ জলস্রোতের বহিঃপ্রকাশের তীব্রতায় সামনের প্রতিরোধ খড়কুটোর মতন ভেসে-যায়। স্বর্ণপ্রভার সারা শরীরের কম্পনের তীব্রতা থেকেই অমিয়া দেবী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কী প্রচণ্ড শোক তার মনের রুদ্ধ প্রাচীরে আবদ্ধ ছিল। আগ্নেয়গিরির উদ্গীরনের মতো গত একবছরের সঞ্চিত শোক-বাষ্প তার দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অমিয়া দেবী মৃদুস্বরে ডেকেছিলেন, মাসিমা।

স্বর্ণপ্রভা ধীরে ধীরে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বসুন্ধরার মা চলে গেছে, তার মাকে তুই ফিরিয়ে দিলি। আমাকে তো তুই কিছু দিলি না।

আমি তো কেবল নিয়েই চলেছি। আমার যে কিছু দেবার ক্ষমতা নেই মাসিমা। স্বর্ণপ্রভার কথার কোনো অর্থ না বুঝেই বলেছিলেন অমিয়া দেবী।

তুই আমাকে একটা ভিক্ষা দিবি?

ছিঃ মাসিমা, এমন ভাবে বললে যে ভীষণ দুঃখ পাই।

তবে বল, তুই আমার সেই খুকি হবি?

আমি যে প্রথম দিনই তোমাব মধ্যে আমার হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পেয়েছি মাসিমা।

তবে মা বলে ডাকিস না কেন?

মা। স্বর্ণপ্রভার বুকে মুখ গুঁজে দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। দুটি শোকতপ্ত হৃদয় সেদিন দুজন দুজনের হৃদয়ের উত্তাপকে শুষে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল।

উৎপাটিত শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বর্ণপ্রভার সেই কথাটাই যেন আবার তার কানে ভেসে আসছিল। গাছটাকে তুই কেন এত ভালোবাসিস?

অমিয়া দেবী জবাব দিয়েছিলেন, গাছটাকে কেন জানি নিজের খুব কাছের মনে হয়।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, জানিস, খুকিও এই গাছটাকে খুব ভালোবাসত। বলত মা এই গাছটার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও। তাহলে ঐ গাছটা ওর সব ফুল আমাকে দিয়ে দেবে। ছোটোবেলায় ও ছুটে ছুটে এই গাছটার তলায় চলে যেত। শিমুল ফুলের পাপড়িগুলি কুড়িয়ে আনত। গাছটার সাথে আপন মনে গল্প করত। জেলা-বোর্ড রাস্তা বানাতে এসে এখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ইঞ্জিনিয়ার এই গাছটাকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল। খবরটা চলে গিয়েছিল খুকির কানে। ওর বাবা তখন জেলা-বোর্ডের মেম্বার। খুকির কান্নায় তাকে সেখানে ছুটে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তাই গাছটাকে বাঁচাতে রাস্তাকে অনেকটা ঘুরিয়ে বানাতে হয়েছিল।

শিমুল গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অমিয়া দেবী। বারান্দায় বসে এই গাছটার মাথাকেই দেখতেন। লালফুলের ঘোমটায় ঢাকা সেই মাথাটা আজ মাটিতে লুটিয়ে আছে। মৃত্যু-যন্ত্রণার ঢেউ তাদের কোষে কোষে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লুটিয়ে পড়া গাছের ডালগুলিতে হাত বোলাবার খুব ইচ্ছে করছিল অমিয়া দেবীর। এই গাছের মধ্যেই সুপ্ত আছে নারীত্বের প্রতীক। যে বিচিত্র গঠন শৈলী আর কোষ বিন্যাস নারীর জীবনে পূর্ণতা এনে দেয়, সৃষ্টিব জঠরে নিজেব রক্ত ও পুষ্টি দিয়ে গড়ে তোলে ভবিষ্যতের ধারক, তারই পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায় বৃক্ষের জীবনচক্রের মধ্যে। ছোট্ট বীজের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে আগামী দিনের মহীরুহের সুপ্ত শক্তি।

কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মনটা মুচড়ে উঠে। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন গতরাতের ঘটনাকে। বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি এক গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে বসুন্ধরার বাড়ির উদ্দেশে এই কাক ভোরে বেরিয়ে পড়েছেন। চোখটা তার অজ্ঞান্তেই আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই করাত হাতে বৃক্ষ-কসাইরা জমা হবে রাস্তা পরিষ্কার করতে। তাদের হাতের চকচকে ধারল দাঁতগুলি নির্মমভাবে কর্তন করবে গাছটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে। একটা যুগের সাক্ষী এই ভাবে হারিয়ে যাবে জড় বাণিজ্যিক সামগ্রী রূপে।

এ-কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে যাওয়া আসার পথে তার এতদিনের নিশানাকে আর দেখতে পাবেন না। সেই বারান্দায় দাঁড়ালে কেউ আর তাকে রক্তিম হাসিতে অভিনন্দন জানাবে না। এখানকার মাটিতে হয়তো নতুন কেউ বসতি স্থাপন করবে। আগামী দিনে এই শূন্য আকাশে হয়তো কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবে কিন্তু তার চেনা গাছটাকে আর খুঁজে পাবেন না; নতুন প্রজন্ম কোনো দিনই জানতে পারবে না এখানেই একদিন কালের এক নীরব সাক্ষী বছরের পর বছর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

কালকের রাত্রে উৎপাটিত শিমুল গাছের ডাল সারা রাস্তা জুড়ে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিল তাকে টপকে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। অমিয়া দেবী রাস্তা থেকে নেমে মাঠে এসেছিলেন। বৃষ্টির জল মাঠে জমে আছে। চটি-জুতো হাতে করে মাঠটা পা টিপে টিপে পার হয়েছিলেন। জলে-কাদায় শাড়িটা একাকাব হয়ে গিয়েছিল।

। ১২ ।

বসুন্ধরার বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন স্বর্ণপ্রভা ও বসুন্ধরা কেউ তখনও উঠেনি। স্বর্ণপ্রভার শরীরটা বেশ কয়েকদিন যাবৎ ভাল যাচ্ছিল না। পিঠে একটা যন্ত্রণা তাকে বেশ কাহিল করে তুলেছিল। রাত্রিবেলায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। তাই দেরিতে উঠেন। গৃহকর্ত্রীর দেরিতে উঠার সুযোগ নিয়ে বাড়ির অন্যেরাও বোধ হয আলস্যের বিলাসিতাকে একটু ভোগ করে নিতে চেয়েছিল, তাই ঘুমন্ত বাড়িটাতে অমিযা দেবী সোজা উপরে চলে গিয়েছিলেন।

বসুন্ধরার ঘরের সামনে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওর ঘরের দরজার একপাট খোলা। ভাবলেন, বসুন্ধরা এত ভোরে উঠে কি করছে?

ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন, বসুন্ধরা তখনও ঘুমিয়ে আছে। মশারি টাঙানো নেই। এত বড় মেয়ে মশারি টাঙাতে পর্যন্ত ভুলে যায় ভেবে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়েছে দেখে তার বিস্ময়ের মাত্রাটা আরও গাঢ় হয়েছিল। কালকের রাতে যে ও দরজা খুলে শুয়েছিল তার চিহ্ন সর্বত্র।

সারা ঘরে জল জমে আছে। আলনার জামাকাপড় লণ্ডভণ্ড। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটা উড়ে এসে ভিজে মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। টেবিল থেকে ফুলদানিটা মাটিতে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ছিলেন অমিয়া দেবী। বসুন্ধরার ঘুমিয়ে থাকার ভঙ্গিটা খুব একটা স্বাভাবিক নয়। সারা শরীর জুড়ে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা। যেন একটা ঝড়ের তাণ্ডব তার সারা শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

আলুলায়িত চুলগুলি সাবা মুখটাকে ঢেকে রেখেছে। পরনের কাপড় সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত। ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কাপড়টা উঠে এসেছে। অন্তর্বাসহীন ব্লাউজের বোতামগুলি খোলা, সাদাশাঁখের মত পেলব স্তন দুটির উপর আঁচড়ের দাগ স্পষ্ট।

বসুন্ধরার মুখ থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন অমিয়া দেবী। সারা গায়ে প্রচণ্ড উত্তাপ। কিন্তু কমলালেবুর কোয়ার মতন ওর গোলাপী ঠোঁটের নীচের ঠোঁটে জমাট রক্তবাঁধার ছাপ। তীব্র নিষ্পেশনের চিহ্ন স্পষ্ট।

বিছানার চাদরও অবিন্যস্ত। তোষকের উপর সরে এসে মাঝখানে দলা হয়ে পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় বিছানার উপর দাপাদাপি হয়েছে। খাটের নীচে পড়ে আছে ভিজে গেঞ্জি আর বিছানার এক কোণে সাপের কুণ্ডলী পাকানোর মতন একটা বেল্ট গত রাতের অতিথির চিহ্ন রূপে থেকে গেছে।

অমিয়া দেবীর সারা শরীরে বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। এ গেঞ্জি তার চেনা। এ বেল্ট তারই হাতে কেনা। তাড়াতাড়ি নিজের জল-কাদা মাখা-কাপড় সায়া ছেড়ে ফেলে আলনা থেকে বসুন্ধরার সায়া-শাড়ি পরে নিয়েছিলেন। নিজের ছাড়া জামা কাপড়ের মধ্যে খাটের তলায় পড়ে থাকা গেঞ্জি আর বিছানার উপর থেকে বেল্টটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

বসুন্ধরার পরনের কাপড়টা হাঁটুর উপর থেকে নামিয়ে এনে গোড়ালি পর্যন্ত টেনে দিলেন। ব্লাউজের বোতামগুলি আটকে দিয়ে আঁচল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। কোঁচকানো চাদরটা টান টান করে টেনে দিয়ে, ফুলদানিটা টেবিলের উপর উঠিয়ে রেখেছিলেন। আলনার চারিপাশে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাপড়গুলো গুছিয়ে রেখে মেঝের উপর পড়ে থাকা ভিজে কালেণ্ডারটা গুটিয়ে রেখে দিলেন। ভিজে মেঝেটা মোছা দরকার, কাউকে ডাকতে গিয়েও থমকে গেলেন। নিজের ছাড়া সায়াটা দিয়ে পুরো ঘরটা মুছে ফেললেন। কাঠের আলমারিটা খুলে একটা মোটা বেডকভার বের করে বসুন্ধরার গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। ফ্যানটা ফুল স্পীডে চালিয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুনি আর ক্রীমটা নিয়ে বসুন্ধরার পাশে এসে বসেছিলেন।

বসুন্ধরা তখনো ঘুমিয়ে ছিল। চিরুনিটা দিয়ে আলতো করে চুলগুলি আঁচড়ে দিলেন। ক্রীমটা হাতে নিয়ে ওর ঠোঁটে বোলাতেই বসুন্ধরা চোখের পাতা দুটি মেলে ধরে ছিল। ওর চোখে তখনো ঘোলাটে দৃষ্টি, তাকানোর মধ্যে এক বিহ্বলতা। জ্বরের দাপটে চেতনা অবলুপ্ত। চোখের পাতা দুটি আবার বুজে গিয়েছিল।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার মুখের উপর ঝুঁকে ডেকেছিলেন বসুন্ধরা।

বসুন্ধরা চোখের পাতা দুটি আবার মেলে ধরে সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল। ওর চোখ দুটি জবা ফুলের মতন লাল। অমিয়া দেবীর কোলে মুখটা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

বসুন্ধরাকে দু'হাতের বাঁধনে ধরে রেখে চুপ করে বসেছিলেন। ক'দিনের ঝড়ের ঝড় বসুন্ধরার জীবনের অনেক সম্পদকেই যে সমূলে উৎপাটিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাসি ফুলের মতন নেতিয়ে যাওয়া বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকাতেই অমিয়া দেবীর বুকের ভিতরটা কে যেন প্রচণ্ড মোচড়ে অসাড় করে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল কালো এক রক্তচোষা দৈত্য যেন তার পাশবতা দিয়ে বসুন্ধরার শরীরের মাধুর্যকে নিঃশেষে পান করে তাকে চরম অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। ওর জ্বরতপ্ত ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে অমিয়া দেবীর ভিতরটা হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। বোঝার চেষ্টা করছিলেন বসুন্ধরার জীবনের সংরক্ষিত বাগানের প্রাচীর ভেঙে সেই দস্যু কতখানি প্রবেশ করতে পেরেছিল। সে কি শুধু তার সাজানো বাগানের কয়েকটি কলিকে দলিত মথিত করে ক্লান্ত হয়ে পালিয়েছে, না সমস্ত বাগানটাকেই তছনছ করে কোনো বন্য বীজ বপন করে চলে যেতে পেরেছে? তার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা বসুন্ধরার অসহায় ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অমিয়া দেবী ভাবতে চাইছিলেন সঠিকভাবে একেবারে খুঁটিনাটির কথা।

নারী দেহের এক বৃন্তে বিধাতা ভরে ভরে সাজিয়ে রেখেছে একই সাথে শৃঙ্গার আর স্নেহ সুধার বিচিত্র অনুভূতি। যে স্তন যুগল সন্তানের কচি স্পর্শে মাতৃস্নেহের ভগীরথকে অমৃত-সুধার যোগান দেয়, সেই স্তনপয়োধর দয়িতের স্পর্শে শিহরন তোলে। আবার এই নারীকেই কস্তুরী হরিণীর মতন তার যৌবনকে শিকারি পুরুষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সদা সতর্ক প্রহরা প্রাচীরের আড়ালে নিজেকে আবৃত রাখতে হয়। যে মাতৃত্ব নারীকে তার পূর্ণ নারীত্বের গরিমায় গর্বিত করে সেই মাতৃত্ব কোনো পুরুষের ঠিকানা না দিতে পারলে নারী জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে বিবেচিত হয়। তাই নারীকে তার উর্বর ক্ষেত্রভূমিকে জীবনের গোপনতম সম্পদ ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রাখতে হয়। ভয় পাছে সেই উর্বর ভূমিতে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে যদি কোনো পুরুষ বীজ বপন করে যায়। অথচ পরযেরা যেন শীতের পাখি। বীজ বপন করে সে যদি আকাশে উড়ে যায় তার খোঁজ রাখে কে? সেই বীজ গাছের চারার মতন শিকড় ছড়িয়ে নারীর নাড়ির সাথে বন্ধন গড়ে তোলে। তার পুষ্টিকে শোষণ করে মাতৃ জঠরে নিরাপদে বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টির প্রতিপালনে বিধাতা নারীর উপর সব দায় চাপিয়ে দিলেও সামাজিক বিধানে সন্তান পুরুষের।

মেয়েদের ঋতুমতী হবার সঙ্গে সঙ্গে মায়েরা তাই জমির ফসল রক্ষা করার জন্য কাকতাড়ুয়ার মতো সবসময়ই পাহারাদারের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকে। বসুন্ধরাকে নিজের মেয়ে

বলে পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। স্বর্ণপ্রভাকে কথা দিয়েছিলেন, বসুন্ধরাকে নিরাপত্তার গণ্ডিতে ধরে রাখবেন। তিনি কি স্বর্ণপ্রভার সামনে দাঁড়াতে পারবেন? বসুন্ধরাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ক্ষুরিপে মাপতে গিয়ে এক অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। বসুন্ধরার তপ্ত কপালে ঠোঁট দুটিকে নামিয়ে এনে ওর শরীরের উত্তাপকে শুষে নিতে চাইলেন।

· সেদিন কতক্ষণ এভাবে বসেছিলেন তার নিজেরই খেয়াল ছিল না। স্বর্ণপ্রভার ডাকে চমক ভেঙেছিল।

তুই এত সকালে?

কালকের ঝড়-জলে তোমরা কেমন আছ দেখতে এসে দেখলাম বসুন্ধরার জ্বর হয়েছে।

সে কি-রে? গলায় উৎকণ্ঠা স্বর্ণপ্রভার। চোখে ছানি পড়াতে দৃষ্টি-শক্তি খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মালদার পিনাকি রায়কে দেখানো হয়েছিল। হাই-প্রেসার। সুগারের মাত্রা তিনশ। ছুরি-কাঁচি ধরা যায় নি। বসুন্ধরার কাছে এসে তার সেই পরিচিত পদ্ধতিতে গাল দিয়ে বসুন্ধরার কপালটা স্পর্শ করে বলেছিলেন, এ যে অনেক জ্বর। সুরেন ডাক্তারকে খবর পাঠা।

বসুন্ধরাকে স্বর্ণপ্রভার দৃষ্টির আড়াল করতে চাইছিলেন অমিয়া দেবী। বসুন্ধরার জীবনে কোনো দুর্ঘটনা যে তারই লজ্জা। তারই ব্যর্থতা। শুধু কি তাই? সেদিন তিনি কি তমালকেও আড়াল করতে চান নি?

তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলের কাছ থেকে চেয়ারটা টেনে এনে স্বর্ণপ্রভাকে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি এত চিন্তা করছ কেন মা? আমি তো আছি।

সেদিন কিন্তু গলার স্বরটা কেঁপে উঠেছিল অমিয়া দেবীর। আমি আছি শব্দটা নিজের কানেই বিদ্রূপের মতন বেজেছিল। বহুদিন বসুন্ধরার চুলে বিনুনি বেঁধে দিতে দিতে তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, তুই যেভাবে খুশি যা ভালো লাগে সব করবি। আমি আছি। তোর কোনো ভাবনা নেই।

বসুন্ধরা দু হাত বাড়িয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে মুখটা কানের কাছে নিয়ে এসে বলত, আমাকে কেন এত বিশ্বাস কর বড়মা? আমি যদি কোনো খারাপ কাজ করি?

তুই যে তা কোনো দিন করতে পারবি না।

কেন তুমি এত বিশ্বাস কর?

আমি আছি যে, আমি তোর মা। মেয়েকে মার থেকে বেশি কে চেনে?

কালকের ঝড় তো শুধু শিমুল গাছের শিকড়কেই উৎপাটিত করে নি। সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থেকেও উৎপাটিত করেছিল। বসুন্ধরার দুটি বোজা চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কেঁপে উঠেছিলেন অমিয়া দেবী। ভাবছিলেন, বসুন্ধরা যদি চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করে, বড়মা তুমি তো ছিলে, তোমার দেওয়া আশ্বাসের গণ্ডির মধ্যে আমি ছিলাম। তবু সেই দস্যুটা সেই গণ্ডির বাঁধন ভেঙ্গে দিয়ে কী ভাবে প্রবেশ করল? কী জবাব দেবেন তাকে?

স্বর্ণপ্রভার মুখোমুখি বসেছিলেন অমিয়া দেবী। কালের ছোবল কত নির্মম। বার্দ্ধক্য পঙ্গপালের ঝাঁকের মতন যৌবনের শেষ লাবণ্যটুকুও শুষে নিয়েছে। মেয়ের নির্মম মৃত্যু ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করে দিলেও বাইরের প্রতিরোধের প্রাচীরটিকে বহুদিন অটুট রাখতে পেরেছিলেন। আজ জরা ও ব্যাধির যুগ্ম আক্রমণে সে প্রাচীরটুকুও ধসে গেছে। স্বর্ণপ্রভার স্বর্ণকান্তি আভার উপর পড়েছে মলিনতার ছাপ। যে উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম দিন তিনি চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন সেই দৃষ্টি আজ নিষ্প্রভ। যে ঋজু দেহভঙ্গিতে প্রকাশ পেত ব্যক্তিত্বের দীপ্তভঙ্গি তা আজ দেহভারে ন্যুব্জ। হাঁটার সময় দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এই স্বর্ণপ্রভাই তার উপর সব কিছু পরম নিশ্চিন্তে সমর্পণ করেছিলেন। বার বার বলতেন, তুই কেন আমার এখানে চলে আসছিস না?

আমি তো তোমার কাছেই আছি মা। আর এই বাড়িটা আমার মার বাড়ি ভাবি বলেই তো একটু দূরে থাকি।

নিজের বাড়ি থেকে বুঝি কেউ দূরে থাকে?

থাকে মা। মেয়েরা বড় হলে মার বাড়িতে থাকে না। সে মার বাড়িতে আসে। দুর্গাঠাকুর মার কাছে আসে বলেই যে এত আনন্দ। মা দুর্গামার বাড়িতে থাকলে কি তুমি এত আনন্দ পেতে?

কোনো জবাব দেন নি স্বর্ণপ্রভা। শুধু অমিয়া দেবীর দুটো হাত আঁকড়ে ধরেছিলেন।

বৃদ্ধার ঘোলাটে দৃষ্টির সামনে অমিয়া দেবীর অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠেছিল। যে বিশ্বাসের অতলস্পর্শী আস্থা স্থাপন করে এই বৃদ্ধা পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তারই সোপান বেয়ে তার চেনা চোর এই পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটিকেই চুরি করে নিয়ে গেছে।

একটা তীব্র অনুশোচনার তীর অমিয়া দেবীর মনকে বিদ্ধ করেছিল। মনে হয়েছিল নিজের সেই অহমিকাকে সরিয়ে রেখে সেদিন যদি এই বৃদ্ধার ডাকে সাড়া দিয়ে এই বাড়িতে চলে আসতেন তবে সেই চোর এই চুরির সুযোগ পেত না।

স্বর্ণপ্রভার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তুমি চিন্তা করো না। মনে হয় ঠাণ্ডা লেগে জ্বরটা এসেছে। আমি সব দেখছি। তুমি পুজো সেরে নাও। একসাথে চা খাব।

তবু ডাক্তারকে একবার খবর দিলে পারতিস।

এক্ষুনি ডাক্তারকে খবর দেওয়ার দরকার নেই মা। দরকার হলে আমিই ডাক্তারকে খবর দেব।

অথচ তিনিই তো কারও সামান্য জ্বর হলেই বিচলিত হয়ে পড়তেন। এ নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে মৃদু ধমকও খেতে হত। বাড়িতে স্বামীর কোম্পানীর স্যাম্পেল। ওষুধের নাম জানেন। তমালের সামান্য পেট খারাপ হলেও সেই জানা ওষুধ নিয়েই ডাক্তারের কাছে ছুটতেন। এই নিয়ে প্রতুলবাবুর একটা চাপা অভিমান ছিল। বলতেন আমরাই এই ওষুধগুলো ডাক্তারদের তোতাপাখির মতন বোঝাই। তাদের এত পড়ার সময় কোথায়? অথচ আমার কথার কোনো মূল্য দিচ্ছ না। আর ডাক্তার বাবুর প্রেসক্রিপ্‌শনে উঠলেই এরা কুলীন হয়ে যায়।

অমিয়া দেবী মানতে চাইতেন না। বলতেন, তোমরা বেচার জন্য বল, আর ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসার জন্য লেখেন। তাই ওষুধ মাত্রই ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নিতে হবে। আমি সর্দি হলেও নিজের থেকে ওষুধ দিতে রাজি নই।

সেদিন নিজের মনেই একটা অপরাধ বোধ খোঁচা দিয়ে চলেছিল। আজ কেন ডাক্তার ডাকতে ইতস্তত বোধ করছেন? তবে কি তিনি বসুন্ধরার উপর সেই দস্যুর হামলাকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন?

দরজা দিয়ে বারান্দার অনেকটা দেখা যায়। গ্রিল ঢাকা বারান্দা সমস্ত দোতালাকে ঘিরে রেখেছে। কাল বিকালেও এই বারান্দা দিয়ে এঘরে ঢুকেছিলেন। প্রতিদিনই আসেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন সব ঠিক আছে কিনা। প্রয়োজন না থাকলেও বিছানার বালিশ ও চাদরটা উল্টে-পাল্টে আবার ঠিক করে রাখেন। আলনায় কোনো কাপড় অগোছানো থাকলে বসুন্ধরাকে ডেকে কৃত্রিম ধমক দিয়ে সেটাকে গুছিয়ে রাখেন। মনে মনে চাইতেন বসুন্ধরা শিশুর মতো সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখুক। তিনি ওকে বকাবকি করবেন আর নিজের হাতে সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে অভিমানী মেয়ের মুখে নানা আদরে হাসি ফোটাবেন।

বসুন্ধরা নিঃশব্দে শুয়ে আছে। নিশ্বাসের তালে তালে ওর বুকটা ওঠা-নামা করছিল। মাঝে মাঝে ওর ভ্রূ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হয়তো গত রাতের স্মৃতি ওকে তাড়া করে চলেছে। অমিয়া দেবী বসুন্ধরার জ্বর তপ্ত একটা হাতকে নিজের হাতের মুঠোয় বন্দি করে বসেছিলেন।

জীবনের সেই হিসেব মিলাতে গিয়ে বার বার গোলমাল করে ফেলছিলেন অমিয়া দেবী। মেলাতে চাইছিলেন সেদিনকার সেই বিদেশি শিশুটির পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ঘটনার সাথে তার মায়ের কথাগুলিকে। ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন বসুন্ধরা কি নিজে নিজেই পা পিছলে পড়ে গেছে, যে তিনি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখবেন সে নিজে থেকেই উঠতে পারে কিনা।

সেই দৃশ্যটাও আবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল যখন তিনি তমালকে নিজে থেকেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে ভেবেছিলেন তমাল নিজে থেকেই উঠতে শিখবে। সেদিনের সেই বিদেশিনী মায়ের ভর্ৎসনা আজও তাকে বিদ্ধ করে। মনে মনে ভাবতে চেয়েছিলেন, তিনিই কি বসুন্ধরাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন নি? তিনিই কি এই ঘটনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?

স্বর্ণপ্রভার ডাকে চমক ভেঙে ছিল অমিয়া দেবীর। তুই তো আছিস। আমি ঠাকুরকে জল দিয়ে আসি।

অমিয়া দেবী সেদিন কোনো মতে উচ্চারণ করেছিলেন, [illegible]

স্বর্ণপ্রভা এখন আর সোজা হয়ে হাঁটতে পা[illegible] পিঠটা নুয়ে পড়ে। তার চলার দিকে তাকিয়ে থেকে অমিয়া দেবী ডুকরে কেঁদে ফেলেছিলেন।

নিভাদিকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখেই একটা আতঙ্কের ঢেউ তার সারা মনে আছড়ে পড়েছিল। নিজের হৃদস্পন্দনের শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পারছিলেন। তবে কি তমাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে? তিনিই তো কিছুক্ষণ আগে নিভাদিকে বলেছিলেন তমাল বাড়িতে থাকলে তিনি নিজের হাতে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতেন। অথচ তমাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এই আশঙ্কায় তার নিশ্বাস নিশ্চল হয়ে পড়তে চাইছে। গলা দিয়ে রুদ্ধ চাপা বিকৃত একটা স্বর বেরিয়ে এসেছিল। নিভাদি কই?

নিভাদি দ্রুত অমিয়া দেবীর কাছে সরে এসেছিল। তার বুকটা কামারের হাপরের মতন ওঠা নামা করছিল। ঔর নিশ্বাসের স্পর্শে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে সে এতটা পথ ছুটতে ছুটতে এসেছে। কোনো মতে জানাতে পেরেছিল, সে এসেছিল।

কে এসেছিল?

তুই বুঝতে পারছিস না? চাপা রাগে নিভাদি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। মা হয়ে বুঝতে পারছিস না কার কথা বলছি? খোকা এসেছিল।

বসুন্ধরার শরীরটা কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু ও চোখ বুজেই শুয়ে ছিল।

অমিয়া দেবী চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ও কি বাড়িতে আছে?

না, এসেই চলে গেল।

চলে গেল?

হ্যাঁ।

কোথায় গেল?

কিছু বলেনি। শুধু বলল আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। কিছু টাকার দরকার। মার কাছে যা আছে আমাকে দিয়ে দাও।

তুই দিয়ে দিলি?

হাঁ।

কোথার থেকে দিলি? কত টাকা দিলি?

নিভাদির রাগ আরো বেড়ে গিয়েছিল। সে গলা চড়িয়ে বলেছিল, আচ্ছা মা তো তুই, ছেলেটার মাথায় এত বিপদ আর তুই টাকার শোকে মরে যাচ্ছিস? তুই যে টাকাগুলি কাল আমায় রাখতে দিয়েছিলি সেই টাকাগুলিই ওকে দিয়ে দিয়েছি। খোকা বলল, ওকে অনেক দূরে যেতে হবে।

কী বলছিস তুই? ওগুলি তো স্কুলের টাকা। আজকেই ঠিকাদারকে পেমেন্ট করতে হবে। তুই এতগুলো টাকা ওকে দিয়ে দিলি?

কী জানি বাপু. তোদের বঙ্গ তো আমি বুঝি না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র ছেলে। পুলিস, শকুনেব তাড়া খেযে কোথায় কোথায় না খেয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে। তাকে টাকাটা দিয়েছি বলে তোর টাকার দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। ধন্যি মা বটে। আরে, জামাই তো কম রেখে যায় নি। ছেলেটা নেবে না তো কে নেবে?

নিভাদির রাগ এবার কান্নায় এসে দাঁড়াল। চোখ দুটি আঁচল দিযে মুছতে মুছতে বলেছিল, সারা রাত এই ঝড়-বাদলের মাঝে কোথায় ছিল কে জানে? সারা রাত জলে কাদায় কাটিয়েছে। এত করে বললাম, তবু ওর মুখে একটা দানাও দিতে পারলাম না। বললাম, জামা-কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম নে। কোথায যাবি কে জানে? পেটে কিছু পড়বে কিনা কি জানি? আমি তাড়াতাড়ি কবে দুটো চাল ফুটিযে দি। কালকেই নতুন ঘি নিযেছি। একটু খেয়ে যা। খোকা শুধু বলল, মাসী আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। মা যে কাল ব্যাঙ্ক থেকে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে এনেছে সেটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি অনেক দূব চলে যাচ্ছি। দেবি হলে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যাব। ওরা আমায় মেবে ফেলবে।

টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছিলেন অমিয়া দেবী। স্কুলের বিল্ডিং-এর জন্য মালদার সাংসদ কোটা থেকে যে অনুদান পেয়েছেন এ তাবই টাকা। টাকাটা তমাল বিপ্লবের কাজে নিয়েছেন এটা তিনি বিশ্বাস করতে চান নি। বিপ্লবের জন্য কেউ অনেক দূরে যাওয়ার জন্য টাকা নেয না। এই টাকা ফেবত দেওযা তাব কাছে খুব সমস্যা নয়। নিভাদি ঠিকই বলেছে, জামাইবাবু কম বেখে যায নি। কিন্তু সে টাকা তো আছে কলকাতার ব্যাঙ্কে। আজকেব বাত্রির ট্রেনে কলকাতায় গেলে কাল টাকাটা তুলে এনে পরশু সকালেই চলে আসতে পারবেন। কিন্তু স্কুলেব টাকা একদিনের জন্যও নিজেব জন্য বাখতে সঙ্কোচের কাঁটা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ কবে বিঁধছিল। নিভাদিকে বিরক্তির সাথে বলেছিলেন, স্কুলের টাকাটা দিয়ে তুই ভাল কবিস নি, নিভাদি।

তুই মা? না, বাক্ষসী? নিভাদি চীৎকার কবে উঠেছিল।

অমিয়া দেবী শান্তভাবে বলেছিলেন, স্কুলের টাকাটা আনতে আজকেই আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। তুই আজ এখানে এসে থাকবি।

বড়মা, বসুন্ধরার ডাকে চমকে উঠেছিলেন অমিয়া দেবী।

বসুন্ধরার মুখের উপব ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই জেগে পড়েছিস?

কোনো কথা না বলে ম্লান হেসেছিল বসুন্ধরা। ওর মুখটা বড় করুণ মনে হযেছিল অমিয়া দেবীর চোখে। কপালে হাতটা ঠেকিয়ে বলেছিলেন, শরীরটা এখন কেমন লাগছে রে?

ভালো। তাবপর অমিয়া দেবীব মুখেব দিকে একবার তাকিয়েই চোখ দুটো বুজে ফেলে বলেছিল, তোমাকে এখন কলকাতায় যেতে হবে না। আমার অ্যাকাউন্টে এর থেকে বেশি টাকা আছে। তুমি তুলে নিও।

তুই তাহলে এতক্ষণ জেগে ছিলি? অমিয়া দেবী অবাক হয়েছিলেন।

বসুন্ধরা কোনো কথা না বলে চোখ বুজেই শুয়ে ছিল।

বসুন্ধরা, ভরা গলায় ডেকেছিলেন অমিয়া দেবী।

বল।

ও তোর কাছে কাল এসেছিল।

কে? বসুন্ধরা তাকিয়েছিল।

বুঝতে পারছিস না?

বসুন্ধরা চুপ। নিশ্চল।

কথা বলছিস না কেন? অমিয়া দেবী বসুন্ধরাব কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন।

কি বলব?

যা জিজ্ঞাসা করছি।

বসুন্ধরা বালিশে মুখটা গুঁজে ফুপিয়ে উঠেছিল। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না বড়মা।

অমিয়া দেবী কিছু বলার আগেই পাশের ঘর থেকে একটা ভয়ার্ত ডাকে অমিয়া দেবী লাফিয়ে উঠেছিলেন। সবাই ছুটে এসো, গিন্নিমা পড়ে গেছে।

একরকম ছুটেই এসেছিলেন অমিয়া দেবী। পিছনে নিভাদি, তার পিছনে বসুন্ধবা।

স্বর্ণপ্রভা ভোরবেলায় স্নান সেরে নিয়ে পুজোতে বসেন। সেদিনও বসুন্ধরার ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিদিনের মতন স্নান করে পুজোতে বসেছিলেন। পুজো সেরে ঠাকুর প্রণাম করে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

বসুন্ধরা চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল, দিদার কী হল বড়মা?

স্বর্ণপ্রভার চোখ দুটো বোজা। বাঁ দিকের মুখটা কেমন জানি বেঁকে গেছে। অমিয়া দেবী বুঝতে পেরেছিলেন। ঘটনাটি নিছক মাথা ঘুবে পড়ে যাওয়াব ব্যাপার নয়। একজনকে ট্যাক্সি ডেকে আনতে পাঠিয়ে আরেক জনকে হেলথ-সেন্টারে পাঠিয়েছিলেন ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

হেলথ-সেন্টারের ডাক্তাব এসেই ঘোষণা কবেছিলেন, হার্ট-অ্যাটাক।

। ১৩ ।

ফ্যানের পাখাগুলি একই ছন্দে ঘুরে চলেছিল। স্মৃতিব তবঙ্গগুলি যেন ফ্যানের ব্লেড গুলিতে ধাক্কা খেয়ে মনের পর্দাটিকে চোখের সামনে মেলে ধবতে চাইছিল।

স্বর্ণপ্রভাকে নার্সিং হোমে ভর্তি কবার পর বসুন্ধরাকে এই ঘরেই নিযে এসেছিলেন। এখান থেকেই নার্সিং হোমটা অনেক কাছে হয। বসুন্ধবার বড় মামাব ফ্ল্যাট সল্টলেকে। যেতে আসতেই সময় নেয় একঘন্টারও বেশি। তাই বসুন্ধরা মামার ফ্ল্যাটে না থেকে এখানে ছিল। ওর অশ্রু সিক্ত চোখ আব উৎকণ্ঠায় মলিন মুখের দিকে তাকিযে সেদিনেব ঝড়েব রাত্রি নিয়ে কথা তোলার ইচ্ছেকে প্রকাশ কবতে পারেন নি। এছাড়া, ডাক্তাব, নার্সিং হোম, আব বাড়ির চক্রাকার আবর্তে সেদিনটিও তাদেব কাছে বিস্মৃতির অতলে তলিযে গিযেছিল।

অমিয়া দেবীকে কয়েক বার বুলবুল চণ্ডিতে আসতে হয়েছিল। বসুন্ধবার মামা-মামী সেসময় ওকে তাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে চেয়েও নিয়ে যেতে পারে নি। সারাটা দিন নার্সিং হোমেই কাটাতো রাত্রিবেলায় শুধু ঘুমোতে যেত।

সেবার ফিরে এসে নিজেই অবাক হয়েছিলেন। তিনি আসছেন জেনেও তার আগের দিনই সে মামার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। বাড়িতে পৌঁছেই বাবার কাছ থেকে শুনেছিলেন, বসুন্ধরা মাঝে দুবার বমি করেছিল। প্রিয়তোষ বাবু তাকে কিছুতেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারেন নি। পরশুদিন তিনি ডাক্তারকে বাড়িতেই কল দিয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পরে ফোন করে জানিয়েছিল, আজ মামার বাড়িতে থাকবে।

স্নান করে কোনোমতে কিছু খেয়ে নিয়েই অমিয়া দেবী ছুটেছিলেন নার্সিং হোমে। হেঁটে গেলে মিনিট কুড়ি সময় লাগে। বাসে গোটা দুয়েক স্টপেজ। অমিয়া দেবীর ট্যাক্সিই

নিয়েছিলেন। স্বর্ণপ্রভার জন্য একটা উৎকণ্ঠা ছিল। তবে তার থেকেও বেশি চিন্তিত হয়েছিলেন বসুন্ধরার কথা শুনে।

প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, মেয়েটা খুব লক্ষ্মী রে। ওর মনের মধ্যে একটা চাপা দুঃখ লুকিয়ে আছে। কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না। এই যে খেতে পারছে না, মাঝেমাঝে বমি করে ফেলছে, তবু ডাক্তার দেখাবে না, বড্ড চাপা মেয়ে।

বসন্ধুরা চাপা স্বভাবের মেয়ে। বাবার কথায় অবাক হয়েছিলেন অমিয়া দেবী। সেই অবিরল ঝরনার ধারার মতন কলকণ্ঠ এক রাত্রির ঝড়েই স্তব্ধ হয়ে গেছে। স্বর্ণপ্রভার আকস্মিক অসুস্থতা ও তাকে জীবনমৃত্যুর দোলায় দুলতে দেখে সেদিনের পর বসুন্ধরাকে গভীর ভাবে দেখার সুযোগ পান নি। কিন্তু বাবার কথায় একটা আশঙ্কার ঢেউ তার-মনের কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেদিন যখন নার্সিং হোমে পৌঁছেছিলেন তখন বসুন্ধরা স্বর্ণপ্রভার মাথার কাছে বসে তার মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুলগুলি বুলিয়ে চলেছিল। বসুন্ধরার মুখটা শুকনো। রাত জাগার ছাপ স্পষ্ট। চোখের নীচে কালো রেখা।

অমিয়া দেবীকে দেখে মাথাটাকে দিদার মুখের উপর আরো ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল।

স্বর্ণপ্রভার নাকে অক্সিজেনের নল। সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। স্যালাইনের হাতটা চাদরের বাইরে, খুব ধীরে ধীরে স্যালাইনের ফোঁটাগুলি পড়ছে। শ্বাস পড়ছে কিনা দূর থেকে বোঝা যায় না। মনে হল যে কোনো মুহূর্তে চিরনিদ্রার ছায়া মুখটাকে ঢেকে দিতে পারে। সে দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস অমিয়া দেবীর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। দৃষ্টির সামনে কে যেন একটা ঝাপসা পর্দা টেনে দিয়েছিল। ভিজে চোখ দুটো মুছে বসুন্ধরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোর কী হয়েছে?

বসুন্ধরার মাথাটা আরো ঝুঁকে পড়েছিল। দিদার চুলে তার আঙুল বোলানো থেমে গিয়েছিল। বাঁ হাত দিয়ে শাড়ির আঁচলে শরীরটাকে একটু যেন আড়াল করতে চেয়েছিল। শুধু বলেছিল, কই কিছু হয় নি তো?

আমার দিকে তাকাতে পারছিস না কেন?

মুখটা তুলেই মাথাটা আবার নামিয়ে নিয়েছিল বসুন্ধরা।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বমি করেছিস কেন?

কে বলল?

যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দে। বসুন্ধরার শরীরের দিকে তীক্ষ্ণ জরীপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অমিয়া দেবী বলেছিলেন।

রাতে হজম হচ্ছিল না। তাই গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করেছিলাম।

বসুন্ধরা।

সে ডাকের মধ্যে কী ছিল সে কথা মনে নেই। তবে লক্ষ করেছিলেন, বসুন্ধরার সারা শরীরটা কেঁপে উঠেছিল। কিছু বলতে যেতেই বসুন্ধরার বড় মামা ঘরে ঢুকেছিলেন। অমিয়া দেবীকে দেখতে পেয়েই তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

বসুন্ধরা উঠে এসে বড় মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বড় মামী এসেছে?

—হ্যাঁ, বারান্দায় এক জনের সাথে কথা বলছে।

আমি একটু আসছি, বড়মা। বসুন্ধরা আঁচল দিয়ে শরীরটাকে মুড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বসুন্ধবাব বড় মামা বলেছিলেন, বসুন্ধবা বলেছিল আপনি আজকে আসবেন, ফোনও কবেছিল ষ্টেশনে আপনাব ট্রেন বাইট টাইম আছে কিনা।

অমিযা দেবী বলেছিলেন, ঘণ্টাখানেক লেট ছিল।

তাহলে তো সোজা এখানে চলে এসেছেন।

না, বাড়ি থেকে স্নান খাওযা কবেই এসেছি।

আপনি একটু বিশ্রাম নিন। সাবা বাত ট্রেনে এসেছেন। আমি মাব কাছে বসছি।

অমিযা দেবী কেবিন থেকে বেবিযে দেখতে পেযেছিলেন, বসুন্ধবাব বড মামী স্নিগ্ধা একজন মহিলার সাথে কথা বলছে। তাকে দেখতে পেযেই এগিযে এসে বলেছিল, সত্যি অমিয়া তুমি যা কবছ তা ভাবাই যায না। সাবা বাত জেগে এসেও একটুকু বিশ্রাম নিলে না।

অমিযা দেবী বলেছিলেন, ও কথা বোলো না স্নিগ্ধা। তোমাব শাশুডি আমাব মা, তাব কাছ থেকে আমি যা পেযেছি সে কথা কাউকে বোঝানো যাবে না। জানি না, ভগবান এই আশ্রযটুকু কেডে নেবেন কি-না।

স্নিগ্ধা পবিবেশকে একটু হাল্কা কবতে ঠাট্টাব ভঙ্গিতে বলেছিল, যাক, তোমাব মত নাস্তিকও তাহলে ভগবানকে বিশ্বাস কবতে শুরু কবল।

অমিযা দেবী একটু থমকে দাঁডিযেছিলেন। তাবপব বলেছিলেন, কথাটা তুমি ঠাট্টা কবে বলছ স্নিগ্ধা। কিন্তু আমি বুঝতে পাবছি মনেব সেই জোব আব পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে এত দিন অনেক কিছুই জোব কবে ভাবতাম। অনেকটা সেই শবৎচন্দ্রেব জ্যাঠামশাইযেব মতন, আমবা নাস্তিক সেটা প্রমাণ কবাব জন্যে আবো বেশি কবে নাস্তিকতাব ভান কবতে হত।

স্নিগ্ধা বলেছিল, তুমি বোধ হয আমাব কথায খুব সিবিযাস হযে গেছ। আমি কিন্তু ভাই নেহাত ঠাট্টা কবেই তোমাকে কথাটা বলেছি। তুমি মাকে কত ভালোলবাস সে কথা আমবা জানি।

অমিযা দেবী বলেছিলেন, না ভাই, তোমাব ঠাট্টাব জবাবে নয, আমাব নিজেব উপলব্ধিব কথা বলছি। বেশ কিছুদিন আগে মালদায হাসপাতালে আমাব এক সহকর্মীকে দেখতে গিযেছিলাম। তাব পাশে বসে আছি। এমন সময বছব তেবো চৌদ্দোব একটি ফুটফুটে ছেলেকে পাশেব বেডে ভর্তি কবা হল। ছেলেটিব সাথে এসেছে তাব বাবা ও মা। থাকে মালদা থেকে কিছু দূবে সামসি বলে একটা জাযগায। এগুলি অবশ্য ছেলেটাব মাব কাছ থেকে শোনা। ছেলেটি তাদেব একমাত্র সন্তান। ভদ্রমহিলাব ইউট্রাসে একটা টিউমাব হযেছিল। ইউট্রাস কেটে বাদ দিতে হযেছে। আব কোনো দিন সন্তান হবাব আশাও নেই। একমাত্র সন্তানকে মনেব মতো কবে মানুষ কবাব কোন ক্রটি বাখেন নি। ছেলেটিও পডাশোনায খুব ভালো। পুরুলিযা বামকৃষ্ণ মিশনে ক্লাস নাইনে পড়ে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে। বিকেলে পাড়াব ছেলেদেব সাথে ফুটবল খেলতে গিযেছিল। হঠাৎ তীব্র মাথা ব্যথা। বাড়িতে ফিবে এসেই জ্ববে অচেতন হযে পডেছিল। সামসিব ডাক্তাব দুদিন ধবে চিকিৎসা কবেও যখন কিছু কবতে পাবেন নি তখন তিনি তাকে কলকাতায নিযে যাওযাব পবামর্শ দিযেছিলেন। তাবা ট্যাক্সি কবেই কলকাতায বওনা দিযেছিলেন। কিন্তু মালদাব কাছে আসতেই ছেলেটিব অবস্থা খুব খাবাপ হযে পড়ায তাবা মালদাব হাসপাতালে তাকে নিযে এসেছিল।

স্নিগ্ধা মাঝপথেই বলে উঠেছিল, ছেলেটি বেঁচে গেছে তো?

অমিযা দেবী তাব জবাব না দিযে বলেছিলেন, আমি ছেলেটাব মুখেব দিকে তাকিযে দেখেছিলাম ওব চোখেব মণি দুটি স্থিব হযে আছে। ওব বেডেব কাছ থেকে ধীবে ধীবে

চলে এসে দেখি ডাক্তারবাবু ছেলেটির বাবাকে একটা ওষুধ আনতে বললেন। ভদ্রলোক ওষুধ আনতে যেতেই আমি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ছেলেটিকে কি রকম দেখলেন?

ডাক্তারবাবু বিষণ্ণ স্বরে বলেছিলেন, খুবই দুঃখের ব্যাপার। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। আমাদের কিছু করার নেই। যে কোনো মুহূর্তে মারা যাবে।

সত্যি তাই। ভদ্রলোক ওষুধ নিয়ে পৌঁছানোর আগেই ছেলেটি মারা গেল। ওর মার সেই কান্না এখনও আমার কানে ভেসে আসে। জানো স্নিগ্ধা, ঐ ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলে চলেছিলেন, ভগবান তুমি ওকে যখন দিলেই তখন কেড়ে নিলে কেন?

স্নিগ্ধা শুধু বলেছিল, আহা রে। কী নিদারুণ দুঃখ।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, হ্যাঁ স্নিগ্ধা, এই দুঃখের তো কোনো সান্ত্বনা নেই। তবু সন্তান-হারা মা ভগবানের কাছে তার সব দুঃখকে উজাড় করে দিয়ে হালকা হতে চেয়েছিলেন। ভগবান নামক ভদ্রলোকের সাথে এই মহিলার কোনো দিন দেখা হয়নি। ভবিষ্যতে কোনো দিন দেখাও হবে না। অথচ তার এই সবহারানোর যন্ত্রণার অভিযোগ জানাবার জন্য তিনি তাঁকেই বেছে নিয়েছেন। তার কাছ থেকে তিনি কোনো উত্তর পাচ্ছেন না। উত্তর চানও না। তব সব দুঃখকে ঢেলে দেওয়ার এই কাল্পনিক পাত্রটিই যে তার একমাত্র সান্ত্বনা। বলত স্নিগ্ধা, কোন বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে মায়ের এই শোক-তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়া সম্ভব? ভগবান আছে কি নেই এই বিতর্কে না গিয়ে এক্ষেত্রে ভগবান আছে ধরে নিলে যদি একটা মানসিক অবলম্বন পাওয়া যায় তবে ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে আপোষ করার মধ্যে কোনো নাস্তিক বা আস্তিকের দ্বন্দ্বের প্রয়োজন নেই।

স্নিগ্ধা বলেছিল, সত্যি অমিয়া, তুমি ঠাকুর দেবতা মানো না, অথচ এক দুঃসহ অভিজ্ঞতাকে আমার মনের মতো ব্যাখ্যা দিতে পারলে আমি দেবতাকে মানি। কোনো দিন ভাবি না তিনি দেখা দেবেন বলে, তবে তিনি আছেন এই বিশ্বাসটুকুই মনে সাহস দেয়। ছোটোবেলায় যখন একা বাথরুমে যেতে ভয় পেতাম তখন মা বলতেন ভয় কিসে আমি তো ঘরেই আছি। মা ঘরে আছে এই ভরসাতে বাথরুমে চলে যেতাম। অনেক দিন বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখতাম মা ঘরে নেই। অথচ মা ঘরে আছে ভেবে দিব্যি বাথরুমের কাজ করতে পারতাম।

অমিয়া দেবী প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বসুন্ধরা কোথায় গেল?

ও তো চলে গেছে।

চলে গেছে? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

সে কি? তুমি জান না? স্নিগ্ধা বলেছিল, বসুন্ধরা আমাকে বলেছিল, মামী, বড়মা এসে গেছে। তুমি ও বড়মামা আছ। আমার মাথাটা খুব ব্যথা করছে। বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ওর শরীরটা কি খারাপ মনে হল?

না তো। শুধু বলল, রাতে ঘুম হয়নি, একটু শুয়ে থাকলে মাথা ব্যথাটা সেরে যাবে। ও আজকে এসেছেও সেই ভোর বেলায়। আমিই আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও বলল, মামী আমি এখন যাই। বড় মা এলে চলে আসব। তোমাকে ও কিছু বলে যায় নি?

স্নিগ্ধার কথার কোনো উত্তর দেন নি অমিয়া দেবী। সেই ঝড়ের রাত আবার তার মনের পর্দায় আছড়ে পড়তে চাইছিল। স্বর্ণপ্রভাকে কলকাতায় আনার পর তিনি ঘন ঘন কলকাতায় এসেছেন। তিনি কি করে ভুলে গেলেন বসুন্ধরার উপর সেই ঝড়ের তাণ্ডবের খোঁজ নিতে? অথচ সেদিনের ঝড় যে বসুন্ধরার শরীরকে লণ্ডভণ্ড করে উৎপাটিত শিমুল গাছের মতন ছুঁড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল সে দৃশ্য তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। সেদিনের রাতের দস্যুকে

কি তিনি চিনতে পারেন নি? তাকে ধরতে তিনি কি সত্যিই চেয়েছিলেন? তিনি লোক মুখে খবর পেয়েছিলেন সে নিজেকে বাঁচাতে বিদেশে উড়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে দিল্লি নিবাসী তার দাদার আই. এ. এস. ব্যাচমেট এক বন্ধু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কই সেদিন তো দিল্লিতে উড়ে গিয়ে সেই ডাকাতকে ধরতে যান নি। বরং সে নিরাপদে পালাতে পারছে বলে কি স্বস্তি অনুভব করেন নি?

বসুন্ধরার শরীরটা তার চোখে একটু ভারী লেগেছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বসুন্ধরা তাকে এভাবে এড়াতে চাইছে কেন? আশঙ্কার জটাজালগুলি আরও কুটিল হয়ে অমিয়া দেবীর চিন্তার স্রোতে ঘূর্ণী সৃষ্টি করেছিল। মনে মনে নানা সম্ভাবনাব ভীড়গুলিকে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েও পারছিলেন না। একবার ভেবেছিলেন, বসুন্ধরা নিশ্চয়ই আশা করেছিল তিনি তমালকে তার সামনে হাজির করাবেন। তমালের পালিয়ে যাবার পথে বসুন্ধরাকে নিয়ে তাব পথ আগলে দাঁড়াবেন। বলবেন, তোর সব কিছু আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। দারিদ্র এড়াতে পালাবি কোথায়?

স্বর্ণপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন অমিয়া দেবী। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের মতন মৃত্যুর ছায়া ধীরে ধীরে তার মুখকে গ্রাস করে চলেছে। তার মুদ্রিত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন এই চোখ দুটি যদি হঠাৎ খুলে যায় তবে সেই চাউনির সামনে তিনি দাঁড়াবেন কি ভাবে? স্বর্ণপ্রভা যদি তাকে প্রশ্ন করেন, তমালকে বাঁচাতে তুই বসুন্ধবাকে কেন বলি দিলি? তার কী জবাব দেবেন তিনি? স্বর্ণপ্রভার অসুখের জন্য তিনি বসুন্ধবার দিকে তাকাবার সময় পান নি এই অজুহাতে তাকে মানানো যাবে না। বলবেন, কই বসুন্ধবা তো এতবড়ো বিপদের মুখেও তার দায়িত্বকে ভুলে যায় নি। স্বর্ণপ্রভাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে ট্যাক্সি ছাড়ার মুখে ড্রাইভারকে স্টার্ট বন্ধ করতে বলে সে ট্যাক্সি থেকে নেমে একছুটে বাড়ির ভিতরে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলেছিল, নিভামাসীর হাতে পঁচিশ হাজার টাকার চেকটা লিখে দিয়ে এলাম। ও টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে স্কুলে দিয়ে আসবে।

[১৪]

সেই ঝড়ের রাত্রির পর তমালের সাথে তাব আব দেখা হয়নি। পুলিসের হাতে যে সে ধরা পড়ে নি সে ব্যাপাবে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। কারণ পুলিসের হাতে ধরা পড়লে সে খবর অন্তত পক্ষে দাদার কাছ থেকে পেযে যেতেন।

আরেকটা ব্যাপার অমিয়া দেবীকে চিন্তিত করে তুলেছিল। সেটি হল নক্সালপন্থীদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর তমালের ভাবনায় তিনি নিজেও যে কবে ওদের রাজনীতি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলেন তা নিজেও বুঝতে পারেন নি। তমালের সাথে ওদের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চাইতেন। গোর্কির মা শুধু কয়েকবার পড়েছিলেন তা নয় বহুদিন তার বালিশের তলায় রেখে ঘুমিয়েছিলেন। তমালকে পাভেল ভলাসভ আর নিজেকে নিলভনা ভেবে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞের নানা কল্পনার জাল বুনতেন। সামাজিক অবক্ষয়ের মুখেও যুব যন্ত্রণার এই ক্ষোভ স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে এক ঝাঁক তরুণকে কোন প্রেরণায় রক্ত-পিচ্ছিল দুর্গম পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে বুঝতে চেয়েছিলেন।

শিলিগুড়িতে যখন ছিলেন তখন অনেকবার গেছেন ধুলা বাড়িতে। পথে পড়ে নক্সাল বাড়ি। পথের দুধারে চা বাগান। মাঝে মধ্যে পাথুরে জমি। সেচ নেই। এক ফসলা কৃষি . আদিবাসী কৃষকের বাঁচার উপকরণ।

অর্থনীতি নিয়ে এম. এ. করেছেন অমিয়া দেবী। এখানে এসে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবার সহপাঠী ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ডঃ দাশগুপ্ত। এখানে এসে দেখেছিলেন, সবাই এসেছেন গঙ্গার ওপার থেকে, ইউরোপ থেকে, ভাগ্যের সন্ধানে আমেরিকা যাত্রার মতন এরাও যেন কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে জায়গা না পেয়ে এখানে তাদের ভাগ্যের জমিটুকু খোঁজ করতে চাইছেন। সাথে নিয়ে এসেছেন এই অঞ্চলের মানুষের জন্য এক উন্নাসিক মানসিকতা। যেন, রাজধানীর বিত্তকে হেলায় সরিয়ে রেখে উত্তর বাংলার পতিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য এসে তারা গভীর আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। এখানকার ছাত্র মহলেও দেখেছেন এক হীনমন্যতা বোধ। শিলিগুড়ি শহরে ডাক্তারের চেম্বারের সামনের নেমপ্লেটে এবং প্যাডে এম. বি. বি. এস. (ক্যালকাটা) লেখার মধ্যে যতটা গর্ব ততটাই যেন লজ্জা এম. বি .বি. এস. (নর্থবেঙ্গল) লেখার মধ্যে। তাই যে ডাক্তারের প্যাডে বা নেমপ্লেটে শুধু এম. বি. বি. এস. লেখা আছে, ধরে নেওয়া যায় তিনি এই নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। অথচ অমিয়া দেবী এমন অনেক প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারকে চেনেন যিনি এই কলেজ থেকে পাশ করে অত্যন্ত সুনামের সাথে চিকিৎসা করছেন। মনে হয়েছিল এক হীনমন্যতার মেঘ সমগ্র উত্তরবঙ্গের আকাশে প্রভুত্ব করে চলেছে। এই হীনমন্যতা বোধই যে একসময় বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রভাবনার আবর্তে ঠেলে দেয় সেই ইতিহাসের পাতাকে কেউ উল্টে দেখতে চায় নি।

ডঃ দাশগুপ্তকে এর ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল। কলকাতার মানুষ ডঃ দাশগুপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন অধ্যাপনার নিযোগ পত্র নিয়ে। ভালবেসে ফেলেছেন এখানকার মানুষ ও প্রকৃতিকে। তার যত আলোচনা ও লেখা, এখানকার জনজীবনকে কেন্দ্র করে।

এখানে গিয়েছিলেন হিমালয়ান স্টাডি সেণ্টারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ। স্থাপিত হয়েছিল গাল ভরা উদ্দেশ্য নিয়ে। আঞ্চলিক বিষয়ে গবেষণা ও তার উন্নয়নে এই বিভাগ মনোযোগী হবে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি ছাপাবে না। অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ঘটনা প্রবাহের উপব মৌলিক অবদানও যোগাবে। সেখানেও এধরনের কোনো উল্লেখযোগ্য নমুনার খোঁজ পান নি। হযতো গঙ্গার ওপারের অভিভাবকেরা এই বঙ্গে অস্থির পদকম্পনের শব্দ অনেক আগেই শুনতে পেতেন। এখানে তার সাথে পরিচয় হয়েছিল ডঃ মিশ্রের। আপনভোলা কাজ পাগল এই মানুষটি নানা বিষয় নিয়ে ভেবে চলেছেন। কিন্তু রূপ দেওয়ার অবলম্বন পাচ্ছেন না বলে হতাশ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে পড়েছেন।

এখানেই দেখা হয়েছিল সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ ভৌমিকের সাথে। চা বাগিচার শ্রমিকদের উপর তার গবেষণামূলক বইটি এই অঞ্চলের প্রাণ ভোমরাদের বিষয়ে তাকে আকৃষ্ট করেছিল।

'চিয়া কো বোটমা সুন ফলছ'—চায়ের গাছে সোনা ফলে—এই হাতছানিতে দলে দলে মানুষ সেদিন পাড়ি দিয়েছিল বোনাল্ডসের 'ল্যাণ্ড অফ দি থাণ্ডার বোল্ট'-এর দেশে।

কী অসীম ক্ষমতা এই দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির সবুজ গাছের। আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপের মতো এক জনবিরল শ্বাপদশঙ্কুল অঞ্চলটিকে সম্পদের চাদরে মুড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই সম্পদ কেন এখানকার মানুষের মনে স্বস্তির হাসি ফোটাতে পারল না? অথচ এই চা গাছের পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু করে জমা হয়ে আছে এই অঞ্চলের মানুষের হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, সংগ্রাম-আত্মসমর্পণ, আত্মত্যাগ-বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

ধাতব যন্ত্রের পেষণে পিষ্ট হয়ে দুটি পাতা আর একটা কুঁড়ির কচিদলগুলি সভ্যতার স্মারক শুষ্ক চায়ে রূপান্তরিত হয়। চায়ের পেয়ালায় গরম পানীয়তে চুমুক দিয়ে ঘ্রাণের আমেজে মাতোয়ারা মনে এরই পাশাপাশি যে আরেক জীবন স্রোত এই বাগিচাগুলিকে কেন্দ্র করে

আবর্তিত হয়ে চলেছে তার খোঁজ রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তাই এদের কথাগুলি এতদিন আর সব শহরবাসীর মতন অমিয়া দেবীর কানেও অচেনা মনে হয়েছিল। এখানে এসে এই কালো পাথরে গড়া খোদাই করা মূর্তির মতন চা বাগিচার মানুষগুলির আনুগত্য দেখে বাবাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, এখানকার চা, বাগানের মানুষ শহরের মানুষের মতন তর্ক করে না। যা বলা যায় বিনা প্রতিবাদে তা করে দেয়। তোমার জামাই চা বাগানের এক শ্রমিকের মেয়েকে বাড়িতে কাজের জন্য নিয়ে এসেছে। সে কোনো কাজে না করে না। ওকে যদি না ঘুমিয়ে না খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে বলা হয় তবু ওর মুখ থেকে না শব্দ বের হবে না। ওরা এতটাই অনুগত।

তাই যখন শুনেছিলেন ঐ কালো পাথরের মানুষগুলি তাঁদের অধিকারের কথা বলতে তীর ধনুক হাতে নিতে চাইছে তখন সেই চেনা মুখগুলি তার কাছে অচেনা মনে হয়েছিল। আনুগত্যের ভাষার পরিবর্তে তাদের মুখে অধিকারের বুলি ফুটেছে শুনে এদের বিদ্রোহী বলে মনে হয়েছিল। এরা অহল্যামাটির ঘুম ভাঙাতে দধীচি হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে বলে এতদিন মনে করে এসেছিলেন। ফলে এরা যখন তাদের হাড়, মাংস, মজ্জা দিয়ে অহল্যাভূমির ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে উর্ববা করেছে তখন তাকে তা তাদের দায়িত্ব বলেই ধরে নিয়েছিলেন। এরা তাদের পাঁজরা দিয়ে এই অঞ্চলের নিস্তব্ধতার দৈত্যকে হত্যা করে নগরায়নের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট মানুষেরা তো ভাবেনি, এই সব দধীচিদের উত্তরপুরুষদের কিছু দিতে হবে। একবারের জন্যও মনে হয়নি এরা একদিন তাদের পাওনা দাবি করতে পারে। আজ যখন ঐ সমস্ত দধিচীর বংশধরেরা তাদের পূর্বপুরুষদের বুকের পাঁজরায় গড়া বজ্রে অর্জিত সম্পদের ভাগ চাইছে তখন সেই অর্জিত সম্পদের দখলদার দেবতারা তাদের দাবি যে কত পদস্খলনজনিত তা প্রমাণ করতে এদের কখনো উগ্রপন্থী আবার কখনো বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।

ডঃ ভৌমিক বলেছিলেন, এই মানুষগুলিকে নিয়ে কাজ করে দেখুন এখানে নানা ভাবনার এক বিশাল খনি পড়ে আছে। বাংলার উত্তর খণ্ডের মতন এত বৈচিত্র ভারতবর্ষে আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। এখানকার জনজীবনের বৈচিত্রের কথাই ধরুন না কেন। পলির উপর পলি পড়ে স্তরে স্তরে জমা হয়ে যেমন গড়ে উঠে একটা ভূখণ্ড, তেমনি এই অঞ্চলের বর্তমান বসবাসকারী মানুষেরা এসেছে নদী স্রোতবাহিত পলির মত, সেই স্রোতে এখানে এসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত হয়েছে এখানকার আদিবাসীদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, গড়ে তুলেছে পাললিক শিলার মতন এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী। এই অঞ্চলের প্রধান এক জনগোষ্ঠী এসেছে দেশের পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করে। এদের ইতিহাস যেমন প্রাচীন তেমনি বিশাল। এদের উৎস সন্ধানে যেতে হবে কামতাপুরে, অহম রাজ্যের সীমানা প্রদেশে। এখানে এসেছে কষ্টিপাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো কালো মানুষগুলি। এদের ইতিহাস রচনা করতে হলে যেতে হবে ছোট নাগপুর, মানভূম ময়ূরভঞ্জের আদিবাসীদের আপন ঘরে। এই জনস্রোতে মিশেছে পার্বত্য জনজাতি। এরা এসেছে তুষার ঢাকা উত্তরের হিমালয়ের গা বেয়ে। এখানকার জন বিন্যাসের জটিলতাকে বুঝতে না পারলে এ অঞ্চলের অস্থিরতাকে যেমন বোঝা যাবে না, তেমনি এখানে ভূমি আন্দোলনে সব মানুষকে এক মঞ্চে সামিল করা সম্ভব নয়।

গবেষণার সিনপসিস জমা দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। অনুমোদন পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বিষয় ছিল উত্তরবঙ্গের জনজীবনে চা বাগিচা শিল্পের প্রভাব।

শাল, সেগুন, ধুপি আর টুন—প্রকৃতি উত্তর বাংলার উত্তর ভাগকে এ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। এরই মাঝে গজরাজের বৃংহতি, হরিণের চকিত শঙ্কাভরা চাউনি, ডোরাকাটার

দীপ্তি, তার পাশে শঙ্খচূড়ের হিমশীতল হিস্ হিস্ শব্দ আর ম্যালেরিয়ার বাহক মশককুলের অপ্রতিহত অভিযান—এই ছিল উত্তব বাংলাব পরিচয়।

এখানেই জন্মায় মাটি থেকে মাথা উঁচু কবা সবুজ সোনার ঝোপ। মানুষের হাতে বাধা না পড়লে এরা ত্রিশ ফুট আকাশ সীমা পর্যন্ত মাথা বাড়াতে পারে। তবে এদের ডাল থেকে দুটি পাতা আব একটি কুঁড়ির সবুজ সোনাকে পিঠের ঝুড়িতে ভরার সুবিধার জন্য মানুষ একে তিন ফুটের ঝোপে নামিয়ে এনেছে। এবই নাম চা গাছ। যান্ত্রিক পেষণের পর মানুষের কাছে শুধু চা।

এখানেও সেই একই ইতিহাস। যে ইতিহাস্ আমেবিকা মহাদেশে কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে এনেছিল, যে ইতিহাস আজ শ্রীলঙ্কায় তামিলদের এনেছিল সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এই চা বাগিচা শিল্পের বর্তমান জনবিন্যাসে।

লড়াইটা শুরু হয়েছিল তরাই-এর এই গণ্ডগ্রাম থেকে। একপাশে চা বাগিচা। অপর পাশে মেচি নদী। নেপাল সীমান্ত। চা বাগানের ডাকে এখানে এসেছিল বিহার, মধ্যপ্রদেশ এমন কি উড়িষ্যার আদিবাসী অধ্যুসিত অঞ্চল থেকে। চা বাগিচার কাজ হারিয়ে এদের অনেকেই নক্সাল বাড়ি এলাকার পতিত জমি চাষবাসেব মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উপকরণ করেছিল। অর্থাৎ কোনো ভাবেই এরা কৃষকের চরিত্রের অধিকারী ছিল না। অথচ নক্সাল বাড়ির কৃষি-বিপ্লব শুরু হযেছিল এদের নিয়েই। আব যাবা প্রকৃত অর্থেই ছিল কৃষক, চা বাগিচার হাতছানিকে উপেক্ষা করে যারা তাদের কৃষি ভূমিকেই একমাত্র অবলম্বন বলে আঁকড়ে রেখেছিল, সেই ভূমিপুত্র রাজবংশী সম্প্রদায় পূর্ববাংলা থেকে আগত আরেক জনস্রোতের চাপে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েও কেন এই কৃষিবিপ্লবে সামিল হতে চাইল না তার কারণ কৃষি-বিপ্লবের কর্ণধারেরা খোঁজ করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

অমিয়া দেবী খোঁজ নিয়ে দেখেছিলেন প্রসাদু জোতে নিহত কৃষক রমণী সহ শহিদদের মধ্যে একজনও রাজবংশী ছিলেন না। বরং তাবা ফাঁসিদাওয়ার ভূস্বামী সম্পদ রায়ের নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে মিছিল সংগঠিত করেছিল তা ছিল অভূতপূর্ব বিশাল। এক বঞ্চিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর এক বঞ্চিত সম্প্রদায় কেন এই জেহাদ ঘোষণা করল তারও কারণগুলি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল বলে কৃষি-বিপ্লবের নেতারা মনে করেন নি।

ভূমি হারানোর যন্ত্রণা যে রাজবংশী সম্প্রদায়কে অস্থির করে তুলতে পারে সে খবর তো অমিয়া দেবী নিজেই জেনেছিলেন।

অমিয়া দেবী বিয়ের পর শিলিগুড়িতে এসে যে পাড়ায় উঠেছিলেন তার নাম কলেজ পাড়া। অভিজাত বাঙালি অধ্যুষিত এই পাড়াটির পূর্ব নাম ছিল কালিপ্রসন্ন জোত। এখানকার ভূমিপুত্র রাজবংশী জোতদারের নাম। অমিয়া দেবীর বাড়িটি বিশাল। চারতলা। প্রতি তলায় দুটো করে তিন রুমের ফ্ল্যাট। তাদের ফ্ল্যাটটি চারতলায়। দক্ষিণ দিক খোলা, পশ্চিমে ব্যালকনি। প্রতুলবাবুকে অনেকদিন খুব ভোর বেলায় ট্যুরে যেতে হত। মাঝে মধ্যে ছিল কার প্রোগ্রাম। সেই ভোরবেলায় গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটার ও ডাক্তারকে দেখে বাড়িতে ফিরতে গভীর রাত্রি হতো। ফ্ল্যাট বাড়িটির চারিদিকে উঁচু বাউণ্ডারী ওয়াল। সামনে বিশাল লোহায় ঢাকা গেট। প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার কাছেই গেটের চাবি থাকে। ভোরবেলায় বেরোতে বা গভীর রাত্রিতে বাড়ি ফিরলে যে যার চাবি দিয়ে সেই গেট খুলে আবার বন্ধ করে দিত।

সেদিন প্রতুলবাবুর কার প্রোগ্রাম ছিল। যেতে হবে কোচবিহার পর্যন্ত। শীতের সকাল, খুব ভোর বেলাতেই বেরিয়েছিলেন প্রতুলবাবু। অমিয়া দেবী নেমে এসেছিলেন। প্রতুলবাবু

বেরিয়ে গেলে গেটে চাবি দিয়ে চলে আসবেন। গেট্ খুলতেই প্রতুলবাবু চীৎকার করে উঠেছিলেন, চোর, চোর।

প্রতুলবাবুর চীৎকার শুনে ফ্ল্যাটের আরো কয়েকজন ছুটে এসেছিল। দেখতে দেখতে এই শীতের সকালেও ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছিল। অমিয়া দেবী তাড়াতাড়ি গেটের বাইরে এসে দেখতে পেয়েছিলেন, গেটের কাছে একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। গেটের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা রাজবংশী। তারা ভয়ে ঠক ঠক্ করে কাঁপছে। প্রতুলবাবুর হাতে এক রাজবংশী যুবকের জামার কলার। তার গায়ের চাদরটা মাটিতে পড়ে আছে। কিল, চড় বর্ষণে ঠোঁট ও কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। অমিয়া দেবী যুবকটির কাছে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, আইন নিজের হাতে নেবে না। ও যদি চোর হয়ে থাকে তবু মারার অধিকার কারো নেই। দেশে পুলিস আছে, তার হাতে তুলে দিলেই হবে।

সেই বৃদ্ধা অমিয়া দেবীর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে বলেছিল, আমরা চোর নই, মা। আমরা আমাদের কুলদেবতার পূজা দিতে এসেছিলাম।

পূজা দিতে এসেছিলে?

হ্যাঁ মা, এই বাড়িতেই যে আমাদের কুলদেবতা থাকে।

প্রতুলবাবুর হাতে তখনও ছেলেটার জামার কলার। বলেছিলে না, চুরি করার মতলবে এসে ধরা পড়ে গেছ। তাই গল্প বানাচ্ছ? বুড়ি হয়েছ, দুদিন বাদে মরবে। সাথে ছেলেটাকেও এনেছ চুরি করতে?

বৃদ্ধ হাত জোড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিল, আমরা চোর নই বাবু। ও আমার নাতি। ও আসতে চায় নি। আমরাই ওকে জোর করে নিয়ে এলাম। আমাদের দোষে ও এমন মার খেল।

কে জানি বলে উঠেছিলো, হারামজাদা বুড়োটাই পাকা চোর। এখন নাতিকে তালিম দিচ্ছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ওদের বলতে দিন। এইভাবে কেউ চুরি করতে আসে না।

বৃদ্ধ এইবার হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। হ্যাঁ মা, আমরা চুরি করতে আসি নি। আপনাদের এই বাড়ির জায়গাটা আমার ছিল। এখানেই ছিল আমার বাড়ি। আর এই যে তোমাদের বারান্দা সেখানেই ছিল আমাদের কুলদেবতার ঘর। ঘোষবাবুরা যখন আমার বাড়িটা কিনেছিলেন তখন আমি বলেছিলাম এই জায়গাটুকু আমাকে ছেড়ে দাও। এখানে আমাদেব কুলদেবতা শিবঠাকুর থাকেন। ঘোষবাবু বলেছিলেন, এই জায়গাতো তোদেরই থাকল। যখন খুশি পূজা দিতে আসিস। ঘোষকর্তা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পৌষ সংক্রান্তিতে আমরা পূজা দিতে আসতাম। ঘোষবাবু মরার পর তার ছেলেরা আর আমাদের বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেয় না। আমার বৌ মানতে চায় না। তাই খুব ভোরবেলায় যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন আমরা গেটের বাইরে পূজা সেরে চলে যাই। এই দেখ মা, আমাদের মোমবাতি, সিঁদুর আর বাতাসা। একটা পায়রা বলি দিতে এনেছিলাম। সেটা এই বাবুর ভয়ে হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছি।

অমিয়া দেবী ওদের নিজের ঘরে এনে বসিয়েছিলেন। নিজে হাতে তরুণটির ক্ষতস্থানে অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক লোশন দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন, এ জমি তারা দেড়শ টাকা কাঠা দরে বিক্রি করেছিল। আজ এ পাড়ার জমির দাম দু লক্ষ টাকা কাঠা। সঙ্গের তরুণটি তার নাতি। নাম সন্তু। শহরে রিকশা চালায়। ঠিকানা দিয়েছিল ফুল বাড়ি, মহানন্দার কাছে। অমিয়া দেবী খোঁজ করতে গিয়েছিলেন সন্তুর। তার গবেষণায় জানতে চেয়েছিলেন সন্তুরা কেন কৃষি বিপ্লবের উত্তাপ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

সন্তুদের খোঁজ পান নি। তিস্তা প্রকল্পে সন্তুদের জমি অধিগ্রহণের আওতায় পড়ে সন্তুরা আবার নিজভূমিতে দ্বিতীয়বারের জন্য পরবাসী হয়েছে। অমিয়া দেবী রাজবংশী রিকশাচালকদের মধ্যে সন্তুদেব খুঁজে বেড়াতেন। ভাবতেন সন্তু যখন ক্লান্ত শরীরে কলেজ পাড়ায় তাদের সেই বাড়ির পাশ দিয়ে রিকশা চালিয়ে যায় তখন নিশ্চয়ই তার মনে বঞ্চনার ক্ষোভ বিক্ষোভের আগুন জ্বালায়। তবু বাঙালি মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে নক্সাল বাড়ির বিপ্লবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটা অংশ এলেও ভূমিহারা ভূমিপুত্র রাজবংশীরা যোগ দিতে চাইল না কেন?

এই প্রশ্নে তমালের সাথে দু'একবার আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। তমাল বলত তোমার কথাগুলো সংশোধনবাদীদের কাছ থেকে ধার করা।

তর্ক তুলতেন অমিয়া দেবী, গরিবের কথা বলিস। অথচ গরিব মানুষগুলি তোদের ডাকে সাড়া দিতে চাইছে না কেন সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিবি না—এটাই তোদের মধ্যবিত্ত অহমিকা।

তমাল বলত তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে চাইছ কেন?

আমি বুঝি দেশের মানুষ নই?

—তোমাকে এসব বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই।

—ঠিক বলেছিস। কিন্তু বলতো গ্রামের কটা ছেলে স্কটিশ, প্রেসিডেন্সি বা শিবপুরে পড়তে আসে?

—বলেছি তো তোমার পিছনে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

—কথাটা ভুল বলিস নি তমাল। তোরা যতই আদর্শবাদের কথা বলিস না কেন, মানুষ কিন্তু তোদের কথা বুঝতে পারছে না। তোরা যারা গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরতে চাইছিস তারাও জানিস না, এটা একটা মধ্যবিত্ত সুলভ রোমান্টিকতা।

কী বলতে চাইছ? রাগে তমালের নাকটা ফুলে উঠেছিল।

হেসে ফেলেছিলেন অমিয়া দেবী। বলেছিলেন, দেখলি তো কত সহজেই রেগে যাস। এটাকেই বলে মধ্যবিত্তের অহমিকা। তোদের ধারণা তোরাই সব জানিস আর বাকিরা সব মূর্খ। তাই ধরে নিয়েছিস পতিত পাবন হরির মতন তোরা কৃষক সমাজকে উদ্ধার না করলে কৃষকেরা মুক্তির পথ খুঁজে পাবে না। কৃষকেরা তোদের ভাষা বুঝতে পারছে কিনা তা জানার প্রয়োজন অনুভব করিস না। তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঐ সব কলেজগুলিতে কটা কৃষকের ছেলে পড়তে আসে? এখানে পড়িস তোরা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা। তোদের দেখে আমার শেলির বিপ্লবের কথা মনে পড়ে যায়।

সে আবার কবে বিপ্লব করল?

শেলি তো বিপ্লব করতে চান নি। বিপ্লবের রোমান্টিক স্বপ্নে সাঁতার কাটতে চেয়েছিলেন। তাই তার বৈপ্লবিক বাণীগুলি লিখে বোতলে ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতেন। ভাবতেন, এই বাণীগুলি ভাসতে ভাসতে যে তীরে পৌঁছবে সেখানেই বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হবে। তোরাও তাই বালিগঞ্জ, নিউআলিপুর থেকে প্রেসিডেন্সির দেয়ালে দেয়ালে কৃষি বিপ্লবের বাণী লিখে বিপ্লবের রোমান্টিকতার আমেজ নিতে চাইছিস।

তমাল বলেছিল, সেই জন্য তো আমরা গ্রামে যাবার আহ্বান জানিয়েছি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমার ধারণা এর পিছনে আছে এক অবচেতন মানসিকতা। তোরা প্রায় সবাই এসেছিস প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। মধ্যবিত্ত সমাজ ও পরিবারের মূল্যবোধ এসে ঠেকেছে একেবারে তলানিতে। ফলে যে সমস্ত তরুণ মনের কোণে একটা আদর্শবোধকে পুষে রেখেছে তারা এই অবক্ষয়ী সমাজের গণ্ডি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চাইছে। আর এই ভাবনা যে শুধু আমাদের দেশে ঘটছে তা নয় দেশে দেশে ঘটে চলেছে।

যেমন?

ফরাসী দেশে নিওল্যাফট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিপি। খোঁজ নিয়ে দেখ এরা সবাই এসেছে উচ্চমধ্যবিত্তের ঘর থেকে।

তুমি আমাদের হিপিদের সাথে তুলনা করলে? তমাল প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চাইছিল।

না, আমি তোদের হিপিদের সাথে তুলনা করিনি। শুধু বলতে চেয়েছি দেশে দেশে মধ্যবিত্ত সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে যুব সমাজের বিক্ষোভ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে।

তুমি কথাগুলি আরো সহজ করে বলো। তমাল একটা চেয়ার টেনে এনে তার কাছে বসেছিল।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিলেন অমিয়া দেবী। যারা একজন ট্র্যাফিক কনস্টেবল খুন করে আসতে পারে তাদের সাহসের প্রশংসা আমি করি। তারা জানে, একটু অসতর্ক হলেই সেই কনস্টবলের গুলিতেই তার হৃদপিণ্ড ফুটো হয়ে যেতে পারে। তবু সে তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে এই ঝুঁকি নিতে দ্বিধাবোধ করে না। যে ছেলে নিজের প্রতি উদাসীন হতে পারে তাকে যদি সঠিক বিপ্লবের পথটা চিনিয়ে দেওয়া যেত তবে এদেশের বিপ্লবকে রোখার ক্ষমতা কারো হতো না।

তুমি বলতে চাইছ আমাদের এই পথ তাহলে ভুল?

খুব জোর গলায়;

একেবারে ডাঙ্গে হয়ে গেলে যে।

সেও আমার মত ভাবে নাকি?

তাই তো শুনি।

আমি রাজনীতি বুঝি না। বাবার কাছে শুনেছি অনুশীলনি গ্রুপের কথা। তাদের আদর্শ, আত্মত্যাগ, সবই প্রশ্নাতীত। তবু দেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদের পথকে যে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত তার দায়িত্ব বিপ্লবীরা অস্বীকার করতে পারে না।

কী রকম? তমালের স্বরে একটা আগ্রহের সুর।

বিপ্লবীরা কালিঠাকুর ও গীতাকে স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করত। এগুলি নিশ্চয়ই অহিন্দু সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করতে পারে না। বরং তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। বিপ্লবীদের এত বড় আত্মত্যাগ সত্ত্বেও দেশের সংস্কৃতি ও তাদের সামাজিক স্তর বিন্যাসকে আমল না দিয়ে সে দিন তারা দেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সেই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করে রেখেছিল।

—তাদের সাথে আমাদের মিল কোথায়?

আছে, অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোরাও দেশের মানুষের চেতনার স্তরকে ভাবনার মধ্যে না এনে তোদের ভাবনটাকেই জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছিস। ফলে সাধারণ মানুষ তোদের ভালোবাসার পরিবর্তে আতঙ্কের চোখে দেখছে। তোদের শ্রেণী সংগ্রাম, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাষা তাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। ফলে যাদের জন্য জীবন দিতে চাইছিস অনেক ক্ষেত্রে তারাই তোদের পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু মা আমাদের তো বুর্জোয়া শক্তি ও তাদের কাজের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। ওদের প্রচার যন্ত্র প্রচণ্ড শক্তিশালী।

ভালো কথা বলেছিস্। টানটান হয়ে বসেছিলেন অমিয়া দেবী। কোন দেশের বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি প্রকৃত বিপ্লবীদের পক্ষ নেয়? একেই বলে মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতা। যে দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ নিরক্ষর সে দেশের কটা মানুষ সংবাদপত্র পড়ে বলত? শুনেছি তোরাও

কাগজ প্রকাশ করিস। সি পি আই, সি পি এমও প্রকাশ করে। তবু যারা সংবাদপত্র পাঠ করে তাদের মধ্যেও কত জন এই সব পত্রিকা পড়ে? তোরা তো সাধারণের কথা লিখিস। তবে কেন তোদের কাগজের প্রচার ওদের তুলনায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। রেড বুকে সাধারণ মানুষের শোষণ মুক্তির পথের কথা বলা আছে। তবু গ্রামের চণ্ডিতলায় রামায়ন গানের জমায়েতের কাছে তোদেব বেড বুকের শ্রোতারা কেন হারিয়ে যায়? এসব কথা তোরা ভাবিস না। এদেশের মানুষ, এদেশের ইতিহাস, এদেশের ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে তোরা দেশটাকে না দেখা ঐ দেশের অনুকরণে গড়তে চাইছিস। তাই তোদের কথাগুলো মানুষের কাছে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। তোবা যখন চীনের চেযারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান বলে দেওয়ালে লিখিস তখন এদেশেব মানুষের কাছে চেঙ্গিস খানের ইতিহাস জেগে ওঠে। যে দেশের এত বড়ো একটা ঐতিহ্য আছে, যার একটা সংগ্রামী ইতিহাস আছে সে দেশের মানুষ কেন অন্যদেশের নেতৃত্বকে তাদের নেতা বলে মেনে নেবে?

তমাল বলেছিল, বুর্জোয়া ভাবনার আফিং তোমাকে আচ্ছন্ন করে বেখেছে মা। বিপ্লব কোনো ভৌগোলিক সীমায আবদ্ধ থাকে না। আমাদের কাছে ভারত-চীনের এই ভৌগোলিক প্রাচীরের কোনো মূল্য নেই। দুই দেশের শ্রমিক, কৃষক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা এই বুর্জোযা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও গুঁড়িয়ে ফেলে এক বিশ্বে রূপান্তরিত করতে চাই।

অমিয়া দেবী ম্লান হাসিব একটা বেখা মুখে টেনে এনে বলেছিলেন, আমি কি এত রাজনীতি বুঝি? তোদের কথা বুঝতে আমার আরো সময় লাগবে। তুই আমাকে বোঝাস। মা ছেলে একসাথে বিপ্লবের কাজে নেমে যেতে পারব।

| ১৫ |

আরেকটি ছেলেব সাথে পরিচয় হয়েছিল অমিয়া দেবীর। তমালের বন্ধু। এসেছিল তমালের সাথে। শ্যামলা, বোগা, ছিপ্‌ছিপে চেহারা। চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল। প্রেসিডেন্সি থেকে ইংরেজী অনার্স নিযে পাস করেছিল। নাম বলেছিল কুহক।

প্রথম দিনেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন অমিয়া দেবী। মুখে হালকা নরম দাড়ি গোঁফ। চুলগুলি অবিন্যস্ত, ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। ঠোঁট দুটো পাতলা, চ্যাপ্টা ছোট কপাল। হাতের নোখগুলি অযত্নে বর্দ্ধিত। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, ঘাড়ে ব্যাগ। হাসিটা খুব সুন্দর, অনেকটা করুণা-ঘন যীশুর মতন।

কুহকেব বিনয়, নম্র ব্যবহার দেখে অমিয়া দেবী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এই নরম মুখটাই শ্রেণী-শত্রু নিধনে ইস্পাতের মতন শক্ত হয়ে উঠতে পারে। শুনেছেন কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি নি, এই রোগা আঙুলগুলি লক্ষবস্তু ভেদে রাইফেল ও বিভলবারের ট্রিগারে নির্ভুলভাবে চাপ দিতে পারে। শুনেছিলেন, ঝানু গোয়েন্দার চোখ এড়াতে কোনো এক মহকুমা হাসপাতালের মর্গে বেওয়ারিশ মরাব পাশে নিজের এই শরীরটাকে অপূর্ব কৌশলে মিশিয়ে দিয়ে সারা রাত কাটিযে দিয়েছিল। সেই ঝানু গোয়েন্দা তার পাশ দিয়ে বার কয়েক হেঁটে গিয়েও তা টের পায় নি।

বুক খোলা পাতলা পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে কুহকের হাড়-সর্বস্ব বুকের খাঁচাটা দেখতে দেখতে অমিয়া দেবী বুঝে উঠতে পারছিলেন না পাজরার এই ছোট্ট খাঁচার মধ্যে কিভাবে এত বিশাল সাহস লুকিয়ে থাকতে পাবে?

মাসী, প্রথম ডাকেই কুহক আত্মীয়তার সুর তুলেছিল। কিছু খেতে দাও। নয়তো মুখ দিয়ে স্টীম ইঞ্জিনের মতন ভক্ ভক্ করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করবে।

ধোঁয়া বেরোবে কি করে? আমার সামনে সিগারেট খাবি নাকি? কুহকের কথার ভঙ্গিতে অমিয়া দেবী হেসে ফেলেছিলেন।

একটা মিষ্টি হাসির ঢেউ কুহকের সাবা মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল, যাক মাসী. কাজটা অনেক হালকা করে দিলে। তা না হলে আমাকে পারমিশনটা চেয়ে নিতে হতো।' তবে এই ধোঁয়া তো সেই ধোঁয়া নয়।

তবে?

খিদেয় পেটের নাড়ি-ভুড়ি জ্বলছে মাসী। তাদের পোড়া ধোঁওয়া বেরোতে শুরু করবে।

আহা রে, মনটা সাথে সাথেই আর্দ্র হয়ে উঠেছিল অমিযা দেবীর। মনে হযেছিল কে যেন তার বহুদিনের তৃষিত আকাঙক্ষার পাত্রে শীতল জল ভবে দিয়েছিল।

তিনি তো চাইতেন, তমাল এসে তার কাছে সেই ছোটোবেলাব মতন আবদার করুক, মা আমার খিদে পেয়েছে। কিন্তু তমালকে খিদের কথা জিজ্ঞাসা কবলে ও বিবক্ত হত। ভাবতেন, খাবার সময় ওর পাশে বসে থেকে শুনবেন, কোনটা কেমন হযেছে। ও বলবে, মা এটা আরেকটু দাও।

কিন্তু তমাল মাথা গুঁজে নিঃশব্দে খেয়ে যেত। বলত, খাওয়ার সময় আমার সামনে অন্য কেউ থাকলে আমার ভালো লাগে না।

প্রথম প্রথম কথাগুলি গায়ে মাখতেন না অমিয়া দেবী, ক'দিনই বা ছেলেকে তিনি কাছে পেতেন! ছুটিতে ও আসত, নয়তো তিনি ক'দিনের জন্য কলকাতায যেতেন। স্নেহের ধমক দিতেন, বড্ড ডেঁপো হয়েছিস, মা আবার কবে থেকে তোর কাছে অন্য লোক হল রে?

আমার যা ভালো লাগে না তাই জানিয়ে দিলাম। মাথা নীচু কবে খেতে খেতে জবাব দিয়েছিল তমাল।

একটু মুড়িঘণ্ট নে।

তোমার এই কথাগুলি বড্ড বিরক্তিকর মা। আমার লাগলে আমি চাইব। এটা নে, ওটা নে বলে আমাকে বিরক্ত করবে না।

তমালের খাওয়া দূর থেকেই দেখতেন। তমাল চুপচাপ খেয়ে উঠে যেত।

সেদিন তাড়াহুড়ো কবে নিজে হাতে লুচি আব বেগুন ভাজা করে এনে কুহককে খেতে দিয়েছিলেন।

কুহক তার সারা মুখে হাসিব বিদ্যুত ছড়িযে বলেছিল, ও মাসী, তোমার সত্যিই তুলনা নেই। তুমি আমার মনের কথা কী ভাবে বুঝলে বলতো?

কেন রে?

লুচি খাবার কথা কদিন ধরেই মনে হচ্ছিল। নাকে লুচির গন্ধও পাচ্ছিলাম। আউশের ভাত আর পাট পাতার ঝোল খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে গেছে। কি জানি, এত ভালো খাবার আমার কপালে আছে কিনা। হয়ত লুচির গন্ধেই আমার মায়ের ভাইরা বাড়িটা ঘিরে ফেলে মামার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবে।

মমতার একটা অদৃশ্য টান অনুভব করেছিলেন অমিয়া দেবী এই রোগা ছেলেটার জন্য। বলেছিলেন, তুমি খাও বাবা। আমি ওদিকটা দেখি।

খপ্ করে অমিয়া দেবীর একটা হাত ধরে ফেলেছিল কুহক। বলেছিল, তা হবে না মাসী। মার কাছে বসে কোনো দিন খাওয়ার সুযোগ পাইনি। তমাল সেই সুযোগ দিল, আর তুমি পালাতে চাইছ? তুমি পাশে বসে না খাওয়ালে আমি খাব না।

অদূরে বসে থাকা তমালের দিকে তাকিয়ে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কিরে, তোর অসুবিধা হবে না তো?

মার কথাটার মধ্যে যে একটা খোঁচা ছিল সেটা না বোঝার কথা নয় তমালের। গম্ভীর হয়ে বলেছিল, তুমি কুহকের পাশে বসবে, আমার অসুবিধা হবে কেন?

এরপর আরো কয়েকবার এসেছে কুহক। একবার গভীর রাত্রে এসে দরজা ধাক্কা দিয়েছিল। সেদিনও ছিল এক ঘন বর্ষার রাত। দরজা খুলে ওকে দেখে চমকে উঠেছিলেন অমিয়া দেবী। সারা শরীর ভিজে একাকার। গায়ের কালো চামড়া ভিজে আরো কালো হয়ে যেন হাড়ের সাথে একেবারে মিশে গেছে। গালের হনূ দুটি চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু দুটি চোখ সেই আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল।

তুমি? এত রাতে? এই ঝড়-জল মাথায় করে? বিস্ময়ে ও আতঙ্কে অমিয়া দেবীর কথাগুলি আর্তনাদের মতন শুনিয়েছিল।

চুপ মাসী, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলেছিল, তোমার ঘরে ডিমলাইট নেই?

আছে, কিন্তু কেন?

লাইটটা অফ করে দিয়ে ডিমলাইট জ্বালিয়ে দাও মাসী।

কেন? কী হয়েছে? অমিয়া দেবীর কণ্ঠস্বরে চাপা আতঙ্কের সুর।

এত রাতে ঘরে আলো জ্বলতে দেখলে পুলিসের চোখ পড়তে পারে। কুহক জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে এসে বলেছিল। এ পর্যন্ত এসেছে বলে মনে হয় না। তবে নদীর ওপার পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল।

সারা শরীরে একটা কাঁপুনি অনুভব করেছিলেন অমিয়া দেবী। বর্ষার ট্যাঙ্গন। এপার ওপার দেখা যায় না। স্রোতের টানে হাতি ভেসে যায়। কোনো মতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই ঝড় বৃষ্টিতে নদী পার হলে কী ভাবে?

সেটাই তো আমার সবচেয়ে সুবিধা মাসী। ঝড় বৃষ্টির আড়ালে কখন যে নদীতে নেমে গেছি ওরা টের পায় নি। তারপর সাঁতরে এ পাড়ে, তাই মনে হয় ওরা হয়ত আমাকে নদীর ওপাড়েই খুঁজে চলেছে। তবে এই বৃষ্টিতে আর কষ্ট করছে বলে মনে হয় না।

এই বিশাল নদী সাঁতার দিয়ে পার হলে তুমি?

মাসী, একটা শুকনো কাপড় দিতে পার?

ক্ষোভে ও অনুশোচনায় মিইয়ে গিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। বিস্ময়ের ঘোরে ভুলেই গিয়েছিলেন, কুহক ওর সামনে এতক্ষণ ধরে ভিজে জামা কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে নিজের তোয়ালেটা এনে দিয়েছিলেন। ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের হাতে ওর ভিজে শরীরটা মুছে দেন, যেমন দিতেন তমালকে ছোটোবেলায়। কিন্তু সঙ্কোচের ঢাকনায় ইচ্ছেটাকে মুড়িয়ে রেখেছিলেন। আলমারি থেকে তমালের একটা জামা আর নিজের একটা শাড়ি এনে কুহককে বলেছিলেন, এটা পরে নাও। কতদিন খাওয়া হয়নি কে জানে? খিঁচুড়ি চাপিয়ে দিচ্ছি। ডিমের ওমলেট দিয়ে রাতে ভালোই লাগবে। ততক্ষণে ভালো ছেলের মত এক গেলাশ গরম দুধ খেয়ে নেবে।

তমাল বাচ্চা ছেলের মতন তার ঘাড়টা নাড়িয়ে ছিল।

নিভাদিকে রান্না ঘরে পাঠিয়ে দুধটা গরম করে নিয়ে এসে দেখেছিলেন, কুহক জামা কাপড় পাল্টে সোফার পেছনে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথার ঘন চুলগুলি অবিন্যস্ত। কপাল ঢেকে চোখের উপর এসে পড়েছে। ওর ঘুমন্ত, ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটা

গভীর মমতা কান্নার উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। ঝাপসা দৃষ্টির আড়ালে তমালকেই যেন সোফায় শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

সেদিন খুব সাবধানে দুধের গ্লাশটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন, পাছে রাখার শব্দে ওর ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। আলতো আঙ্গুলের ছোঁয়ায় কপালের ওপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন। কপালটা জ্বরের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে।

কুহককে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার। মৃদু স্বরে ডেকেছিলেন, কুহক।

এক ডাকেই ও সাড়া দিয়েছিল। ওদের পলাতক জীবনে ইন্দ্রিয়গুলিকে সদাসতর্ক ব্যবহারের জন্য বোধ হয় বন্য জীবের মতন সংবেদনশীল হয়ে যায়। তাই অমিয়া দেবীর মৃদু ডাকের তরঙ্গেই ও চমকে উঠে বসেছিল। মুখে একটা লজ্জার রেখা।

মাসী, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গভীর স্নেহে ওর কপালে হাত রেখে রেখে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে।

ও কিছু নয় মাসী। মাঝে মাঝেই জ্বরটা জ্বালাতে আসছে, আবার বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে।

দুধটা খেয়ে নে। তুমি থেকে তুই নিজে থেকেই নেমে এসেছিল অমিয়া দেবীব ভিতব থেকে। কালকেই ডাক্তার আনব। ভালো না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাবি না। দবকার হলে তোদের চারু মজুমদাবের কাছে তোব হয়ে ছুটিব দরখাস্ত পাঠাব। সেখানে ছুটি মঞ্জুব না হলে তোদের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর কাছে অভিযোগ করব।

হেসে ফেলেছিল কুহক। বলেছিল, তা পাঠিও। তবে ডাক্তার ডেকে এনে তাব আগে মায়ের ভাই-এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিও না।

এই ডাক্তার আমার খুব পরিচিত। ও কোনো খবব দেবে না। তাছাড়া আমাব স্কুলে তোদের দলের একজন আছে। দরকার হলে তাকে দিয়ে তোদেব দলেব ডাক্তারকে খবর পাঠাব।

না, মাসী, তাকে খবব দিও না। আমাদের মধ্যেও যে পুলিসের লোক ঢুকে পড়েনি তার নিশ্চয়তা কোথায়? দবকাব হলে তোমার ডাক্তারকেই খবর দিও।

বুকটা ধক্ করে উঠেছিল অমিয়া দেবীর। তাহলে এদের মধ্যেও শুরু হয়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস। তবে তমাল কোন দিকে? সেই ঝড়ের রাতের পর তমালের কোনো খোঁজ পান নি। দাদা জানিয়েছিলেন, ও নিরাপদে আছে। এর বেশি কিছু এখন বলা যাবে না। নিজের ছেলের নিরাপদ থাকার খববে তো গভীর স্বস্তি পেয়েছিলেন। তবে আজ কেন কুহকেব দিকে তাকিয়ে সেই খবরটাই তাকে কাঁটার মতন বুকের কোণে খোঁচা দিতে চাইছে?

তাই দেব। এখন দুধটা গরম থাকতে খেয়ে নে। কুহকের মুখের সামনে দুধের গেলাসটা ধরে বলেছিলেন অমিয়া দেবী। নিভাদিকে খিঁচুড়ি চাপাতে বলেছি। তখন তো জানতাম না জ্বর বাধিয়ে বসে আছিস। তুই আমার বিছানায় শুয়ে পড়। আমি বরং তোর লুচি ভেজে আনি। গরম গরম বেগুন ভাজা দিয়ে জ্বরের মুখে ভালো লাগবে।

না, মাসী, নিভা মাসীকে খিঁচুড়িই বানাতে বলো। আমার যে খিঁচুড়ির গন্ধেই জিভে জল আসছে।

আচ্ছা, খিঁচুড়িই খাস। তুই একটু ঘুমিয়ে থাক। খিঁচুড়িটা কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে যাবে। আমি বরং নিভাদির কাছে যাই।

মাসী।

থমকে দাঁড়িয়েছিলেন অমিয়া দেবী। কুহকের ডাকের মধ্যে যেন সেই হারিয়ে যাওয়া অতীতের সুরকে শুনতে পেয়েছিলেন।

কিছু বলবি রে?

তুমি আমার কাছে একটু বসবে মাসী?

তোর যে একটু ঘুমোনো দরকার, বাবা।

না, মাসী। তার থেকেও বেশি লোভ তোমার কাছে বসে থাকা। জানো মাসী, তুমি যখন আমার কপালে হাত দিয়েছিলে তক্ষুণি আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। আসলে আমরা তো ঘুমের মধ্যেও পুলিসের পায়ের শব্দ শুনি। তাই সামান্য স্পর্শেই আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কপালে তোমার হাতের স্পর্শটা যে কী ভালো লাগছিল তা বোঝাতে পারব না। তাই চুপ করে চোখ বুজে ছিলাম। তুমি না ডাকলে চোখ খুলতাম না।

কুহককে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার মাথার কাছে বসেছিলেন। বলেছিলেন, আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তবে একটু জেগে থাক। খেয়ে ঘুমোবি।

মাসী, তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে আমি সারা রাত জেগে সেই স্পর্শটাকে উপভোগ করব। ঘুমিয়ে পড়লে তো এই আনন্দকে বুঝতে পারব না। মনে হবে আমারও মা আছে। তোমার হাতের স্পর্শে আমার মার স্পর্শ পাব।

বুকের ভিতর চাপা বাষ্পটা ভিসুভিয়াসের উদগীরণের মতন অমিয়া দেবীর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। মনে পড়েছিল আধুনিক এক কবির কবিতার দুটো লাইন।

যার হাত আছে তার ভাত নেই,
যার ভাত আছে তার হাত নেই।

তমালের মা আছে কিন্তু মায়ের ছেলে নেই। কুহকের মায়ের ছেলে আছে, কিন্তু ছেলের মা নেই। বুকের সেই বাষ্পটা প্রাণপণে বুকের ভিতর চেপে রেখে বলেছিলেন, তোর মার কাছে যাস না।

আমার মা আছে, মাসী। কিন্তু মার মনে যে আমি নেই।

সেদিন সারা রাত কুহকের মাথার কাছেই বসেছিলেন অমিয়া দেবী। কুহক সত্যিসত্যিই জেগেছিল। অমিয়া দেবীর কাছে নিজের মনের ঢাকনাকে সম্পূর্ণ উন্মোচন করে দিয়েছিল।

[১৬]

কুহকের বাবা সীমান্ত জোয়ারদার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এই পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছেন যাদের পিছনে ভাগ্য ছুটে বেড়ায়, এরা নাকি ভাগ্যের ঘোড়ায় চেপে যেখানে পা ফেলেন সেখানেই সন্ধান পান সোনার খনি। সীমান্ত জোয়ারদার সেই বিরল ভাগ্যের অধিকারী। নিউ আলিপুরে বিশাল ফ্ল্যাট, গাড়ি, বাবুর্চি, পিয়ন। বড় বড় শিল্পপতি, দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদের আপ্যায়নে ঘরে-বাইরে ঢালাও ব্যবস্থা। বছরে বার দুয়েক বিদেশের সংস্থাগুলির সাথে আলোচনার জন্য পূর্ব থেকে পশ্চিম দুনিয়ায় রাজধানীতে যাত্রা সীমান্ত জোয়ারদারের রুটিন কাজ।

মর্নিং শোজ দা ডে—ইংরেজী প্রবাদ বা বাংলা প্রবচন শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়—কোনোটাই সীমান্ত জোয়ারদারের বেলায় খাটে নি। ছাত্র জীবনে কৃতি ছাত্র ছিলেন বলে তার ঘনিষ্ঠ শিক্ষকেরাই শোনে নি। শোনা যায় তিনি যখন প্রথম বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রধান শিক্ষককে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন তখন নাকি প্রধান শিক্ষক তার স্কুলের এই ছাত্রটিকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন;

দেখ বাবা, তুমি তোমার এই কৃতিত্বের কৌশলগুলি আবার অন্যদের শিখিয়ে দিও না, তাহলে কোনো ছাত্র স্কুলে আসবে না। বই নিয়েও পড়তে বসবে না। ছাত্রের অভাবে যে

আমাদের তখন শুকিয়ে মরতে হবে। তুমি বাপু যদি তোমার এই প্রতিভার কলাকৌশলগুলি ভিন্ রাজ্যে গিয়ে প্রয়োগ কর তবে আমরা পরিবার নিয়ে কিছু দিন খেয়ে পরে বাঁচতে পারব।

প্রধান শিক্ষকের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হোক, অথবা গুরুর অনুবোধ রক্ষার জন্যই হোক সীমান্ত জোয়ারদার নিজের শহরে ভর্তি না হয়ে কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন, আমার খরচ তোমাদের চালাতে হবে না। নিজের খরচ আমি নিজেই জোগাড় করে নেব।

একটা নামী কলেজেই ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজে কোনো খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু ইউনিভার্সিটির একটা স্পোর্টস্ ব্লেজার জোগাড় করে নিয়েছিলেন। বসিবহাট থেকে বসিরহাট লোকালে চেপে শিয়ালদায় নামতেন। গায়ে ইউনিভার্সিটিব ব্লেজাব, কাঁধে নামী কলেজেব মনোগ্রাম যুক্ত বড় ব্যাগ। ভিতরে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আনা সামগ্রী। ওপবে একটা দুটো বই। স্টেশন থেকে বড়বাজার পর্যন্ত হেঁটে যেতেন। সেখানে ব্যাগ খালি কবে ব্লেজারটাকে জমা রেখে কলেজে যেতেন। বিকেলে ফেবার পথে পনেবো পার্সেণ্ট কমিশন জামার ঘড়ি পকেটে ঢুকিয়ে ট্রেনে উঠতেন। আবো আশ্চর্যের ব্যাপাব, ডিগ্রীতেও ফাস্টক্লাশ পেয়ে গেলেন।

এম. এ-তে ভর্তি হবাব আগেই প্রতিদিনেব পনেবো পার্সেণ্ট কমিশন জমে জমে স্ট্র্যাণ্ড রোডে একটা বেশ বড়োসড়ো ঘব কেনাব সুযোগ কবে দিয়েছিল। বসিবহাট থেকে যে ঝোলা ব্যাগে আগে আসত জামা প্যান্টের কাপড়, ব্লেড, ঘড়ি, এবার ঝোলা ব্যাগের পরিবর্তে হাতে থাকত ভি. আই. পি এট্যাচি ভিতবে হলুদ বিস্কুট। নাম সোনা। উপরে থাকত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ছাপা কাগজপত্র। আরো কটা পবিবর্তন অবশ্য হয়েছিল। আগে তিনি পনেবো পার্সেণ্ট কমিশন পেতেন। এখন পনেরো পার্সেণ্ট কমিশন তিনি দেন। আগে আসতেন বসিবহাট লোকালে চেপে বড়বাজাবে। এখন স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকেই বসিবহাট, খিদিরপুব ডক, শিলিগুড়িব হংকং মার্কেট থেকে ব্যাঙ্কক-দুবাই। এই একটা ঘরই যে কি ভাবে জোয়ারদার ম্যানসনে রূপান্তবিত হল সে খবর এখন আব কেউ রাখে না। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট, ডিপার্টমেণ্টাল অর্ডার স্লাপাই থেকে পেট্রোকেমিক্যালেব সাম্রাজ্যেব সদব দপ্তব, মেসার্স সীমান্ত জোয়ারদার এণ্ড কোম্পানী গ্রুপ অফ ইনডাসট্রিস।

কিছু লোক আছে যাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরেকটি অতি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় থাকে যা তাদের সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক বলে চেনাতে সাহায্য করে। সীমান্ত জোয়ারদার ছিলেন সেই বিবল শ্রেণীর একজন। সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি হল রাজনৈতিক আবহাওয়ার আগাম অনুমানের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক নেতা তথা আমলাদের দুর্বল জায়গাগুলিব ঠিকানা সংগ্রহ করা।

সীমান্ত জোয়ারদারের এই যষ্ঠ ইন্দ্রিযটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কোন রাজনৈতিক দাদাব সীমারেখা কতখানি, সেই পরিমাপের যন্ত্রটি যেন তার দৃষ্টির মধ্যেই স্থাপন কবা ছিল। তাদেব মনের কাছে পৌঁছাবার শর্টকাট্ রাস্তাগুলি ছিল তার মুখস্থ। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মনের ঘরে ঢোকার জন্য লক্ষ্মীন্দরের বাসর ঘবের ছিদ্রের মত কোনো না কোনো ছিদ্র থাকবেই। কালনাগিনীর দৃষ্টির মতন সেই ছিদ্র পথটিকে শুধু চিনে নেওয়ার দৃষ্টি-শক্তি প্রয়োজন।

কোন রাজনৈতিক নেতা তার স্ত্রীর চোখকে এড়িয়ে ডায়মণ্ডহারবার লজে সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে রাত্রি কাটিয়ে আসেন সে খবরও যেমন তার ডাইরীতে লেখা থাকে তেমনি কোন

মন্ত্রী শ্যালকের নামে এজেন্সি খুলিয়ে তার মারফৎ ডিপার্টমেন্টে ত্রিশ শতাংশ মাল কম সরবরাহ করে পুরো বিলের টাকা পাওয়া যায় সে ভূগোলও তার মুখস্থ। ফলে বহু মন্ত্রী থেকে আমলা —আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন কখন সীমান্ত জোয়ারদার তাদের সান্ধ্য আসরে ভারী খামের উপহার নিয়ে বিগলিত হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে হাজির হবেন। এহেন সীমান্ত জোয়ারদারের সাম্রাজ্যের সীমা যে ক্রমশ দিগন্ত প্রসারী হয়ে উঠবে এতে অবাক হবার কিছু ছিল না।

কুহকেব মা আইভি সান্যাল কনভেন্টে পড়া মহিলা। দুধে-আলতা গায়ের রঙ, মরাল গ্রীবা। সুউন্নত বক্ষ যুগল। ক্ষীণ কটিদেশ, পক্ক বিম্বাধবোষ্ঠী। কলেজ জীবনে নিজের রূপের ছটায় বহু পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়েছিলেন। তার রূপমুগ্ধ বহু পুরুষ তার সামান্য একটু হাসির ইঙ্গিতেই তার পদ্মের পাপড়ির মতন পদযুগলে নিজেদেব বিকিয়ে দিতে ছটফট করত।

এই আইভি সান্যাল শেষপর্যন্ত বরমাল্য পরিয়েছিলেন সীমান্ত জোয়ারদারের গলায়। এই বিয়ে নিয়ে তুমুল আলোড়ন উঠেছিল রাজধানীর রূপবান পরুষ মহলে। এক ব্যর্থ প্রেমিক বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা পরিয়ে এনে খাঁচাশুদ্ধ বাঁদরটিকে বিবাহ-ভোজে উপহার দিয়ে গিয়েছিল। জীবনসঙ্গি নির্বাচনে যে মহিলা গ্রীক ভাস্কর্যের সাথে তুলনীয় পুরুষ-সঙ্গিব রূপের সাথে নিজেব রূপকে মিলিয়ে নেবেন বলে সবাই ধরে নিয়েছিল সে কিনা তার থেকে বয়সে দ্বিগুণ, কালো, টাকপড়া বিশাল উদরের এই কুৎসিত দর্শন সীমান্ত জোয়ারদারকেই পছন্দ কবে বসল। সীমান্ত জোয়ারদারের টাকা আছে। কিন্তু তার থেকেও অনেক বিত্তবান যুবক আইভি সান্যালের জন্য তো অপেক্ষা কবেছিল।

সীমান্ত জোয়ারদার তার নিউ আলিপুরের বিশাল বাড়িটাকে মনের মতন সাজিয়ে তুলেছিলেন। দোতলা বাড়িটা মার্বেল প্যালেসের অনুকরণে তৈরি। সিঁড়ি থেকে ছাদ পর্যন্ত মার্বেল পাথরে মোড়া। গেটে দারোয়ান। বাড়িতে ঢুকতে হলে আগে পরিচয় দিতে হয়। দাবোয়ান ওপরে খবর পাঠিয়ে অনুমতি পেলেই গেট খুলবে। গেট পেরোলেই বিশাল লন। সবুজ মখমলের মতন ঘাসের মাঝখান দিয়ে লাল টাইলসেব রাস্তা সোজা বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে। লনেব চারপাশ ঘিরে উইপিং দেবদারুর সারি একটা সবুজের প্রাচীর সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে ঢুকেই শ্বেত পাথরের বারান্দা। ভিতরে বিশাল হলঘরের মতন ড্রইংরুম। পাশে সীমান্ত জোয়ারদাবের চেম্বার। হলঘরেব ভিতরের বাঁ কোণকে ঘিরে দোতলায় উঠে গেছে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি। সীমান্ত জোয়ারদার যখন বাড়িতে থাকেন তখন তার চেম্বারে তরুণী স্টেনো সারা শরীরে সেক্সের বিজ্ঞাপন এঁটে ডিকটেশন নিতে আসে।

আইভি সান্যাল মিসেস জোয়ারদার হয়ে এ বাড়িতে এসেই হলঘরের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। যেখান দিয়ে দোতলার সিঁড়িটা উঠে গেছে তার গা ঘেসে বানিয়েছিলেন আধুনিক ডিজাইনের শো-কেস। তার তাকে সাজিয়ে রেখেছিলেন নানা ধরনের বিলেতি মদের বোতল। ঘরের দুকোণে চারশ ওয়াটের স্টিরিও স্পিকারে বিদেশি সঙ্গীতের তালে তালে বিদেশি তরলের স্নায়ু ঝাঁকানির আমেজ যে নতুন সম্মোহনী শক্তির কাজ করে তা সীমান্ত জোয়ারদার নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন।

সন্ধ্যার পর থেকে জাজ ও পপ্ মিউজিকের উদ্দাম শব্দ জোয়ারের ঢেউ-এ পাতলা কাচের গ্লাসের স্বাস্থ্য-পানের ঠোকাঠুকি। মিসেস জোয়ারদারের কয়েক ইঞ্চি পরিমাপের স্লীভলেস ব্লাউজ আর গভীর নাভির নীচের শাড়ির মধ্যবর্তী পেলব উজ্জ্বল উন্মুক্ত চামড়ার উপর আলোর ঢেউ যখন খেলা করত তখন বহু সমাজপতিরাই যে তার সভ্যতার বস্ত্রভার

আদিম আস্তাবলে ছুঁড়ে ফেলতে চাইত, এই বিভৎস সত্যটি মিসেস জোয়াবদারেব অজানা ছিল না। দক্ষ সাপুড়ের মতো তিনি জানতেন এদের খেলাতে হয কিন্তু ছোবলেব হাত থেকে বাঁচাবাব কৌশল জানতে হয়। কারণ এদেব বিষথলি থেকে বিষ অন্যপাত্রে ঢেলে দিলেও কাব দাঁতেব কোণে বিষ জমা হযে আছে তা সবসময জানা সম্ভব নয। পাতলা ফিনফিনে কাপড়েব আঁচল ঘাড থেকে খসে পডাটা কতখানি ইচ্ছাকৃত সেটা অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। তবে খসে যাওযা আঁচলেব ফাঁকে বুকেব গভীব খাদেব দুপাশেব দুধে বাঙা চডাই দুটোকে গলা কাটা ব্লাউজেব মধ্যে দিযে শাবীবিক মোচডে যে জ্যামিতিক বেখা সৃষ্টি কবতেন তা উপস্থিত মানুষেব তলপেটে যে শিহবনেব তবঙ্গ তুলত তা আইভি জোযাব দাব তাদেব কামজর্জবিত চোখেব চাউনীব মধ্যেই পডতে পাবতেন।

ভূমিকম্প যখন আসে তখন কাউকে জানান দিযে আসে না। কিন্তু মিসেস জোযাবদাবেব জীবনেও যে এমন ভযাবহ ভূমিকম্প ঘটে যাবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পাবেন নি। হঠাৎ আতঙ্ক-ঘন বিস্ময়ে আবিষ্কাব কবলেন তিনি উগ্র আধুনিকা হলেও যে নাবী এই পবম সত্যটি প্রকাশ পেযে গেছে। নাবীব উর্ববা ভূমিকে যে সতর্ক প্রহবাব বেষ্টনীতে এতদিন লুকিযে বেখেছিলেন তাতে সীমান্ত জোযাবদাব তাব কোনো অসতর্ক মুহূর্তেব সুযোগ নিযে বীজ বপন কবে ফেলেছে।

নিজেব ব্যক্তিগত আলমাবিতে জন্মনিযন্ত্রণেব পিল আব কোহিনুব মাকা ববাবেব প্রতিবোধক আববণগুলি সাজানো আছে। হিসেবেব ভুল হবাব কথা নয। তবল পানীযব উত্তেজক প্রভাব শুরু হবাব আগেই সাবধানেব বটিকাগুলি গলাধঃকবণ কবতেন। ভিডিব আতঙ্কেব পাশাপাশি এসেছে এ আই ডি এস। এই সমস্ত চবে বেডানো আধুনিক ষাঁডদেব বিশ্বাস কবা চলে না। তাই ববাবেব প্রাচীবেব আডালে নিজেব উর্বব‌ভূমিকে বক্ষা কবতে কোনো দিন ভুল কবেছেন বলে মনে কবতে পাবেন নি।

সমস্ত বাগটা গিযে পডেছিল সীমান্ত জোযাবদাবেব উপব। বিযে নামক অনুষ্ঠানেব পব কযদিন লোকটাকে তাব কাছে আসতে দিযেছেন তা তো হাতে গুনে বলতে পাবেন। তাও যে কদিন তাকে প্রশ্রয দিযেছেন সে কযদিন তাব আগে সমস্ত ঘব নিচ্ছিদ্র অন্ধকাবে ঢেকে নিতেন। কালো, পেট মোটা, উঁচু কপালেব এই লোকটাব চেহাবাব কথা মনে পডলেই তাব নাভি দেশ থেকে একটা বমিব ধাক্কা গলা পর্যন্ত উঠে আসত। অথচ এই লোকটাই তাব আর্থিক ও সামাজিক জীবনেব পাসপোর্ট।

প্রকৃতিব অন্য অনেক প্রাণীব তুলনায মানুষেব ইন্দ্রিযগুলি এত দুর্বল কেন—এ নিযে ছোটো বেলায খুব অনুযোগ কবতেন আইভি জোযাবদাব। বলতেন পাখিব মতো মানুষ কেন উডতে পাবে না? ভাবতেন পেঁচাব মতন মানুষও বাতেব অন্ধকাবে দেখতে পেলে কত মজা হত। আজ কিন্তু মনে হযেছিল, মানুষ যদি বাতেব অন্ধকাবে দেখতে পেত তবে হযতো তিনি বেঁচে থাকতে পাবতেন না। সীমান্ত জোযাবদাবেব অস্থিব হাত যখন তাব সাবা শবীবে সাপেব মতো ঘুবে বেডাত, অন্ধকাবে দেখতে পেলে তা কিছুতেই সহ্য কবতে পাবতেন না। মনেব কল্পনায বেছে নিতেন আজকেব সান্ধ্য আসবে উপস্থিত কোনো সুন্দব যুবকেব ছবিকে। মনে কবতেন, সীমান্ত জোযাবদাব নয, সেই যুবকটিই যেন তাব দেহে বিচবণ কবে চলেছে।

নিজেব বযসেব অর্দ্ধেকেবও কম সুন্দবী স্ত্রীব অপূর্ব দেহমঞ্জবীব সমতটভূমি কিংবা তুষাব ধবলযুগল শঙ্খেব কবোষ্ণ উত্তাপে সাঁতাব কাটাব বাসনায সীমান্ত জোযাবদাব নিজেব

বহিঃমনকে প্রথম প্রথম গৃহাভিমুখী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর কঠিন প্রত্যাখ্যানে তার অতৃপ্ত স্নায়ুতন্ত্রগুলি আবার ঘরের বাইরে নিত্যনতুন প্রমোদ কুঞ্জে যাতায়াত করতে শুরু করেছিল। এরই সাথে আরো একটা পরিবর্তন সীমান্ত জোয়ারদারের পছন্দের তালিকায় যুক্ত হয়েছিল। এর আগে কবি, বেজি বা পামেলারা তাদের শুভ্র চামড়ার হাঁটুর উপর স্কার্টের সীমারেখাকে রেখে সাদা ঊরুর কাঁপুনিতে সীমান্ত জোয়ারদারের কালো মুখের, কালো *ঠোঁটের* কোণকে সিক্ত করে তুলত। কিন্তু তার কালো রঙের প্রতি স্ত্রীর ঘৃণা তাকে সাদা চামড়ার পরিবর্তে কালো চামড়ার প্রতিই আকৃষ্ট করে তুলেছিল। বেরিয়ে পড়তেন, বেতলার ফরেষ্ট গেস্ট হাউসে, অথবা উড়িষ্যা বা মধ্যপ্রদেশের কালো মাণিকের দেশে। কালো চামড়ার মাংসের হাটে, উপভোগ করতেন কালো চামড়ার ঘ্রাণ।

আইভি জোয়ারদারের ধারণা কোনো এক মাত্রাতিরিক্ত নেশার বশে তার অচেতনতার সুযোগ নিয়েছেন সীমান্ত জোয়ারদার। এটা তার মতে পাশবিক অত্যাচার। তারা আইনসম্মত স্বামী স্ত্রী হতে পারেন। কিন্তু কোনো নারীর নেশার সুযোগ নিয়ে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই এই পাপকে তিনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

সীমান্ত জোয়ারদারের ধারণা তার স্ত্রী চালাক কোকিলের মতন তার কেয়ার অফে অন্যের পাড়া ডিম ফুটিয়ে নিতে চাইছেন। কিন্তু আইভি জোয়ারদার যখন তার কাছে গর্ভপাতের সম্মতি আদায় করতে এসেছিলেন, তখন তার মনে অন্য এক ভাবনার স্রোত বয়ে গিয়েছিল। তাই ঠোঁটের কোনায় এক ক্রূর হাসি ফুটিয়ে বলেছিলেন, যে আসছে তাকে আমি দেখতে চাই।

বিস্ময়ের আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন মিসেস জোয়ারদার। সীমান্ত জোয়ারদার যে আক্রমণের তীরটা এভাবে ছুঁড়ে দেবেন তা তার কল্পনাতেও আসেনি। তাই প্রথমে কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পর তুবড়ির ফোয়ারার মতন ফেটে পড়তে চেয়েছিলেন।

হোয়াট ডু ইউ মীন? তুমি কী ভাব তোমার এই দাঁড়কাকের বীজ ফুটতে দিয়ে তার মাথা কোলে নিয়ে আমি বসব?

সীমান্ত জোয়ারদার তার হাতের জ্বলন্ত হাভানা চুরুটের ছাইটাকে ক্রিস্টালের অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। হাত বাড়িয়ে ভ্যাট ৬৯-এর বোতলটা টেনে এনেছিলেন। গ্লাসে ঢালতেই ক্রিস্টালের গেলাসে রামধনুর বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি হয়েছিল। ধীরে ধীরে গ্লাসটা ঠোঁটের ডগায় তুলে এনে তার থেকে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমার গর্ভের বাসায় এটি আমার মতন দাঁড়কাকের ডিম, না তোমার কোনো সাহেব বন্ধুর দান তা তো আমাকে দেখতেই হবে।

আইভি জোয়ারদারের পেলব মাংসপেশীর প্রতিটি স্নায়ু যেন তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছিল। মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়েছিল, ইউ সোয়াঁইন, বাস্টার্ড, সন অফ বীচ।

মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, সীমান্ত জোয়ারদার। বলেছিলেন, আমাকে যা খুশি বল, আমি মনে কিছু করব না। আমি মদ্যপ, আমি লম্পট, আমি স্মাগলার—সব সত্যি। যারা আমাকে আড়ালে এসব কথা বলে তারাই আমার কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। কোনো বিচারপতির মেয়ে ওয়াশিংটনে ম্যানেজমেন্ট পড়তে যাবে তার টিকিট কাটার আর্জি আমাকেই মানতে হয়। কোনো সচিবের বউ শহরের নামি জুয়েলরিতে গিয়ে হীরে বসানো নেকলেস নিয়ে এসেছেন, বার্থডে পার্টির নামে সেই আমলার বউকে আমার দূরসম্পর্কের

বোন সাজিয়ে তার প্রতি আমার স্নেহের প্রমাণ স্বরূপ সেই টাকা আমাকে মেটাতে হয়। কোনো এক মন্ত্রী আমাকে পদ্মভূষণ দেবার সুপারিশ করেছিল। দু একটা খবরের কাগজ এমন হৈ চৈ শুরু করেছিল যে সে সুপারিশের ইতি ঘটেছিল। তবে সেই হৈ চৈ যে কোনো নীতিগত কারণে হয়নি সেটা আমার থেকে কে আর বেশী জানে? দলের মধ্যে মন্ত্রীর বিরোধী গ্রুপের ধারণা আমি তাদের তুলনায় মন্ত্রীকে বেশি টাকা দিই। তার. নির্বাচনে বুথ দখলে মস্তান পাঠাই। জমায়েতের জন্য শখানেক ট্রাক দিই। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে খুব কষ্টের দরকার ছিল না। তাদের নেতাদের বিদেশ ভ্রমণের যে আমন্ত্রণ পত্রগুলি বিমানের টিকিট সহ এসে পৌঁছায় খোঁজ নিলে দেখতে পাবে ঐ সংস্থাগুলির নামে অনুষ্ঠানটি আমাকেই করতে হয়। আমন্ত্রণ পত্রগুলি আমিই পাঠাই। এমন কি তাদের বিগ বসের বিদেশের পাঁচতারা হোটেলের অনেক বিল যে আমি মেটাই সে খবর দলের চুনোপুটিরা না জানলেও বিগ বস ও তাদের ঘনিষ্ঠরা জানেন। তাই ইচ্ছে করলে একটা খেতাব হয়ত পেতাম। কিন্তু এই খেতাব আমার কী কাজে লাগবে? বাজারে বেচলে তো দুটো টাকাও পাওয়া যাবে না। আর রাজনৈতিক দলের নেতারাই যখন আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে তখন আমার-ই বা রাজনীতিতে নামার কি দরকার? শোনো আইভি, কোনো নেতা চিরকুট পাঠিয়ে কী অনুরোধ করেছেন সব আমার কাছে জমা থাকে। এগুলিই আমার ক্যাপিটাল। আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবার সময় তুমি যে সব কথা বলেছিলে সে কথাগুলিও টেপ করা আছে। তুমি যদি চাও শোনাতে পারি।

মিসেস জোয়ারদারের মনে হয়েছিল এ সীমান্ত জোয়ারদার তার অচেনা। অক্টোপাস যেমন তার শুঁড়গুলিকে গুটিয়ে এনে শিকারকে তার মুখের কাছে টেনে নেয়, সীমান্ত জোয়ারদারের দুটো হাত যেন অষ্টভুজ হয়ে একইভাবে তাকেও এক শূন্য গহ্বরের দিকেও টেনে নিতে চাইছে।

সীমান্ত জোয়ারদারের সেদিন বলার নেশা পেয়ে বসেছিল। বলে চলেছিলেন, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ এই ভাবে আমি টাকা দিয়ে মানুষ কিনে চলেছি। অনেকে টাকা দিয়ে ভগবানকে কিনতে চায়। কিন্তু আমি ভগবানের বদলে লোভী মানুষদের কিনে চলেছি। আমার তো এদেরই দরকার। দশকোটি টাকার সোনা পাচার করতে যদি আমাকে এক কোটি টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হয় বাকি নয় কোটি টাকা তো আমার লাভ, মাঝেমধ্যে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মতন সৎ, আদর্শবান অফিসার বা মন্ত্রী যে আসেন না তা নয়। প্রথমে তাদের টাকা দিয়ে বশ করি। না পারলে আমার গোয়েন্দাদের পাঠাই তার দুর্বল জায়গার অনুসন্ধানের জন্য। টাকা ছাড়া আর দুটো ক্ষেত্রে মানুষের দুর্বলতা আমাদের খুব কাজে লাগে। এ দুটি হল, মদ ও নারী। তোমার থেকেও অনেক সুন্দরী আধুনিকা মেয়ে আমার খাঁচায় আছে। তাদের পাঠাই। পাঁচতারা যে হোটেলের ঘরে তারা আদম-ইভের পোষাকে শীৎকারের ফোয়ারা তোলে সেই ঘরের গোপন ছিদ্রে থাকে আমার মুভী ক্যামেরার লেন্স। তার পরে ঘটনা তো আর বলার অপেক্ষায় থাকে না। সেই ক্যাসেটটাই হয় আমার পাসপোর্ট। আর যাদের কোনো দুর্বলতাই খুঁজে পাওয়া যায় না, তাদের তো এই পৃথিবীতে থাকার অধিকার নেই। মানুষ হয়ে জন্মাবে অথচ তার চরিত্রে মদ, মেয়ে মানুষ, টাকা কোনোটারই প্রতি কোনো দুর্বলতা থাকবে না, এমন মানুষ তো আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিই।

আইভি জোয়ারদার দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, তোমার নরকেও জায়গা হবে না।

হেসেছিলেন সীমান্ত জোয়ারদার। বলেছিলেন সকাল বেলা হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে কোনো দিন গেছ?

না।

গেলে একথা বলতে না।

তার মানে?

সীমান্ত জোয়ারদার তার গ্লাসে ভ্যাট্-৬৯-এর বোতল থেকে এক পেগের থেকে বেশিই পানীয় ঢেলে নিয়েছিলেন। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলেছিলেন, ছোটোবেলায় একবার বাবার সাথে হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম গঙ্গায় স্নান করে কপালে চন্দন লেপে বড়বাজারের কিছু ব্যবসায়ী চার আনার জিলাপী কিনে ষাঁড়কে খাওয়াচ্ছে, আর বলছে বেইমানী কা পযসা গো খা লেতা হ্যায়। অর্থাৎ এরা সারা দিন ধরে যে ভেজাল মিশাবে, লোককে ঠকাবে, তার জন্য আগে ভাগেই সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে ধর্মের ষাঁড়কে চারআনাব জিলাপী খাইয়ে রাখছে। দৃশ্যটা আমার মনে গেঁথে আছে আইভি। এদেশের সব মন্দিরেই আমার, নাম দাতা-ফলকে খোদাই করা আছে। তাই স্বর্গের পথ আমার বাঁধা। নরকের পথ তো তোমার নপুংসক বাবাদেব জন্য বাঁধা আছে।

ইউ সন অফ বীচ—আইভি জোয়ারদার চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন।

আইভি—মাঝপথেই তার চীৎকারকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন সীমান্ত জোয়ারদার। আমাব মার সম্বন্ধে কোনো বিশ্রী মন্তব্য করলে তোমার এই মসৃণ গালে আমার পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ এমন ভাবে বসে যাবে যে সে দাগ তুমি সারা জীবন ধরেও তুলতে পারবে না।

মানে?

মানে তুমি বুঝতে পারছ। মনে বেখ, আমাব মার মতন এমন দেবীর সম্পর্কে সামান্যতম কটূক্তি আমি সহ্য করব না। আমার মা যখন জানতে পেবেছিলেন আমার রোজগার সোজাপথে নয়, তখন থেকে আমার মাকে আমি একটা টাকাও ছোঁয়াতে পারিনি। আমার মা দিনের পব দিন না খেয়ে থেকেছেন কিন্তু আমার পয়সায হাত দেন নি। আর তোমার মা, টাকার জন্য, গযনাব জন্য, যে খাটে আজ তুমি শোও, সেই খাটে আমার সাথে দিনের পর দিন কাটিযেছে। তুমি যেদিন আমাকে বিযেব কথা বলেছিলে সেদিন আমি ভাবার সময় চেয়েছিলাম। কেন জান?

না।

তবে শোন, আমি নিশ্চিন্ত হতে চেযেছিলাম, তোমার মায়ের গর্ভে তোমাকেই আমি জন্ম দিয়েছিলাম কিনা।

সাপের ফণার সামনে ওঝা যখন গাছের শিকড় ধরে তখন সাপ যেমন ফণা গুটিয়ে পালাতে চায় আইভি জোয়ারদারও মাথা নীচু করে সীমান্ত জোয়ারদারের কাছ থেকে চলে যাবার সময় গম্ভীর ডাকে আবার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

আরেকটা কথা শুনে যাও, আইভি।

বল।

আমাকে নিশ্চয়ই এতদিনে চিনতে পেরেছ। আমার অজান্তে কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে তুমি যদি মুক্তি কিনতে চাও তার যে দাম দিতে হবে সে কথা তুমি ভাবতে পারবে না। যে আসছে তাকে আসতে দাও। সে যদি আমার ঔরসে না এসে থাকে তবু তাকে আমি সন্তানের মতনই মানুষ করব।

ভেবে দেখব, কিন্তু ভাবতে গিয়েও তিনি ভাবতে পারেন নি।

বারান্দায় বেতের চেয়ারটাতে গাটা হেলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন আইভি। দক্ষিণমুখী এই বারান্দাটাতে অফুরন্ত হাওয়া। বিশেষ করে কলকাতায় বিকেল বেলায় একটা মিষ্টি হাওয়ার ঢেউ খেলে যায়। এটাই যেন এই মহান নগরীর জীবনীশক্তি। মুমূর্ষু শহরের ক্ষয়ে যাওয়া ফুসফুসে মৃত সঞ্জিবনীর ধারা বয়ে আনে।

বোগেনভেলিয়ার ডালটা এঁকে-বেঁকে বারান্দার পাশ দিয়ে উঠে এসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মাখনের মতন সাদা ফুলের থোকাগুলি হাওয়ায় দুলছে। বহু জায়গায় নানা রঙের বোগেনভেলিয়া দেখেছেন আইভি, কিন্তু এই ফুলগুলির মতন ফুল অন্য কোথাও দেখেন নি।

গেটের সামনে আছে একটা রাধাচূড়া। এর মাথাটা সামনের রাস্তাটাকে কিছুটা আড়াল করে দিয়েছে। তবে নববধূর বেনারসী শাড়ির মতন গাছটা তার সারা শরীরকে রক্ত-আবির রাঙা ফুলের চাদরে ঢেকে রেখেছে নীল আকাশের বুকে পেঁজা তুলার মতন ভাসমান খণ্ড খণ্ড মেঘ এই লালের সমারোহের সাথে যে প্রাকৃতিক শিল্প মঞ্জুষার ছবি এঁকে চলেছিল, তার দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আইভি।

লাল সুরকির পথ সোজা উঠে এসেছে সিঁড়ি পর্যন্ত। মাঝখানে একটা আরকেরিয়া কুকি রাস্তাটাকে দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। একটা চলে এসেছে নীচের বারান্দাব সিঁড়ি পর্যন্ত। আরেকটি লনের চারিপাশ ঘিরে রেখেছে।

আইভি তার জীবনের নানা বাঁকের কথা ভাবতে ভাবতে হাতের কাছের রিমোটের বোতামটা টিপে কলিং বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। বেয়ারাকে লাইম ও জীনেব বোতলটা এনে দিতে বলেছিলেন, বেয়ারা বারান্দায় ফোল্ডিং টেবিল পেতে জীন, লাইম, আইস বক্স ও গ্লাস সাজিয়ে রেখে চলে যেতে উদ্যত হলে তাকে বলেছিলেন, কেউ এলে যেন বলে দেয় মেমসাহেব বাড়িতে নেই। কখন ফিরবে কোনো ঠিক নেই।

সূর্যাস্তের আলো যখন কৃষ্ণচূড়ার মাথা শেষবারের মতন ছুঁইয়ে যায় তখন জীনের হালকা নেশার মধ্যে গভীর একটা তৃপ্তি খুঁজে পান আইভি। লাইমের মিষ্টি গন্ধের ঢেকুরের সাথে সাথে মনের গভীর প্রদেশ থেকে স্মৃতিগুলি পাক খেতে খেতে উঠে আসে।

সীমান্ত জোয়ারদার নামে ব্যক্তিটি তার স্বামী। তার স্বামীর নাম সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়ই জায়গা করে নেয়। বেলুড় মঠের প্রার্থনা সভা থেকে পার্ক স্ট্রীটের ক্যাবারে ড্যান্স— সর্বত্রই তার অবাধ গতি। মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন সেমিনারে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ভাষণ দিতে তার ডাক পড়ে।

মিসেস জোয়ারদার রূপে নারীমুক্তি ও নারী সমাজের উপর তার মন্তব্য নামি দামি সংবাদ পত্রে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। নামি পাক্ষিকের দামি প্রচ্ছদে আদর্শ স্ত্রীর বিজ্ঞাপনে তার ছবি ছাপা হয়েছে। সম্পাদকের অনুরোধে আদর্শ দম্পতির অ্যাবশ্যিক গুণাবলীর উপর তাকে কয়েক পৃষ্ঠা প্রবন্ধও লিখতে হয়েছে। ফটোগ্রাফারদেব অনুরোধে সীমান্ত জোয়ারদারের গলা জড়িয়ে আকর্ণ হাসির ঢেউ তুলে লেন্সের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। তাদের সেই ছবি বিখ্যাত পাক্ষিকের রঙীন পাতায় ছাপা হবার পর কে যেন 'বিউটি এণ্ড বিষ্ট' লিখে তাদের বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়েছিল। তিনি সেই পত্রিকাটি বেয়ারার হাত দিয়ে সীমান্ত জোয়ারদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এর পরেই অবশ্য দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন অপর নামি কাগজের প্রতিনিধিকে। তাতে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার স্বামী কখন ঘুম থেকে উঠেন, কফিতে কয় চামচ চিনি খান, তাকে

ছাড়া ব্রেকফাস্ট করেন না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর ফোন করে খোঁজ নেন স্বামী নিরাপদে তার অফিসে পৌঁছেছেন কিনা ইত্যাদি। তাদের অনুরোধে আবার দাঁড়াতে হয় লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে।

দামি লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলোর প্রতিসরণ যতই সূক্ষ্ম ভাবে কালো গহ্বরে বন্দি ফিল্মে মানুষের ছবিকে ধরে রাখুক না কেন, মন নামক অনুভূতিব সাম্রাজ্যে তার কোনো প্রবেশাধিকার নেই—এটাই মানুষের বিরাট রক্ষাকবচ। তাই জোয়ারদার দম্পতির যুগল ছবি ছাপিয়ে অনুগ্রহ প্রার্থী সম্পাদকেরা পার পেয়ে যেতে পারেন।

তিনি তো চেয়েছিলেন তার মনের সাম্রাজ্যে তিল তিল করে জমানো বিশ্বাসভঙ্গের জ্বালার প্রতিশোধ নিতে বিদ্রোহের ধ্বজাকে তুলে ধরতে। কিন্তু আজ সীমান্ত জোয়ারদার যে দম্ভ ও হুমকির ভ্রূকুটি দিয়ে আঘাত করে গেলেন তার বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলতে গিয়ে কেন থমকে যাচ্ছেন? তিনি তো এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়তে পারেন। লাল রঙের এই বিদেশি ফোনের বিসিভারটির বোতামগুলিও যে তার পদ্মকলির মতন পেলব আঙ্গুলের স্পর্শ পেতে অধীর কামনা নিয়ে অপেক্ষা করে সে খবরও তিনি রাখেন। পুশ বোতামে চাপ দেবাব সাথে সাথেই মিঃ স্যানিয়াল, মিঃ আচারিয়া, মি ভাট, মিঃ আগরওয়ালা বা মিঃ বাজাজের দামি বিদেশি গাড়ি তার বাড়ির দরজায় এসে মিউজিক্যাল হর্ণ বাজাবে। যে গাড়িতে উঠবেন সেই গাড়ির মালিক এ যুগের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি ভেবে হাওয়ার বেগে গাড়ি ছোটাবেন।

সীমান্ত জোয়াবদাবের সাম্রাজ্য ছেড়ে আরেক সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হওয়া তার ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সামাজিক জীবনের যে আদর্শ সমাজসেবিকা ও দম্পতির ঝলমলে পোযাক বহু তিতিক্ষা ও অভিনয় কৌশলে গায়ে চড়াতে পেরেছেন তাকে এককথায় ছেড়ে যাওযাটাই যে কঠিন।

জীনের বিশেষত্ব হচ্ছে এর নেশা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। আর সেই নেশাব গতির ছন্দে তিনি তার ভাবনার তারগুলিতে নানা সুর তুলতে ভালোবাসেন।

নিজের সাবধানতার উপর অগাধ আস্থা ছিল আইভি জোয়ারদারের। তাই ঋতুচক্রের গতি বন্ধ হযে আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত দিলেও তাকে গ্রাহ্য করেন নি। পরপর কতগুলি জমকালো পার্টি আর ফ্যাশান-শোর হট্টগোলে একে আমল দেওয়ার সময়ও পান নি। কিন্তু তিনি যে নারী, এটি যখন আবিষ্কার করলেন তখন গর্ভের প্রোথিত বীজ থেকে অঙ্কুরিত শিকড় শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে ফেলেছে। তবু ছুটে গিয়েছিলেন নামি নার্সিং হোমে, পরিচিত ডাক্তারের কাছে, অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে আর সাধারণ গৃহবধূ বা কুমারী নন,—দশ মিনিটে সমস্যাটা মেটানোর বিজ্ঞাপন দেখে এই সমস্যা মিটিয়ে আসবেন। তিনি মিসেস সীমান্ত জোয়ারদার। নামি স্বামীর স্ত্রীরাও যে দামি। তাই ডাক্তাররাও হয়ে উঠেছেন সাবধানি। মিঃ জোয়ারদারের সম্মতি না পেলে তারা কিছু করতে পারবেন না বলে আবদার তুলে বসে আছেন।

এই সুযোগটাই নিতে চাইছে এই লোকটা। সীমান্ত জোয়ারদার—তার স্বামী, জীনের নেশা দক্ষিণের হাওয়ার তালে তালে এখন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। টেবিলের উপর বোতলটা খালি। নিজেই অবাক হন। একটা বোতল এর মধ্যেই শেষ করে ফেলেছেন। অথচ সব কিছু ভাবতে পারছেন। কিন্তু এই ভাবনা পেছনের ভাবনা। যখন তিনি মিসেস জোয়ারদার নয়। আইভি সান্যালও নন। শুধু আইভি, জীনের খালি বোতলটা থেকে যেন সেই আইভিই তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে চলেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের কৃতি ছাত্র শিবশঙ্কর সান্যাল। এম. এস. সি. পরীক্ষার ফল তখনও বের হয় নি। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবেন এতে সন্দেহ নেই। অল্প বয়সেই শিবশঙ্কর মামার বাড়িতে মানুষ। মামাদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল—দুবেলা খাওয়া পরাটা ভালো ভাবেই চলে যায়, শিবশঙ্করের মা সতী দেবী যখন থান কাপড় পরে একমাত্র শিশু সন্তানের হাত ধরে ভাইদের সংসারে ফিরে এসেছিলেন তখন ভাইরা তাকে ফেলে দেন নি। প্রতিদিনকার পাতের সাথে আরো দুটো পাত যোগ করে নিয়েছিলেন।

গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের বিধবা। বয়স যতই কম হোক না কেন পারিপার্শিক অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছিলেন ভাইরা বোনকে যতই টেনে নিক না কেন, ভাই-বৌদের মন যোগানোর উপর তার ও তার ছেলের দু বেলার ভাতের থালাটা নির্ভর করবে। এ বাড়িতে এসে প্রথমেই তাই রান্না-ঘরের হাঁড়ি ঠেলার দায়িত্বটা হালকা করে দিয়েছিলেন। ভাইদের কাছে একটা অনুরোধই মুখ ফুটে জানিয়েছিলেন। তারা যেন শিবশঙ্করকে পড়ার সুযোগটা করে দেয়। শিবশঙ্করের পড়াশোনার ব্যাপারে অবশ্য মামাদের কোনো দায়িত্ব নিতে হয়নি। স্কুলে ভর্তি করে দেবার পরেই শিক্ষকেরা বুঝে গিয়েছিলেন এই ছেলেটা তাদের সংবাদপত্রের শিরোনামায় জায়গা করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। বাপ মরা এই ছেলেটির প্রতি প্রতিটি শিক্ষকেরই একটা সহানুভূতি প্রথম দিন থেকেই বর্ষিত হয়েছিল।

স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার প্রথম হওয়ার পুরস্কারের বইগুলি যখন শিবশঙ্কর বুকে জড়িয়ে মা মা বলে বাড়িতে ছুটে আসতেন তখন সীতা দেবী ভুলে যেতেন রান্নাঘরের উনানের কাঠের কালি তার সারা হাতে মুখে লেগে আছে। ছেলেকে কালি হাতে জড়িয়ে ধরে আনন্দের কান্নায় তবে কপাল ভিজিয়ে দিতেন। পরে রাত্রিবেলায় ছেলের জামা থেকে সেই কালির দাগ তুলতে জামাটা কেচে নিবে যাওয়া উনানের তাপের উপর টাঙিয়ে রাখতেন।

সীতা দেবীর কোমরে একটা তীব্র ব্যথা হত। রাত্রি বাড়ার সাথে সাথে এর তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেত। শেষ রাতের দিকে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করলেও মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের করতেন না, পাছে শিবশঙ্করের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু শিবশঙ্কর টের পেয়ে যেতেন মায়ের এই যন্ত্রণার কথা। উঠে বসে তার কচি হাতদুটো দিয়ে মায়ের কোমর টিপে দিতেন। বলতেন, আরেকটু শুয়ে থাক মা। ব্যথাটা তা হলে একটু কম হবে।

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখেও হাসি ফুটিয়ে সীতা দেবী বলতেন, নারে, তোর মামা ভোর বেলায় ট্রেন ধরবে। উনানের তাপে ব্যথাটা অনেক কম লাগে।

ব্যথার জন্যই বোধ হয় সীতা দেবী চা খেতে একটু বেশিই ভালবাসতেন। কিন্তু যদি তার চা খাওয়া নিয়েই আবার বৌদিরা কেউ কিছু ভেবে বসেন এইভেবে করা চায়ের পাতাগুলি জমিয়ে রাখতেন। পরে গরম জলে ফুটিয়ে ছেঁকে নিয়ে নুন মিশিয়ে খেতেন।

কতদিন ভেবেছেন, শিবশঙ্কর, কি হবে এই পড়াশোনা করে? তার থেকে মামাদের বলে কোনো একটা দোকানে কাজ নিয়ে নেবেন। যা পাবেন তা দিয়ে মার চিকিৎসা করাবেন। মার কাছে কথাটা বলতেই ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন। সীতা দেবী তাকে দিয়ে তার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, তিনি আর কোনো দিন পড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা বলবেন না। মায়ের চোখের জল থামাতে শিবশঙ্করকে সেদিন সারা রাত জেগে থাকতে হয়েছিল।

হায়ার সেকেণ্ডারিতে বিজ্ঞানের চারটি বিষয়ে স্টার মার্ক সহ যখন দশের মধ্যে নাম হয়েছিল তখনও সীতা দেবী রান্নাঘরে দুপুরের রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বড় বৌদিই খবরটা নিয়ে এসে বলেছিলেন, সীতা, এই মাত্র রেডিও তে বলেছে শিবশঙ্কর প্রথম দশজনের মধ্যে

একজন হয়েছে। ও আমাদের গর্ব। তুই রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে আয়। স্কুলের মাস্টাররা আসবে। শিবশঙ্করের ছবি তুলবে।

সীতা দেবী বলেছিলেন, সব কিছুই তো তোমাদের জন্য বৌদি। তোমরা আশ্রয় না দিলে শিবু কি এমন ফল করতে পারত? তোমরাই তো আছ। আমি ওর মাস্টারমশাইয়ের সামনে গিয়ে কী বলব?

না, সীতা, লোকে কী বলবে? সবাই ভাববে আমরা তোকে রাধুনীর মতন কাজ করাই। তুই আমার একটা ভাল কাপড় পরে হাত-মুখ ধুয়ে বস। আজ আমি রান্না করে শিবুকে খাওয়াব।

বড় মামা চেয়েছিলেন, শিবু ডাক্তারি পড়ুক, বলেছিলেন, ওর যা রেজাল্ট, মেডিক্যাল কলেজেই ও চান্স পেয়ে যাবে। ডাক্তার হতে পারলে ওর পয়সা কে খায়?

শিবশঙ্কর কিন্তু অঙ্কে অনার্স নিয়েই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। অঙ্কই তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। পাসও করেছিলেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে। ভেবেছিলেন, স্কুলে চাকরি নিয়ে মাকে এনে আলাদা বাড়ি ভাড়া করবেন। কিন্তু সীতা দেবীর চোখের জলে তাকে ভর্তি হতে হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে মাকে লুকিয়ে টিউসনি নিয়ে নিজের খরচের জন্যে তো বটেই স্কলারশীপ ও টিউসনির টাকা দিয়ে মার জন্য আনতেন ওষুধ, ফল আর চা।

ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তার বাঁধা। অধ্যাপকরাও জানেন। নামি কলেজ তো বটেই, বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার কাজ হয়ে যাবার কথা। অপেক্ষা শুধু ফল প্রকাশের।

কী একটা কারণে তারাতলায় মুখার্জী এণ্ড কোং-এর দপ্তরে বড়মামার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন শিবশঙ্কর। বিশাল প্রতিষ্ঠান। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ছাড়াও ইলেকট্রনিক শিল্পে এদের প্রায় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। এখানেই অ্যাকাউন্টস দপ্তরে বড় মামা কাজ করেন। অবসর নেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। অথচ বড়মামার তিন মেয়ের একজনেরও বিয়ে দিতে পারেন নি। বড় জন দু দুবার বি. এ পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে নি। এখন বাড়িতেই বসে আছে। মেজ মেয়ে হায়ার সেকেণ্ডারিতে কম্পার্টমেণ্টাল পেয়ে পাস করে আর পড়েনি। ছোটটি এখন ভূগোলে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছে।

বড়মামার খোঁজে লিফ্টে উঠতে গিয়েই দেখা হয়েছিল তার এক অধ্যাপকের সাথে। তিনি মুখার্জী এণ্ড কোম্পানীর মালিক সন্তোষ মুখার্জীর শ্যালক। তিনিই তাকে এক রকম জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন মালিকের চেম্বারে।

বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে পুরু ফোমে মোড়া রিভলভিং চেয়ারে বসেছিলেন সন্তোষ মুখার্জী। পিছনের দেয়ালে কোম্পানীর অগ্রগতির গ্রাফ্ বোর্ড।

গোলগাল চেহারা। সারা শরীর জুড়ে প্রাচুর্যের মেদ উপচে পড়ছে। মাথা জুড়ে গড়ের মাঠের মতন মসৃণ টাক। দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। শ্যালককে দেখে খুশিই হলেন। বোঝা গেল উভয়ের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক বজায় আছে। শিবশঙ্করকে দেখে শ্যালকের প্রতি জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

পরিচয়টা তার অধ্যাপকই দিয়েছিলেন। ও শিবশঙ্কর। মানে শিবশঙ্কর সান্যাল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করেছিলেন শিবশঙ্কর।

বসো ভাই। এখন তো তোমাদের মতন যুবকেরা এ ভাবে প্রণাম করে না। আমার শ্যালক তার দিদিকে ছাড়া এর আগে আর কাউকে প্রশংসা করেছে বলে শুনিনি। তুমি যে কত দুর্মূল্য রত্ন তাই বুঝতে পারছি।

অঙ্ক ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবার আছে বলে শিবশঙ্কর জানতেন না। মিঃ মুখার্জীর

কথাগুলি ঠাট্টা না প্রশংসা এগুলি ভাবার ক্ষমতাও ছিল না। অধ্যাপকের দিকে একটা লাজুক হাসি টেনে সামনের সোফাতে বসে ছিলেন শিবশঙ্কর।

অধ্যাপক বলেছিলেন, ওর ফাইনাল রেজাল্ট বের হয়নি। অথচ এখনই নানা জায়গা থেকে ডাক আসা শুরু হয়েছে। তবে ওকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই আমরা নেব। ওরও তাই ইচ্ছে।

মিঃ মুখার্জী সোজা হয়ে বসেছিলেন। খুব খুশি হলাম ভাই তোমার কথা শুনে। তা তুমি কি আমার শ্যালকের সাথে কলকাতা পরিক্রমায় বেরিয়েছো?

অধ্যাপক বলেছিলেন, না, না। আপনার সাথে দেখা করতে এসে দেখি ও লিফ্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কোনো আত্মীয় এখানে কাজ করেন। আমি জোর করে আপনাব কাছে ধরে এনেছি।

বল কী? আমার এখানে কাজ করেন? কী নাম?

আজ্ঞে, অক্ষয় লাহিড়ি।

প্রায় শ দুয়েক লোক কাজ করে মিঃ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানীতে। মুখ চেনেন সবাব তবে সবার নাম জানেন না। অক্ষয় লাহিড়িকে চিনতে পারলেন মিঃ মুখার্জী। তার অ্যাকাউন্টস বিভাগে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন। রোগা লম্বা। মনে পড়ল তিন চারদিন আগেই তাব কাছে এসেছিলেন। সামনেই অবসর নেওয়ার কথা। হাত জোড় কবে অনুবোধ কবেছিলেন তিনি যেন তার এক্সটেনসনের প্রার্থনা বিবেচনা করে দেখেন। প্রাইভেট ফার্ম। তিনিই মালিক। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এখন যে আর হাতে কলমে হিসেব রাখার যুগ শেষ হতে চলেছে সে কথা বলে মিঃ মুখার্জী তাকে বিদায় করে দিয়েছিলেন।

বেশ অবাক হয়েছিলেন, মিঃ মুখার্জী। সেই অক্ষয় লাহিড়ির এমন প্রতিভাবান ভাগ্নে, বলেছিলেন, অক্ষয়বাবুর ভাগ্নে তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তার বাড়িতেই আমরা মানুষ হয়েছি।

—আমরা মানে?

—আমি আর আমার মা।

—তোমার বাবা?

—ছোটোবেলাতেই মারা গেছেন।

—অক্ষয়বাবু থাকেন কোথায়?

—আজ্ঞে, বনগাঁয়ে।

—তুমি কি ওখানেই থাক?

—আমি মাস কয়েক হল বেলগাছিযার একটা মেসে উঠেছি। রেজাল্ট বের হওয়া পর্যন্ত এখানকার একটা স্কুলে ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে কাজ করব। বিকেল বেলায় কয়েকটা ছাত্র পড়াই। তাই যার বদলে স্কুলে কাজ করছি তার মেসেই আছি। তবে আমার মা মামার ওখানেই আছেন।

মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন, তুমি বসো, আমি অক্ষয় বাবুকে ডেকে আনছি।

ভীষণ সঙ্কোচে পড়েছিলেন শিবশঙ্কর। মামার চোখের দিকে চেয়ে আজ পর্যন্ত কোনো কথা বলেন নি। তার সাথে দেখা করতে এসেছেন মাকে একটা ওষুধ পাঠাবেন বলে। তাকে বেয়ারা দিয়ে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেছিলেন, মামা যেখানে বসেন সে জায়গাটা আমি চিনি। আপনার অনুমতি পেলে আমি তার কাছে যেতে পারি।

মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন, বেশ, তুমি দেখা করে এস। আমার ড্রাইভার তোমাকে বেলগাছিয়ায় নামিয়ে দিয়ে আসবে।

শিবশঙ্কর বলেছিলেন, না স্যার, গাড়ির দরকার নেই। আমি বেহালার এক বন্ধুর বাড়ি যাব। এখান থেকে তো মাত্র দু মিনিটের পথ।

মামাকে পান নি শিবশঙ্কর। অফিসের কাজেই ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। পাশের সহকর্মীর কাছে ওষুধের প্যাকেটটা রেখে চলে এসেছিলেন।

সেদিন মেসে ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। ছাত্রের বাড়িতে জন্মদিনের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানেই দেখা হয়ে গিয়েছিল এক অঙ্কের অধ্যাপকের সাথে। অঙ্ক নিয়ে আলোচনা হলে শিবশঙ্কর সব কিছুই ভুলে যেতেন। খেতে বসেছিলেন সবার সাথে। কিন্তু যখন উঠলেন সব নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাই বাড়ি ফিরে গেছেন। শুধু তার ছাত্র করুণ মুখে বসে ছিল। মেসে ফিরে এসে জানতে পেরেছিলেন বড় মামা তার খোঁজে মেসে এসেছিলেন। যুগপৎ বিস্ময় ও অজানা আশঙ্কায় সারারাত ছটফট করেছিলেন শিবশঙ্কর। বড় মামা তার খোঁজে মেসে আসবেন এটা অবিশ্বাস্য। মার কোনো খারাপ খবর থাকলে বড়মামা নিশ্চয়ই তাকে বাড়িতে যাবার কথা বলে যেতেন। কিন্তু তিনি মেসের ম্যানেজারকে বলে গেছেন কাল সকালে আসবেন, শিবশঙ্কর যেন কোথাও না যায়।

বনগাঁ থেকে ফার্স্ট লোকাল ধরে চলে এসেছিলেন অক্ষয়বাবু। শিবশঙ্কর শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তখনও ঘুম ভাঙে নি। মেসের ঠাকুরের ডাকে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিলেন। বড় মামাকে নিয়ে মেসের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়েছিলেন।

বড় মামাকে এত খুশি কখনো দেখেন নি শিবশঙ্কর। অবশ্য তার সুযোগই বা কোথায় ছিল? বড় মামা কোনো দিন তার কাছে এত ঘনিষ্ঠভাবে বসতে পারেন সেটা তো তার কল্পনাতেও আসে নি।

তোমার সাথে আমাদের কোম্পানীর মালিক মিঃ মুখার্জীর দেখা হয়েছিল? উত্তেজনাকে চেপে রাখতে পারেন নি অক্ষয়বাবু।

অবাক হবার পালা শিবশঙ্করের। বড়মামা তাকে তুমি বলে কথা বলছেন। এর আগে তো এই ছোড়া ছাড়া তার মুখ থেকে কোনো ডাক শোনেন নি। শিবশঙ্কর বলেছিলেন, হ্যাঁ হয়েছিল।

ভগবান বোধ হয় এতদিনে আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। কপালে জোড় হাত তুলে প্রণাম করে অক্ষয়বাবু বলেছিলেন, কী দুঃখেই না এতটা জীবন কাটিয়েছে তোমার মা।

শিবশঙ্কর মামার কথার কোনো অর্থ না বুঝতে পেরে শুধু মামার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

শোন বিরাট একটা অবিশ্বাস্য প্রস্তাব এসেছে মিঃ মুখার্জীর কাছ থেকে। একেবারে রাজত্ব ও রাজকন্যা।

শিবশঙ্কর তখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। উত্তেজনায় অক্ষয়বাবুর গলা কাঁপছে। বলেছিলেন, বুঝতে পারছ না?

না। মাথা নেড়েছিলেন শিবশঙ্কর।

মিঃ মুখার্জী তোমার সাথে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। আর এই মেয়েটিই তার একমাত্র সন্তান। বুঝতে পারছ, তুমিই হবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক।

বিয়ে? আঁতকে উঠেছিলেন শিবশঙ্কর।

হ্যাঁ বাবা, তুমি আপত্তি করো না। কত বড় মানুষ মিঃ মুখার্জী। তার কাছে যেতেই ভয়

অক্ষয়বাবুর বুক কেঁপে উঠে। তিনি নিজে আমায় ডেকে হাত জোড় করে এই প্রস্তাব দিয়েছেন। তোমার প্রফেসার তোমার সব কথা বলেছেন।

কিন্তু মামা, আমি যে বিয়ের কথা ভাবতেই পারছি না।

না বাবা, তুমি এসব কথা বোল না। আমাদের কথা ভাব। তোমার মামীর শরীরটা ভেঙে পড়েছে। মাথার উপর তিন তিনটে অ-বিবাহিতা মেয়ে। কয়েক মাস বাদেই আমার অবসর নেওয়ার কথা। মিঃ মুখার্জী বলেছেন, আমাকে এক্সটেনসন দিয়ে সেকসন ইনচার্জ করে দেবেন। মেয়েদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমার এই একটা হ্যাঁর জন্য আমাদের সবার দুঃখ দুর হয়ে যাবে।

আমায় একটু ভাববার সময় দিন বড়মামা। শিবশঙ্কর গলার সুরে একটা প্রতিবাদ তুলতে চেয়েছিলেন।

অন্যসময় হলে আশ্রিত ভাগ্নের এই আপত্তির সুর বেয়াড়াপনা বলে মনে হত। কিন্তু আজ অক্ষয়বাবু অন্যমানুষ। ভাগ্নের সম্মতির উপরই তার সব কিছু নির্ভর করছে।

শিবশঙ্কর চলে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই ব্যাঙ্কের কাজ সেরে ফিরে এসেছিলেন অক্ষয় বাবু। অফিসে ঢুকতেই চীফ্ অ্যাকাউনটেন্ট নিজে এসে খবর দিয়েছিলেন। মালিক তাকে কয়েকবার খোঁজ করেছেন। জানিয়েছেন, এলে যেন তাকে তার চেম্বারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খবরটা শুনেই হাত পা অবশ হয়ে এসেছিল অক্ষয়বাবুর। স্বয়ং মালিক তার খোঁজ করেছেন। ভয়ে ভয়ে চীফ্ অ্যাকাউনটেন্টের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সে সময় মিঃ মুখার্জীর পিয়ন অক্ষয়বাবুকে এসে বলেছিল, সাহেব এক্ষুণি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন।

ঘরে ঢুকতেই মিঃ মুখার্জী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আরে আসুন অক্ষয়বাবু, বসুন।

মিঃ মুখার্জী নিজে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বসতে বলছেন ব্যাপারটা তখনও অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল অক্ষয়বাবুর কাছে। তিনি তখনও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

মিঃ মুখার্জী অনুরোধের সুরটা আরো নরম করে বলেছিলেন, এ কি অক্ষয়বাবু। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে? প্লিজ বসুন।

একটা চেয়ারে গভীর সঙ্কোচ নিয়ে বসেছিলেন অক্ষয়বাবু। পাশের ভদ্রলোককে এর আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারেন না।

মিঃ মুখার্জীই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, উনি আমার শ্যালক। আপনার ভাগ্নের শিক্ষক।

মালিকের শ্যালক চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন অক্ষয়বাবু।

প্রবীণ অধ্যাপক তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে পাশে বসিয়েছিলেন।

অক্ষয়বাবু, মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন, আপনার ভাগ্নে যে এত বড় স্কলার তা তো আপনি কোনোদিন আমাকে জানান নি।

থতমত খেয়ে যান অক্ষয়বাবু। ভাগ্নে তার একটাই, শিবশঙ্কর। সে পড়াশোনায় ভাল হয়েছে স্ত্রীর কাছে শুনেছেন। এর বেশি খোঁজ রাখার কথা কোনো দিনই ভাবেন নি। সেই ভাগ্নের খবর যখন মালিকের কাছে এসে পৌঁছেছে, তখন তার খবর এতদিন না রাখাটা যে অপরাধ হয়েছে তা বুঝতে পারেন। বলেছিলেন, বাপ মরা ছেলে, গরীবের সংসারে উঠে এসেছিল। ওর পড়াশোনার ঝোঁক দেখে নিজের মেয়েদের না পড়িয়ে ওকেই পড়িয়েছি স্যার। আপনাদের আশীর্বাদে ও বড় হয়েছে।

আপনার কাছে আমার আর আপনার ভাগ্নের শিক্ষকের পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব রাখতে চাই।

চমকে উঠেছিলেন অক্ষযবাবু। মিঃ মুখার্জীব মেযেব সম্পর্কে নানা বসালো কথা সহকর্মীদেব মুখে শুনেছেন। দেখেছেনও তাকে। নিঃসন্দেহে সুন্দবী। তবে তাব উগ্র সাজসজ্জাব মধ্যে ছিল দেহ প্রকাশেব কদর্য ভঙ্গি। নিজেই গাডি চালিযে মাঝে মাঝে বাবাব কাছে আসতে দেখেছেন। নামও জানেন। মিতা মুখার্জী। সহকর্মীদেব কাছ থেকে শুনেছেন, নিত্যনতুন পুরুষ সঙ্গী পাল্টানো তাব কাছে পোষাক পবিবর্তনেব মতনই নিত্য অভ্যাস। চেম্বাবেব বাইবে থেকে অনেকেই বাপ-মেযেব ক্রুদ্ধ চিৎকাব শুনেছেন। মুঠো মুঠো টাকাব দাবি নিযেই হত তাদেব ঝগড়া।

অ্যাকাউন্টস সেকশনেই আছেন অক্ষযবাবু। তাই জানেন মাসেব প্রথমেই মোটা টাকা মিতা মুখার্জীব নামে ব্যাঙ্কে জমা হয। কিন্তু তাব বেপবোযা জীবনযাত্রাব ঘূর্ণিতে সে টাকা কযেকদিনেব মধ্যেই তলিযে যেত। সে নিযেই বাবা মেযেব কথা কাটাকাটি বাড়ি থেকে অফিস পর্যন্ত গডাত। শেষ পর্যন্ত মেযেব দাপটে হাব মানতেন মিঃ মুখার্জী। অ্যাকাউনটেন্টকে ডেকে মেযেব নামে আবাব চেক জমা কবে দিতে বলতেন।

মিঃ মুখার্জীব স্ত্রীকেও দেখেছেন অক্ষযবাবু। কোম্পানীব প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসবে প্রতি বছবই আসেন। ঐ দিন বেশ বড কবেই উৎসব হয। মিসেস মুখার্জী সকাল থেকেই আযোজন ও তদাবকিতে যোগ দিতেন।

লাল চওডা পাডেব সাদা গবদেব শাডি, কপালে বড সিঁদুবেব টিপ হাতে শুধু দুটো সোনাব বালা, মিসেস মুখার্জীকে অনেকটা মা সাবদাব মতন মনে হতো।

অক্ষযবাবু, মিঃ মুখার্জীব ডাকে আবাব চমকে উঠেছিলেন অক্ষযবাবু।

স্যাব।

আপনাব ভাগ্নেব সাথে আমাব মেযেব বিযেব প্রস্তাবটা যদি ভেবে দেখেন।

ঠোঁট দুটি আপনা থেকেই ফাঁক হযে যায। বিস্মযেব অভিব্যক্তি অক্ষযবাবুব বিস্ফাবিত দুটি চোখ দিযেই প্রকাশ পাচ্ছিল। কোনোমতে বলেছিলেন, আপনি এটা কী বলছেন স্যাব?

আপনাব আপত্তি আছে?

আমাদেব মতন এত সামান্য ঘবেব সাথে আপনাব সম্বন্ধ তো স্বপ্ন।

আপনাব [illegible] সম্পর্কে সব কিছু শুনেই আমি এই প্রস্তাব এনেছি।

আমাব বোনেব সাথে একবাব কথা বলতে দিন স্যাব। তা ছাডা ভাগ্নেব একটা মত—

শুনুন, অক্ষযবাবু, পাইপ থেকে ছাইগুলি ঝেডে ফেলে মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন, আপনি তো জানেন, সন্তান বলতে আমাব একটিই মেযে। তাকে মনে হয আপনি দেখেছেন। রূপ নিযে কোনো কথা বলাব দবকাব বোধ হয নেই। তবে মেযে আমাব একটু [illegible] আব চঞ্চল। বিযেব আগে অনেক মেযেই এবকম থাকে। বিযেব পব সব ঠিক হযে যায। কী বলেন অক্ষযবাবু?

মালিকেব কথায় সামকে কাঁঠাল বলতে অভ্যস্ত অক্ষয়বাবু আজও মাথা নাডেন তা তো ঠিক-ই স্যাব।

মিঃ মুখার্জী আবো একটু ঝুঁকে এসেছিলেন। শুনুন অক্ষযবাবু, আমি আব কতদিন? জানেন তো আমাব ডাযেবেটিস আব প্রেসাবেব কথা? সেদিনও কার্ডিওগ্রাফে বুকটা ওযার্নিং দিযেছে। তাব পব সব কিছুই মেযে আব জামাই। তাই না?

হ্যাঁ স্যাব।

গলাব স্ববটা আবেকটু নামিযে আনলেন মিঃ মুখার্জী। দেখুন অক্ষযবাবু, আমার এত বড বাড়িতে প্রাণী বলতে আমবা তিন জন। তাই মেয়ে, জামাই যদি এ বাড়িতে থাকে তবে বুড়োবুড়ি ভবসা পাব, মবাব সময মুখে জল দেবাব কেউ থাকবে।

পাইপের তামাকটাকে আবার অগ্নি সংযোগ করেন মিঃ মুখার্জী। একটা নীল ধোঁয়া দুজনের মধ্যে আবছা আবরণ সৃষ্টি করে।

অক্ষয়বাবু, গলার স্বরটা আরো খাদে নামিয়ে এনে মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন, আপনার কথাটাও আমি ভেবে রেখেছি।

স্যার, অক্ষয়বাবু সোজা হয়ে বসেছিলেন।

আপনি তো অনেকদিন আমার কোম্পানীতে চাকরি করলেন?

হ্যাঁ স্যার, অজানা আতঙ্কে অক্ষয়বাবুর গলার স্বরটা অস্পষ্ট শোনায়।

আপনার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন হতে চলেছে। আমার ঢাকুরিয়াতে দোতলা একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে। ভাবছি ঐ বাড়িটা আপনার নামে লিখে দেব, মনে করুন ওটা আমার তরফ থেকে আপনাকে আমার উপহার। অ্যাকাউন্টস সেকশনের ইনচার্জের পোষ্টটা খালি হবে। ওখানে একেবারে নিজের লোক নেব ভাবছি। আপনার সাথে যখন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেল তখন আপনার থেকে আর নিজের লোক কে হবে? যদি চান আমার এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ডিভিশনে আপনার মেয়েদের ভাল মাইনের চাকরি দিয়ে দিতে পারি।

স্যার, অক্ষয়বাবুর ঠোঁটে কথাটা ঐ পর্যন্তই আটকে থাকে।

তাহলে এটাই ফাইনাল কথাবার্তা হয়ে গেল। দিন দশেকের মধ্যে শুভ কাজটা সেরে ফেলতে চাই। ভয় পাবেন না, শুভ কাজের দিনেই আমার প্রতিশ্রুতিগুলিও পালন করে ফেলব। আপনি ভাগ্নেকে নিয়ে আজকেই বাড়ি চলে যান। আমরা কালকে গিয়েই আশীর্বাদের কাজটা সেরে আসব।

মামা, আপনার চা। আর এটা একটু খেয়ে নিন। সেই সকালে বেরিয়েছেন। শিবশঙ্করের ডাকে চমক ভাঙ্গে অক্ষয়বাবুর।

মেসের ঠাকুরকে দিয়ে মিষ্টি আনিয়েছেন শিবশঙ্কর।

হ্যাঁ বাবা, খিদে সত্যি পেয়েছে। তোমার মা দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমিই ওকে জোর করে আবার শুতে পাঠিয়ে দিয়েছি। এ বাড়িতে এসেই তো হাঁড়ি ঠেলে গেল।

তবে আরো কিছু আনিয়ে দিই? মেসে সকালে সবাই চা, বিস্কুট খায়।

শিবশঙ্কর ঠাকুরকে ডাকতে যেতেই অক্ষয়বাবু, তার হাতটা ধরে বলেছিলেন, আমার আর কিছু দরকার নেই বাবা। তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। নটা দশের লোকাল ধরতে হবে।

কিন্তু আমি কোথায় যাব?

বাড়িতে। তোমার মা-ই যে আমাকে নিয়ে যেতে পাঠালো।

মা যেতে বলেছেন? দুনিয়ার এই একটা জায়গাতেই শিবশঙ্করের সব দুর্বলতা, সব সাহস সব নির্ভরতা।

হ্যাঁ বাবা, অক্ষয়বাবু বলেছিলেন, এই দেখ, তোমার মা যে তোমাকে যেতে চিঠি লিখেছেন তা দিতে ভুলে গেছি।

মা লিখেছেন, শিবু, বড়দার সাথে পত্রপাঠ চলে আসবি। তোর জন্য অপেক্ষা করে আছি।

কিন্তু মামা, আমার ছাত্রদের তো কিছুই জানানো হয় নি। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

তুমি ওদের ঠিকানা বা ফোন নম্বর দাও। আমিই ওদের খবর দেবার ব্যবস্থা করব।

মামাকে খবর দিতে হয় নি। শিবশঙ্কর স্কুলে ফোন করে দিয়েছিলেন। তবে নটা দশের ট্রেন ধরতে পারেন নি। পরের ট্রেন প্রায় এগারোটায়। অক্ষয়বাবু সারাটা রাস্তা জপতে জপতে চলেছিলেন, হে ভগবান, ওদের চলে আসার আগেই যেন আমরা পৌঁছাতে পারি।

বাড়িতে পৌঁছেই মাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। পরিষ্কার শাড়ি। ঝকঝকে চেহারা। রান্নাঘরের কোণেই এতদিন মাকে দেখে এসেছেন। এই মা তার চোখে নতুন। তার মার চেহারা এত সুন্দর ভাবতেই অবাক লাগছিল। মায়ের মুখের এ হাসি এর আগে কোনোদিন দেখেন নি।

শিবশঙ্করকে ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, তুই দাদার কথা অমান্য করিস না, শিবু।

—কী কথা মা?

—তোর বিয়ের কথা।

কিন্তু মা, এ কী করে সম্ভব? আমার পরীক্ষার ফল বেরোয় নি। কোনো চাকরি নেই। মেয়ে কেমন তার কিছুই জান না। তোমাকে কতখানি সম্মান করবে তা জানি না। তাছাড়া, এত বড়লোকের সাথে আত্মীয়তা করতে তুমি চাইছ কেন?

সীতা দেবীর মুখের সেই খুশির হাসিটা মিলিয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিতে নেমে এসেছিল একটা হতাশার ছাপ। শিবশঙ্করের একটা হাত দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলেছিলেন, আমি যে দাদাকে বড় মুখ করে কথা দিয়েছি শিবু। বলেছি, শিবু আমার ছেলে। আমার মত দেওয়াই ওর মত। তুই কি দাদার কাছে আমার মাথাটা এভাবে নুইয়ে দিবি?

তুমি কথা দিয়েছ মা?

হ্যাঁ রে, শিবু।

শিবশঙ্করের দুর্বলতম জায়গা এখানেই। মায়ের মুখটাই তার প্রেরণার উৎস। মায়ের সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটাই তার চোখে ভেসে ওঠে। ভেবে রেখেছেন চাকরিটা হয়ে গেলেই মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসবেন। ছোট্ট ছিমছাম একটা বাড়ি। সেখানে মায়ের কর্তৃত্ব প্রাণভরে উপভোগ করবেন। সেই মায়ের মুখে এই মাত্র যে হাসিটি দেখেছিলেন সেই হাসিটা দেখার জন্যই তো তিনি এতদিন স্বপ্ন দেখে এসেছেন।

শিবশঙ্কর বলেছিলেন, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে মা।

শিবু। সীতা দেবী দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন শিবশঙ্করকে।

[১৯]

অঙ্কের দুরূহতম থিয়রম নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘর থেকে ও ঘর করছেন শিবশঙ্কর। ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড ও খাতার বাইরের জগতের দিকে তাকাবার সময় পান নি। সহপাঠিনীদের সাথে দেখা হলে চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তাদের মুখের দিকে তাকান নি। জীবনে মা ছাড়া অন্য কোনো নারীর মুখের প্রতি সোজাসুজি তাকানো এই প্রথম। তাই শুভদৃষ্টির সময় মিতার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। সে দৃষ্টিতে ছিল আবিষ্কারের মুগ্ধ বিহুলতা। চারিপাশের খিলখিল হাসি আর মেয়েলি ঠাট্টার তীব্র স্রোতও তার চোখের পাতাকে নামাতে পারে নি। নারীর মুখের সৌন্দর্য সেদিন চোখের দৃষ্টিতে পান করে চলেছিলেন।

বিয়ের প্রথম রাতেই আবিষ্কারের মুগ্ধ স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিলো। মিতা তাকে বলেছিল, সে যেন তার উপর স্বামীর দাবি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা না করে। তবে এর থেকেও তীব্র হোঁচট তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মিতা বলেছিল, তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট কবে বলা দবকাব।

বল।

বাবা তোমাব কাছে নিশ্চযই আমাব ঘটনাটা জানিযেছে?

—কোন ঘটনা?

—না জানার ভান কবছ কেন? বাজ্য দেবাব বিনিময়ে বাবা নিশ্চযই তোমাব মতন এক গেঁযোব সাথে সাত তাডাতাডি আমাব বিযেব ব্যবস্থা কবতেন না।

—আমি কিছু জানি না।

বাবা যদি আমাব ঘটনা লুকিযে থাকেন তবে অন্যায কবেছেন। আমি স্পেড কে স্পেড বলতেই ভালবাসি।

—আমি কিছু বুঝতে পাবছি না।

—আমি গর্ভবতী।

অঙ্কেব জটিল প্রশ্নগুলি টপাটপ সমাধান কবাব সময শিবশঙ্কব জানতেন না জীবনেব জটিল প্রশ্নগুলিব কথা। ছোটোবেলা থেকেই আশ্রিতেব মানসিকতায় প্রতিবাদ শব্দটি তাব জীবনেব অভিধান থেকে বিদায নিয়েছিল। সব কিছুকে মেনে নেওযাব মধ্যেই নিবাপদ আশ্রয ভাবতেন। মাঝে মাঝে নিজেকে চাষিব বলদেব সাথে তুলনা করে মনেব ভাবকে লাঘব কবতে চাইতেন। বিশাল দেহ। তেল চকচকে ধাবালো শিং। অথচ পিঠে যখন লাঠি পডে, নিজেব শবীব আব শিং এব ব্যবহাবেব কথা ভুলে গিযে আযত চোখেব কালো সীমাবেখাকে আবো বিস্তাব কবে অসহায নিবেদনেব আকৃতি নিযে জোযাল টেনে চলে।

শুভদৃষ্টিব মুহূর্তে যে নাবীব সৌন্দর্যেব মুগ্ধতায সাঁতাব কাটতে চেযেছিলেন, ফুলসজ্জাব বাত্রিতে সেই নাবীব এই ভিন্ন রূপেব দিকে শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিযে ছিলেন।

মিতা বলেছিল, এই বিযেটা বাবাব চাপে আমি বাজি হযেছিলাম। না হলে বাবা আমাকে টাকা দেওয়া বন্ধ কবে দিত। তুমিও বিযে কবছ বাবাব সম্পত্তি দেখে। বাবাব নাতিব জন্মদাতাব একটা বৈধ স্বীকৃতিব দবকাব ছিল। বাবা তোমাকে কিনতে পেবেছেন। এই ফ্ল্যাট ছাডাও তোমাব মামাকে একটা বাডি দেওযা হযেছে। তুমি তোমাব মত চলবে, আমি আমাব মত। কেউ কাবো ব্যাপাবে নাক গলাবে না।

অঙ্কেব বইতে প্রতিবাদেব ভাষা নেই। সব কিছুকে মিলিযে দেওযাব মধ্যেই তাব কৃতিত্ব।

শিবশঙ্কব বলেছিলেন, আচ্ছা।

—শ্বশুবমশাই একদিন ডেকেছিলেন, মিতা কি ওব ব্যাপাবে তোমাকে সব বলেছে।

—বলেছে।

—তুমি কিছু বলবে?

—না।

—আমাব উপব তোমাব কোনো অভিযোগ নেই।

—না।

মিঃ মুখার্জী পাইপে আগুন না ধবিযেই টানতে গিযে কেশে ফেলেছিলেন।

এ বাড়িতে শাশুড়িকে দেখে মনে হত সেই গ্রীক উপাখ্যানের অ্যাটলাসেব কথা। এ বাড়িব সব বোঝা নির্বাক দিনযাপনেব মধ্যে একাই নিজেব মাথায বযে চলেছেন।

লালপাড়েব শাড়ি আব কপালে সিঁদুরেব টিপ। হাতে শাঁখা। আর কোনো পোষাক বা অলঙ্কাবে তাকে দেখেন নি শিবশঙ্কর। ঠাকুব ঘব আব বাবান্দার ইজি চেযাবে বসে থেকে

বইপড়া। এরই ফাঁকে ঠাকুর ডেকে রান্নার নির্দেশ দেওয়া—এই তার জগত। শিবশঙ্কর এলে জিজ্ঞাসা করতেন, ভাল আছ? তারপরেই বইয়ের পাতায় ডুবে যেতেন।

শিবশঙ্কর একবার বলেছিলেন, মা, আপনার সাথে আমার কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে।

বই থেকে মুখটা তুলে শিবশঙ্করের দিকে একবার তাকিয়েছিলেন। তারপরেই বই-এর দিকে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, আমার সাথে কথা বলে তোমাদের কোনো লাভ তো নেই। ওদের সাথে কথা বল।

তবু দমেন নি শিবশঙ্কর। একটা মোড়া টেনে এনে শাশুড়ির পায়ের কাছে এসে বসেছিলেন।

মিসেস মুখার্জী বলেছিলেন, আমার কাছে বসলে কেন? আমার সাথে কথা বলতে তোমার কি ভালো লাগবে?

—আমি কিন্তু একমাত্র আপনার জন্যই এ বাড়িতে আসি।

—কেন?

—আপনাকে আমার মার মতনই মনে হয়।

—তোমার মা, আমার মতন পাপ-পুরীর প্রেত হতে যাবেন কেন?

—ছিঃ মা, ও কথা বলবেন না।

—কাউকে আমি কিছু বলি না। তবে তুমি তোমার মার সাথে আমার তুলনা করলে বলে কথাটা বললাম।

—আমার মা যে খুব দুঃখী, মা।

—দুঃখী?

—হ্যাঁ, মা।

সেদিন শিবশঙ্করের কাছ থেকে তাদের সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছিলেন মিসেস মুখার্জী। বলেছিলেন, তোমার মাকে আমার কাছে এনে দেবে?

আপনার কাছে?

হ্যাঁ, বাবা। তোমার মাকে কাছে পেলে হয়তো আরো ক'দিন বাঁচতে ইচ্ছে করবে।

আমি আমাব মাকে আপনার কাছে আনব, মা।

না, থাক বাবা। এই পাপ-পুরীতে তার আসার দরকার নেই। তার থেকে তুমি আমাকেই তার কাছে নিয়ে চল।

আপনি যাবেন মা?

আমি তো এক্ষুণি যেতে চাই। তুমি নিয়ে যাবে আমাকে?

যাব মা। তবে মা যে এখনো মামার বাড়িতে আছেন। কলকাতায় আসেন নি। বলেছেন, আমার চাকরিটা হয়ে গেলেই তিনি চলে আসবেন।

আমি যে তাই চাই বাবা। আমি চাই তুমি ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া নাও। এদের দেওয়া বাড়িতে থেকো না। সেখানেই তোমার মাকে মাথা উঁচু করে নিয়ে আসবে।

আপনি তাহলে তখন মার সাথে দেখা করতে যাবেন?

না, কালকেই তোমার মার সাথে দেখা করতে যাব। তবে এ বাড়ির গাড়িতে যাব না, ট্রামে করে এখান থেকে শিয়ালদায় যাব। সেখান থেকে ট্রেনে করে তোমার বাড়ি যাব।

শিবশঙ্কর শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার বুক ঠেলে শুধু একটা কথাই বেরিয়ে এসেছিল, আমিও যে তাই চাইছিলাম মা।

এম. এস. সি. পরীক্ষার ফল যা প্রত্যাশিত ছিল তাই হয়েছিল। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তবু ইউনিভার্সিটির চাকরিটা হতে সময় নিয়েছিল। ইতিমধ্যেই অবশ্য স্কুলের ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সির চাকরিটাই স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। হেদুয়ার কাছে একটা দু-কামরার ঘর ভাড়া নিয়ে মাকে নিয়ে এসেছিলেন শিবশঙ্কর। মিতা এ বাড়িতে যে আসবে না সে কথা শিবশঙ্করের অজানা ছিল না। সীতা দেবী বলেছিলেন, যা শিবু, মিতাদের দেওয়া ফ্ল্যাটে। আমাকে নিয়ে তোদের মধ্যে ঝগড়া করিস না। তোদের সুখী দেখলেই তো আমার সুখ। আমি বনগাঁতে খুব ভালো থাকব।

জীবনে এই প্রথম অবাধ্য হয়েছিলেন শিবশঙ্কর। বলেছিলেন, তোমার কথা শুনেই আমি বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম। এবার তোমাকে ছাড়তে বলছ। আমাকে আর এসব বোলো না।

মিঃ মুখার্জী এসেছেন কয়েকবার। অনুরোধ করেছেন তার দেওয়া ফ্ল্যাটে চলে আসতে। শিবশঙ্কর সবিনয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, মিতাকে বলবেন এ বাড়ির দরজা তার জন্য সবসময়ের জন্য খোলা রইল। তার বিন্দুমাত্র অমর্যাদা হবে না। ওর সন্তান আমার সন্তানেরই মর্যাদা পাবে।

মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন, তোমার কাছে নিজেকে বড্ড অপরাধি বলে মনে হয় শিবশঙ্কর।

—কেন?

—মিতার কথা লুকিয়ে তার সাথে তোমার বিয়ে দিলাম বলে। কিন্তু বিশ্বাস কর শিবশঙ্কর, এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল। ওর গর্ভপাত ঘটাতে গেলে ওর জীবন নিয়ে টানাটানি হতে পারত। তাই তোমার সরলতার সুযোগ নিয়ে তোমার উপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছি।

—আমি তো এ নিয়ে কোনো অভিযোগ করিনি।

—সেইজন্যই তো নিজেকে আরো বেশি অপরাধি মনে হয়। তুমি যদি এ নিয়ে প্রতিবাদ করে, আমার কাছে এর বিনিময়ে দাবি জানাতে তবে আমি মনের দিক থেকে অনেক হালকা হতে পারতাম। তাছাড়া, ভেবেছিলাম, বিয়ের পর তোমার উপর কৃতজ্ঞতাবশতঃ ও ওর জীবনধারা পরিবর্তন করবে। কিন্তু সে আশাও যে সত্যি হল না।

শিবশঙ্কর মিঃ মুখার্জীর হাত ধরে বলেছিলেন, আমি কিন্তু আপনাকে কখনই এর জন্য দায়ি করিনি। সন্তানের জন্য যে কোনো পিতাই এই পরিস্থিতিতে এটাই করতেন। মিতা যদি কোনো দিন ওর দায়িত্ব আমাকে দেয় তবে সে দায়িত্ব হবে আমারই। আপনার কাছে অনুরোধ আমার এই ছোট্ট ঘরে আমার মাকে নিয়ে থাকতে দিন।

মিঃ মুখার্জি ফোন করেছিলেন, মিতা নার্সিং হোমে আছে। সিজার করতে হবে। শিবশঙ্কর যদি আসে তবে খুব ভাল হয়।

শিবশঙ্করই স্বামী রূপে নার্সিং হোমের কাগজপত্রে সই করেছিলেন। মিসেস মুখার্জী আসেন নি। মিঃ মুখার্জী একাই ছিলেন। শিবশঙ্কর মিঃ মুখার্জীর পাশে বসেছিলেন।

সিস্টার ধপধপে সাদা তোয়ালে করে এনেছিল সেই শিশুকে। মাথা ভর্তি কালো চুল। টকটকে ফর্সা। লাল টুকটুকে ঠোঁট। নিষ্পাপ নিদ্রিত মুখ। মিঃ মুখার্জীর আগেই শিবশঙ্কর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সিস্টারের দিকে। বলেছিলেন, ওর মা কেমন আছে?

সিস্টার অতি সাবধানে শিবশঙ্করের প্রসারিত হাতে তোয়ালে জড়ানো শিশুটিকে তুলে দিয়ে বলেছিল, মিতা দেবীর ইউট্রাসে একটা টিউমার ছিল। তাই কেসটা খুব জটিল ছিল। এখন উনি ভালো আছেন। তবে এই ব্যাপারে ডাক্তারবাবুই সব বলবেন।

নার্সরা দাবি তুলেছিল, এত সুন্দর মেয়ে হয়েছে আপনার। মিষ্টি খাওয়াতে হবে।

মিঃ মুখার্জী এগিয়ে এসে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি এর দাদু। মিষ্টিটা আমিই খাওয়াব।

না, শিবশঙ্কর তোয়ালে জড়ানো শিশুকন্যাকে সিস্টারের হাতে তুলে দিতে দিতে বলেছিলেন, বাবার দায়িত্ব সবার আগে। আজ আমি মিষ্টি খাওয়াব। দাদু খাওয়াবেন বাবার দিন।

মিঃ মুখার্জী একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

সিস্টার জিজ্ঞাসা করেছিল, মেয়ের কী নাম রাখবেন?

হেসে জবাব দিয়েছিলেন শিবশঙ্কর, আপনারাই ওর একটা নাম ঠিক করে দিন না।

—আমাদের দেওয়া নাম রাখবেন?

সমস্বরে চীৎকার করে উঠেছিল ওরা, পরে কিন্তু নাম পাল্টাতে পারবেন না।

শিবশঙ্কর বলেছিলেন, আপনারা আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

তাহলে আমরা লটারি করব। যার দেওয়া নাম লটারিতে উঠবে সেটা আপনাকে জানিয়ে দেব।

আমাকে নয়। শিবশঙ্কর মিঃ মুখার্জীর দিকে হাত দেখিয়ে বলেছিলেন, মেয়ের দাদুর ওপর নাম ঠিক করার ভার ছিল। আপনারা ওনাকে জানিয়ে দেবেন। নাতির বাবার দেওয়া প্রতিশ্রুতি উনি নিশ্চয়ই রাখবেন।

লটারিতে নাম উঠেছিল, আইভি।

ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে শিবশঙ্কর প্রতিদিনই নার্সিং হোমে গেছেন। মিতার শরীরের খবর নিয়েছেন। ইউট্রাস কেটে বাদ দিতে হয়েছে। টিউমার ছিল। বায়োপসি করাতে দেওয়া হয়েছে। আইভিকে কোলে নিয়ে আদর করেছেন।

মাকে বলেছেন শিবশঙ্কর, তুমি নার্সিং হোমে নাতনিকে দেখতে যাবে না?

শিবু। আর কোনো কথা বলতে পারেন নি সীতা দেবী। চোখ থেকে জলের ফোঁটা শিবশঙ্করের পায়ের কাছেই পড়েছিল।

ছিঃ মা। তুমি তো মা। মাকে তো অন্য কিছু ভাবতে নেই। মিতা তোমার ছেলের বউ তুমি চল মা।

সীতা দেবী শিবশঙ্করের সাথে নার্সিং হোমে গিয়েছিলেন। মিতা পাশ ফিরে শুয়েছিল। কথা বলেনি। মায়ের কোলে আইভিকে দিয়ে শিবশঙ্কর বলেছিলেন, মিতার মেয়ে, তোমার নাতনি।

মিসেস মুখার্জীকে একদিনের জন্যেও নার্সিং হোমে আসতে না দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলেন, শিবশঙ্কর। মেয়ের এত বড়ো অসুখ অথচ মা দেখতে এলেন না। শিবশঙ্কর নিজেই এসেছিলেন।

তাকে দেখেই মিসেস মুখার্জী বলেছিলেন, এসো কলিযুগের দধিচী। কেমন আছ?

—ভালো।

—হঠাৎ তোমার শাশুড়ির কথা মনে পড়ল কেন?

—আপনি একবারও মিতাকে দেখতে গেলেন না, তাই আমিই এলাম।

—তুমিই তো আছো। প্রতিদিন যাচ্ছ। মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করছ, তোমার মাকে নিয়ে গেছ, সবার উপর মিতার বিশাল বড়লোক বাবা আছেন। আমার মতো এই গরীব মানুষ সেখানে গিয়ে কী করবে?

শাশুড়ির কথাগুলি শিবশঙ্করের কানে কান্নার মতন ঠেকেছিল। হয়তো মনের ভুল।

শিবশঙ্কর বলেছিলেন, মিতার বায়োপসির রিপোর্ট খুব ভাল।

জানি। ও আর কোনো দিন মা হতে পারবে না। পরশুদিন নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পাবে।

—আমি সাথে আসব।

—ভালো।

চলে আসার সময় মিসেস মুখার্জী ডেকেছিলেন। শিবশঙ্কর তোমার মাকে বলবে, আমি পরশুদিন তার কাছে যাব।

আইভির অন্নপ্রাশন বিশাল ঘটা করে দিয়েছিলেন মিঃ মুখার্জী। শিল্পপতি থেকে মন্ত্রী সবাই এসেছিলেন। জামাইয়ের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। শিবশঙ্কর আইভির পিতৃত্বের বিজ্ঞাপন কপালে এঁটে বিকেল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সবার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন।

যাবার সময় মিতার কাছে গিয়ে শিবশঙ্কর বলেছিলেন, যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে খবর দিও।

মিতা কোনো জবাব দেয় নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেও আবার ফিরে এসেছিলেন শিবশঙ্কর। এত বড়ো অনুষ্ঠান। শাশুড়ি বাড়িতেই আছেন, অথচ একবারের জন্যও ঘর থেকে বের হননি। ধীরে ধীরে দোতলার সেই পিছনের বারান্দায় এসে তার দেখা পেয়েছিলেন। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন।

শিবশঙ্করের পায়ের শব্দে সোজা হয়ে বসেছিলেন, এস এ কালের দধিচী। সব মিটে গেছে?

শিবশঙ্কর বলেছিলেন, আপনি একবারও এলেন না।

আমার মতো সামান্য একটা মেয়েছেলেকে এত দামি মানুষের মাঝে বেমানান মনে হতো।

—কিন্তু মেয়ে তো আপনার।

—সেটাই যে আমার লজ্জা শিবশঙ্কর। মানুষ ভুল করে, তাব জন্য অনুশোচনাও করে, কিন্তু যার মন বলেই কিছুই নেই তাকে নিয়ে ভেবেই বা লাভ কী? আজকের দিনটাতেও কি মিতা সুস্থ ছিল?

কোনো জবাব দেন নি শিবশঙ্কর। মিতার বেসামাল দৃশ্য তার চোখকেও পীড়া দিয়েছিল। একের পর এক পেগ গলায় ঢেলে যে ভাবে পুরুষ অতিথিদের গায়ে ঢলে পড়েছিল তা শালীনতার গণ্ডিকে যে কতখানি ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটা মিঃ মুখার্জীর মুখভঙ্গি দেখেই শিবশঙ্কর বুঝতে পেরেছিলেন, মিঃ মুখার্জী শিবশঙ্করের পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, আমি লজ্জিত, তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

মিসেস মুখার্জী বলেছিলেন, অনেক রাত হল শিবশঙ্কর। তুমি তো এ বাড়িতে থাকবে না। বাড়ি যাও। তোমার মাকে বলো কাল তোমাদের বাড়িতে আমি যাব।

আমি আপনাকে নিতে আসব?

দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারব। ভাবছি তোমার মাকে নিয়ে কিছুদিন পুরীতে কাটিয়ে আসব।

খুশি হয়েছিলেন, শিবশঙ্কর। খুব ভালো হয় মা। মা কোনোদিন বাইরে যায় নি। আপনার সাথে গেলে মার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না।

মিঃ মুখার্জী কাউকে কোনো সুযোগ না দিয়েই কয়েক মিনিটের বুকের ব্যথায় তার বিশাল সাম্রাজ্যকে কোলে রেখেই অনন্ত বিশ্রামের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন।

শিবশঙ্কর সে সময় কলকাতায় ছিলেন না। হায়দ্রাবাদে এক সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। মুখার্জী এন্ড কোম্পানীর অফিস থেকে ট্রাঙ্কলে সেখানে খবরটা পেয়েছিলেন। পেয়েই ফিরে এসেছিলেন। তবে তার আগেই শ্মশানের কাজ মিটে গিয়েছিল। মিসেস মুখার্জীই কারো জন্য অপেক্ষা করতে দেন নি।

শিবশঙ্কর এ বাড়িতে এসে প্রথমেই গিয়েছিলেন শাশুড়ির সাথে দেখা করতে। সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসা। তফাত বলতে লাল পাড়ের শাড়ির পরিবর্তে পরনে সাদা থান। কপালে নেই সিঁদুরের টিপ। হাতে নেই শাঁখা।

তাকে দেখে সেই একই ভঙ্গিতে বলেছিলেন, বস।

একটা মোড়া টেনে এনে বসেছিলেন শিবশঙ্কর। ডেকেছিলেন, মা।

—কবে এলে?

—আজ।

—খবর পেতে দেরি হয়েছিল?

—হ্যাঁ, মা, আমি হাযদ্রাবাদ থেকে মাদ্রাজে গিযেছিলাম। তাই আসতে দুদিন দেরি হয়ে গেল।

—তোমার সেমিনারটা নষ্ট হল।

—তার থেকেও যে বেশি দরকার ছিল, ওনার শেষ কাজে উপস্থিত থাকা।

হেসেছিলেন মিসেস মুখার্জী। তোমার শ্বশুরমশাই একটা উইল করে গেছেন। আর সেই উইল সবাই উপস্থিতিতেই প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাই সবাই বিশেষ করে তোমার স্ত্রী তোমার সাথে যোগাযোগ করাব জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পিতার মৃত্যুর পরের দিনই চেক কাটতে গিযে মুখার্জী এন্ড কোম্পানীর উকিল মিঃ গোস্বামীর কাছ থেকে বাধা পেয়েছিল। মিঃ গোস্বামী জানিয়েছেন, উইলে যা নির্দেশ আছে তাতে মিতা কোম্পানীর চেক কাটতে পারবে না। তবে সবাই অর্থাৎ তুমি না থাকলে উইলের বিষয়বস্তু প্রকাশ কববেন না।

অবাক হয়েছিলেন শিবশঙ্কর। কোম্পানীর ব্যাপারে আমার কিছু ভূমিকা তো নেই। এ-তো আপনার আর মিতার ব্যাপার।

—সে তো মিঃ গোস্বামীই বলতে পারবেন।

মিতা বাড়িতে নেই? একটা সঙ্কোচ নিয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলেন শিবশঙ্কর।

সকালে একবার এসেছিল আমার কাছে টাকা চাইতে। বারান্দার রেলিং-এর উপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, মিসেস মুখার্জী। নিজের স্ত্রীর কথা জানতে এত সঙ্কোচ বোধ কর কেন?

মাথা নীচু করে বসেছিলেন শিবশঙ্কর। কোনো কথা বলেন নি।

—শিবশঙ্কব।

—মা।

—মহাদেব শুধু গলায় গরল ধারণ করেন নি, তার প্রলয় নাচে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। তোমার নাম শিবশঙ্কর। শুধু গরল ধারণ করে নীলকণ্ঠ হতে শিখেছ, কিন্তু প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছ।

—খুব ছোটোবেলা থেকেই আশ্রিতের পরিচয়ে মানুষ হয়েছি। আশ্রয় হারাবার ভয় আমার মনের মধ্যে সিন্দবাদের দৈত্যের মতন চেপে বসে থাকত। প্রতিবাদের কথা ভাবতে পারতাম না।

—আজ তো সে ভাবনা তোমার নেই। তোমার নিজের যোগ্যতায় তুমি পায়ে দাঁড়িয়েছ।

—কিন্তু মা, সে ভয় যে আমার মেরুদণ্ডের মধ্যে বাসা বেঁধে বসে আছে। কোনো কিছু ভালো না লাগলেও বলতে পারি না এটা আমার পছন্দ নয়। ভাবি এটাই বুঝি আমার পাওনা ছিল।

—না শিবশঙ্কর, এটা তোমার মানসিক দুর্বলতা। তোমার নিজের জন্য তো বটেই, মিতার ভালো চাইলে এ দুর্বলতা তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। নিজেব অধিকারকে প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আছে মানুষের পবিচয়ের ঠিকানা।

শিবশঙ্কর নির্বাক হয়ে শুনছিলেন।

মিসেস মুখার্জী বলেছিলেন, শোনো শিবশঙ্কর, বাবাকে হারিয়ে মিতার মনে কোনো শোকের ছায়া নেমে এসেছে বলে মনে হয় না। তবে ও শোকে ভেঙে পড়েছে বাবার একটা উইল আছে জেনে।

—কেন?

—তুমি বড্ড ভালমানুষ। মিঃ গোস্বামী উইলের কথা না জানালেও উইলে কি আছে সে কথা আমি জানি।

—তার মানে আপনাকে জানিয়েই বাবা এই উইল করে গেছেন?

—হ্যাঁ, তোমার শ্বশুরমশাই লোক হিসেবে খারাপ ছিলেন না। তবে সন্তান স্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতন ছিলেন। মেয়ের বে-হিসাবী জীবনের ফসল রূপে আইভি যখন ওর পেটে এল তখন গর্ভপাতের জন্য অনেক ছোটাছুটি করেছিলেন। কিন্তু ডাক্তাররা বলেছিলেন ওর ইউট্রাসে একটা টিউমার আছে। গর্ভপাত করাতে গেলে এই টিউমার থেকে ওর গভীর বিপদের আশঙ্কা আছে। তারা টিউমার শুদ্ধ ভ্রূণটাকে বাদ দিতে চেয়েছিল। এতে ইউট্রাসটি কেটে ফেলতে হতো। মিতা কোনোদিন মা হতে পারত না। তোমার শ্বশুর তাই ওর তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে আইভিকে এই পৃথিবীতে আনার পক্ষে ছিলেন। আর সে সময়ই তোমার সাথে তোমার শ্বশুরের দেখা হয়েছিল। তোমাকে ঠকিয়েছেন বলে তার জীবনে এসেছিল তীব্র অনুশোচনা।

—কিন্তু মা, আমি তো এ নিয়ে কোনো অনুযোগ করিনি। আমাকে উনি ঠকিয়েছেন, এ অভিযোগও তো আমি কোনো দিন করিনি।

—সেটাই তো উনার অপরাধ বোধকে আরো তীব্র করে তুলেছিল। আমাকে বলতেন মিতাটা যদি শিবশঙ্করের এই উদারতাকে সামান্য স্বীকৃতি দিত তবে নিজের অপরাধের বোঝাটা একটু হালকা হতো। উনি উইলটা আমাকে শুনিয়েছিলেন। তবে, এখন বুঝতে পারছি, তিনি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন ওপার থেকে তার ডাক এসে যেতে পারে।

মিসেস মুখার্জীর চোখেও যে জল আসে, তারও গলা ধরে যায়, এই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন শিবশঙ্কর। বলেছিলেন, আপনি খুব একা হয়ে পড়লেন মা। তবে আমি আছি, আপনি যখন ডাকবেন তখনই আমি আসব।

মিসেস মুখার্জী বলেছিলেন, আমি জানি শিবশঙ্কর। তোমার শ্বশুরমশাই বলতেন, মিতার জন্য এনেছিলাম শিবশঙ্করের মতন রত্ন, কিন্তু ও ওর মূল্য বুঝল না। থাক সে কথা। শোনো শিবশঙ্কর, এই কোম্পানীর অর্দ্ধেক মালিক তুমি হলেও আমার সম্মতি ছাড়া তুমি এই কোম্পানীর তোমার ভাগকে বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না। মিতা প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা পাবে মাত্র। এছাড়া বাড়ি, ঘর সব কিছুই আমার নামে।

—কিন্তু আমি যে সম্পত্তির প্রশ্নে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই। শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুর পর আপনাদের সম্পত্তি তো আপনার আর মিতার ব্যাপার। এখানে আমার থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

—তুমি একথাই বলবে, এটা আমি জানি। তবু বলব মিতার কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। এই কোম্পানী মিতার হাতে পড়লে এর সর্বনাশ হতে মাসখানেক সময়ও লাগবে না। তুমি হয়তো এর মধ্যেই আমাকে চিনেছ। লোভ আমার নেই। এই বিশাল সম্পত্তি কিভাবে হয়েছে তার সব খবর না জানলেও এটা জানি এর সবটাই সাধুপথে আসেনি। তবু এই কোম্পানীর উপব তাকিযে আছে কয়েকশ মানুষ ও তাদের পরিবার। তারা এসেছিল আমার কাছে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছি এই প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা কবার চেষ্টা করবো। তুমি একটু আগেই তো বলেছিলে, আমি একা নই, যখন ডাকব তখনই তুমি আসবে। তাই আশা বাখছি ওদেব কাছে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি তা রক্ষা করতে তোমাকে আমার পাশে পাব।

শিবশঙ্কব সে দিন মিসেস মুখার্জীকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। যিনি বাড়ির গাড়িতেই চড়তে চান নি সেই মিসেস মুখার্জী কালো পাড়ের সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ আর হাতে শুধু মাত্র একটা ঘড়ি পবে মুখার্জী এন্ড কোম্পানীব গাড়িতে করে এসে চেম্বারের চেয়ারে বসেছিলেন।

মেযেব সব আক্রমণ একে একে নিজেই প্রতিহত কবেছিলেন। শিবশঙ্করকে একবারের জন্যও সামনে আসতে দেন নি। এমন কি তাকে ইউনিভার্সিটিব চাকবি ছাড়তেও বলেন নি। তবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাকে ডেকেছেন। সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করেছেন। সময় দিয়েছেন মতামত জানাবার জন্য। মতামত আদায় করে ছেড়েছেন। মেয়েকে বলেছেন, যে দিন দেখব নিজের জীবনযাত্রা পাল্টে মানুষেব মতন হতে পেরেছ সেদিন সব কিছু আমি নিজের হাতেই তোমাকে তুলে দেব।

কিন্তু মিতার আক্রোশের তীব্রতা আরো ছড়িযে পড়তে শুরু করেছিল। আর বল্গাহীন উচ্ছৃঙ্খলতাব মাধ্যমে সে তা প্রকাশ কবে চলেছিল।

ষাট বছরের যুবক মিঃ ঘোষাল, মিঃ সৈয়দ, তরুণ শিল্পপতি ভাট, বা আগরওয়ালাদের গাড়ির ভিড় দরজায় লেগে থাকত। কলকাতার নাইট ক্লাবের অনুষ্ঠানে মিসেস সান্যালের অনুপস্থিতি ক্লাব ম্যানেজাবের ভাবনার কারণ হত। মিসেস সান্যাল মানেই ভিড়, মজা, পানের ফোয়ারা।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত এ বাড়ির দক্ষিণের ঘরের আলোটা জ্বলে থাকত। নিঝুম রাস্তায় যখন মিতাকে কেউ গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে যেত, তার হাইহিলের অসংলগ্ন পদক্ষেপে বাড়ির সিঁড়িতে প্রতিধ্বনী উঠত তখন মিসেস মুখার্জী তার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিতেন।

মাঝে মধ্যে ক্রুদ্ধ ফণা তুলে এগিয়ে আসত মিতা। আমার টাকার দরকাব।

আমারও আকাশেব চাঁদকে হাতের মুঠোয় আনা দরকার। মিসেস মুখার্জীর নিরুত্তাপ উত্তর।

—তার মানে টাকা দেবে না?

—আমি যে এক কথা দুবার বলি না, তোমার তো সে কথা জানা।

—তুমি ডাইনি। মিতার চীৎকারে ঘর গমগম করে উঠত।

মিসেস মুখার্জী কোনো জবাব না দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাক থেকে একটা বই টেনে নিয়ে তার পাতা উল্টে চলেছিলেন।

মিতার ক্রোধের আগুনে তা ধূপের কাজ করেছিল। জামাই আর তুমি মিলে বাবাকে যাদু করে সব কিছু লিখিয়ে নিয়েছ।

মিসেস মুখার্জী চুপ। চোখের দৃষ্টি বই-এর দিকে।

—তুমি ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না। ঐ ন্যাকা-বোকা জামাইয়েব সাথে তোমার সম্পর্কের কথা সবাই জানে। গভীর রাত পর্যন্ত ঐ লোকটার সাথে বসে থাকাব কি অর্থ তা বুঝতে কারো বাকি নেই।

মিসেস মুখার্জী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বইটা তাঁকে বেখে দিযে ডেকে ছিলেন, রাম।

রাম এই বাড়ির দারোয়ান। মিসেস মুখার্জীর বিয়ের সময় থেকেই আছে। বহুজীর কথায় নিজের মাথাটাও কেটে ফেলতে পারে।

বহুজী। রাম এসে দাঁড়িয়েছিল।

একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও। দিদিমণির জিনিসপত্র যাবে।

কি বলতে চাইছ? প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চেয়েছিল মিতা।

তুমি তোমার যা খুশি এ বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে পার। তবে আমি বেঁচে থাকতে এ বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করবে না।

—তার মানে তুমি আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলছ?

—যা বলেছি কথাটার অর্থ তো তাই দাঁড়ায়।

রাম তখনও দাঁড়িয়ে। তার দিকে তাকিয়ে মিসেস মুখার্জী বলেছিলেন, এর আগে তোমাকে একটা কথা দুবার বলতে হয়নি, রাম। দিদিমণির জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেলে ট্যাক্সিতে তুলে দিও।

—তুমি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পার না। এটা আমার বাবাব বাড়ি। এতে আমারও অধিকার আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মিসেস মুখার্জী বলেছিলেন, সেটা যদি পাব আদালতে বলার চেষ্টা করো।

রামকে ট্যাক্সি ডাকতে হয়নি। মিতা নিজেই বাড়ি থেকে বেব হয়ে গিয়েছিল। মিসেস মুখার্জী বাড়িতে বসেই খবর পেয়েছিলেন মিতা মিঃ শেঠীর ফ্ল্যাটে উঠেছে।

আইভির বয়স তখন ষোলো। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিযেছে।

শিবশঙ্করকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মিসেস মুখার্জী। বলেছিলেন, তুমি যদি মিতার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাও তবে তোমার পাশে আমি দাঁড়াব। তোমার বয়স তো কিছুই হয়নি। নতুন করে জীবন শুরু কর।

শিবশঙ্কর শুধু হেসেছিলেন।

আমি তো হাসির কোনো কথা বলেছি বলে মনে হয় না।

—দেখুন মা, শিবশঙ্কর বলেছিলেন, মুখার্জী পরিবারেব সম্মান বাঁচাতে আর আমার মামাব ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার কথা কোনো পক্ষই ভাবে নি। আজ তো আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তার থেকে আমার বাড়ির দরজাটা বরং খোলাই থাক। যদি কোনো দিন ওর সব দরজাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যায় তখন ও ক্লান্ত জীবনের আশ্রয় খুঁজবে। আমার ঘরের দরজাটা না হয় সেদিনেব জন্য অপেক্ষা করুক।

[২১]

জীনের নেশাটা খুব ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরটা আস্তে আস্তে হালকা হতে থাকে। মন থেকে ভাবনার বাষ্পটা কিছুক্ষণের জন্য মাথাটাকে গুটিয়ে রাখে।

আইভি জোয়াবদাব আজ অন্য দিনেব থেকে কযেক পেগ বেশীই পান করেছেন। অথচ নেশাব চাপে মনেব ভাবনাব বাষ্পটাকে চাপা দিতে পাবছেন না। বেয়াবাকে ডেকে নতুন কবে লাইম, সোডা আব জীনেব একটা নতুন বোতল আনতে বললেন। বেযাবা টেবিলের উপব সেগুলি সাজিযে দিযে চলে যাচ্ছিল, আইভি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, কেউ এসেছিল?

হ্যাঁ, মেমসাব। দত্তসাহেব, আগবওযালা সাহেব আব পোদ্দাব সাহেব। আব ফোন এসেছিল আহুজা সাহেবেব কাছ থেকে। কাল আপনাব যে পার্টিতে যাওযাব কথা ছিল তার কথা মনে কবিযে দিতে বলেছেন।

সবাইকে বলে দিযেছ তো আমি বাড়িতে নেই।

হ্যাঁ, মেমসাব। তবে সবাই জিজ্ঞাসা কবছিল, আপনি কাব সাথে গেছেন?

তুমি কি বললে?

আপনি একাই গেছেন, মেমসাব।

খুব ভালো বলেছ। তুমি যাও।

নতুন কবে জীনেব গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আইভি জোযাবদাব নিজেকে অতীতেব আকাশে ভাসিযে নিযে এসেছিলেন।

মাব বন্ধুদেব তপ্ত দৃষ্টি যে তাব শবীবকেও জবীপ কবতে শুরু কবেছিল তা সেই কিশোবী বযস থেকেই বুঝতে পাবতেন আইভি। একটা অস্বস্তিকব অনুভূতি সাবা মনে তিক্ত স্বাদ এনে দিত। নিজেকে ওদেব দৃষ্টিব আড়াল কবে স্বস্তি পেতে চাইতেন। ঘবেব দরজা বন্ধ কবে নীচেব ঘব থেকে ভেসে আসা নেশা জড়ানো আধো আধো কথাব ঢেউগুলি আটকাতে চাইতেন। কিন্তু বাতেব উদ্দামতা বৃদ্ধিব সাথে সাথে নীচ থেকে মাঝে মাঝে তার নাম ধবে ডাকা শব্দ কানে তপ্ত সীসাব মতন আঘাত কবত। বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইত তাব কিশোবী অন্তবাত্মা। রুদ্ধ আক্রোশে নিজেব কান দুটোকে দুহাতে চেপে ধবে চীৎকাব করে কেঁদে উঠতেন।

বাবা শিবশঙ্কব সান্যালকে গৃহপালিত দু পাযেব কোনো আজব জীব বলে মনে হত। প্রতিবাদ ও প্রতিবোধহীন অবযবেব এমন জীবন্ত উদাহবণ এই পৃথিবীতে থাকতে পারে— এটাই ছিল তাব কাছে এক পবম বিস্ময। তবু এই মানুষটাকেই তাব ভালো লাগত। তাব অসহায চাউনীব মধ্যে খুঁজে পেত একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ। তাব শান্ত ও ক্ষমা-সুন্দব দৃষ্টির প্রলেপেব মধ্যে দেখতে পেত সমস্ত অবহেলা ও অপমানকে নিঃশেষে শুষে নেওয়ার দক্ষতা। কিন্তু শিবশঙ্কবেব এই নির্লিপ্ত ভাবনাই আবাব আইভিকে কোনো কোনো সময় অস্থিব কবে তুলত। একে তাব বাবাব মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষতাব কথা ভেবে মনেব কোণে বিদ্রোহেব বীজ বপন কবে যেতেন।

বাবাব কাছে নিবাপদ আশ্রযেব সন্ধানেই ছুটে গিয়েছিলেন আইভি। শিবশঙ্কব তাকে স্নেহেব স্পর্শে বুকে টেনে নিযেছিলেন।

বাবার সেই ছোটো ফ্ল্যাটের ছোটো সীমানার মধ্যেই সেই স্পর্শ তাব দগ্ধ মনে শীতলতাব প্রলেপ পবিযে দিযেছিল। বাবাব বুকেব ভিতব মাথা গুঁজে দিযে হু হু কবে কেঁদে উঠেছিলেন আইভি। সেদিন শিবশঙ্করেব মুখ থেকে কোনো কথা শুনতে না পেলেও মাথার উপর তার হাতেব স্পর্শকেই পরম ভবসাব আশ্রয বলে মনে হয়েছিল। তাব বুকে মুখ গুঁজেই বলেছিলেন, বাবা, তোমার কাছেই আমি থাকব।

আয়। শিবশঙ্কর আইভির মাথা থেকে হাতটা এনে ওর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন।

ভিতরের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে আইভি জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাকুমা কোথায় বাবা?

শিবশঙ্কর ইতিমধ্যে পড়ার টেবিলে স্তূপাকৃত কাগজপত্রের মধ্যে অঙ্কের কোনো জটিল প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। আইভিব জিজ্ঞাসা তাব কানে পৌঁছায় নি।

আইভি টেবিলের উপর থেকে কাগজপত্রগুলি ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে টেবিলের উপরই পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে বলেছিল, আমি আসাতে তুমি খুশি হওনি, বাবা?

তুই এমন কথা বলছিস কেন রে?

বলব না? আমার কোনো কথাবই তো জবাব দিচ্ছ না।

ও, তুই বুঝি কিছু বলছিলি? আমি শুনতে পাই নি। ভেবেছিলাম তুই বুঝি ভিতরের ঘরে তোর জামা-কাপড় ছাড়তে গেছিস।

হেসে ফেলেছিল, আইভি। তুমি তো বেশ বাবা। দেখলে আমাব হাতে কিছু নেই। খালি হাতে এসেছি। জামা ছাড়ব কী করে?

এতক্ষণে হুঁশ হয়েছিল শিবশঙ্করের। তাই তো, আইভি যে ভাবে এসেছে তাতে নিশ্চয়ই ওর মার সাথে কিছু হযেছে। তাই একটু ব্যস্ত হযে পড়েছিলেন, হ্যাঁরে, তুই তোর মাব সাথে ঝগড়া করে না জানিয়েই চলে আসিস নি তো?

কার সাথে বললে? টেবিলের উপর বসে পা দোলাতে দোলাতে আইভি বলেছিল।

কেন? তোর মার সাথে।

মার আবার আমার সাথে ঝগড়া করার সময় আছে নাকি? তোমার কাছে এলে বেশ আশ্চর্য রকমের খবর-টবর পাওয়া যায়। আমার সাথে ঝগড়া করে সময নষ্ট না করে সেই সময়টুকু আয়েঙ্গারের সাথে কাটালে মায়ের অনেক লাভ, বাবা।

আইভি! একটা চাপা ধমক দিয়ে প্রসঙ্গ এড়াতে চেয়েছিলেন শিবশঙ্কর। তুই আমাকে কিছু বলছিলি, আইভি?

ঠাকুমাকে দেখছি না কেন?

কোনো খবর রাখিস না। তোর দিদার সাথে যে ঠাকুমা পুরীতে গেছে সেটাও জানিস না। শিবশঙ্করের গলায় স্নেহের প্রত্যয।

আজ রাতে কী খাবে বাবা? ঠাকুমা তো নেই। রান্না করবে কে?

আইভির নিষ্পাপ চোখের তারার দিকে তাকিয়ে শিবশঙ্করের সারা মনে একটা সহানুভূতির ঢেউ বয়ে যায়। ওর মুখের অপূর্ব সৌন্দর্য সুষমায় একটা স্নেহ-চুম্বন এঁকে দিতে তার অন্তরাত্মা উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কী এক অদৃশ্য সঙ্কোচ তাব সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আইভির মুখের উপর থেকে নিজের দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। শিবশঙ্কর বলেছিলেন, আমাব জন্য দুধ আছে। রাত্রিবেলায় খই, দুধ খেয়ে নিতাম। কিন্তু তোর জন্য রাঁধতে হবে। বাজার তো করিনি। সন্ধেবেলায় গিয়ে বরং হোটেল থেকে তোর পছন্দমত খাবার আনিয়ে নেব।

না বাবা, আইভি শিবশঙ্করের বুকের কাছে মুখ এনে দাঁড়িয়ে বলেছিল। তোমার পাঞ্জাবীর একটা বোতামও নেই যে বাবা। এটা ছেড়ে ফেল। বোতাম এনে লাগিয়ে দেব। আইভি তার পদ্মকলির মতন আঙ্গুলগুলি শিবশঙ্করের বুকের উপর বোলাতে বোলাতে বলেছিল,

চল বাবা, আমরা আজকে বাজার করে আনি। আজকে আমি রান্না করব। তোমাকে দুধ-খৈ খেয়ে রাত কাটাতে হবে না।

তুই আবার রাঁধতে জানিস নাকি?

ভাত আর ডাল রান্না করতে শিখে গেছি। বাকিটা তুমি আমি মিলে রান্না করে নেব।

নারে আইভি। একটা স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল শিবশঙ্করের ঠোঁটে। হাত পা পুড়িয়ে ফেলবি। তারপর তো মা এসে আমার গলা টিপে ধরবে।

বাবা, আইভির গলা ভারী।

—কিরে?

—আমি তোমার মেয়ে বাবা। সব কথাতেই কেন তুমি মাকে টেনে আন? তুমি তো জানো মাকে আমি কত অপছন্দ করি। আমি যে শুধু তোমারই মেয়ে হতে চাই, বাবা।

শিবশঙ্করের সারা শরীর জুড়ে একটা কম্পন অনুভব করেছিলেন। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু নারীর স্পর্শ-সুখের অনুভূতি আজও তার কাছে অনাস্বাদিত। অথচ তিনি পিতা। তার স্ত্রীর গর্ভের সন্তান তার কাছে সন্তানের অধিকারের দাবিতে উপস্থিত হয়েছে।

আইভির চুলগুলি বারবার শিবশঙ্করের নাকে, মুখে উড়ে এসে পড়ছিল। ওর শরীর থেকে একটা অচেনা গন্ধের অনুভূতি তাকে যেন কেমন একটা অচেনা জগতের অতলে টেনে নিতে চাইছিল। অথচ তিনি তো আইভিকে সন্তান স্নেহেই বুকের ভিতর টেনে নিতে চান। তবে কেন এক অচেনা ঘ্রাণ আইভিকে তার কাছে নারী রূপে হাজির করছে?

—বাবা।

চমকে উঠেছিলেন, শিবশঙ্কর। কি রে?

—তুমি মাকে ভয় কর, না ঘৃণা কর?

কি বলছিস তুই? শিবশঙ্কর একটু সরে দাঁড়ান।

আইভি শিবশঙ্করের ঘাড়ে তার হাত দুটো তুলে দিয়ে বলেছিল, জানো বাবা, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার বুকটা খুলে যদি দেখতে পেতাম, তবে মন ছাড়া একটা মানুষ কি দিয়ে তৈরি হলেও বাঁচতে পারে তা জানতে পারতাম।

তুই বুঝি আমাকে খুব নিষ্ঠুর ভাবিস?

নিশ্চয়ই। যে নিজের প্রতি এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে সে যে সারা দুনিয়ার প্রতি নিষ্ঠুর হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সব কিছুর প্রতি এই উদাসীনতা তো নিষ্ঠুরতারই আরেক দিক বাবা।

তোর সাথে মনে হয়, তোর মার খুব ঝগড়া হয়েছে। প্রসঙ্গ ঘোরাতে চেয়েছিলেন শিবশঙ্কর।

—তোমার সাথে মার কি খুব ঝগড়া হত বাবা?

—কোনো দিনই নয়।

—ঝগড়া করলেই বোধ হয় ভালো করতে। তাহলে হয়ত আমাকে এইভাবে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি উড়ে উড়ে বেড়াতে হত না।

কেন বলত? শিবশঙ্কর আইভির কথায় অবাকই হয়েছিলেন।

হ্যাঁ বাবা, আইভি শিবশঙ্করের আরো কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। মা হয়ত তাহলে তোমাকে একটু ভয় পেত। সংসারকে মেনে নিত। নয়ত আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ হত। আমি একটা স্থায়ী ঠিকানা পেয়ে তোমার কাছেই থাকতাম।

শিবশঙ্কর আইভির কথাগুলি বুঝতে পারেন না। ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

বাবা, তুমি যে বড্ড ভাল। আইভি শিবশঙ্করের কপালের উপর উড়ে এসে পড়া চুলগুলিকে সরিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন। তোমার এই ভালোমানুষী আমার কাছে একদিকে যেমন রাগের কারণ তেমনি ভরসার কেন্দ্র। দিদাও খুব ভালো। কিন্তু তিনি সবকিছুকে এত বেশি অভিমানী দৃষ্টিতে দেখেন যে তার কাছে সহজে ঘেঁসা যায় না। মা আর তোমার মধ্যে আইনগত সম্পর্ক ছাড়া তো আর কোনো সম্পর্ক নেই।

শিবশঙ্কর প্রসঙ্গ এড়াতে চেয়েছিলেন। তুই এসব কথা এখন রাখ, আইভি। চল, আমরা বাজার করে আনি।

আমি তো এখন ছোটো নই বাবা। আর কয়দিন পবে কলেজেব গণ্ডিও পার হয়ে যাব। কলেজের সবাই যেমন জানে আমি তোমার মতন বিদগ্ধ অধ্যাপকেব মেয়ে, তেমনি জানে এই মহানগরীর মক্ষিরাণী আমাব মাকে।

শিবশঙ্কর সেদিন এক অসহায় দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সামনে রুদ্ধ কান্নাব দমকায ফুলে ফুলে উঠা আইভির পিঠে হাতটা রাখতে গিয়েও কি এক অদৃশ্য সঙ্কোচেব টানে হাতটা সরিয়ে নিয়েছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, তাকে কে যেন এক চবম সত্যেব কিনাবায ঠেলে নিয়ে চলেছে।

বাবা, আইভি তার কান্না ভেজা মুখটা শিবশঙ্করেব বুকে গুঁজে দিয়েছিল। আমি তো তোমাব মেয়ে বাবা। আমি শুধু তোমার মেয়ে হয়েই থাকতে চাই। আমাব মাকে তোমাব স্ত্রী রূপে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাকে তো তুমিই এই পৃথিবীতে এনেছ। আমি তো কাবো উপর চাপিয়ে দেওয়ার ফল নই। তুমি কেন তোমাব সন্তানকে এই ক্লেদাক্ত গহ্বর থেকে তুলে আনোনি? আমি তো সেই কবে থাকতেই আমাব বাবাব কাছে থাকতে চেয়েছি।

শিবশঙ্কর নীরব, নিথর।

—বাবা, আমি তোমার কাছে এসেছি বলে তুমি কি আমাব উপব রাগ কবেছ?

না রে। আইভির মাথার উপর হাত রেখে শিবশঙ্কব বলেছিলেন, তুই যে আজ আমাকে রান্না করে খাওয়াবি বলেছিস তা কিন্তু একেবাবে ভুলে গেছিস।

লজ্জাই পেয়েছিলেন আইভি। বলেছিল, চল বাবা, তুমি আব আমি মিলে বাজার কবে আসি। আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে মাংস বান্না করেছিলাম। সবাই যা প্রশংসা করেছিলো, কি বলব।

—বলিস কি বে? আমার যে এখনই জিভে জল আসছে।

—তবে তোমাকে একটা কথা বলি বাবা। কাউকে আবাব বলে দিও না।

—বল।

—আমি মাংসে চিনিকে নুন মনে করে দিয়েছিলাম।

হাসির দমকায় ফেটে পড়েছিলেন শিবশঙ্কর। এমন প্রাণখোলা হাসি এর আগে কখনো হেসেছেন বলে মনে পড়ে না শিবশঙ্করেব।

বাড়ি থেকে বেরোবার আগে আইভি বলেছিল, বাবা, কিছু বেশি টাকা সঙ্গে নিও।

কেন রে? তুই কি সারা কলকাতাটা কিনবি বলে ঠিক করেছিস।

অনেকটা তাই বাবা। তবে আজকে আমাকে একটা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ কিনে দিও। দেখছ না এক সালোয়ার কামিজ পরেই চলে এসেছি।

এত আনন্দ জীবনে আর কোনোদিন পাননি শিবশঙ্কর। আইভিকে নিয়ে গিয়ে একের

বদলে চারটে শাড়ি কিনেছিলেন। মনে হচ্ছিল সমস্ত দোকানটাই আইভির জন্য কিনে দেন।

আইভি আপত্তি করেছিল। তুমি কি করছ বাবা? ঐ বাড়িতে আলমারি বোঝাই আমার শাড়ি আছে। কালকে গিয়েই তো আমি নিয়ে আসব।

না-রে আইভি। তোকে ও বাড়ি থেকে কিছুই আনতে হবে না। আমি কালকে বরং আরো শাড়ি কিনে আনব।

তুমি পাগল হয়ে গেছ বাবা। এবার চল বাজার করি। নয়ত আমার রান্না করার সুযোগটাই মাঠে মারা যাবে। তবে তুমি নুনটা দিয়ে দিও।

শিবশঙ্কর ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি মহানগরীর হাজার জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। আইভিকে কাছে টেনে এনে ওর মাথার উপর মুখটা রেখে চুলের ঘ্রাণে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, পৃথিবীটা এত সুন্দর, বেঁচে থাকার এত সুখ এর আগে কখনও অনুভব করেন নি। বলেছিলেন, তুই যা দিবি তাই অমৃত মনে হবে।

আইভি শিবশঙ্করের একটা হাত গভীর আবেগে চেপে ধরে বলেছিল, তুমি এত ভালো। তবু তোমাকে মা বুঝল না। তোমার থেকেও মার জন্য আমার বেশি দুঃখ হয় বাবা। মা বুঝতে পারল না কি সম্পদ সে পেয়েছিল আর কী ভাবে তা হারাল।

যে প্রসঙ্গ শিবশঙ্করের মনের ভিতরটাকে রক্তাক্ত করে সেটাই বার বার ঘুরে আসতে চায়। প্রসঙ্গটিকে এড়াতে চান বলেন, আইভি চল, বাজার এর পর বন্ধ হয়ে যাবে। তোর হাতের রান্না মাংস খেতে জিহ্বটা জলে ভরে উঠেছে।

সেদিন আইভি সারাক্ষণ শিবশঙ্করকে তার রান্নার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। বলেছিল, আজকে তোমার এই ছাইভস্ম অঙ্কের আঁকি-বুকি থাক বাবা। তুমি আমার রান্না দেখবে আর যা যা দরকার হাতের কাছে এনে দেব।

শিবশঙ্কর পালাতে চাইছিলেন আইভির দৃষ্টির সামনে থেকে। মনে হয়েছিল এ সুখ তার অর্জিত নয়—এ সুখ তার চুরি করা। বার বার মনে হয়েছিল আইভির চোখের এই সরল চাউনির লেন্সে তার চুরি করা সুখ ধরা পড়ে যাবে। নিষ্পাপ সরল বিশ্বাসের মধ্যে যে এত তীব্র অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণতা থাকে তা এই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেই তীক্ষ্ণতার সামনে চূড়ান্ত সত্যের উপরের আবরণটি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পাছে তিনি উন্মুক্ত হয়ে পড়েন সেই আতঙ্ক তাকে আইভির দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যেতে চাইছিল। বলেছিলেন, তুই সাবধানে মাংসটা নাড়তে থাক। আমি সে ফাঁকে কালকের ক্লাসের নোটটা একটু তৈরি করে নি।

গালে, হাতে আর কাপড়ের নানা জায়গায় আইভি হলুদের আলপনা এঁকে ফেলেছে। আঁচলটা কোমরে গুঁজে এগিয়ে এসে বলেছিল, ওটি হচ্ছে না বাবা। কাল তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া এমন কি তোমার ইউনিভার্সিটি—সবখানে তোমার সাথে যাব।

মশলা মাখা হাত দিয়েই শিবশঙ্করের পাঞ্জাবিটা নিজের মুঠির মধ্যে দিয়ে আইভি বলেছিল, আমি যে স্বপ্ন দেখি আমার অন্য বন্ধুদের মতন আমিও বাবা-মার হাত ধরে বেড়াতে চলেছি। আচ্ছা বাবা, তোমার এই মেয়েটা যে এত দুঃখ তার বুকের ভিতর বয়ে চলেছে সে কথা ভেবে তোমার কি এক ফোঁটাও মায়া হয় না? কেন আমার দিক থেকে তুমি, মা এমন কি দিদা-ঠাকুমাও মুখ ফিরিয়ে নেয়? দিদার কাছে গেলে দিদা গম্ভীর হয়ে বলেন, যাও ভালো করে পড়াশোনা কর। ঠাকুমার কাছে এলে বলেন, কেমন আছ? কেউ তো আমাকে কাছে টেনে এনে বলেন না, কিরে? কাছে আয় তো। তোর মুখটা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? আমার গালে তারা কেউ গাল রেখে বলেন না, আহারে, তোর শরীরটা বেশ গরম। আমি জ্বর হলেও তাই কাউকে কিছু বলি না। মার কাছে যেতে পারি না। তার বন্ধুদের

চাউনি আমার সারা শরীরে আগুনের জ্বালা ধরায়। আমি এলে তুমি নোট তৈরি করতে বস। আচ্ছা, বাবা, সবার চোখে এই অবাঞ্ছিত মেয়েটাকে তোমরা কেন এই পৃথিবীতে নিয়ে এলে?

শিবশঙ্করের বুকের ভিতর যন্ত্রণার ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছিল। এক রুদ্ধ আবেগ বাঁধ ভাঙ্গা জলের মতন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে চাইছিল। আইভির মুখটাকে দুহাতের তালুতে ধরে ছিলেন। ওর শুভ্র কপালে ঘামের বিন্দুগুলি মুক্তোর মত টলটল করছে। ওর চোখের তপ্ত অশ্রু-ফোঁটা শিবশঙ্করকে অনুশোচনার দহনে দগ্ধ করতে চাইছিল। এক গভীর ব্যাকুলতার স্রোতে আইভিকে ঢেকে দিতে চাইছিলেন। মনে হচ্ছিল রজনীগন্ধার এক শুভ্র কলি তার বুকের কাছে নুয়ে পড়েছে।

ওর ঘন কালো চুলে ঢাকা মাথাটা নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়েছিলেন শিবশঙ্কর। বুঝতে পারছিলেন আইভির হৃদয় স্পন্দন তার হৃদয় থেকে পিতৃত্বের উত্তাপকে শুষে নিতে চাইছে। কিন্তু আইভির পেলব শরীরের এক অনাস্বাদিত ঘ্রাণ শিবশঙ্করকে বার বার এক সঙ্কোচের কাঁটায় বিদ্ধ করতে চাইছিল। আইভির আলিঙ্গন তার সাযুজ্যে এক অচেনা নারীর স্পর্শানুভূতির মোচড় তুলতে চাইছিল। আইভি তার বুকে মুখ রেখে যে বাবা, বাবা, ডাকের স্পন্দন তুলেছিল তা যেন সেই অনুভূতির অবসন্নতাকে কাটাতে বিশল্যকরণীর ভূমিকা পালন করেছিল। আইভিকে স্নেহের বন্ধনীতে আবদ্ধ করেছিলেন।

শিবশঙ্কর আইভিকে দুহাতের বাহুবন্ধনে কাছে টেনে এনে ওর গালে নিজের গালটা চেপে ধরে বলেছিলেন, আইভি, তুই যে সত্যিসত্যিই আমারই মেয়ে। আইভি তুই শুধু আমারই মেয়ে।

দরজাটা খোলাই ছিল। শিবশঙ্কর অবশ্য প্রায়ই এটা বন্ধ করতে ভুলে যেতেন। সীতা দেবী থাকলে তিনিই শোবার আগে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করেন। ইদানিং প্রায়ই পুরীতে যান। মিসেস মুখার্জীই এই অভ্যেসটা করিয়েছেন। ইসকনের মন্দিরের সামনেই তিন কামরার একটা বাড়ি কিনে তাকে নিজের পছন্দ মতন করে সাজিয়ে নিয়েছেন। প্রথম কয়েক বছর সীতা দেবী ও তিনি এক সাথেই যেতেন। ইসকনের মন্দিরে সকাল ও সন্ধ্যা সুন্দরভাবে কেটে যেত। সমুদ্রের ঢেউ আর মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মধ্যেই সীতা দেবী ভুলতে চাইতেন তার অব্যক্ত যন্ত্রণাকে।

শিবশঙ্করকে তো তিনিই এই বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন। শিবশঙ্কর একদিনের জন্যেও এর জন্য তার কাছে কোনো অনুযোগ করে নি। অথচ শিবশঙ্কর যদি এ নিয়ে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতো তবে বোধ হয় অনুশোচনার দহন এত তীব্র হত না।

মিসেস মুখার্জী পুরীতে গেলে বেশি দিন থাকতে পারেন না। মুখার্জী এন্ড কোম্পানীর সাম্রাজ্যের পরিধি অবশ্য আর প্রসারিত হয় নি। তবু যা আছে তাকে অটুট রাখতে তাকে কলকাতাতে থাকতে হয়। সীতা দেবী এখন একাই পুরীতে আসেন। থাকেনও সেখানে একটানা বেশ কয়েক মাস। মার মানসিক যন্ত্রণার কথা শিবশঙ্করের অজানা ছিল না। মা পুরীর পরিবেশে শান্তি পান তাই তার জন্য তিনিই আগ্রহের সাথে মার পুরী যাত্রার ব্যবস্থা করে দিতেন। মিসেস মুখার্জী গেলে অবশ্য শিবশঙ্করকে কিছুই করতে হত না। যা কিছু করার মিসেস মুখার্জীই সব করতেন।

একা বাড়িতে শিবশঙ্কর ডুবে থাকতেন অঙ্কের তথ্যের বিশ্লেষণে। কখন যে টেবিলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন তা টের পেতেন না। ভোর বেলায় কাজের মেয়েটার বকবকানিতে তার ঘুম ভেঙে যেত।

—দাদাবাবু তুমি তো দরজা খোলা রেখে দিব্যি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়। আলসেমী করে রান্না ভাতও হাঁড়িতেই রেখে দাও। সেই বাসি ভা- না হয় আমার গতরের কাজে লেগে যায়। কিন্তু বাপু চোর যে দিন সব কিছু তুলে নিয়ে যাবে তখন তো প্রথমেই দোষ পড়বে এই গরীব মেয়ে মানুষটার উপর। সবাই বলবে, এই মেয়েটাই চুরি করেছে।

• হাসতেন শিবশঙ্কর। সেই লজ্জিত হাসি। এটাই তার জীবনের সঙ্গী।

সেই খোলা দরজা দিয়েই সেদিন ঘরে ঢুকেছিলেন মিতা সান্যাল। রান্নাঘরের দিকে এগোতেই মাঝের ঘরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। শিবশঙ্কর আইভির গালে তার গালটা চেপে দাঁড়িয়ে আছেন।

মিতার আঁচল বুক থেকে নেমে মাটিতে লুটাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে থাকলেও পা টলছে। পাকস্থলী থেকে মুখ বেয়ে উগ্র পানীয়র গন্ধ ঘরকে ভারী করে তুলেছিল। চোখের পাতাকে জোর করে খুলে রাখার চেষ্টা করেও মাঝে মাঝে বুজে ফেলছে। তার জড়ানো কণ্ঠস্বরের তীব্র শ্লেষধ্বনিতে দুজনেই চমকে উঠেছিলেন।

বাঃ! বুড়ো ব্রহ্মচারীর রসালো প্রেম তাহলে এখন মেয়ের শরীর নিয়ে চলছে।

শিবশঙ্কর ছিটকে সরে এসেছিলেন। ছিঃ মিতা। নেশার ভারে তোমার মাথা ঠিক নেই।

তাই নাকি? ভাগ্যিস নেশা করেছিলাম। তা নাহলে মেয়ে বাবার এই রসাল আলিঙ্গনের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হত না। মিতার কথায় তীব্র ব্যঙ্গের সুর আছড়ে পড়েছিল।

শিবশঙ্কর তার বোবা চাউনি দিয়ে কতক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন জানেন না। আইভির তীক্ষ্ণ চীৎকারে চমকে উঠেছিলেন।

মা, খবরদার বলছি। আর একটা নোংরা কথা উচ্চারণ করলে তোমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে এ বাড়ি থেকে বের করে দেব।

কী বললি? মিতার দুটি চোখ ক্রোধের উত্তাপে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

তোমার বাবা-মা যে ভাষায় কথা বলতেন সেই ভাষাতেই কথা বলেছি। অবশ্য ঝুনঝুনওয়ালা, শেট্টিদের পয়সায় মদ খেয়ে তাদের সাথে রাত কাটিয়ে যদি নিজের মাতৃভাষাকে ভুলে গিয়ে থাকো, তাই আরো স্পষ্ট বাংলা ভাষায় যে কথাগুলি বলছি, তা আরেকবার ভালো করে শোনো। তোমাকে আমার মা বলে ভাবতে ঘৃণা হয়। তুমি যে কতখানি বাজারি মেয়েতে পরিণত হয়েছ, তার প্রমাণ বাবা ও মেয়ের পবিত্র সম্পর্ককে তুমি নেশার চোখে এত কদর্য ভাবে দেখতে পাও। শোনো মা, তোমার জীবন-ধারার সব খবরই আমি রাখি। তবু কিছু বলিনি। বলতে পার নিজের উপর ধিক্কার ও লজ্জায় কিছু বলতে চাই নি। তোমার মতো একজন নোংরা মেয়ের গর্ভে দশ মাস কাটিয়েছি, এটাই আমার লজ্জা। তবে যে কথা মুখ ফুটে বলতে চাইনি, তাই আজ বলছি। মন দিয়ে শোনো। তোমাকে আমি একটা বেশ্যা ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। আইভির সারা শরীর জুড়ে উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

কি বললি? মিতার স্বর চিরে যায়।

—যা বলেছি আবার শুনতে চাও?

—তুই আমাকে বেশ্যা বললি?

—বলে মনে হয় ওদেরই অপমান করলাম! যারা পেটের তাগিদে দেহ বিক্রি করে তারা তো তোমার মতন নিচু মেয়ে-ছেলে নয়। তাদের মধ্যেও আছে মূল্যবোধ। নিজের সন্তানের

প্রতি তাদের আছে মায়া। তারাও যাকে তার পুরুষ বলে মনে করে তার প্রতি সম্মান দেখায়। তারা মেয়ে-বাবার সম্পর্ক নিয়ে তোমার মতো কদর্য মন্তব্য করতে স্বপ্নেও চিন্তা করে না।

শিবশঙ্কর এতক্ষণ হতভম্বের চাউনি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জীবনে যা কল্পনার মধ্যেও আনতে পারেন নি আজ তাই করে বসলেন। স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, মিতা, ভদ্রভাবে কথা যদি বলতে না পার তবে তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।

কি বললে? মিতার দু চোখে আগুন।

শিবশঙ্কর সেই চাউনির সামনে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটার তা ঘটে গেছে। মিতা মেয়ের আক্রমণের মোকাবিলা থেকে শিবশঙ্করের প্রতি আক্রমণের এই সুযোগ পেয়ে যেন হিংস্র উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। চীৎকার করে বলেছিল, তুমি আমার মেয়েকে কেড়ে নিতে ষড়যন্ত্র করেছ।

না, আমি ওকে কিছু বলিনি। ও নিজে থেকেই আমার কাছে এসেছে। শিবশঙ্কর আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

—মা, আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমার জন্য বাবাকে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ? বাবা যদি উত্তর দিতেই পারত তবে কি তুমি রাজধানীর নগব নটী-হতে পারতে? বাবা যদি সত্যিই কথা বলতে পারত তবে তুমি কোনো শেট্টি বা ঝুনঝুনওয়ালার বিছানা থেকে উঠে এসে এভাবে স্বামী ও সন্তানের সামনে দাঁড়াতে পারতে না। বাবা যদি তোমার কথার জবাব দিতে পারত তবে তার জবাবে তোমার গালে বাবার পাঁচ আঙুলেব ছাপ পড়ত।

আইভি। নেশা জড়ানো কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল মিতা।

নেশা কেটে গেলে কথা বলার চেষ্টা কর। যদি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার নাগর অনুমতি দেয় তবে তোমার নীলকণ্ঠ স্বামীর পায়ের তলায় শুয়ে থেকে নেশা কাটিয়ে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে বেরিও।

তুই আমার সাথে যাবি।

কোথায়? তোমার প্রভুদের রাতের খোরাক হতে। শোনো, আমি তোমার মতন বাজারি মেয়েছেলের গর্ভে জন্মাতে পারি এটি যেমন আমার দুর্ভাগ্য, তেমনি বলার মতন সৌভাগ্যও আমার আছে। আমি শিবশঙ্কর সান্যালের মতন এক মহান ব্যক্তির কন্যা। আমার মা মিতা সান্যাল আমার লজ্জা, আমার বাবা শিবশঙ্কর সান্যাল আমার গর্ব।

তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। মিতা স্খলিত পদক্ষেপে আইভির দিকে এগিয়ে এসেছিল।

আমি এখন সাবালিকা। আইভি সরে এসেছিল। বলেছিল, তোমার মুখের মদের গন্ধে আমার বমি আসছে। আমি আমার বাবার কাছেই থাকব।

বাবা, হিস্ হিস্ শব্দ বেরিয়ে এসেছিল মিতার গলা দিয়ে। কে তোর বাবা?

শিবশঙ্কর জীবনে দ্বিতীয়বাব স্ত্রীর মুখোমুখি এগিয়ে এসেছিলেন। মিতা, প্লিজ। নেশায় তোমার মাথা ঠিক নেই। তুমি শান্ত হও। আমি আইভিকে কাল তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।

মিতার হিংস্র স্বর ঘরের চারিপাশে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না। এই মাত্র যা দেখলাম, তারপরও, তোমার ভালোমানুষীর মুখোশটা আর পরে থেকে লাভ নেই। আমি নয় বাজে মেয়ে। কিন্তু যাকে মেয়ে মেয়ে করে গলে পড়ছ, তাকে জড়িয়ে ধরে যেভাবে চুমু খাচ্ছিলে সে দৃশ্য সোনাগাছিতেও কেউ দেখেনি। কে জানে আর কতদূর এগিয়েছ।

মা। কোনো কিছু বোঝার আগেই আইভির জোরালো চড় মিতার গালে বসে গিয়েছিল। রাগে তার নাক ফুলে উঠেছিল। সারা দৃষ্টিতে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়তে চাইছিল। দুহাত দিয়ে মার ঘাড় দুটোকে চেপে ধরে তার চোখের দিকে চোখ রেখে বলেছিল, আর একটা নোংরা কথা মুখ থেকে বেবোলে তোমার জিব টেনে ছিঁড়ে দেব। জেনে রাখ, আমি এসেছি আমার বাবার কাছে। আমি থাকব আমার বাবার কাছে। আমার বাবার কাছে আসতে হলে তুমি আমার অনুমতি নিয়ে আসবে। আমার বাবার সাথে কথা বলার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

মিতা দাঁতে দাঁত চেপে কাটা-কাটা স্বরে বলেছিল, তোর বাবা? কে তোর বাবা?

শিবশঙ্কর নিথর। নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিতার দিকে তাকিয়েছিলেন। কিছু বলতে চেয়েও পারলেন না। গলার কাছে কথাগুলিকে কে যেন চেপে ধরে রেখেছিল। মনে হচ্ছিল কালবৈশাখীর ঘন কালো মেঘ তাকে উত্তাল সমুদ্রের মাঝ দরিয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তিনি যে ভেলায় ভাসছেন তাকে সেই উত্তাল ঢেউ ঘূর্ণীর টানে অতল-গহ্বরে টেনে নিতে চাইছে। তার কিছু করণীয় নেই। তিনি শুধু সেই অন্তিম ঘণ্টাধ্বনির প্রতিক্ষায় আছেন?

মিতা এক ঝট্‌কায় আইভির হাতের বন্ধনী থেকে তার ঘাড়টা মুক্ত করে নিয়ে বলে এই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ ও তোর বাবা কিনা।

বাবা, তুমি এই নোংরা কথাগুলির প্রতিবাদ করছ না কেন? এই মহিলার কোনো সম্মানবোধ নেই। কিন্তু তোমার আছে। শিবশঙ্কর সান্যালের সন্তান বলে আমার আছে। তবে তুমি কেন কথা বলছ না। সেদিন নিস্পন্দ শিবশঙ্করের বুকে পাগলের মতন ঘুঁসি মারতে মারতে তার হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে পড়েছিল আইভি।

মিতা হিস্ হিস্ শব্দ তুলেছিল। কই কথা বলছ না কেন? তুমি ভেবেছ আমার মেয়েকে এভাবে কেড়ে নেবে? বল, তুমি এর বাবা কিনা?

না, আমি তোর বাবা নই। শিবশঙ্করেব মনে হয়েছিল, নই কথাটা অন্য কে যেন তার অজ্ঞান্তেই তার মুখ দিয়ে বলেছিল। সেদিন দেখেছিলেন আইভিকে বিদ্যুতের গতির মতন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে।

শিবশঙ্কর তার পেছনে ছুটে গিয়ে বলতে চেয়েছিলেন, আইভি ফিরে আয়। আমি তোর বাবা। 'নই' শব্দটা আমি উচ্চারণ করিনি। পায়ে পায়ে জড়িয়ে টেবিলের কোনায় মাথায় ধাক্কা খেলেন। কপাল দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত হাতের তালুতে চেপে ধরে বলেছিলেন, এ তুমি কি করলে মিতা? নিজের মেয়েকে এইভাবে কোনো মা খুন করতে পারে?

মিতার সারা শরীর জুড়ে তখনও নেশার দাপট। শরীরের ভারসাম্য রাখতে মাঝে মাঝেই চেয়ারের হাতলটাকে আঁকড়ে ধরছে। কোনো কথা বলেনি মিতা। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

[২৩]

মেমসাব।

চমক ভাঙ্গে আইভি জোয়ারদারের।

কে?

আমি রামু, মেমসাব।

কী বলছিস?

নন্দা সাহেব এসেছেন, মেমসাব।

তুই কি বলেছিস? আমি বাড়িতে আছি?

না, মেমসাব। শুধু বলেছি, আমি দেখে আসছি, মেমসাব বাড়িতে আছেন কিনা।

যা বলে আয় মেমসাব বাড়িতে নেই। কখন ফিরবে কিছু বলে যায় নি। আর শোন, নন্দা সাহেব চলে গেলে এখানে আসবি।

জী, মেমসাব।

নন্দা সাহেবকে শিল্পপতি জগতে এক ডাকে চেনে তার সাথে এবার আইভি জোয়ারদারের কন্টিনেন্টাল ট্যুরে যাবার কথা। নন্দা সাহেবের সুপারিশেই এক ট্রেড ডেলিগেশনে তার নামটা যুক্ত হয়েছে।

নন্দা সাহেবের সাথে মেমসাহেবের সম্পর্কের কথা জানে বলেই রামু আর সবার মতন মেমসাহেব নেই বলে তাকে বিদায় না করে বুদ্ধি করে তাঁকে বসিয়ে রেখে মেমসাহেবকে খবর দিতে এসেছিল।

ইম্‌পেলারে মিষ্টি আওয়াজে আইভি জোয়ারদার টের পেয়েছিলেন মিঃ নন্দা চলে গেছেন।

মেমসাব। রামু নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

নন্দা সাহেব চলে গেছে?

হ্যা, মেমসাব।

ঠিক আছে। আমাকে হুইস্কির বোতলটা আর সোডা দিয়ে যা।

মেমসাব, আজ আপনার অনেক খাওয়া হযে গেছে।

রামু, ধমক দিয়েছিলেন আইভি জোয়ারদার। তোকে যা বলছি তুই তাই কর।

জীনের নেশাটা তার প্রিয়। কিন্তু আজ সেই নেশার আমেজটা কিছুতেই তার মনকে অবস করতে পারছে না। এক বোতল জীন সন্ধে থেকে পান করেছেন। মনে হচ্ছে তিনি এতক্ষণ বিশুদ্ধ জল পান করে চলেছেন। অথচ নেশায় ডুবে থাকবেন বলেই তিনি আজ আইভি জোয়ারদার। তার সেই কুসুম অতীতকে বিসর্জন দিতেই তিনি মদের সাথে গড়ে তুলেছেন এই নিবিড় আত্মীয়তা।

গ্লাসে এক সাথে দু পেগের মতন হুইস্কি ঢেলে নিলেন। সোডার বোতলের ছিপিটা শব্দ করে ছিটকে পড়ল। এসব ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত নিপুণ। বোতল থেকে এক ফোঁটা ফেনা উপচে পড়ে না।

শরীরটাকে পিছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে হুইস্কির গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিলেন আইভি জোয়ারদার। হুইস্কি তার খুব একটা পছন্দের না হলেও আজকে বেশ ভালো লাগল। পা দুটোকে সামনের দিকে টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজেছিলেন।

সেদিন বাড়ি থেকে কী ভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন তা আজও মনে আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই একটা ফাঁকা ট্রাম দেখতে পেয়ে তাতেই চড়ে বসেছিলেন। ধর্মতলার মুখে দাঁড়িয়ে পড়তেই তিনিও নেমে পড়েছিলেন। কন্ডাকটার টিকিট চাইতে এসেছিল কিনা তা আজ মনে নেই। মনে হয় আসে নি। এলে অবশ্য বিপদেই পড়তে হত। কারণ সেদিন তিনি বাড়ি থেকে সেই এক কাপড়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন। কন্ডাকটার ভাড়া চাইলে দিতে পারতেন না।

ধর্মতলার মোড়ে চৌরঙ্গী রোডের পাশে বারের উজ্জ্বল আলোর নিমন্ত্রণে নিশির ডাকের মতন ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন। হয়তো তার অপূর্ব দেহ সুষমার জন্যই কেউ তার পোষাকের দিকে নজর দেয় নি। একের পর এক পেগের অর্ডার দিয়েছিলেন। আর সেদিনই জীবনে প্রথম মদের গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়েছিলেন।

প্রথম চুমুকেই পৃথিবীটাকে রাঙিন মনে হয়েছিল। তরল পানীয় যখন কণ্ঠনালী বেয়ে নীচের দিকে নামছিল তার দহন জ্বালায় কিছু আগের সেই দুঃস্বপ্নের প্রহরগুলি ফিকে হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন সেই বিষহরণ তরল-সুধার আবিষ্কার কর্তাকে।

কী অপূর্ব ক্ষমতা এই পানীয়র। সে জারজ,—এই আবিষ্কার তাকে শত কাঁকড়া বিছের দংশনের যন্ত্রণায় এতক্ষণ অস্থির করে তুলেছিল। অথচ এই পানীয় তার সেই যন্ত্রণাকে শুষে নিয়ে কোনো এক কল্পলোকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। মনে হয়েছিল সবকিছুই তার সামনে উড়ে চলে যাচ্ছে। এমন কি তিনি নিজেও। পা দুটো যেন মাটিতে নেই। টেবিলটাকে ধরে মাটিতে নেমে আসার চেষ্টা করতেই ঘটেছিল বিপত্তি। পাতলা কাঁচের গ্লাস আর প্লেট হাতের ধাক্কায় মেঝেতে পড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাঁচের টুকরো আইভি সান্যালের নগ্ন পায়ের তলায় ফুটে শ্বেত পাথরের মেঝেতে রক্তের আলপনা এঁকে দিয়েছিল।

হোটেলের বেয়ারা ও ম্যানেজার ছুটে এসেছিল সে দিন। মিস আইভি সান্যাল তখনও বলে চলেছেন, বেয়ারা মোর ড্রিঙ্কস্, প্লিজ।

সে সময়েই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন ব্যবসায়ী জগতের মধ্যমনী সীমান্ত জোয়ারদার। সেদিন মিঃ জোয়ারদার সেখানে না থাকলে হোটেলের লোকেরা আইভিকে ধাক্কা দিয়েই দরজার বাইরে বের করে দিত। কারণ ততক্ষণে আবিষ্কার হয়ে গেছে সে কপর্দকহীন এক রাস্তার মেয়ে। কিছু অতিথি অবশ্য ইতিমধ্যেই আইভির অবিন্যস্ত বেশভূষার মধ্যে দিয়ে তার দেহপল্লবীর সৌন্দর্য-শোভা কাঞ্চনমূল্যে হিসেব করতে শুরু করে দিয়েছিল।

আপনারা যে যার জায়গায় বসুন। সীমান্ত জোয়ারদার আইভির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমি একে চিনি। ও মিসেস মিতা সান্যালের মেয়ে।

মিসেস মিতা সান্যাল এই হোটেলের ম্যানেজারের কাছেও অত্যন্ত পরিচিত। মিতা সান্যালের মর্জির উপর যে পার্টির জন্য হোটেল নির্বাচিত হয় একথা অনেক হোটেলের ম্যানেজারের মতন এই হোটেলের ম্যানেজারেরও অজানা নয়।

হোটেলের ম্যানেজার আইভিকে চেয়ারে বসিয়ে তার পা থেকে কাঁচের টুকরোগুলিকে বের করে নিজেই ফাস্ট-এইডের ব্যবস্থা করেছিলেন। সীমান্ত জোয়ারদারের সামনে মাথাটাকে যথাসম্ভব ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে দাঁড়িয়ে পেশাদারি দক্ষতায় বলেছিলেন, উই আর এক্সট্রেমলি স্যরি, মিঃ জোয়ারদার। আমরা কোনো দিন মিস সান্যালকে দেখি নি। তাই বুঝতে পারিনি তিনি আমাদের এত বড় রেসপেক্টেবেল গেস্টের মেয়ে। তার জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষের হয়ে আমি মিসেস সান্যালের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। মিস সান্যালের কাছেও আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু মিস সান্যালের এখন যা অবস্থা—

ম্যানেজারের মুখের কথা শেষ হতে না দিয়েই সীমান্ত জোয়ারদার বলেছিলেন, মিস সান্যালকে নিয়ে আমাকেই ভাবতে দিন। উনার বিলটা আমার অ্যাকাউন্টে যোগ করে দিন। আমি মিস সান্যালকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।

আইভির মাথাটা চেয়ার থেকে ঝুঁকে এসেছে। চোখ দুটি বোজা। ঘন ঘন নিঃশ্বাসের তালে তার আঁচল খোলা স্তন যুগল দ্রুত ওঠানামা করছে। মাথা থেকে অবিন্যস্ত চুলের ফোয়ারা ঢেকে দিয়েছে তার মুখকে।

সীমান্ত জোয়ারদার দু হাতের বাঁধনে আইভিকে তুলে এনে তার গাড়ির পিছনের সিটে বসিয়েছিলেন। জানালার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, মাথাটা জানালার কাছে রাখতে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় নেশাটা একটু কাটবে। গাড়িটা স্টার্ট করার পর বমির শব্দে বুঝতে পারলেন আইভি বমি করে চলেছে। মার্সিডিজের দামি সিটকভার। সীমান্ত জোয়ারদার গাড়ি থামান

মিঃ কাননকে টয়োটা নিয়ে বের হবেন। প্রথমেই গিয়েছিলেন মিতা সান্যালের ফ্ল্যাটে। তাকে অবশ্য বাড়িতে পাওয়ার কথা নয়। সকালেই ফোনে কথা হয়েছিল। বিকেলে তার নন্দার পার্টিতে যাবার কথা। রাত্রিবাসটা তার ফ্ল্যাটেই হবার সম্ভাবনা। একবার মনে হয়েছিল আইভিকে নিয়ে সেখানেই যান। আইভি তখন বেহুঁশ। নিজের বাড়িতেই নিয়ে এসেছিলেন তাকে।

সীমান্ত জোয়ারদারের বাড়িতে মহিলার আগমন কোনো নতুন ঘটনা নয়। তবে গভীর রাতে নেশায় বেহুঁশ কোনো মেয়েকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসার ঘটনা এ বাড়িতে এর আগে কখনো ঘটেনি। এ বাড়িতে মহিলা বলতে কানন। ষাটের ঘর পেরিয়ে গেছে। সীমান্ত জোয়ারদার যখন আজকের মিঃ সীমান্ত জোয়ারদার হন নি, তবে গুটি গুটি পায়ে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখতে শুরু করেছিলেন তখন কাননকে মা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ঐ একটা জায়গাতেই ছিল সীমান্ত জোয়ারদারের সব দুর্বলতা। মা তাকে তার শেষ সম্বল হাতের চারগাছা সোনার চুড়ি তুলে দিয়ে কলকাতার কলেজে ভর্তি হতে পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরার দোকানে চুড়িগুলি দিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন সীমান্ত জোয়ারদার। ভর্তি হবার টাকা দিয়েও হাতে এসেছিল বেশ কিছু টাকা। মাকে টাকাগুলি ফেরত দিতে গিয়েও দেন নি। বিঘে ছয়েক ধানী জমি। এতে মাস ছয়েকের চাল হয়। মা রাত জেগে চটের ব্যাগ সেলাই করে। দিনের বেলায় মহাজনের গদিতে দিয়ে আসতেন সীমান্ত। সেখানেই পরিচিত হয়েছিলেন সীমান্তের ওপারের জিনিস আনার শিল্পকর্মের সাথে। ভেবেছিলেন, মার এই চারগাছা চুড়ির পরিবর্তে মাকে দুটো সোনার বালা গড়িয়ে দেবার এটাই সুযোগ। টাকাটা তুলে দিয়েছিলেন মহাজনের হাতে। ধীরে ধীরে এ জগতের কানাগলির মানচিত্র তার যতই পরিচিত হতে শুরু হয়েছিল ততই মানুষের নানা বর্ণ তার দৃষ্টির সামনে হাজির হতে আরম্ভ করেছিল। এই মানচিত্রের পথ ধরে প্রথম যার কাছে একদিন হাজির হয়েছিলেন তাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। তিনি তো তাকে সর্বত্যাগী রাজনৈতিক নেতা বলেই জানতেন। পায়জামা-পাঞ্জাবি আর ঘাড়ে কাপড়ের ব্যাগ এই তার পোষাক। মাঠে-ময়দানে চোরাকারবারীদের কেন ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দেওয়া হয় না তার প্রতিবাদে ফেটে পড়তে দেখেছেন। কারো বিয়ে বা শ্রাদ্ধতে পঞ্চাশ-একশটাকা সাহায্য দিয়ে বিনয়ের সাথে বলেন, গরীব পার্টির কর্মী। তবু এইটুকু সাহায্য জোগাড় করে আনতে পেরেছেন। রাস্তার ধারে টিনের চালের ঘর। সব সময় নানা চেনা-অচেনা লোকের ভীড়। তবে নেতা খুব কমই থাকেন। দলের কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। সবাই তাকে রাজনৈতিক সন্ন্যাসী বলে চেনে। দল থেকে তাকে নমিনেশন দিতে চাইলেও তিনি পদের আকাঙ্ক্ষী নন। তবে তিনিই ঠিক করে দেন, দল কাদের মনোনয়ন দেবে।

সীমান্ত জোয়ারদার তাকেই সীমান্ত কারবারের অধীশ্বরের সিংহাসনে দেখবেন তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। নিউ আলিপুরের এই বিশাল বহুতল বাড়ির পাশ দিয়ে অনেকবার গেছেন। এই প্রাসাদের মালিক যে তাদের মহকুমা শহরের সন্ন্যাসী দাদা এটা মনের কোণে কোনোদিন জায়গা পায় নি। তিনি সীমান্ত জোয়ারদারকে বলেছিলেন, এখানকার নিয়ম হল, তুমি যা দেখেছ তা এ বাড়ি থেকে বের হলেই ভুলে যাবে। আর নিয়মের গণ্ডি অতিক্রম করলেই এখানকার আইনে চিরতরের জন্য হারিয়ে যেতে হবে।

মানুষের মনের খবর পড়া সীমান্ত জোয়ারদারের সহজাত প্রতিভা। সন্ন্যাসী দাদার মনের খবর পড়তে তার অসুবিধা হয় নি। সীমান্ত পরের ব্যাকরণগুলি তাই সহজে চিনে নিতে পেরেছিলেন। শিখে নিয়েছিলেন, লোকের চোখে কি ভাবে ধুলো দিতে হয়। বাঘা বাঘা

পুলিশ কর্তাদের হয় বোকা বানিয়েছেন, নয়ত বশ করেছেন। কিন্তু মায়ের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। মা তার কাছ থেকে এক পয়সাও নিতে রাজি হন নি। সীমান্ত জোয়ারদার কথায় কথায় এখন নানা মহিলাকে সোনার গয়না উপহার দেন। অথচ যে মাকে চারগাছা সোনার চুড়ির পরিবর্তে দুটো বালা দেবার খোঁজে এই রাজত্বের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলেন, সেই মার হাতে বালা দিতে পারেন নি।

মা বলেছিলেন, আমি তোর সৎপথের রোজগারে দুটো শাক-ভাতকেই অমৃত বলে মনে করতাম। তোর এই টাকার কেনা জিনিস পরলে আমার হাতে জ্বালা করবে।

এই মা-ই কাননকে পাঠিয়েছিলেন তার রান্নাবান্না করে দিতে।

নিজের বেডরুমে লাগোয়া ঘরেই আইভিকে শুইয়ে দিয়ে কাননকে ডেকে বলেছিলেন, কানন দি, তুমি একে পরিষ্কার করে তোমার একটা কাপড় পরিয়ে এই ঘরে শুইয়ে দাও। তুমি আজ ওর সাথে থাক।

জীবনের প্রথম নেশা কাটতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল আইভির। রাত্রিতে নেশার ঘুমে দুবাব বমিও করেছিলেন। সীমান্ত জোয়ারদার দুবারই এসেছিলেন। ঘুম তার পাতলা। সামান্য শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়। এটাও তার সাম্রাজ্যের প্রাথমিক ব্যাকবণ। সন্ন্যাসী দাদাই বলেছিলেন, এই রাজত্বে বেঁচে থাকতে হলে তোমাকে ঘুমানোর সময় মাছের মতন চোখের পাতা আর বাঘের মতন কান দুটোকে খোলা রাখার কায়দা রপ্ত করতে হবে। নয়ত টের পাবে না কে কখন তোমার পিছনে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাননকে বলেছিলেন, কানন দি বেড শিটটা পাল্টে দিও। কাপড়টাতে বমি লেগে থাকলে ছাড়িয়ে দিও। কাল তোমাকে আমি কয়েকটা নতুন কাপড় আনিয়ে দেব।

ঘুম ভাঙতেই অচেনা ঘরে নিজেকে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়েছিলেন আইভি। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দক্ষিণ দিকের দরজাটা খুলে দিতেই ব্যালকনি। নীচে সবুজ মখমলের মতন লন। বুঝতে পারলেন না জায়গাটা কোথায়। বারান্দা থেকে আবার ঘরে এলেন। সামনেই ড্রেসিং টেবিল। অবাকই হয়েছিলেন। পরনে কালো পাড়ের সাদা শাড়ি। বিস্ময়ের রেশটা একটা আতঙ্কের স্রোত ধরে তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এসেছিল। তবে কি কাল রাতে তার শরীরের আরো কিছু লুণ্ঠিত হয়েছে? অ্যাটাচ বাথরুমের দরজা খুলে একটানে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, খুলে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেছিলেন। কোথাও কোনো দংশনের চিহ্ন নেই। পায়ের পাতায় শুধ একটা ব্যান্ডেজ।

ঘরে ফিরে এসে বিছানাতে বসলেন আইভি। মাথাটা তখনো ভারী। কপালের দুপাশের রগাটা দপ্‌দপ্‌ করছে।

ঘরটা বিশাল। হাল্কা আকাশি প্লাস্টিক কালার। এক দিকে সবুজ আর হাল্কা হলুদের বিশাল ল্যান্ডস্কেপ। উল্টোদিকে দেয়ালে সাদা প্লাস্টিক পেন্টের উপর সোনালি আভা। ঘরের এক কোণে চকলেট রঙের সেন্টার টেবিল। তার পাশে ক্রিস্টাল গ্লাসে ঢাকা টবে সবুজ ফার্ণ।

গত রাতের ঘটনা মনে করার চেষ্টা করলেন আইভি। শুধু মনে পড়ল শিবশঙ্করের বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ট্রামে উঠে পড়েছিলেন। আর একটা বারে নিশির ডাকে সাড়া দেওয়ার মতন ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর কী ঘটেছিল, কে তাকে কী ভাবে এখানে নিয়ে এল—কোনো কিছুই মনে করতে পারলেন না।

হঠাৎ ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় সীমান্ত জোয়ারদারের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলেন। আগে কখনো তাকে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। তবে এই মানুষটাই যে এ বাড়ির মালিক তা তার চেহারা দেখে মনে হয়নি। ভেবেছিলেন বাড়ির ম্যানেজার

জাতীয় কেউ হবেন। বলেছিলেন, বাড়ির মালিককে ডেকে দিন।

সীমান্ত জোয়ারদার হেসে বলেছিলেন, এই অধমই এই ছোট্ট বাড়িটার মালিক। তা ঘুমটা তো তোমার ভালোই হয়েছে। দুবার খোঁজ নিয়েছি। তুমি ঘুমোচ্ছিলে। তুমি জেগেছ শুনে চা আনতে বলেছি।

বেয়ারা ট্রলিতে করে টি-পটে চা নিয়ে এসেছে। আইভি সেদিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে সীমান্ত জোয়ারদারকে বলেছিলেন, আপনার বাড়িতে আমি কি করে এলাম? আপনাকে তো আমি চিনি না।

আমি তোমাকে চিনি। তুমিও আমাকে তোমার মার ফ্ল্যাটে দেখেছ। মনে করতে পারছ না।

বেয়ারা ট্রলিটা সামনে নিয়ে আসতেই সীমান্ত জোয়ারদার তাকে হাতের ইসারায় চলে যেতে বলে নিজেই কাপে চা ঢেলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাপে কয় চামচ চিনি দেব?

আইভি সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি আমাকে কাল এ বাড়িতে নিয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—আমার মার সাথে আপনার কী রকম সম্পর্ক?

আইভির প্রশ্নে থমকে গিয়েছিলেন। নিজেকে সামলে নিযে বলেছিলেন, বন্ধুত্বের।

কিন্তু আমার মা তার পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো রাখেন না।

পাইপে অগ্নি সংযোগ করে একটা নীলাভ ধোঁয়া ছেড়ে সীমান্ত জোয়ারদার বলেছিলেন, তোমার কাপে দু চামচ চিনিই দিলাম।

আপনি কিন্তু আমার কথার জবাব দিলেন না। আইভি সীমান্ত জোয়ারদারের চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, আপনি কি আমার অপ্রকৃতস্থ অবস্থার কোনো সুযোগ নিয়েছেন?

সীমান্ত জোয়ারদারের ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, যাক্ গত রাতে তোমার কি অবস্থা ছিল তা তাহলে তুমি মনে করতে পেরেছ। সুযোগ কতটা নিয়েছি তা তো তোমারই বোঝার কথা। তবে আমি না নিলেও কালকে তোমার অবস্থার সুযোগ অনেকেই নিতে চেয়েছিল। আমি তাদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে এনে কানন দির হাতে তোমাকে তুলে দিয়েছিলাম।

ধন্যবাদ। আইভি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমাকে কিছু টাকা ধাব দিতে পারেন?

এতো আমার পরম সৌভাগ্য। তবে ধার কথাটা উঠিয়ে নিতে পারলে খুব খুশি হব।

তার দরকার নেই। আইভি গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন। আরেকটা ব্যাপারে যদি আমাকে সাহায্য করেন তবে কৃতজ্ঞ থাকব।

বল।

আমার ব্যাপারে মাব সাথে যদি কোনো যোগাযোগ না করেন।

তুমি যদি না চাও তবে নিশ্চয়ই করব না। তবে তুমি কি করবে তা জানার দায়িত্ব আমার থেকে গেছে।

আপনার এখানেই আবার ফিরে আসতে পারি। তবে তার আগে একজনের সাথে আমার কিছু কথা সেরে নেওয়ার প্রয়োজন।

চা টা কিন্তু কোনো দোষ করেনি।

ধন্যবাদ।

এক চুমুকে চা টা শেষ করে দিযে আইভি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার স্ত্রী কোথায়?

—এখনো খুঁজে চলেছি।

—আমার মাকে বলেছিলেন?

—তাতেও কাজ হয়নি।

তাই নাকি? আইভির মুখে একটা বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, আপনি মার বন্ধু, তবে আমি শুনেছি যাদের স্ত্রী যোগাড় হয়নি অথবা স্ত্রীকে পছন্দ হয়নি তারা চাইলে আমার দয়ালু মার কাছ থেকে সে অভাব পূরণ করে নিতে পারেন।

পাইপের ধোঁয়া টানতে গিয়ে বিষম খেয়েছিলেন সীমান্ত জোয়ারদার বলেছিলেন, তুমি তোমার মার উপর খুব রেগে আছ মনে হয়।

—মোটেই না। তবে আমি আমার মার মেয়ে হবার চেষ্টা করছি।

—দাঁড়াও আইভি, তোমার টাকাটা নিয়ে আসি। কত লাগবে বলত? বিশ? পঞ্চাশ হাজার?

—ওটা আমার মার দাম। আমি ধার নিচ্ছি। আমাকে হাজার পাঁচেক ধার দিন। কালকেই ফেরত পাবেন। ব্যাঙ্কে আমার ঠাকুমা আমার নামে প্রতি মাসে যে টাকা জমা রাখেন তার কোনোটাই আমাকে তুলতে হয়নি। টাকাটা ফেরত দিতে তাই আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

টাকাটা এনে দিতেই আইভি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ধন্যবাদ। আমি এখন চলি। প্রয়োজন হলে আবার আসব।

তোমাকে কাল রাত্রিতে আমি নিয়ে এসেছিলাম। তুমি কোথায় যাবে তা জানার একটা দায়িত্ব আমার থেকে যায়।

আমি সাবালিকা। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অপহরণ করে আনেন নি। আপনি যদি আমার উপর কোনো অশালীন আচরণ করতেনও তবে আপনার বিরুদ্ধে আমাকেই অভিযোগ আনতে হতো। আমার দায়িত্ব আপনার উপর কোনোভাবেই বর্তাবে না।

সীমান্ত জোয়ারদার জীবনের কাণাগলি থেকে দেশ-বিদেশের নানা রাজপথে ঘুরেছেন। অসংখ্য মানুষের মনের খবর পেয়েছেন। নারী ও নারীদেহ তার অচেনা নয়। আইভিকে তার চেনা ভিড়ের সাথে মেলাতে পারেন নি। ওর দিকে কিছুটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, আমার গাড়িটা অন্ততপক্ষে নিয়ে যাও। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আর ইচ্ছে করলে তুমি যতদিন খুশি গাড়িটাকে ব্যবহার করতে পার।

আইভি বলেছিলেন, আপনার এই বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ। তবে আপাতত কোনোটারই দরকার নেই। আপনার ব্যক্তিগত ফোন নাম্বারটা দিন। প্রয়োজনে ফোন করব।

সীমান্ত জোয়ারদারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই রাস্তাটাকে চিনতে পেরেছিলেন। বালিগঞ্জ লেক রোড। ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে নেমে পড়েছিলেন। সামনেই বার। কয়েক পেগ হুইস্কি খাওয়ার পর সারা শরীরের বিদ্রোহ মাথার স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে অগ্নিদাহের যন্ত্রণায় ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। মনের ভিতরে একটা হিংস্র দানব সারা পৃথিবীটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছিল। সেদিন মনে হয়েছিল যা কিছু চেনা, যা কিছু প্রচলিত যা কিছু নিয়ম সব কিছুকেই তিনি ভেঙ্গে ফেলতে চান, সামাজিক নিয়মের এই মুখোশগুলি ছিঁড়ে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত তার মনের এই দাহকে প্রশমিত করা সম্ভব নয়।

বেয়ারাকে ডেকে বিল চাইতেই বেয়ারা বলেছিল, আপনার বিল মিঃ জোয়ারদার দিয়ে দিয়েছেন।

কেন?

সে কথা তো আমি বলতে পারব না ম্যাডাম। ম্যানেজার বলেছেন, বাইরে আপনার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে। উনি নিজে এসে আপনাকে গাড়িতে তুলে দেবেন।

ম্যানেজারকে বল আমি ডাকছি।

হুইস্কির নেশায় দৃষ্টিটা ঘোলাটে হতে শুরু করেছিল। ম্যানেজার এসে ইয়েস ম্যাডাম বলে দাঁড়িয়েছিল।

আপনি আমার বিল নেন নি কেন? আইভির কণ্ঠস্বরে উত্তাপ।

মিঃ জোয়ারদার ফোনে আমাদের সেরকম নির্দেশ দিয়েছেন ম্যাডাম।

হু ইজ মিঃ জোয়ারদার? চীৎকার করে উঠেছিলেন আইভি। আপনারা কি আমাকে তাব কোনো রক্ষিতা কুলের একজন মনে করেন?

স্যরি ম্যাডাম। মিঃ জোয়ারদার আমাদের অতি সম্মানীয় অতিথি। তিনি জানিয়েছেন আপনি তার অতি নিকট আত্মীয়া। আপনার মা উনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনি মানসিক যন্ত্রণা পাচ্ছেন। তাই আপনার যাতে না অসুবিধা হয়, কেউ যাতে আপনাকে বিরক্ত না করে তা দেখার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। আপনি যাতে নিরিবিলিতে বসতে পাবেন তার জন্য আপনার পাশের সব টেবিল তিনি বুক করে নিয়েছেন।

আইভি এতক্ষণ লক্ষ করেন নি তার চারিপাশের টেবিলগুলিতে 'রিজার্ভড' বলে টেবিল বোর্ড দেওয়া আছে।

মিঃ জোয়ারদার তার মা মিতা সান্যালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভাবতেই একটা অপমান বোধ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছিল। এই লোকটা তাহলে তার বাড়ি থেকে বেরিযে আসা থেকেই তার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে চলেছে।

ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আইভি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মিঃ জোয়ারদার এখন কোথায আছেন বলতে পারেন?

না, ম্যাডাম। তবে কিছুক্ষণ আগেও তিনি ফোন করে ছিলেন। আব তার পাঠানো গাড়িতে যেতে আপনি আপত্তি করলে আপনাকে এই চিঠিটা দিতে বলেছেন।

চিঠি?

হ্যা, ম্যাডাম।

দিন।

ছোট্ট চিঠি,

আইভি,

> ভাবছ তোমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছি। তা নয়। এ শহরটা 'সুবর্ণরেখার' বিজন ভট্টাচার্যের সুরে বলি, 'কলকাতা এক বীভৎস মজা'। এখানে অক্টোপাসের মতন মারাত্মক সব দু পায়ের জীবেরা তোমার মানসিক অবস্থার সুযোগ নেওয়ার জন্য জাল পেতে রেখেছে। আমার ড্রাইভার অতি বিশ্বস্ত ও বয়স্ক। তুমি ওকে ব্যবহার করতে সঙ্কোচ করো না।

সীমান্ত জোয়ারদার।

অবাকই হয়েছিলেন আইভি। লোকটা দূর থেকেই তার মনের খবর পড়ে ফেলেছে। ম্যানেজারকে বলেছিলেন, আমাকে মিঃ জোয়ারদারের কারটাকে চিনিয়ে দিন। গাড়িতে উঠে বলেছিলেন, হেদুয়াতে চল।

দরজাটা খোলাই ছিল। ঘবের ভিতর ঢুকে দরজাটার ছিটকিনি তুলে বন্ধ করে দিয়েছিলেন আইভি। অবাধ্য পা তার শরীরেব ভারসাম্যকে কোনোভাবে সামলে নিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাড়িয়েছিলেন।

শিবশঙ্কর টেবিলের উপর স্তূপাকার কাগজপত্রের মধ্যে মাথা গুঁজে অঙ্কের কিছু দুরূহ সমস্যা সমাধানে সারাটা দিন ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন। সকালে কাজের মেয়েটা এসে কপালে রক্ত দেখে এমন চেঁচামেচি শুরু করেছিল যে তিনি ডাক্তারের কাছে না গিয়ে পারেন নি। কপালে দুটো স্টিচ পড়েছিল।

ইউনিভার্সিটিতে যান নি। সারা দিন অঙ্কের মধ্যে ডুবে থাকলেও বিকেল থেকে আর বসে থাকতে পারছিলেন না। মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। সকালে ওষুধ এনেছিলেন, অ্যান্টিবায়োটিক আর পেইনকিলার। খেয়েছিলেনও সকালবেলায়। দুপুরেও কাজের মেয়েটা হাতে করে ওষুধগুলি খাইয়ে দিযে বার বাব করে ওষুধ খাবাব কথা মনে করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তার হাত থেকে ওষুধগুলি নিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় রেখেছেন কিছুতেই মনে কবতে পাবলেন না। পড়ার টেবিল থেকে উঠে গিয়ে মাথাটা বালিশে চেপে শুয়ে পড়েছিলেন।

মিঃ সান্যাল।

নাবী কণ্ঠেব ডাকে ধড়ফড় কবে উঠে বসেছিলেন শিবশঙ্কর। আইভি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কালো পাড়ের সাদা শাড়ি। চুল অবিন্যস্ত। মুখে তরল মাদকের তীব্র গন্ধ।

আইভি তুই? কাল সারা বাত কোথায ছিলি? কী অবস্থা হযেছে তোর? এক দমে প্রশ্নগুলি কবেছিলেন শিবশঙ্কব।

মিঃ সান্যাল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি আপনাব সন্তান নই। কথাগুলি জড়িয়ে এলেও স্থির দৃষ্টিতে বলেছিলেন আইভি।

শিবশঙ্কব বিছানা থেকে নেমে এসে বলেছিলেন, তুই এসব কথা ভুলে যা আইভি। তুই আমাব মেয়ে। তুই বিশ্রাম নে। আমি তোর জন্য ডিম সিদ্ধ দিয়ে ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি।

আইভি চেযারেব হাতলে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মিঃ সান্যাল আমি আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ জানাতে এসেছি। আপনাকে তার জবাব দিতে হবে।

তোর সব অভিযোগ কালকে শুনব। আজকে তুই সুস্থ নোস আইভি। আর রাগ করে থাকিস না। শিবশঙ্কর আইভির মাথায় হাত রাখতে এগিয়ে গিয়েছিল।

আইভি সরে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, মিঃ সান্যাল, কাল পর্যন্ত আপনাকে আমার বাবা বলে জানতাম। তাই আপনি যখন আমার গায়ে হাত দিয়েছেন তখন আমি কিছু মনে করি নি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি আপনি অন্যের সন্তানকে নিজের মেয়ের মিথ্যা পরিচয়কে সামনে রেখে তার দেহস্পর্শের মধ্যে আপনার অতৃপ্ত কাম-বাসনাকে তৃপ্ত করতেন।

আইভি! শিবশঙ্করের মুখ থেকে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এসেছিল।

কিন্তু আইভির কণ্ঠস্বর নির্মম। অন্যের যুবতী মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া, তাকে বুকে জড়িযে রাখা নিশ্চয়ই সদাশিব অধ্যাপক শিবশঙ্কর সান্যালের নির্মল চরিত্রের পরিচয় হতে পারে না।

কী বলছিস আইভি! তুই আমার মেয়ের মতো—আমার মেয়ে। নার্সিং হোম থেকে সেই ছোট্ট তোকে আমিই কোলে করে বাড়িতে এনেছি। শিবশঙ্করের কথাগুলো কান্নার মতো শোনায়।

বিদ্রূপের একটা হাসি ফুটে উঠেছিল আইভির ঠোঁটে। মেয়ের মতো? এটাই তো আপনার ভালোমানুষীর মুখোশ। যেমন দক্ষিণের মন্দিরের দেবদাসীরা ভাগবানের সেবকদের কাছে

দিবালোকে, [illegible] মাতা আর চার দেওয়ালের অন্ধকারে তাদের কাম-লালসা মেটানোর ক্রীতদাসী। আপনিও সবার সামনে আমাকে মেয়ের পরিচয় দিয়েছেন, আর যে সুখ আপনার স্ত্রীর কাছে থেকে পান নি সেই সুখ নিপুণ অভিনেতার মতন আমাব এই যুবতী দেহের স্পর্শে পেতে চেয়েছেন।

আইভি, দুহাতে নিজের মুখটা ঢেকেছিলেন, শিবশঙ্কর। প্লিজ আইভি। তুই নেশা কবেছিস। তুই জানিস না তুই কি বলে চলেছিস।

ঠিক বলেছেন মিঃ সান্যাল, আইভি টান টান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নেশা না করলে কি এই মুখোশ-ঢাকা যুগে এত কঠিন সত্যটি এত সহজে বলা যায়?

আইভি, তুই কেন আমাকে বারবার মিঃ সান্যাল বলে ডাকছিস? কাল তোব মা আসার আগের, সেই সুন্দর সময়গুলির কথা মনে কব।

আইভি শিবশঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তার উত্তপ্ত নিশ্বাস শিবশঙ্কবের মুখে প্রতিহত হয়ে তার চোখ-মুখকেই পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। শিবশঙ্কব নিজেকে পিছনে সবিযে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইভির দু'হাতের আঙ্গুলগুলি তার দু-কাঁধে সাঁড়াসিব চাপেব মতন বসে ছিল।

মাননীয় অধ্যাপক, আমার জন্মদাতাব পরিচয় বহনকারী মিঃ সান্যাল, আইভি দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, নিজের মেয়ে আপনার এত কাছে দাঁড়ালে কি আপনি এইভাবে সবে যেতে চাইতেন? না তাকে আবো কাছে টেনে নিতেন?

শিবশঙ্কর নিশ্চল দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জীবনের কাঠগড়ায যে তীব্র প্রশ্নেব সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার জবাব যে অঙ্কের কোনো ফর্মূলাতে পাওযা যাবে না, তা বুঝতে পেরেছিলেন।

আইভি, তার চোখের উপব দৃষ্টি বেখে বলেছিল, আপনি কি নিজেব বুকে হাত বেখে বলতে পারবেন, মিঃ শিবশঙ্কর সান্যাল, আপনি যখন আমাকে স্পর্শ কবতেন তখন আমাকে আপনার আত্মজা বলেই মনে করতেন? আমার স্পর্শ কি আপনাব মনে কোনো সঙ্কোচ সৃষ্টি করে নি? আমি যখন মেয়ের দাবিতে আপনার বুকে মুখ গুঁজেছি তখন আমাব স্পর্শে আত্মজাব পরিবর্তে নাবীর স্পর্শ কি আপনি অনুভব করেন নি? আপনাব স্ত্রী অর্থাৎ আমাব গর্ভধারিণী যখন কাল আমাকে আপনার বক্ষলগ্না দেখে কদর্য অভিযোগ কবেছিল, আপনাব সারা মুখে যে অপরাধ বোধের ছায়া ফুটে উঠেছিল, তাকি আমি আপনাব আত্মজা হলে এমনি অপরাধ বোধের যন্ত্রণার বিদ্ধ হোতেন?

শিবশঙ্কর নির্বাক। নিশ্চল।

আইভি শিবশঙ্কবেব কাছ থেকে একটু দূবে সবে এসে দাঁড়িযেছিল। তার ঠোঁটের কোণে যে একটা হাসি ফুটে উঠেছিল তা এক অচেনা হাসি। বলেছিল, মিঃ সান্যাল, আজ কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমি আপনার কাছে এলে আপনি কেন এত সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। আমি আপনার বুকে মাথা রেখে আমার মায়ের ছবিটাকে দূরে সরিযে রাখতে চাইলে আপনার পেশীতন্ত্রগুলি কেন এত শক্ত হয়ে উঠত। আপনার অবচেতন মনে চলত লড়াই। পিতৃস্নেহেব পেলব স্পর্শ আপনি আমাকে দিতে পারেন নি। অথচ আমার এই বিশটা বছর সেই স্নেহ স্পর্শের কাঙালিনীব মতন আপনার কাছে ছুটে এসেছে। কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে তাকে সেই নরকপুরী থেকে উদ্ধার করতে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে পিতৃস্নেহের নিরাপদ আশ্রয়ের ডাকের জন্য। আজ আমি বুঝতে পারছি। আপনার সেই অসহায় চাউনির মধ্যে আমি যে আপনার ব্যক্তিত্বহীনতা ও নিছক ভালোমানুষীর ছবি দেখেছিলাম তা ছিল আমার

ভুল। আজ আমি বুঝতে পারি আপনার অবচেতন মনের কোণে আমি ছিলাম এক নারী। তাই আমাকে নিয়ে আপনি বাইরের সম্পর্কে সন্তানের পরিচয় দিতে চেয়েছেন বটে কিন্তু আমার স্পর্শ আপনার পিতৃহৃদয়কে নয়, নারী-পুরুষের সম্পর্ককেই জাগিয়ে তুলত। কোনো দিন আপনি আমাকে ওই সন্তানের পিতার নির্মল স্পর্শ দিতে পারেন, নি।

আমাকে ক্ষমা কর আইভি, শিবশঙ্কর সেদিন নিজের দুহাতের তালুতে মুখ লুকিয়েছিলেন।

না, তা হয় না, মিঃ সান্যাল। ক্ষমা যেমন আমি আমার গর্ভধারিণীকে করতে পারি না, তেমনি আপনার মতন মেরুদন্ডহীন প্রাণীকেও ক্ষমা করতে পারব না। বলতে পারেন আমি কেন আপনাদের এই বিষময় সম্পর্কের দাবার চাল হতে যাব?

আমাকে তবে তুই শাস্তি দে, আইভি। শিবশঙ্করের গলাটা ধরে এসেছিল।

আইভি এক পা পিছিয়ে এসে শিবশঙ্করের মুখেব উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলেছিল, হ্যাঁ মিঃ সান্যাল শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে।

শিবশঙ্কব এগিয়ে এসে আইভির দুটো হাত ধবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইভি নিজের হাত দুটোকে টেনে নিয়েছিল।

শিবশঙ্কব বলছিল, আইভি তুই যে শাস্তি আমাকে দিবি আমি তাই মাথা পেতে নেব। আমি তোকে অনেক দুঃখ দিযেছি। তুই যে আমার—

এইটুকুই থাক মিঃ সান্যাল। কথাটাকে আর টানবেন না। এর পর আমি আপনার কি তা আমিই ঠিক করব। তবে শাস্তিটা মাথা পেতে নেবেন। তাই তো?

আইভির কথা মাঝপথেই শিবশঙ্কব বলেছিল, হ্যাঁ আইভি তুই আমাকে শাস্তি দে। আমি প্রতিজ্ঞা কবছি তুই যা বলবি আমি তাই করব। আমি আব আগের মতন কোনো ভুল কবব না।

শুনুন, মিঃ সান্যাল, আইভির স্বব গম্ভীব, আমি আব আপনি আপনাব স্ত্রী অর্থাৎ আমার জন্মদাত্রী মিতা দেবীর কাছে যাব। আপনি বাজি তো?

বাজি। তুই যা বলবি তাই করব।

এই মাত্র যে প্রতিজ্ঞাটি আপনি করেছিলেন তা মনে আছে তো?

আছে, আইভি আছে, কিন্তু তুই এখনো আমাকে কেন আপনি করে বলছিস? আমি তো তোব সব শাস্তি মেনে নেব বলেছি। তবু কেন আমাকে ক্ষমা করতে পারছিস না; শিবশঙ্করের গলার স্বর আর্দ্র।

আপনি—তুই সম্পর্কটা আমিও রাখতে চাই না। তবে তার আগে তো আমাদের সম্পর্কের অধিকাবটুকু কায়েম করে নিতে হবে।

সম্পর্কের অধিকার? আবার কি বলছিস তুই? শিবশঙ্কর অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা কবেছিলেন।

হ্যাঁ, সেই অধিকারটুকু কায়েম করার জন্যই তো আমি আপনাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা কবিয়ে নিয়েছি, আমি যে শাস্তি দেব তাই আপনাকে মাথায় পেতে নিতে হবে। সেটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে।

আছে রে, আইভি, আছে। শিবশঙ্কর আইভির মাথাটা দুহাতের ভিতর টেনে নিয়ে তাব ঘন চুলে মুখটা ডুবিয়ে বলেছিল।

আইভি তার মাথাটা শিবশঙ্করের হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে বলেছিল, আমি আর আপনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে যাব মিতা সান্যালের কাছে। আপনি আমাকে এই মুহূর্তে আপনার স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন।

আইভি! একটা বুক-ফাটা আর্তনাদ শিবশঙ্করের গলা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। এমন করে আঁতকে উঠলেন কেন মিঃ সান্যাল?

চেয়ারের একটা হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আইভি। নাকের দুটো পাটা ফুলে উঠেছিল। কপালে মুক্তোর মতন স্বেদ বিন্দু। বলে চলেছিল, আমি যে আপনার সন্তান নই, আপনার সাথে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। তবু আপনি আমার পিতা, এই নির্মম রসিকতা কিন্তু আপনিই আমার সাথে করে এসেছেন। আমি জারজ। তবু এতদিন আমাকে আপনারা মিথ্যার ফানুসে চাপিয়ে মজা দেখেছেন। আজ আমি তার বদলা চাই। আমার বাবা কে? সেই ঠিকানা তো কেউ আমাকে দেন নি। দিলেও তা যেমন হবে সমাজের কাছে আমার নির্মম পরিচয়, তেমনি আপনার সাথে আমার এই পরিচয় হবে তথাকথিত উচ্চসমাজের প্রতি আমার নির্মম আঘাত। আমি আপনাদের মাঝে যে এক অদ্ভুত নিরাকার সম্পর্ক নিয়ে বেঁচেছিলাম তার একটা অবয়ব দানের অধিকার কিন্তু আমার আছে। আমি যে এতদিন নহুষের আত্মার মতন নিরালম্ব অবস্থানের যন্ত্রণা না জেনেই ভোগ করেছি তার কিছু ভাগ তো এখন আপনাকেও নিতে হবে। আমি একা আপনাদের সামাজিক দায়ের কফিনকে বয়ে বেড়াব—এই প্রত্যাশা কিন্তু ঠিক নয়।

আইভি আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তার তপ্ত নিশ্বাস শিবশঙ্করের মুখের উপর জ্বালা সৃষ্টি করেছিল। শিবশঙ্করের কাঁধের উপর তার হাতের নখগুলি কেটে বসেছিল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিবশঙ্করের কাঁধদুটোকে ঝাঁকিয়ে বলেছিল, কি হল ভালো মানুষ অধ্যাপক? আবার মা যদি আপনাদের সমাজ পিতাদের কাছে অভিযোগ করেন, আপনি আমার পিতা নন তবে নিশ্চয়ই আপনি সেই পরিচয় স্থাপন করতে পারবেন না। কারণ কোনো পুরুষ মানুষই তা পারে না। কিন্তু আপনি যদি দাবি করেন এই মেয়েটি আমার স্ত্রী আর সেই মেয়েটি যদি একবার ঘাড় নাড়ায় তবে তো আপনার দাবিটিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

আইভি, প্লিজ। শিবশঙ্কর দুহাতে তার কান দুটোকে চেপে ধরেছিল।

কি হলো? ভালো মানুষ, অধ্যাপক। একটু আগে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন? আপনার আইনী-স্ত্রীর প্রতি আমার কোনো দায়িত্ব আছে বলে মনে করি না। তবে হিসেব নেবার অধিকার আমার আছে। ভাবুন তো সমাজের উঁচু মহলে আমাদের নিয়ে কত মুখরোচক আলোচনা হবে। সৎ মেয়ের সঙ্গে সৎ পিতার এই সম্পর্ক নিয়ে আনাচে-কানাচে যে প্রতিবাদ উঠবে সে কথা ভেবেই তো আমি যেন আমার ঘৃণ্য জন্ম-পরিচয়ের জ্বালাটা ভুলতে পারছি।

আইভি, তুই আমাকে ক্ষমা কর। সারা দুনিয়া যা জানে সেই সম্পর্ক নিয়েই আমরা এবার মাথা উঁচু করেই চলব। তুই আমার মেয়ে। তোর মা যদি আসে তাকে মোকাবিলা করব আমি। তুই যদি চাস এ শহর থেকে আমরা অনেক দূর চলে যাব। তোর ভালো বিয়ে হবে, তুই সুখী হবি।

অনেক দেরি হয়ে গেছে, স্যানাল বাবু। আইভির গলার স্বরগুলি যেন দূর থেকে ভেসে আসছিল। বলেছিল, কথাগুলি কেমন লাগছে জানেন?

—তুই বল।

আইভির ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, কোনো লোককে যদি সম্পত্তির লোভে তার বাবাকে খুনের অপরাধে বিচারের জন্য আনা হয় তখন যদি সে বিচারকের কাছে আবেদন জানায়, হুজুর আমি পিতৃহীন এক সন্তান। আমার পিতাকে হারাবার শোকের কথা বিবেচনা করে আমাকে মার্জনা করা হোক। তবে কথাগুলো যেমন শোনাবে আপনার কথাগুলিও কিন্তু আমার কাছে তেমনি লাগছে।

আইভি, তুই আমাকে অন্য যে কোনো শাস্তি দে।

শিবশঙ্করের কান্না-ভেজা কথাগুলি করুণ প্রার্থনা বলে মনে হয়েছিল আইভির কাছে। আর সেটাই আইভিকে আরো বেশি উত্তেজিত করে তুলেছিল। শিবশঙ্করের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধহীন অবয়বকে দলিত-মথিত করার তীব্র আক্রোশে শরীরের প্রতিটি কোষ অপ্রতিহত ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছিল।

আইভি হঠাৎ শিবশঙ্করের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। উন্মত্তের মতো শরীর থেকে প্রতিটি আবরণ খুলে ফেলে শিবশঙ্করের মুখের কাছে নিজের মুখটা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

নিষ্পন্দ শিবশঙ্করকে প্রবল বেগে নিজের দিকে টেনে এনেছিল আইভি। সেই আকস্মিক টানে তিনি ওর নগ্ন শরীরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। তার ঠোঁট দুটো এসে পড়েছিল আইভির বুকের উপর।

শিবশঙ্কর আইভির উপর থেকে নিজের দেহটাকে সবাবার চেষ্টা করতেই আইভির দুটো হাত অজগরের বেষ্টনীর মতন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। শিবশঙ্কবকে নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে দিতে চেয়ে তার কানে মুখ এনে বলেছিল, আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে আপনি যা দাবি করতে পারেন নি, তার জারজ সন্তান তাই আপনাকে স্বেচ্ছায় দিতে এসে নরকের পথকে চিনে নিতে চাইছে।

আইভির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেও শিবশঙ্কর মুক্ত হতে পারেন নি। আইভির শরীরে যেন সেদিন এক দানবীয় শক্তি বাসা বেঁধেছিল। মনে হয়েছিল তিনি যেন এক অক্টোপাসেব বাহুবন্ধনেব চাপে পিষ্ট হযে চলেছেন। যে কোনো মুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। কোনো কিছুকে বাধা দেবাব ক্ষমতা যেন ব্লটিং পেপারের মতন শুষে নিয়েছে। আইভি যে কখন তার দেহটাকে বিছানায় টেনে এনেছিল তা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। আইভি সেদিন তার আক্রোশের উত্তাপে শিবশঙ্করের দেহটাকেই ভস্মীভূত করতে চেয়েছিল।

ঝড় যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন, তারও শেষ আছে। আইভির মন ও শরীরের ঝড়ও এক সময় ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করেছিল।

লুপ্ত চেতনা হঠাৎই যেন ফিরে পেয়েছিল আইভি। ধরফড় করে উঠে বসেছিল। কালকের রাত্রির ঘটনাগুলি তার কাছে এক দুঃস্বপ্নের ঘোর বলে মনে হয়েছিল। মেঝেতে তার সায়া, ব্লাউস, ব্রা পড়ে আছে। কে যেন তার শরীরে কাপড়টা জড়িয়ে দিয়ে গেছে।

আইভি তাড়াতাড়ি সায়া, ব্লাউজ পরে নিল। কাপড়টা ঠিক করে পরতে যেতেই টেবিলের উপর শিবশঙ্করের চিঠিটা দেখতে পেয়েছিল।

আইভি,

তোর দেওয়া এত নিষ্ঠুর শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই পালিয়ে গেলাম। তোর দাদুর দেওয়া সম্পত্তি আমি অনেক আগেই তোর নামে হস্তান্তর করে রেখেছি। তোর নামে ব্যাঙ্ক চেকে সই করে গেলাম। তোর মার কাছে যেতে না চাইলে এ বাড়িতেই তুই থাকিস। এটা তোরই বাড়ি। রক্তের সম্পর্ক দিয়েই সব সম্পর্ক তৈরি হয় না। সম্পর্ক তৈরি হয় মনের বাঁধনে, হৃদয়ের ভাষা দিয়েই হৃদয়কে জানা যায়। আমি তোকে আমার হৃদয়ের ভাষা দিয়েই সন্তান বলে মনে করে এসেছি, আজও কবব। তোর কাছে ক্ষমা চাইবার অধিকার আমার নেই। তবু পারলে ক্ষমা কবিস।

ইতি—

(বাবা) শিবশঙ্কর।

সীমান্ত জোয়ারদারের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন আইভি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই দেখতে পেয়েছিলেন, যে গাড়িতে এসেছিলেন সেটা গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। জেনেছিলেন মালিকের হুকুমে সারারাত ড্রাইভার গাড়িতেই রাত কাটিয়েছে।

সীমান্ত জোয়ারদার বাড়িতেই ছিলেন। আইভিকে দেখে বলেছিলেন, এস।

আইভি সামনের সোফায় বসে বলেছিলেন, আপনার সাথে আমার কিছু কথা বলার আছে।

একশবার। তার আগে বল কী খাবে? চা, না কফি? তারপর স্নান করে জামাকাপড় ছেড়ে নাও। সারা রাত কিছু খেয়েছ বলে মনে হয় না।

আমার কোনোটারই এখন দরকার নেই। তার থেকেও আমার কথাগুলি আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি।

বেশ, তবে তোমার সঙ্গে বসে কফি খাব বলে আমি কিন্তু বেড-টিও খাইনি। বিশ্বাস না হলে কানন দিকে জিজ্ঞাসা করতে পাব।

আমি যে আপনার বাড়িতে ফিবে আসব তা তো আপনার জানার কথা নয়। তবে কি আমাকে ধরে আনার জন্যই আপনার ড্রাইভারকে গাড়িসহ বাড়ির দরজায় পাহারায় রেখেছিলেন?

না, আমার ড্রাইভার নিশ্চয়ই তোমাকে আমার বাড়িতে আসার কথা বলেনি। যে ড্রাইভার তোমার জন্য সারারাত গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেছিল, তাকে আমি হরিকাকা বলে ডাকি। আমি যখন ট্রামের পাদানিতে ঝুলে গাড়ির স্বপ্ন দেখারও সাহস করতাম না, তখন ও ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল। আজ ও আমার সবচেয়ে প্রিয় মার্সিডিজ চালায় বটে, কিন্তু হরিকাকা আমাব কাছে ড্রাইভার নয়। ওর বয়স ৬০ পেরিয়ে গেছে। গাড়ি ওকে আর চালাতে হয় না। অন্য ড্রাইভারদের দেখাশোনা করে। হরিকাকাকেই পাঠিয়েছিলাম যাতে তোমাকে কেউ কোনো অসুবিধায় ফেলতে না পারে।

আইভির মনে পড়েছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই গাড়ির দরজা খুলে হবিকাকা নেমে এসেছিল। তিনি কোনো কথা না বলেই তো গাড়ির ভিতর এসে বসেছিলেন। হরিকাকাকে কোথায় যেতে হবে সে কথাও বলেন নি। হরিকাকা নীরবেই গাড়িটা চালিয়ে এনেছিল।

আইভি বলেছিলেন, আমার জন্য আপনি এত ভাবছেন কেন?

বলতে পারব না। হয়ত মিতা সান্যালের মেয়ে বলে। তোমাকে বারে ঐ অবস্থায় দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম তুমি বাড়ির সাথে রাগ করে বেরিয়ে এসেছ। বাবার কাছেও যেতে চাওনি। গেলে ঐ অবস্থায় কোনো মেয়ে বারে ঢুকতে পারে না। আমি কাননদিকে পাঠিয়ে তোমার শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ সব আনিয়ে দিয়েছি।

আমি মিতা সান্যালের মেয়ে বলেই আমার জন্য আপনি এত কিছু ভাবছেন? আইভির মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠেছিল।

—সেটাই তো স্বাভাবিক।

—আমার মার সাথে আপনার সম্পর্কটা কত দূর?

—প্রশ্নটা আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার।

—আমি জানতে চাইছি, আমার মার সাথে আপনার সম্পর্কটা কত দূর পর্যন্ত এগিয়েছে।

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছিল সীমান্ত জোয়ারদারের। তবে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন নিজের মার সম্পর্কে তুমি কতটা জান?

—যেটুকু জানিনা সেটাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

—আইভি, আমি কিন্তু তোমার কাছে কিছু জানতে চাইনি। তুমি কেন রাগ করে এমন দিশাহারা হয়ে বারে ঢুকেছিলে, কার উপর রাগ করেছ—কোনো প্রশ্নই তো আমি করিনি।

—আমিও তো আপনাকে কিছু বলিনি। বলতেও চাইনি।

—তুমি আজ কিছু বলবে?

—বলতে পারি। তবে তার আগে আপনার কাছ থেকে আমাকে কিছু জানতে হবে।

—বেশ, কি জানতে চাও বল।

আইভি তাকিয়েছিলেন সীমান্ত জোয়ারদারের মুখের দিকে। কালো মুখমণ্ডলে কপালের ভাঁজ স্পষ্ট। কানের দুপাশে সাদা কালো জুলফি। গোঁফের মাঝেও সাদা রেখার উঁকিঝুকি। বয়সটা তাব আসল বয়স থেকে হয়ত বেশিই মনে হয়। তবে রুক্ষ কালো চেহারার মধ্যেও ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট।

মার সাথে আপনাব পরিচয় কত বছবের?

বছব ছ'সাতেক হবে।

মনে মনে হিসেব করেছিলেন আইভি। তার জন্মের বীজ কম করেও এর তেরো-চৌদ্দ বছর আগেই বপন করা হয়েছিল। সীমান্ত জোয়ারদারেব চোখের উপর সরাসরি দৃষ্টি স্থাপন কবে আইভি বলেছিলেন, একটা কথা সত্যি করে জবাব দেবেন?

দেব।

আমাব মার সাথে আপনার সম্পর্কটা কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে?

—তুমি কতটুকু জানতে চাও?

—যতটুকু সত্যি তার সবটাই।

—সইতে পাববে?

—পাবব জেনেই তো সব জানতে চাইছি।

—যদি বলি একটা নারী-পুরুষের মধ্যে যতদূর সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তার সবটাই ঘটে গেছে।

বিশ্বাস করাটাই সোজা। আইভি গম্ভীর হয়েই জবাব দিয়েছিলেন। তবে আপনাদের মধ্যে ভবিষ্যত-জীবন নিয়ে কোনো পরিকল্পনা কি ছিল?

—তোমার মা আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।

—আপনি কি ভেবেছেন?

—তোমার মা আমাকে আমার ব্যবসায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এর জন্য অবশ্য তিনি তার প্রাপ্য অর্থ পেয়েছেন। তবে টাকার বাইরে আমাদের সাম্রাজ্যে আর কিছু না থাকলেও আমার জীবনে আরেকটি জিনিস এখনো সামান্য হলেও টিকে আছে। সেটি হল কৃতজ্ঞতা।

—আপনি কি তাহলে আমার মাকে বিয়ে করার কথা ভেবেছেন।

—আইভি, আমি নিজে সৎ নই। আমার সাম্রাজ্য গড়ার পেছনেও আছে নানা বে-আইনী কাজ। আমি নারী দেহের প্রতি উদাসীন একথা বলব না। আমি চাইলেই প্রতিরাতেই নতুন নারীসঙ্গ পেতে পারি, চেহারায় নয়, টাকাই আমাকে অনেক নারীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। তবে আমি নারীদেহ শিকারি নই। তোমার মার সব খবরই আমি রাখি। কাল কোথায়

ছিলেন সে খবরও আমি জানি। তবু তোমার মার প্রস্তাবকে এখনো ফিরিয়ে দিই নি। ভাবার সময় চেয়েছি।

—আমার মার তো ডিভোর্স হয় নি। অর্থাৎ তাকে আপনি তার রক্ষিতা করে রাখতে চাইছেন?

নিজের মার সম্পর্কে তোমার একটু নরম মনোভাব থাকা দরকার। সীমান্ত জোয়ারদার খানিকটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন।

নিশ্চয়ই। আইভির ঠোঁটের কোণায় একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, মার প্রেমিকের সামনে মার সম্পর্কে নরম ভাবনাকেই প্রকাশ করা উচিত।

সীমান্ত জোয়ারদারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন আইভি। তার মুখে তপ্ত নিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমার মা তো এখনো অপূর্ব সুন্দরীর সংজ্ঞাতেই পড়েন। তবে তার এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য এত ভাবার দরকার কেন? আমি যত দূর জানি মিঃ সান্যালের কাছে মা ডিভোর্স চাইলে তিনি সাথে সাথেই তা মেনে নেবেন।

হেসেছিলেন সীমান্ত জোয়ারদার। বলেছিলেন, তুমি হয়ত ভাবছ তোমার মার কাছ থেকে যা পাবার সবই আমি পেয়ে গেছি তাই তার স্থায়ী দায়িত্ব নিতে আমি ইতস্তত করছি। আসলে আমি ভাবছি তোমার মার কথা।

স্পষ্ট করে বলুন। আইভির কথায় কৌতূহলের ছাপ।

আইভি, তোমার মার রোগটার জন্ম তোমার দাদুর বাড়িতেই। বড়লোকের একমাত্র সন্তান। রূপো বা সোনা নয়, একেবারে হীরের চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছে। যা চেয়েছে মুখের কথা ফুটে ওঠার আগেই পেয়ে গেছে। তাই তার ধারণা এই পৃথিবীটা তার ইচ্ছেপূরণের যন্ত্র। কোনো কিছু পেতে হলে যে প্রতীক্ষা করতে হয় তার জন্য নিজেব কিছু ছাড়তে হয সে কথা তোমার মা জানে না। সবকিছুই তার মনে হয়, সহজলভ্য। পেযে গেলেই মনে হয় ঠুনকো। আমি উঠেছি ধাপে ধাপে। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গার জন্য লড়াই কবে। তাই জিনিস সহজে পেলে আমার মন ভবে না। ছেড়ে দাও এসব কথা। হয়ত তোমার মাকেই বিয়ে করব। আইভির একটা ঘাড়ে ডানহাতটা তুলে দিয়ে সীমান্ত জোয়ারদার বলেছিলেন, তুমি চলে যাবার পরেই তোমার মা আমার কাছে এসেছিল।

তার মানে আপনি মাকে খবর পাঠিয়ে ছিলেন?

না, আমি ছাড়াও তোমার মাব নানা পরিচিত জন আছে। বাবে তোমার মাকে চেনে না এমন স্থায়ী খরিদ্দার খুব কমই আছে। মিসেস সান্যালের সুন্দরী মেয়েকে সীমান্ত জোয়ারদার গভীর রাত্রিতে তার ঘরে এনে তুলেছে এটাই তো এখন এলিট সমাজের সবচেয়ে মুখরোচক খবর।

ঠোঁট দুটিকে নিজের অজান্তেই দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিলেন আইভি। ঘাড় থেকে সীমান্ত জোয়ারদারের হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আপনি কি মাকে আবাব আসতে বলেছেন?

না, তোমার মা নিজেই আসবেন।

কেন?

মা তার মেয়ের কাছে আসবেন, এতে কেন—এই প্রশ্ন তো আসতে পারে না। বিশেষ করে অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে আমার মতো তার এক মাতাল প্রেমিকের সঙ্গে এই বাড়িতে উঠেছিল এটা তো তোমার মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ হতেই পারে।

সীমান্ত জোয়ারদারের কথার মাঝেই আইভি বলেছিলেন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। বিশেষ করে যে মহিলা তার যে পুরুষ সঙ্গীর অঙ্কশায়িনী হতে মাঝে মাঝেই আসেন তার ঘরে তার যুবতী মেয়েকে আসতে দেখলে হিংসার আগুনে ঝলসাতে পারেন।

সীমান্ত জোয়ারদার কোনো জবাব দেন নি। শুধু ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

আইভিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা, মা আমার সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেন নি? বিশেষ করে আপনাদের সম্পর্ক যখন স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে?

তোমাকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার কারণ থাকতেই পারে। সীমান্ত জোয়ারদার তার ভ্রূ দুটিকে নাচিয়ে ছিলেন।

—কী রকম?

—তোমার মার ভয়, পাছে তাকে ছেড়ে তার সুন্দরী মেয়ের দিকে নজর দিয়ে বসি। সে জন্য তোমার একটা বিয়ের ব্যবস্থা তিনি প্রায় পাকা করে ফেলেছেন।

আমার বিয়ে? মা পাকা করেছেন? বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে বেশ সময় নিয়েছিলেন আইভি।

—হ্যাঁ। আর সে কথা জানাতেই সেদিন তিনি তোমার বাবার কাছে গিয়েছিলেন। তুমি তো তার জন্যই বাগ করে বাড়ি থেকে বেবিয়ে এসেছ।

—মা একথা বলেছে?

—হ্যাঁ।

—আমার বাবাকে আপনি চেনেন?

—অধ্যাপক সান্যালেব সাথে আমাব সরাসরি পরিচয় নেই। তবে তাকে আমি দেখেছি। আসলে আমি তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম। তবে সোস্যাল সাইন্স নিয়ে। আর উনি ছিলেন অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক। তাই আমি উনার সরাসরি ছাত্র নই বটে, তবে উনার গুণমুগ্ধ। সত্যি কথা বলতে কী জান আইভি? তোমার মার প্রস্তাবে যে আমি এখনও সাড়া দিতে পারি নি, তার কারণ তোমার বাবা। এমন ঋষিতুল্য মানুষের কাছে কোন মুখে দাঁড়াব?

আইভি এগিয়ে এসেছিলেন সীমান্ত জোয়ারদারের মুখের কাছে। তার তপ্ত নিশ্বাসের ছোঁয়া তার কপালকে যেন পুড়িয়ে দিতে চাইছিল।

আইভি বলেছিলেন, আপনি আমার কাছে সত্যি কথা বলেছেন। তাই আপনারও সত্যটি জানা দরকার। অধ্যাপক শিবশঙ্কর সান্যাল আমার জন্মদাতা নন।

কী? কী বললে? সীমান্ত জোয়ারদারের মুখ থেকে বিস্ময়ের গোলাটা যেন ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল।

আইভির কোনো ভাবান্তর নেই। সেই একই স্বরে বলে চলেছিলেন, আমি কথাটা খাঁটি মাতৃভাষায় বলেছি। শিবশঙ্করের ঔরসে আমার জন্ম হয় নি। আমি মিতা সান্যালের জারজ সন্তান। অধ্যাপক সান্যালকে আমার দিদিমা বলতেন নীলকণ্ঠ। সত্যি তিনি তাই। আপনি তাকে বলেছিলেন ঋষিতুল্য। ঋষিদেরও আছে কাম, ক্রোধ, চাওয়া-পাওয়ার বাসনা। অধ্যাপক সান্যাল এসব কিছুরই ঊর্ধ্বে। তাই আমার মার পাপের বোঝা তিনি সব জেনেই বয়ে চলেছিলেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সীমান্ত জোয়ারদার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ সত্যটি তুমি কবে জেনেছ?

যে দিন আপনি আমাকে বারে আবিষ্কার করেছিলেন।

আইভি, সীমান্ত জোয়ারদার আইভির ঘাড়ে আবার তার হাত দুটো তুলে দিয়ে বলেছিলেন, তোমার পাশে আমি কিভাবে দাঁড়াতে পারি বল।

—আপনি কি সত্যিই আমার পাশে দাঁড়াতে চান?

—তুমি বলেই দেখ।

আইভি, সীমান্ত জোয়ারদারের হাত দুটো কাঁধ থেকে নামিয়ে এনে নিজের হাতের মুঠিতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন? এখানে এই মুহূর্তে।

সীমান্ত জোয়ারদার আইভির হাতের মুঠি থেকে হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার ঘাড় দুটোকে চেপে ধরে বলেছিলেন, তুমি কি বলছ, তা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই।

—আমি নাবালিকা নই।

—যাকে তুমি বিয়ে করতে চাইছ সে তোমার থেকে বয়সে অনেক বড়ো।

—আপনি তো আমার মার থেকে ছোটো হয়েও তার বিয়ের প্রস্তাবকে বিবেচনা করার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কিন্তু আইভি, সীমান্ত জোয়ারদারের মুখ থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস আইভির কপালের উপরের চুলগুলিকে এলোমেলো করে দিয়েছিল। বলেছিলেন, যাকে তুমি বিয়ে করতে চাইছ তার সাথে তোমার মার সমস্ত সম্পর্ক ঘটে গেছে। তুমি বুদ্ধিমতী, আশা করি বুঝতে পারছ আমি কোন সম্পর্কের কথা বলতে চাইছি।

আইভির পটে আঁকার মতন সুন্দর ভ্রূযুগল একসাথে জোড়া লেগেছিল। বলেছিলেন, এর জন্যই আপনাকে আমার প্রয়োজন। এই মুহূর্তে। মার আসার আগেই তার সামনে আমরা স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে দাঁড়াতে চাই। আপনি মাকে ফোন করে বলুন সন্ধেবেলায় আমি আপনার কাছে আসব। সে যেন তখন আসে। আর দুপুরের মধ্যেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে নিয়ে এসে আমাদের বিয়েটাকে পাকা করে ফেলুন। আর আজকে বাড়িটাকে ফাঁকা করে দিন। আমাদেব এই বিয়ের অতিথি হবে শুধু আমার মা।

সীমান্ত জোয়ারদার বলেছিলেন, আইভি, তুমি ঝোঁকের মাথায় এসব বলছ, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ।

প্লিজ, আইভির গলায় কাতর প্রার্থনা ঝরে পড়েছিল। আমি কথা দিচ্ছি, আমি আপনার চলার পথে কোনো বাধা দেব না। আপনিও আমাকে আমার পথে বাধা দেবেন না।

—তোমার সাথে বিয়ের পরও আমি যদি তোমার মার সাথে সম্পর্ক রেখে চলি?

আমার ঐ একটা জায়গাতেই আপত্তি থাকবে। এই আপত্তিও থাকত না, যদি আপনি আমার মার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করে আমার গর্ভেও সন্তানের বীজ স্থাপন করতে পারতেন।

মানে? সীমান্ত জোয়ারদারের ঠোঁট দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে পড়েছিল।

আইভি বলেছিলেন, আমাব মার জরায়ু আমার জন্মানোর সঙ্গে বাদ পড়েছে। তাই এখানে যখন কোনো শোধ নিতে পারব না, তবে তার প্রেমিককে জিতে নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেবার উদারতাও দেখানো সম্ভব নয়।

তখনই ফোনটা বেজে উঠেছিল। ফোনটা কানে তুলেই নামিয়ে দিয়েছিলেন সীমান্ত জোয়ারদার। আইভির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমার মা মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়বে।

আইভি কোনো জবাব না দিয়ে বলেছিলেন, আপনি না ডাকলে নিশ্চয়ই বাড়ির কেউ আপনার বেডরুমে ঢোকে না।

—না।

—কাননদিও নয়?

—না। কিন্তু কেন বলত?

এমনি, আইভি বলেছিলেন। আচ্ছা, আমার মা নিশ্চয়ই আপনার বেডরুমে সোজা চলে আসতে পারে?

সীমান্ত জোয়ারদার হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, এবার তুমি কিন্তু একেবারে বোকার মতন প্রশ্ন করে বসলে।

—কেন?

—যাকে বিছানার সঙ্গী করতে অসুবিধা নেই, সে আমার বেডরুমে সরাসরি আসতে পারে কিনা, সেই প্রশ্নটা অন্ততপক্ষে তোমার কাছ থেকে আসা উচিত নয়।

আইভি ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ইন্টারকমে বলে দিন, আমার মা এলে তিনি যেন সোজা আপনার বেডরুমে চলে আসেন।

বেশ।

আইভি নিজের শরীরটাকে সীমান্ত জোয়ারদারেব গায়ের সাথে মিশিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তার শরীরেব উত্তাপ সীমান্ত জোয়ারদারের লোমকূপেব মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল।

আইভি একটানে শাড়িটাকে গা থেকে খুলে দূবে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। দ্রুত হাতে ব্লাউজটা খুলে পাশের সোফায় রেখে দিলেন। ব্রাটা একটানে খুলে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলেব উপর ছুঁড়ে দিলেন। সায়ার দড়িটা খুলে দিতেই সায়াটা পায়েব তলায় লুটিয়ে পড়ল।

আইভি দাঁড়িয়ে আছেন সীমান্ত জোয়ারদারের বুকের কাছে। তার সুডৌল স্বর্ণমুখী শুভ্র স্তন যুগল সীমান্ত জোয়ারদারকে স্পর্শ করছে। সীমান্ত জোয়ারদারের শরীর থেকে একে একে শেষ আব্রুটুকু খুলে নিয়ে তাকে অমোঘ আকর্ষণে পাশের দুগ্ধফেননিভ শয্যার বুকে টেনে নিয়েছিলেন। হাত বাড়িয়ে বেড সুইচটা অন করে দিলেন।

বিশ বছব ধরে তিলে তিলে গড়ে উঠা, আইভির দেহপল্লবীর সৌন্দর্য সুষমার খাঁজে খাঁজে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সীমান্ত জোয়ারদার মৃদু স্বরে বলেছিলেন, লাইটটা অফ করে দি। দবজাটা যে ভেজানো।

আইভি উত্তব দিয়েছিলেন, না, তীব্র আলোতেই নিজেদের খোঁজা ভাল।

সীমান্ত জোয়ারদার তার ক্ষুধার্ত হাতে আইভির দেহতনুর নানা ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে বলেছিলেন, দরজার ছিটকানিটা লাগিয়ে দিয়ে আসি।

আইভি সীমান্ত জোয়ারদাবকে আরো গাঢ় টানে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলেছিলেন, সম্পর্কটা যখন তার সামনেই তুলে ধরতে চাই তখন আর আব্রুর প্রয়োজন নেই।

সেদিন আইভি সীমান্ত জোয়ারদারকে তীব্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ রেখে তার পেলব বুকের ভাজে কীট-দংশনের জ্বালা অনুভব করতে করতে দেখেছিলেন, ভেজানো দরজাটা খুলে গেছে। তীব্র আলোতে স্নাত তাদের উলঙ্গ যুগলবন্দী শরীরেব প্রতি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার গর্ভধারিণী মিতা সান্যাল।

বিশ্বজয়ের আনন্দে সীমান্ত জোয়ারদারের উন্মত্ত পেষণে সেদিন নিজেকে পিষ্ট হতে দিয়ে আইভি দেখে চলেছিলেন তার গর্ভধারিণীর আঁচলটা মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। দরজাটাকে ভেজিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

[২৫]

মাসি সারাটা রাত তুমি বসেই কাটিয়ে দিলে? কুহকের ডাকে চমক ভেঙ্গেছিল অমিয়া দেবীর।

পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে জানালাটা খুলে দিয়েছিলেন। পুবের আকাশে রক্তিম আভা। সারা রাত ধরেই বৃষ্টি হয়েছে। ক্লান্ত মেঘ রণে ভঙ্গ দিয়ে সূর্যদেবের রথকে জায়গা করে দিয়েছে। জানালাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ভিজে হাওয়া অমিয়া দেবীর সারা দেহে আলিঙ্গনের শিহরণ তুলেছিল।

জানালা দিয়ে কৃষ্ণচূড়ার মাথার দিকে তার দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দূর থেকে মনে হচ্ছিল তার আবীর রাঙা চাদরে রাতের বৃষ্টির ফোঁটার উপর সপ্তবর্ণের ছটা যেন রক্তমঞ্জরীর উদ্যানের রূপ নিয়ে মাথা দুলিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছিল সূর্যদেব তার রামধনুর রথের চাকায় রাত্রির তমশাকে ছিন্নভিন্ন করে বসুন্ধরাকে আলোর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে দ্রুত বাহু বিস্তার করতে চাইছে। আকাশের নীল চাদবের দিকে তাকালে কে বিশ্বাস করবে কাল সারারাত এই দৃষ্টিনন্দন নীলিমা-ধূসর ওড়নায় নিজেকে ঢেকে রেখে পৃথিবীর বুকে ঢেলে চলেছিল নিরবচ্ছিন্ন বারি-ধারা?

সকালে দুধ দিতে এসে গোয়ালা জানিয়ে গেল কাল ট্যাঙ্গনের ওপারের বাঁধ ভেঙ্গেছে। প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জলের তোড়ে ভেসে গেছে বহু বাড়ি-ঘর, এপারের বাঁধের অবস্থাও ভাল নয়।

অজান্তেই দৃষ্টিটা চলে গিয়েছিল বিছানায় শুয়ে থাকা কুহকের দিকে। হাড়-সর্বস্ব কালো হাত দুটি বুকের উপর রেখে চোখ বুজে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে, না জেগে আছে, বোঝা যাচ্ছে না। যে কম্বলটা গায়ে দিয়ে দিয়েছিলেন তা সরে গেছে। বুকের হাড়গুলো তার চামড়াকে ভেদ করে ফুটে উঠেছে।

একটা গভীর নিশ্বাস অমিয়া দেবীর বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। ভেবে পাচ্ছিলেন না, এত অসীম সাহস আর মনের জোর এই শীর্ণ দেহপিঞ্জরের মধ্যে কিভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে, যার কাছে এই ট্যাঙ্গনের স্রোতও পরাভূত হয়ে ফিরে যায়।

খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অমিয়া দেবী। পরম মমতায় ওব গায়ের উপর চাদরটা টেনে দিয়েছিলেন। কপালে উড়ে আসা তেলবর্জিত রুক্ষ চুলেব গুচ্ছগুলি সরিয়ে দিলেন। কুহক ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে এনে ওর কপালে নিজের গালটা স্পর্শ করে জ্বরের উত্তাপ নিতে চেয়েছিলেন অমিয়া দেবী। তমালের ছোটো বেলাতেও এভাবে তার দেহের উত্তাপ নিতেন।

মাসি।

কুহকের ডাকে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

কুহক তার ডান হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, মাসী তোমার গালটা আরেকবার আমার কপালে রাখ।

অমিয়া দেবী দুহাতে কুহকের শীর্ণ দেহটাকে নিজের কাছে টেনে এনে সেদিন তার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনকেই তৃষিত শ্রবণ দিয়ে শোষণ করেছিলেন।

কুহকের মাথাটা বালিশের উপর ঠিক করে দিয়ে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোর শরীরটা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। নিভাদিকে পাঠাচ্ছি ডাক্তার ডেকে আনতে।

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথাটা তুলে কুহক বলেছিল, মাসি তুমি একটু আমার মাথার কাছে বস। তাহলেই দেখবে আমার জ্বর সেরে গেছে। তাছাড়া আমার কথা কাউকে জানিও না মাসি। সে রকম হলে বলে ওষুধ আনিয়ে দিও।

অমিয়া দেবী কুহকের হাত দুটো নিজের কোলে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, মা, মাসিকে এত ভালোবাসিস। মা, মাসিদের বুক খালি করতে কী ভাবে তাহলে বন্দুক হাতে নিস?

মাসি, কুহকের উজ্জ্বল চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, যারা মায়ের বুক থেকে ছেলে কেড়ে নেয় তাদের তোমরা দেখতে পাওনা। কারণ, তারাই যে এই সমাজের কর্তা। এরা ইন্দ্রজিতের মতন সামাজিক কৌলিন্যের আড়ালে থেকে হাজার হাজার মায়ের কোলকে প্রতিদিন শূন্য করে চলেছে। এদেশের অভুক্ত মা নিজের রক্ত বেচে রুগ্ন ছেলের

জন্য যে ওষুধ বা ইনজেকশন কিনে আনে তার মধ্যে থাকে ভেজাল। এতে যে কত মায়ের কোল শূন্য হয় তার কথা তো বল না।

এদেশে বেবী শো হয়। মায়েরা তাদের হরলিক্সমার্কা ছেলে মেয়েদের সাজিয়ে গুছিয়ে ডগ শোব মতন নিয়ে যায। আর সেটাকেই তোমরা আমাদের ভারতবর্ষ বলে ভাবতে ভালোবাস। অথচ এর আড়ালে যে ভারতবর্ষ তাকে তোমরা দেখতে পাওনা। সেই ভারতবর্ষে ফুটপাতে পড়ে থাকে মরা মায়ের বুকে মুখ গুঁজে হাড়-সর্বস্ব শিশুরা।

এদেশের অসংখ্য মায়েরা অভুক্ত সন্তানের মুখে এক দানা বার্লি দিতে সারাদিন অনাহারে থেকে কোনো নরপশুর ধারালো থাবার নীচে নিজের শরীরটাকে সঁপে দেয়, বাড়ি ফিরে এসে মরা ছেলের মুখের উপর কালো করে বসা মাছির চাদর সরায়। তোমরা কিন্তু তখন ভাব না এই মায়ের কোলশূন্য করার জন্য কে দায়ি?

বাঁধ-ভাঙ্গা জলের স্রোতের মতন কুহকের এই কথাগুলি অমিয়া দেবী নির্বাক হয়ে শুনে চলেছিলেন।

কুহক বলে চলেছিল, মাসি তুমি কিছু মনে কবো না। আমি এর জন্য তোমাকে দায়ি করছি না। আমি আসলে আমাদের সামাজিক বৈষম্যের কথাই বলতে চেয়েছিলাম। আমার মা-বাবার কথাই ধরনা কেন। তাদের প্রতিদিনকাব মদের খরচের টাকায় এদেশের বেশ কয়টি পরিবাবেব মাসেব খবচ মিটে যায। অথচ আমি জানি আমার বাবার রোজগারের এক বিশাল অংশই চোরাপথে আসে। বাবার চুল কেউ স্পর্শ করতে পারে না। কারণ এই টাকার একটা ভাগ চলে যায় যারা বাবার অসৎ উপায়কে ধরার জন্য আমাদের সেবকের দাবিদার হয়ে ক্ষমতাব মসনদে বসে আছে।

কুহকেব মাথায় হাত বুলিযে দিতে দিতে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, মা-বাবার উপর এত বাগ করতে নেই কুহক।

একটা ম্লান হাসি কুহকের ঠোটের কোণে ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, জান মাসী, বড্ড বেশি ভালোবাসতে চেয়েছিলাম মা-বাবাকে। তাব জন্যই বোধ হয় তাদের উপর আমার এত বাগ।

মা-বাবার উপর রাগ করতে নেই, অমিয়া দেবী বলেছিলেন।

কুহক বলেছিল, আমি মা-বাবাকে খুব কাছে পেতে চাইতাম। অথচ কাউকেই পেতাম না। আমাকে তাদের কাছেই যেতে দেওয়া হত না। গভীর রাতে তারা কখন বাড়ি ফিরতেন আমি টের পেতাম না। বিশাল ঘরে একা শুতে ভয় পেতাম। ভয়ে ঘুম হত না। বালিশে মুখ গুঁজে ঠক ঠক করে কাঁপতাম। মা, মা বলে কেঁদে উঠতাম। আমাব কান্নার স্বর তাদের কাবো কানে পৌঁছাত না। ভোরবেলা কাননদি আমাকে যখন স্কুলে যাবাব জন্য বাড়ির গাড়িতে তুলে দিতেন তখন দেখতাম গভীর রাত্রিতে ফেরা আমার বাবা-মা ঘুমে অচেতন।

নিভাদি এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসেছিল। অমিযা দেবী বলেছিলেন, এটা আগে খেয়ে নে। তারপর তোর কথা শুনব।

কুহক বাধ্য শিশুর মতন অমিয়া দেবীব হাত থেকে দুধের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে খালি গ্লাসটা তার হাতে দিয়ে বলেছিল, আমি আমার বাবার চরিত্রের যে দৃশ্য দেখেছি তা যে কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমি আমার বন্ধুর মাকে বাবার সাথে যে অবস্থায় দেখেছি তা শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা।

একটা অস্বস্তি বোধ অমিয়া দেবীর মনে বিচরণ করছিল। বলেছিলেন, এসব কথা থাক কুহক, বাবা-মার প্রতি এত রাগ পুষে রাখতে নেই।

টান-টান হয়ে বসেছিল কুহক। গায়ের উপর থেকে কম্বলটা এক ঝটকায় দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। কাল রাতে বৃষ্টির জলে স্নান করে এসেছিল। তমালের পাজামা, গেঞ্জি পরেছে। রোগা শরীরে সেগুলিকে বালিশের খোলের মতন মনে হচ্ছিল।

উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল কুহক। কামারের হাফরের মতন পাঁজরাগুলি ওঠানামা করছিল। বলেছিল মাসি, তোমাকে আগে খুঁজে পেলে আমি কোন পথে যেতাম জানি না। হয়তো পরিবারের সুখী হাওয়ায় স্বাস্থ্যবান হয়ে নিজের ভবিষ্যত গড়ার কারিগর হতাম। কিন্তু আমার বাবা-মাকে ধন্যবাদ, তারাই আমাকে এই সমাজের কদর্য রূপটাকে আমার শোবার ঘরে এনে দিয়েছে। তাই তো আমি একে ধ্বংস করার আগুনকে মনের ভিতর বইতে পারছি। আমি বুঝি আমার মধ্যে একটা কালো পাহাড়ি মনোভাব বাসা বেঁধেছে। সব কিছুকেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। যা কিছু বর্তমান তাকেই আমার অসহ্য বলে মনে হয়। তার মধ্যেই আমার বাবা-মার ছবিকে দেখতে পাই। শুনতে পাই তাদের নেশা জড়ানো উদ্দাম চীৎকার। দু-হাতে টিপে ধরতে চাই এই সমাজকে। ছিন্ন-ভিন্ন করতে চাই তোমাদের এই বুর্জোয়া সমাজের মূল্যবোধের মুখোশকে।

কুহকের কপালে ফুটে উঠেছিল স্বেদ-বিন্দু। কালো রোগা হাত দুটিকে মুষ্টিবদ্ধ করে সজোরে ছুঁড়ে দিয়েছিল বিছানার উপর।

অমিয়া দেবী কম্বলটা কুহকের কোমর পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছিলেন, তুই একটু ঘুমিয়ে নে, নিভাদি লুচি ভাজবে। জ্বরের মুখে দেখবি খুব ভালো লাগবে।

কুহক বলেছিল, মাসি, তোমাকে আর বেশি বিরক্ত করব না। জানি না এর পর আর তোমার সাথে দেখা হবে কিনা। খবরও হয়ত পাবে না, কোন জঙ্গলে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে পচে আছি।

অমিয়া দেবী কুহকের মাথাটা নিজের বুকের ভিতর টেনে এনে বলেছিলেন, ও কথা বলিস না তুই। তমাল থেকেও নেই, তোকে আমি হারাতে পারব না।

কেন মাসি? তমাল তো ভালো আছে।

এই ভালো আমি চাইনি। আমি তোদের এই রাজনীতিকে সমর্থন করি না কারণ এতে আবেগ আছে, সততা আছে, আছে দেশ গড়ার স্বপ্ন। নেই বাস্তব অবস্থার ছোঁওয়া। তবু তমাল যখন এ পথে এল আমি বাধা দিই নি। কিন্তু মাঝপথে নিজের সুখী ভবিষ্যত গড়তে এভাবে পালিয়ে যাওয়া যে অপমৃত্যুরই নামান্তর। এ যে সহকর্মীদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আমার তমাল তাই আমার কাছে হারিয়ে গেছে।

মাসি। মাথা নীচু করেছিল কুহক। বলেছিল, তমাল ঠিক কাজ করেনি। ও চলে যেতে চেয়েছিল, চলে যেতে পারত। অনেকেই চলে গেছে। আমরাও ভুল করেছি। যারাই মত পার্থক্য দেখিয়েছে তাদেরই শ্রেণী-শত্রু বলে ঘোষণা করেছি। জানো মাসি, যে ট্র্যাফিক কনেস্টবলটিকে আমি গুলি করেছিলাম সে আমাকে অন্ধ ভেবে রাস্তা পার হতে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। আর আমি সেই সুযোগে তাকে শ্রেণী-শত্রু বলে গুলি করেছিলাম।

এরজন্যই তো তোদের আমার ভালো লাগে না। কাকে মারলি তোরা? খোঁজ নিয়ে দেখ, ঐ কনস্টেবলকে হয়তো তার বিধবা মা লোকের বাড়িতে কাজ করে কোনো মতো মানুষ করেছে। শ্রেণীগতভাবে সে বঞ্চিত শ্রেণীরই অংশ।

কিন্তু মাসি, যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে তারা তো সবাই আসে সাধারণ পরিবার থেকে। সেখানে কোনো পক্ষের সৈনিকের সঙ্গে কারো কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তবু

তারা বিরোধী পক্ষের শক্তির প্রতীক। তাই একে অপরের বিরুদ্ধে গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা বোধ করে না। বরং তা করলেই হয় কাপুরুষতা। তোমাদের মহাভারতেও তো অর্জুনকে স্বজন নিধনে নামতে হয়েছিল।

তোর কথাগুলি অস্বীকার করি না। অমিয়া দেবী বলেছিলেন। তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। যখন যুদ্ধ হয় তখন উভয়পক্ষের সৈনিক পরস্পরকে ধ্বংস করার ঘোষণা করেই মুখোমুখি হয়। এখানে যে কনেস্টবলটি চাকরির তাগিদে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে এসেছে, সে তো তোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আসেনি।

কুহক বলেছিল, মাঝে মাঝে মনে হয় ভুল করছি। যে ট্র্যাফিক কনেস্টবলটিকে আমি গুলি করেছিলাম তাকে দেখতে দলের কাউকে না জানিয়েই শ্মশানে গিয়েছিলাম। ওর গ্রামের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। টালির ঘর। একদিকে হেলে পড়েছে। বাবাটা যক্ষার রোগী। ছোটো ছোটো দুটি ছেলেমেয়ে। বৌটা মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়েছিল। মনে মনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ কোন শ্রেণী শত্রুকে হত্যা করলাম?

কুহকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উত্তর খুঁজে পেলি?

না, মাসি। কুহক বলেছিল। উত্তর পাবার আগেই যে বাবা-মায়ের কথাগুলি মনে পড়ে গেল। তখনই যে মনে হত বেশ করেছি। এই কনেস্টবলটি আমার ক্ষতি করেনি বটে, কিন্তু এরাই তো আমার বাবা-মার সাম্রাজ্যের পাহারাদার।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আসলে তুই তোর মা-বাবাকে মন থেকে খুব ভালোবাসিস বলেই তাদের উপর এত রেগে আছিস।

কুহক হেসেছিল বলেছিল, মাব সাথে তার সন্তানের অন্ততপক্ষে দশমাস দশদিনের সম্পর্ক থাকে। আমাব সম্পর্ক কিন্তু তার থেকেও কম। আমি মার গর্ভে ছিলাম মাত্র আট মাস। লোকে হেসে বলত আমি নাকি মার গর্ভে থাকার সময় মদের সমুদ্রে সাঁতার কাটতাম। তাই মাতাল হবার জন্য আর তর সয় নি। মাতৃগর্ভ থেকে দুমাস আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। বাবার টাকার জোর আর ষাট বছরের কাননদির সেবার গুনে মার দুধ ছাড়াই বেঁচে রইলাম। লোকে ভেবেছিল আমি জলের পরিবর্তে মদ খেয়ে বেঁচে থাকব। মাতৃগর্ভেই এত মদ খেয়েছি বলেই হয়তো এর গন্ধটা আর আমার সহ্য হয়নি। পাড়ার এক মদের দোকানের লাইসেন্সের বিরোধিতা করতে গিয়েই এই রাজনীতির ঠিকানা পেয়েছিলাম।

মার কাছে তুই কেন নিজের থেকে যাস নি?

যেতাম মাসি। পরে বুঝতাম মার বুকেও আছে এক জ্বালা, সবার উপর তীব্র অভিমান। আর সেই অভিমানের প্রকাশ ঘটাত আমার উপর তীব্র ঘৃণার মাধ্যমে।

আমার একবার খুব জ্বর হয়েছিল। আমি একদিন রাত্রিবেলায় টের পেয়েছিলাম আমার মা ঠিক তোমার মতনই তার গাল দিয়ে আমার কপালের তাপ পরখ করছে। আমি জেগেও না জাগার ভান করে চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম। বাড়ির কাজের মেয়েটার সঙ্গে যে ছোট্ট কোলের বাচ্চাটা আসে সেও যেমন তার সহজাত অভিজ্ঞতার গুনে বুঝে যায় সে বাবুর বাড়িতে অবাঞ্ছিত, তেমনি আমিও বুঝে নিয়েছিলাম আমি আমার মার কাছে রবাহুত। তাই নিজের অজান্তেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। সে রাত্রির কথা যে এখনো আমাকে দোলা দেয়। সেই প্রথম মার স্পর্শ টের পেয়েছিলাম। এত আনন্দ, এত সুখ, যে এই স্পর্শের মধ্যে লুকিয়ে ছিল তা সেদিন আবিষ্কার করেছিলাম। পাছে এই সুখটুকু হারিয়ে ফেলি তাই সেদিন ঘুমের ভান করে মার স্পর্শটুকু চুরি করেছিলাম। মা উঠে যাবার সময় টের পেয়েছিলাম

তার তপ্ত চোখের জল আমার কপালে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি এনে দিয়েছে। আজ মনে হয় আমার মার মনেও মাতৃস্নেহের এক ফল্গুধারা হয়তো বয়ে চলেছে।

অমিয়া দেবী টের পেয়েছিলেন, তার চোখের পাতা দুটো ভিজে উঠেছে। পাছে ধরা পড়েন, সেই ভয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ দুটিকে মুছে নিয়ে বলেছিলেন, মার কোলে ফিরে যা কুহক। ওর মনের তীব্র ক্ষতের চিকিৎসা একমাত্র তুই করতে পারিস।

কিন্তু মাসি, ফিরে যেতে চাইলেও যে ফিরতে পারব না। আমাদের বাড়িটা যে এখন মিথ্যের হাট। কে আসে না আমাদের বাড়িতে? সংসদীয় মার্কসবাদী দলের প্রধান থেকে শুরু করে দক্ষিণপন্থী দলের কর্মকর্তা। মদের গ্লাসের টুনটুন মিষ্টি আওয়াজের সাথে সাথে চলে কত তাত্ত্বিক আলোচনা। আমার বাবা তো এখন চরিত্র সংশোধনী সভা থেকে শুরু করে ভ্রষ্টাচার মোচন সমিতির সভাপতি। মার্কসবাদী দল থেকে শুরু করে কংগ্রেস সব দলীয় তহবিলে তার অবাধ দান। তাই ফিরে গেলে আমার বাবা ও বাবাদের মতন সমাজপিতারা যা করবেন, তাই ভগবান কৃষ্ণের মতন লীলা বলে মেনে নিতে হবে।

নয়তো নাস্তিক অপবাদের মঞ্চে৷ আমাদের সমাজ বিরোধীর অভিযোগে তোমাদের এই সভ্য সমাজ থেকে নির্মূল হতে হবে।

তুই কি বলতে চাইছিস, বলতো? অমিয়া দেবী ঘুরে বসেছিলেন।

হেসে ফেলেছিল কুহক। বলেছিল, শান্ত হয়ে বসো মাসি। দেখ, কৃষ্ণ যখন মেয়েদের স্নানের ঘাটে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে স্নানের দৃশ্য দেখেন, তাদের কাপড় লুকিয়ে রাখেন, তখন তার মধ্যে তোমরা কোনো বিকৃত রুচির ছবি খুঁজে পাওনা। একে বল শ্রীকৃষ্ণের লীলা। কিন্তু কোনো ছেলে যদি সৎ উদ্দেশ্য নিয়েও কোনো মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চায় তবে তোমরা সেই ছেলেটাকে বলবে লম্পট। আমাদের বাবারা ভগবান কৃষ্ণ হয়ে আছেন। তাদের সবকিছুর পেছনেই আছে একটা লীলার আশ্রয়।

কুহকের স্বরে উত্তেজনা। বলেছিল, তাইতো আমরা সমাজের এই আগাছাদের নির্মূল করতে বন্দুককে বেছে নিয়েছি। কারণ এই আগাছাগুলিই যে সমাজের ফুলগাছগুলিকে ঢেকে রেখেছে।

কুহক বলে চলেছে, মাসি, তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ গোলাপ গাছে মাঝে মাঝেই জংলী ডাল বের হয়। তাদের ফনফনে পাতাগুলি দেখে যদি মায়া কর তবে দেখবে কিছুদিনের মধ্যে আসল গাছটাই জংলী ডালের দাপটে হারিয়ে গেছে। আমরাও তাই সমাজকে বাঁচাতেই সমাজের আগাছাদের নির্মূল করতে বেরিয়ে পড়েছি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কয়েকটা বন্দুক আর দেওয়ালে বিপ্লবের বুলি লিখেই তোরা এই বিপ্লব করবি ভেবেছিস?

কুহক জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি চীন বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছ মাসি?

পড়েছি, সেই সাথে সোভিয়েত বিপ্লবের ইতিহাসও।

মাসি, তুমি আবার সেই সংশোধনবাদীর নাম আনলে? কুহক উত্তেজিত।

তোরা সোভিয়েত ইউনিয়ানকে সইতে পারিস না কেন বলত?

সোভিয়েত ইউনিয়ানকে নয়, আমরা সইতে পারি না এর সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে।

অমিয়া দেবী মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন, যে দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাল সেই দেশের মানুষই সেই দেশের পার্টিকে বিচার করবে। তোরা এদেশে বসে তার এত সমালোচনা করছিস কেন?

কেন করব না? কুহক উঠে বসেছিল। ওরাই তো আমাদের দেশটাকে শোষণ করছে, ইন্দিরা গান্ধীর মতন বুর্জোয়া নেত্রীর শাসনকে সমর্থন করছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আচ্ছা, তোর কথাই ঠিক বলে মেনে নিলাম। কিন্তু আয়ুব খান কি শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি?

কুহক বলেছিল, না, তা হবে কেন?

অমিয়া দেবী হেসে বলেছিলেন, মাও-সে-তুং-এব কমিউনিস্ট পার্টি কেন আয়ুব খানকে সমর্থন করছে?

কুহক বলেছিল, কথাটা ভেবে দেখব। তবে বিপ্লবের প্রয়োজনে এটা একটা কৌশল হতে পারে।

কুহকের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আসলে সোভিয়েত ইউনিয়ান কি সেটাই তোরা জানিস না। ওটা জানা অনেক কষ্টকর ব্যাপাব।

তাব মানে?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, দাঁড়া বলছি। চীনকে জানতে দশ টাকা খরচ করলে চলে। জাপানকে জানতে আব কয়টি টাকা বেশি দরকাব হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বাদই দিলাম। হিপিরাই ওদের চিনিযে দেয়। সোভিযেত ইউনিয়নকে জানতে গেলে অনেক পড়তে হয়।

মাসি, তোমাব কথাগুলি একটু সহজ করে বল। কুহকের কথায় অসহিষ্ণুতার ছাপ।

অমিয়া দেবী হেসে বলেছিলেন, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আমি তো সব বুঝিয়েই বলতে চাইছি। চৌবঙ্গিব ফুটপাথে দশ টাকায় যে স্মাগলিং করা পেনটা কিনতে পারবি তার গায়ে লেখা আছে মেড ইন, চায়না। গোটা ত্রিশ টাকা দিলেই জাপানের তৈরি একটা ফোল্ডিং ছাতা কিনে এনে ঘবে আনা যায। কিন্তু আমি রাশিয়ার তৈরি এ ধরনের ভোগ্য জিনিস খুঁজে পাইনি। তাই রাশিয়াকে জানতে হলে যেতে হয় ভিলাই বা বোকারোতে। এত বড়ো ইস্পাত কাবখানা তো আর ফুটপাথে কেনা যায় না।

কুহক উঠতে গিয়েও শুয়ে পড়ে বলেছিল, মাসি, তুমি তাহলে রাশিয়াপন্থী?

না, অমিয়া দেবী বলেছিলেন। তবে এটা বুঝি, এ দেশটা না থাকলে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশই তার স্বাধীনতা হারাত। পৃথিবীতে আরো কয়েকটি নাগাসাকি ও হিরোসিমার জন্ম হত। হ্যানয় তেজস্ক্রিয় মৌলের ধাক্কায় ধুলোতে পরিণত হত। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে আমেরিকার আজ্ঞাবহ দেশে পরিণত হতে হতো।

উঠে বসেছিল কুহক। উত্তেজনায় ওর কপালের পাশের রগদুটি কাঁপছিল। বলেছিল, কিউবা থেকে শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ যেভাবে পালিয়ে এসেছিল তাকে তুমি বিশ্ববিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলতে চাও না।

হেসে বলেছিলেন অমিয়া দেবী, তোর তখন জন্ম হলেও তুই ছিলি একেবারে শিশু। সেদিনকার ঘটনার সাক্ষী আমরা। সারা পৃথিবী আবার আণবিক যুদ্ধের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল। গোয়াড় কেনেডি পৃথিবীকে আবার প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। তুই বিজ্ঞানের ছাত্র নোস তবু আণবিক যুদ্ধের কি পরিণতি ঘটতে পারে সেই সম্পর্কে আইনস্টাইনের সেই মারাত্মক সতর্কবার্তার কথাটা মনে করে দেখ। আইনস্টাইনকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটলে কি ফল হতে পারে? এই বিজ্ঞান তাপস জবাব দিয়েছিলেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটলে কী হবে তার বিবরণ না দিতে পারলেও চতুর্থ মহাযুদ্ধ কিভাবে ঘটবে তার বর্ণনা দিতে পারেন। ঐ যুদ্ধে মানুষ আবার পাথর দিয়ে লড়াই

করবে। কারণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটলে আণবিক শক্তির আঘাতে এই সভ্যতার সাক্ষী হতে একটি প্রাণীও বেঁচে থাকবে না। তাই ক্রুশ্চেভ যদি সেদিন বিশ্বমানবতার প্রতি এই শ্রদ্ধা না দেখাতেন তবে কিন্তু আমি বা তুই আজ এভাবে কথা বলাব জন্য বেঁচে থাকতাম না।

কিন্তু মাসি, কুহকের স্বরটা বেশ নরম হয়ে এসেছিল। বলেছিল, ইন্দিরা গান্ধীর মতন একটা ফ্যাসিস্ট সরকারকে সোভিয়েত ইউনিযন যেভাবে সমর্থন কবছে সেটাকে তুমি কিভাবে সমর্থন করবে?

অমিয়া দেবী কুহকের কাছে এগিয়ে বসেছিলেন। ওর কপালে উড়ে আসা চুলগুলিকে সরিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, তুই কি তর্ক করার জন্যই কথাগুলি বলছিস না ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিস?

—যদি বলি তর্ক করব?

—তবে এই ব্যাপারে তোর সাথে একটাও কথা বলব না। আর তুই কম্বলটা গাযে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকবি।

—না, মাসি, আমি জানতে চাই। তুমি বল।

প্রথম কথা অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোরা ফ্যাসিস্ট দেশের ইতিহাসটাই জানিস না। ফ্যাসিস্ট জার্মানীতে সেই দল ছাড়া আর কারো অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হয় নি। দল গঠন তো দূরের কথা, বাক্‌স্বাধীনতার কোনো চিহ্নই সেখানে ছিল না। আর এখানে বাষ্ট্রেব সর্বপ্রধানের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখানো চলে। ভোটেব মাধ্যমে তাকে পবাজিত কবা চলে। কমিউনিস্ট পার্টি রাজ্যের ক্ষমতা দখল কবতে পারে। আর সাহায্যের কথা বলছিস? এই ব্যাপাবে তো আমেরিকাই গলা ফাটিযে চলেছে। তোরা আবার তাদের সাথে গলা মেলাতে চাইছিস কেন?

—তার মানে? কুহক আবার উত্তেজিত হয়।

অমিয়া দেবী হেসে বলেছিলেন, তুই কিন্তু তর্ক করবি না বলেছিলি।

কুহক বলেছিল, তুমি যে আমাকে কথার প্যাঁচে আমেরিকার তাঁবেদার বানিয়ে দিতে চাইছ।

কিছুতেই নয়। অমিয়া দেবীর মুখে একই হাসি। বলেছিলেন, ভেবে দেখ, তোরাও মার্কিন প্রশাসনকে কতখানি ঘৃণা করিস। অথচ পি. এল. ৪৮০-র গমের ফাঁস থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ভারতকে মুক্ত করে বাষ্ট্রীয় কৃষিখামার গড়ে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তবে তোরা কেন আপত্তি করবি? ভারতেব মত অনুন্নত দেশ যদি ইস্পাতের মতো বুনিযাদী শিল্প গড়ার মাধ্যমে আমেরিকার উপর তাব নির্ভরশীলতাকে কমাতে পারে তবে তোরা কেন বিরোধীতা করবি?

কুহক চুপ করে শুনে চলেছিল। অমিয়া দেবী বিছানার পাশের জানালাটা খুলে দিযে পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছিলেন। এক ঝলক রোদের ছটায় বিছানাটা হেসে উঠেছিল। নিভাদিকে লুচিগুলি ভাজতে বলে আবার কুহকের বিছানার পাশে বসেছিলেন।

আরো একটা কথা তোদের ভাবা দরকার। কুহকের কপালের তাপটা গালের স্পর্শে অনুভব করার ফাঁকেই বলেছিলেন, অমিয়া দেবী। ভারতবর্ষের একটা নির্বাচিত সরকারকে সাহায্য করার জন্য তোরা সোভিয়েত কমিউনিস্টদের এত গালাগালি করিস, অথচ বছরের পর বছর সামরিক শাসনে লাঞ্ছিত পাকিস্থান সামরিক সরকারের সাথে তোদের চেয়ারম্যানের এই বন্ধুত্বকে তোরা কী ভাবে মেনে নিস?

ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, মাসি, কুহক একটা সঙ্কোচ নিয়ে বলেছিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এ নিয়ে তোর সাথে পরে কথা বলা যাবে। এখন মুখটা ধুয়ে আয়। ভালো লাগবে। নিভাদিকে লুচি ভাজতে বলেছি। জ্বরের মুখে একটু ভালো লাগতে পারে।

ঠিক আছে মাসি। তুমি কি তোমাদের স্কুলের চিত্তবাবুর কাছে একটা খবর দিতে পার যে আমি তোমার এখানে আছি।

চিত্তবাবু! বিস্ময়ে হোঁচট খেয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

হ্যাঁ, মাসি। উনি আমাদেব দলেব গোপন সদস্য।

চিত্ত সেন স্কুলের করণিক। বিনয়ী, নির্বিবাদী ভদ্রলোক বলেই পরিচিত। কোনো দিন রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন বলে শোনেন নি। তিনি নক্সাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভাবতেই অবাক হয়েছিলেন।

নিভাদিকে দিযে খববটা পাঠিয়েছিলেন। সেই সাথে বলে পাঠিয়েছিলেন ডাক্তারকে বলে যেন জ্বরের ওষুধ পাঠিয়ে দেন।

সন্ধ্যাবেলাতেই তিনি খবর এনেছিলেন, পুলিশি এ অঞ্চলে চিরুনি তল্লাসি চালাবে। কুহক যেন এক্ষুনি এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়।

গায়ে তীব্র জ্বরের উত্তাপ নিয়েই কুহক সে রাত্রেই বেরিয়ে পড়েছিল। অমিয়া দেবী বাধা দিয়েছিলেন।

এত জ্বব নিযে তুই কোথায় যাবি?

ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠেছিল কুহকের মুখে। বলেছিল, চিত্তদার খবর সত্যি হয়। পালাতে আমাকে হবে মাসী। জ্বরেব জন্য নয়, মনের সাথেও যে দ্বন্দ্ব চলছিল তা তোমার সাথে কথা বলে আরো অনেক বেড়ে গেছে। পার্টির নেতাদের সাথে কথা বলব। যদি ধরা না পড়ি, তবে তোমার কাছেই আমি আসব। সত্যি বলছি, মাসি, মন ও শরীর কেন জানি বিশ্রাম চাইছে। তোমার বাড়িতে ধরা পড়লে প্রাণে হয়তো বেঁচে যাব কিন্তু পুলিস তোমাকে নিয়েও টানাটানি করবে।

যাবার সময় নিজের দামি কাশ্মীরি শালটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, সাবধানে যাস। আর এবার এলে নতুন করে ভাবিস।

তোমার কাছেই আসব মাসি। বলে কুহক অমিয়া দেবীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিল, জীবনে এই প্রথম কাউকে প্রণাম করলাম মাসি।

অমিয়া দেবী কুহককে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে ওর জ্বরতপ্ত কপালে গালটা চেপে ধবে শরীরেব উত্তাপটুকু শুষে নিতে চাইছিলেন।

কুহক নিজেকে ধীরে ধীরে অমিয়া দেবীর বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, এবার আসি। পরেব বার যখন আসব তখন তোমাকে মা বলে ডাকতে দিও।

মিশমিশে অন্ধকারে ওর শরীরটা মিলিয়ে গেলেও সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন অমিয়া দেবী।

দিন তিনেক পরে চিত্তবাবুই খবরটা এনেছিলেন।

থেঁতলে যাওয়া বিকৃত মুখটা দেখে কুহককে চেনার উপায় ছিল না। ছোট্ট রোগা দেহটাকে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েও ওরা ক্ষান্ত হয় নি। কি এক পৈশাচিক প্রতিহিংসায় কালো শীর্ণ মুখটার কোনো অংশকে অক্ষত রাখে নি।

সেদিন রাতে তার দেওয়া চাদরটা বুলেটের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়াতে সেটা আর কেউ নেয়নি। ওটা কুহকের গায়েই জড়ানো ছিল। মর্গের বারান্দায় পড়ে থাকা লাশের উপর এই চাদরটা দেখেই অমিয়া দেবী কুহককে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

অসময়ে এভাবে শুয়ে আছিস? প্রিয়তোষ বাবুর ডাকে উঠে বসেছিলেন অমিয়া দেবী।

প্রিয়তোষ বাবু অমিয়া দেবীর কপালে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোর জ্বর-টর হয়নি তো?

একটা সঙ্কোচ আর লজ্জা অমিয়া দেবীকে ঘিরে ধরেছিল। বাবা চাকরি থেকে অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। তার সৌম্য চেহারায় বার্দ্ধক্যের ছাপ। তাকে যে কোনো কারণে চিন্তায় ফেলা, একটা অপরাধবোধ মনকে পীড়িত করে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, বাবা, তুমি কেন সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলে?

বৌমা বলল, তোকে দুবার ডেকে গেছে। তুই সাড়া দিস নি। এবকম সময়ে তো তোকে কেউ ঘুমোতে দেখেনি। ঘরের লাইটটাও জ্বালাস নি। মাথা ব্যথা করছে না তো?

অমিয়া দেবী এতক্ষণ লক্ষ করেন নি, সারা ঘবে অন্ধকাব নেমে এসেছে। অথচ তিনি যে ঘুমিয়ে পড়েছেন সে কথা মনে পড়ছে না।

বেড সুইচটা অন কবে বলেছিলেন, বাবা, তুমি বসবে না?

হ্যাঁ, বসছিরে। বিছানার উপরে পা ঝুলিয়ে বসে বলেছিলেন প্রিয়তোষ বাবু।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, শরীব ভালো আছে বাবা। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—তোব একটা চিঠি আছে।

—আমাব চিঠি? অবাকই হয়েছিলেন অমিয়া দেবী। কলকাতাব বাড়ির ঠিকানায তাকে এখন কেউ চিঠি দেয় না।

আমার কাছেই লিখেছে তমাল। তবে তোকে জানাতে বলেছে। প্রিয়তোষ বাবু কিছুটা কুণ্ঠার সাথেই কথাগুলি বলেছিলেন।

অমিয়া দেবী কিছুক্ষণ একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিযে ছিলেন। তাবপরই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোথায সেই চিঠি? কোথা থেকে লিখেছে? কী লিখেছে?

দাঁড়া, তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? প্রিয়তোষবাবু শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন। তুই তো এতদিন ধরেই নিয়েছিলি ওর কিছু ঘটে গেছে। তমাল শুধু ভালো নেই, ও ওয়াশিংটনে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে ভালো অফার পেয়ে কালকেই দিল্লি থেকে রওনা দিয়েছে, তোকে চিঠি দেয়নি, বা জানায় নি। তোব এখানে নাকি তমালের নক্সাল বন্ধুদের যাতায়াত আছে। ওব ওয়াশিংটন যাবাব খববটা ওদের কানে পৌছে গেলে ওরা বাধা দিতে পারে বলে ওর ভয় ছিল। তবে ওখানে পৌছে গিয়েই তোকে চিঠি দেবে বলে জানিয়েছে।

অমিয়া দেবী এতক্ষণ বাবাব কথাগুলি গোগ্রাসে গিলে চলেছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না।

প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, কী রে খুকি, তুই কোনো কথা বলছিস না কেন?

অমিয়া দেবী ফিরে এসেছিলেন নিজের মধ্যে। বলেছিলেন,

বাবা, তমালের এই ওয়াশিংটন যাত্রার পিছনে বড়দার হাত আছে, তাই না?

তমাল তো বড়োখোকার ওখানেই উঠেছিল। প্রিয়তোষ বাবু গলার স্বরটা একটু নামিয়ে এনেছিলেন। ছোটো খোকাই ওকে দিল্লি যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ছোটো খোকা তোকে কোনো কিছু জানাতে বারণ করেছিল। তুই তো ছোটোবেলা থেকেই জেদি। নীতির সাথে আপোস করতে শিখিস নি। পরে শুনেছিলাম তমাল ওদের কাছে ওদের দলের অনেক গোপন খবর পৌছে দিয়েছে। ধরা পড়েছে শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতা। তমালের এই ব্যাপারটা আমার

ভালো লাগেনি। তবে দলের নেতারা তমালের এই কাজকে যে মেনে নেবে না এটা জানা কথা। ছোটো খোকা নিজেই স্বরাষ্ট্র সচিব। সেই আমাকে বলেছে নক্সাল আন্দোলন ভেঙে পড়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ছন্ন-ছাড়া হয়ে যাবে। দলের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। তমাল বাইরে চলে গেলে কিছুদিনের মধ্যে সব ভুলে যাবে।

অমিযা দেবী বাবাব ঘাড়ে মাথাটা রেখে বলেছিলেন, তমাল আর কিছু জানিয়েছে? কোনো মেয়ের সম্পর্কে কিছু জানিয়েছে? বসুন্ধরার কথা।

হ্যাঁ, আমাদেব সবার জন্য যে সুখবরটা জানিযেছে তা তোকে সবার শেযে দেব বলে রেখে দিয়েছি রে।

সুখবর? কি সুখবর বাবা? অমিয়া দেবী প্রিয়তোষ বাবুর ঘাড় দুটো ধরে তার মুখের উপর ঝুঁকে বসেছিলেন।

দাঁড়া মেযে দাঁড়া। ছেলের সুখবব জানার জন্য কি ব্যস্ত দেখ। হেসেছিলেন প্রিয়তোষ বাবু।

—বাবা বল।

—বলছি। তুই শাশুড়ি হয়ে গেছিস। ছেলেব বৌকেও তুই দেখেছিস বলে বড়ো খোকা জানিয়েছে।

তুমি বসুন্ধরাব কথা বলছ বাবা? অমিয়া দেবীর আঙ্গুলগুলি উত্তেজনায় প্রিয়তোষ বাবুর দুটি ঘাড়ে চেপে বসেছিল।

বসুন্ধরা! প্রিযতোষ বাবুব মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিযে এসেছিল।

—হ্যাঁ বাবা, আমি বসুন্ধরার কথা বলছি বাবা। ওব সাথেই তো ওব বিযে হবে বাবা।

কিন্তু মা, আমি তো এসব কিছু জানি না। প্রিযতোষ বাবু বলেছিলেন, বড়ো খোকা জানিযেছে ওযাশিংটন যাবাব আগে পররাষ্ট্র দপ্তরের সিনিয়ার আই. এফ. এস. মিঃ গুপ্তের মেযের সাথে ওর রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেছে। আর ওরা দুজনেই ওয়াশিংটনে গেছে।

কিন্তু বাবা, এ বিয়ে হতে পারে না। আমি এ বিয়ে মেনে নিতে পাবব না। এ তো চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ওর দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। বসুন্ধরার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। অমিযা দেবী প্রিয়তোষ বাবুর কাঁধে মাথা রেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন।

প্রিযতোষ বাবু অমিয়া দেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, ছিঃ মা, তোর মতন মেয়ের এ কথা বলা সাজে না। ছেলে সাবালক হয়েছে। ওর সিদ্ধান্ত ও নেবে। তুই তো এমন গোঁড়া কোনো দিনই ছিলিস না।

—বাবা।

অমিয়া দেবীকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, মেযে বাঙালি। ওর এক কাকা আই. পি. এস.। দাদা ওয়াশিংটনের বিখ্যাত ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। ওরাই তমালে বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তোর পুত্রবধুও ম্যানেজমেন্টের ছাত্রী। দুজনেই একসাথে থাকবে। তমাল লিখেছে, তোকেও নিয়ে যেতে চায়। তুই এ বিয়েতে আপত্তি করছিস কেন?

কথার তোড়ে প্রিয়তোষ বাবু লক্ষ করেন নি অমিয়া দেবী তার মুখের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মুখ রক্তশূন্য। মনে হচ্ছে কে যেন ব্লটিং পেপারের সাহায্যে তার মুখের সমস্ত রক্ত শুযে নিয়েছে।

নিজের মেয়েকে এই প্রথম দেখলেন পরাজিত সৈনিকের অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে

থাকতে। অথচ তার জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখেও সে থেকেছে অবিচল। বরং তাকেই সান্ত্বনা দিয়েছেন।

তমালের এই খবরে প্রিয়তোষ বাবু নিজেও যে প্রথমে একটা মানসিক হোঁচট খান নি তা নয়, নিজে কোনো দিন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি বরাবরই একটা দুর্বলতা অনুভব করেছেন। মার্কসবাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে বুকের ভিতর বহন করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদীদের সংকীর্ণতাকে সহ্য করতে পারেন নি। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে দমিয়ে রাখার মার্কসবাদী প্রচেষ্টাকে বর্বর ভাবনা বলেই মনে করেছেন। একটা সময়ে মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে কলেজে শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয় ভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙার পর মার্কসবাদীদের মধ্যে যে অসহিষ্ণুতা ও গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের কদর্য বহিঃপ্রকাশ দেখেছেন, তা তার অনেক বিশ্বাসকেই সন্দেহের আবর্তে ঠেলে দিয়েছে। মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের অবরোধ ভাঙার খবর নিতে নিতে কখন যে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন টের পান নি। কিন্তু স্তালিনের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব তাকে ব্যথিত করেছে। নেতাজীকে কমিউনিস্টরা জাপানের কুকুর বলে চিত্রায়িত করলে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন। তবে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আধুনিকতার মানদন্ডে জহরলালকে নেতাজীর উপরে জায়গা দিয়েছেন।

মিষ্টভাষী ও চিন্তার গভীরতার জন্য প্রিয়তোষ বাবু তার সহকর্মীদের কাছে শ্রদ্ধাই পেয়ে এসেছেন। তার বিভিন্ন রচনার মনোযোগী পাঠকের সংখ্যাও কম নয়।

পার্টি ভাঙার পর দলের অনেক প্রথম সারির নেতা যার যার অংশে টানার চেষ্টা করেছিলেন। ওদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। বোঝার চেষ্টা করেছেন। ইনারপার্টি স্ট্রাগলের কথা বললেও দলটাকে কেন ভাগ করতে হল তা জানার চেষ্টা করেছেন। গভীর রাত পর্যন্ত মার্কস-লেনিনের রচনাগুলি পড়ে দেখেছেন। সমর্থন পান নি দল ভাঙ্গার বিষয়গুলিতে।

ময়দানে বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের জমায়েত দেখেছেন। চৌ-এন-লাই-নেহরুর ঐতিহাসিক জমায়েতের সাক্ষী হয়ে হিন্দি-চীনি ভাই ভাই ধ্বনিতে সুর মিলিয়েছেন। তারপরেই সীমান্তের এপারে চীনের সেনাবাহিনীকে মেনে নিতে পারেন নি। প্রশ্ন করেছেন, হিমালয়ের বরফে ঢাকা জনমনুষ্যহীন এক খন্ড মাটির জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে ভারত-চীনের জনগণের এই ঐতিহাসিক মিলন সেতুকে ধ্বংস করতে পারল? নিজেকে তাই গুটিয়ে নিয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

যে সহকর্মী ও দলীয় নেতারা দুদিন আগেও তাকে দলে টানার জন্য ঘন ঘন আসতেন তাদের কাছে তিনি রাতারাতি পুলিসের চর হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ সারাজীবন তিনি কেন জানি পুলিসের পোষাকটিকে মনে-প্রাণে অপছন্দ করে এসেছেন। যদিও তিনি জানতেন এ পোশাকের আড়ালে আছে তারই মতন একজন মানুষ। আজ তো তারই ছোটো ছেলে আই. এ. এস. হয়েও স্বরাষ্ট্র দপ্তরকেই সামলাচ্ছে।

তমাল তার নাতি। ওকে নিজের কাছেই রাখতে চেয়েছিলেন, মেয়ে রাখে নি। হোস্টেলে রেখে পড়িয়েছে। তমাল যখন আবার শোধনবাদী আবিষ্কার-কর্তাদের মধ্যে নয়া শোধনবাদীদের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন খুব একটা বিচলিত বোধ করেন নি। ভেবেছেন এটাই ইতিহাসের নিয়ম। একটা ভুল আরেকটা ভুলের জন্ম দেয়।

তমাল শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনে গিয়েই নিজের নিরাপত্তাকে খুঁজে নেবে এটা ভেবে মানসিক

দিক থেকে হোঁচট খেয়েছিলেন। তবে এক মাত্র মেয়ের জীবনে এত বড়ো বিপর্যয়ের পর একমাত্র অবলম্বন তার এই সন্তানের নিরাপদ আশ্রয়ের খবরটাকেই বড়ো ঘটনা বলে মনে করেছিলেন, ভেবেছিলেন, তমালের নিরাপত্তার ভাবনাতেই ওর মা এত অস্থিরতায় ভুগছে। তাই ছোটো ছেলে যখন জানিয়েছিল, তমালকে তারা ধরেছে, কিন্তু সরকারীভাবে ওর নামটা, রেকর্ড করেনি তবে তার বিনিময়ে ওদের দলে অনেক নেতাদের গোপন আস্থানার খবর পেয়েছেন তখন নৈতিকতার প্রশ্নে বিবেকের দংশন অনুভব করলেও একটা স্বস্তি পেয়েছিলেন, তমালের কোনো ক্ষতি হয়নি।

অমিয়া দেবীর পিঠে পরম স্নেহে হাতটা রেখেছিলেন। বলেছিলেন, সন্তানের ভালো থাকাটাই তো মায়ের কামনা। বসুন্ধরা খুবই ভালো মেয়ে। আমারও ওকে খুব পছন্দ। বড়ো খোকা, ছোটো খোকা দুজনেই ওর খুব প্রশংসা করে। কিন্তু তমাল যদি অন্য সিদ্ধান্ত নেয় আমাদের তো তা মেনেই নিতে হবে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, বাবা, তুমি ওর যাবার খবরটা যখন জানতে তখন ওর যাওয়ার দুদিন আগে কেন আমাকে খবরটা দিলে না? আমার যে ওর সাথে দেখা করার ভীষণ দরকার ছিল।

প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, আমি তোকে সব জানাতে চেয়েছিলাম খুকি। কিন্তু ছোটো খোকাই আপত্তি করেছিল। ও বলেছিল তোর এখানে নাকি নক্সাল ছেলেরা যাতায়াত করে। খবরটা যদি কোনোভাবে জানাজানি হয়ে যায় তবে তমালের বিপদ হতে পারে।

প্রিয়তোষ বাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, চিঠিটাই আনতে ভুলে গেছি। চল নীচে যাই। চিঠিটা আমার ঘরেই রেখে এসেছি।

অমিয়া দেবীও বিছানা থেকে নেমে পড়েছিলেন। তার নিত্যসঙ্গি শান্তিনিকেতনী চামড়ার ঝোলা ব্যাগটা কাঁধে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ওর চিঠি আমার দরকার নেই বাবা। আমাকে এক্ষুনি বের হতে হবে।

তুই এসময়ে কোথায় যাবি? প্রিয়তোষ বাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

পায়ে চটিটা গলাতে গলাতে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, পরে বলব বাবা, চেষ্টা করে দেখি একজনকে এখনো আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।

প্রিয়তোষ বাবু ভয় পেয়েছিলেন। অমিয়া দেবীর পেছনে পেছনে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, তোর কোনো কথাই বঝতে পারছি না খুকি। তুই কার আত্মহত্যার কথা বলছিস? একটু দাঁড়া, আমিও তোর সাথে যাব।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোমার গিয়ে কিছু লাভ হবে না বাবা। তোমার যাওয়ার দরকারও নেই। এ আত্মহত্যা শুধু যদি কোনো মানুষের আত্মহনন হতো তবে তোমাদের সবাইকে নিয়ে ছুটে যেতাম। কিন্তু বাবা, এ হত্যা যে একটা সরল পবিত্র বিশ্বাসকে গলা টিপে হত্যা করা।

প্রিয়তোষ বাবুকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন অমিয়া দেবী। মাথার ভিতর তপ্ত শলাকা-বিদ্ধের মতন যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুলেছিল।

ট্যাক্সিটা রাস্তায় বেরোতেই পেয়ে গিয়েছিলেন। এসময় তো বসুন্ধরার নার্সিং হোমেই থাকার কথা। কিন্তু কিছুদূর যেতেই মিছিলে রাস্তা-জ্যাম। সামনে পেছনে কোনো দিকেই যাবার উপায় নেই। ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেও কোনো লাভ নেই। ট্রাম, বাস সবই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিছিলের ল্যাজ নাকি এখনো এক কিলোমিটার দূরে। অগত্যা সিটের পিছনে মাথাটাকে এলিয়ে দিয়ে সেই ঘটনাগুলির ভিড়ে নিজেকে সঁপে দিলেন।

তমাল ভালো আছে। ওয়াশিংটনে উড়ে গেছে। বিয়ে করেছে। কোনোটাই মেনে নিতে পারছে না অমিয়া দেবী। যেদিন খবর পেয়েছিলেন বারাসতের জাতীয় সড়কের ধারে সারি সারি যুবকের মৃত দেহগুলি পড়েছিল, ওরা নাকি সব নক্সাল, পুলিসের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে নিহত হয়েছে সেদিন ছুটে এসেছিলেন। মর্গে সারি দিয়ে সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহগুলি পড়েছিল। চিত্তবাবুই খবর দিয়েছিলেন, কুহক এদের মধ্যে আছে। সেদিন তো শুধু কুহকের কথা ভেবেই তিনি এভাবে ছুটে আসেন নি। শুনেছিলেন, তমাল নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু তিনি তখনো জানতেন না তমাল কোথায় আছে।

মর্গে সাদা কাপড় তুলে যখন একটি একটি করে মুখ দেখছিলেন তখন কুহকের চেয়েও আরেকটি মুখের ভাবনাই তাকে অবশ করে দিতে চাইছিল। এতদিন নাস্তিক থেকেও সেদিন মনে মনে ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন, এই দলা পাকানো মাংসপিণ্ডগুলির মধ্যে যেন তমালের মুখকে দেখতে না হয়। সে সময় তো কুহকের কথা মনে হয়নি।

মিসেস মিত্র।

চমকে ঘুরে তাকিয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

তার পিছনেই এক পুলিস অফিসার, ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি। এই বিভৎস মৃত্যুর মিছিলের সামনেও মানুষ হাসতে পারে দেখে অবাকই হয়েছিলেন। পরে জেনেছিলেন এই পুলিস কর্তাটি গোয়েন্দা বিভাগের এক বড় কর্মকর্তা। নক্সাল নিধন নামে মানুষ খুন করাই নাকি তার নেশা।

পুলিস অফিসারটি অমিয়া দেবীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলেন। তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই বলেছিলেন, আপনি যাকে খুঁজছেন সে এখানে নেই। তার জন্য আপনার কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু আপনার খুব পরিচিত এক জন এখানে আছে। তার জন্য আমরা দুঃখিত। ওকেও আপনার ছেলের মতন আমরা সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু ও নিতে চায় নি।

কী বলতে চাইছেন? অমিয়া দেবী নিজেকে আড়াল করতে চাইছিলেন।

হেসেছিলেন পুলিস অফিসারটি। সেই বিদ্রূপের হাসি। বলেছিলেন, মিসেস মিত্র, আমরা জানতাম কুহক আপনার বাড়িতেই আছে। ওখানেই ওকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পারতাম। কিন্তু তাতে আপনারও কিছু অসুবিধা হতো। অবশ্য এতে আমাদেরও অনেক উপকার হয়েছে।

উপকার? অমিয়া দেবী অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

—কেন? এদের দেখেও বুঝতে পারছেন না?

—না।

—আপনার মতন বুদ্ধিমতী মহিলার কাছ থেকে এরকম উত্তর আশা করিনি।

পুলিস অফিসারটি একটানে বাঁদিক থেকে একেবারে শেষের দেহটার উপর থেকে কাপড়ের ঢাকনাটাকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দেখুন একে চিনতে পারেন কিনা। এর জন্যই তো আমরা এতগুলো নক্সাল শিকার করতে পারলাম।

কুহক। সেই কালো রোগা দেহ। মুখের একটা দিক একেবারে থেঁতলে গেছে। বাঁদিকের চোখটা নেই। অন্য চোখটা বোজা।

কুহক বলেছিল, সে তার কাছে ফিরে আসবে। আবার তার ভাবনাগুলিকে যাচাই করে দেখবে। এরা তাকে সে সুযোগ দিল না।

দুহাতে মুখটা ঢেকে কুহকের পাশে বসে পড়েছিলেন অমিয়া দেবী। পুলিস অফিসারটি একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ওকে এভাবে না মেরে আমার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করলেন না কেন? অফিসার বলেছিলেন, তাহলে যে আপনাকেও থানায় আনতে হতো।

অমিয়া দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমার উপর আপনাদের মহানুভবতার কারণটা বলবেন? অর্চনা গুহর জন্য তো আপনাদের এই মহানুভবতা দেখা যায় নি।

অফিসার বলেছিলেন, আপনি আমাদের উপর শুধু রাগ করছেন, মিসেস মিত্র। আমরা চাকরি করি। ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করাই আমাদের কাজ।

আমার উপর এই করুণা দেখানোর জন্যও কি ওপর থেকে নির্দেশ ছিল? অমিয়া দেবীর মুখে একটা বিদ্রূপের রেখা ফুটে উঠেছিল।

—আমাদের মুখ খোলা বারণ। আমাদের উপর সে রকমই নির্দেশ আছে।

—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। পুলিশি ভাষায় কথা না বলে মানুষের ভাষায় কথা বলতে অসুবিধা কোথায়?

কুহকের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই অমিয়া দেবীর মুখমন্ডল শক্ত হয়ে উঠেছিল। অফিসারটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, পুলিস হলে অবশ্য আপনারা মানুষ থাকেন না। ভুলে যান আপনারাও জন্মেছেন মানবীর গর্ভে মনে করতে পারেন না, আপনার স্ত্রী আছে, সে তার গর্ভে আপনার সন্তানকে ধারণ করে। আপনার সন্তানও যে আপনাকে বাবা বলে ডাকে, সে কথা আপনারা ভুলে যান। তাই এভাবে এই ছেলেগুলিকে আপনারা খুন করে পৈশাচিক হাসি হাসতে পারেন।

ম্যাডাম, আমি বোধ হয় আপনার সাথে অনেকটা বেশি কথাই বলে ফেলেছি। পুলিস অফিসার গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন। একটু চুপ করে থেকে চাপা স্বরে বলেছিলেন, তমালকে আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি।

অমিয়া দেবীকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই পুলিস অফিসারটি দ্রুত পায়ে চলে গিয়েছিলেন।

অমিয়া দেবী একটা শূন্য দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণ যার এই বিভৎস পরিণতির আশঙ্কায় নিজেকে এক অস্থির যন্ত্রণার মোড়কে বেঁধে রেখেছিলেন সেই আশঙ্কার বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েও বুকের উপর চেপে বসে থাকা পাথরটিকে সরাতে পারছেন কই?

কুহকের বিকৃত দেহটাকে দেখে এতক্ষণ মনের ভিতর একটা তীব্র আক্রোশ কামানের গোলার মতন বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু কাল বৈশাখীর দমকা হাওয়ার পর যেমন আকাশ ভেঙ্গে নেমে আসে বৃষ্টির প্রবল ধারা, অমিয়া দেবীর সারা শরীর কাঁপিয়ে তেমনি নেমে এসেছিল দুচোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারা।

তারই দেওয়া কাশ্মীরি শালটি কুহকের গায়ে চাপ-বাঁধা রক্তে লেপ্টে আছে। কুহকের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ওর থ্যাঁতলানো মাথাটাতে হাত রেখেছিলেন অমিয়া দেবী।

কুহকের মৃতদেহের পাশে বসে তমালের খবরটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তমাল ভালো আছে কথাটা যেন তপ্ত সীসার মতন তার কানে বারবার আঘাত করে চলেছিল। অথচ কিছুক্ষণ আগেই গভীর আশঙ্কা নিয়ে মৃতদেহগুলির মুখের আবরণ তুলে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন যে এদের মধ্যে তমাল নেই। একমাত্র কুহকের দেহ ছাড়া আর কাউকে তিনি চিনতে পারেন নি। ওদের মুখের ঢাকনাগুলি সরাতে তার হাত অবস হয়ে যাচ্ছিল, পাছে তমালের মুখটা বেরিয়ে পড়ে। কারো মুখ দেখেই চেনার উপায় ছিল না। সারা হাতে-মুখে সিগারেটের ছ্যাঁকার চিহ্ন। কোনো ভারী কিছু দিয়ে ওদের মুখগুলিকে প্রায় মাংসপিণ্ডে পরিণত করে রাখা হয়েছে। অথচ পুলিসের ভাষ্য ওরা নাকি পুলিসকে আক্রমণ করতে এসেছিল। পুলিস আত্মরক্ষায় গুলি চালাতে বাধ্য হলে এদের মৃত্যু ঘটেছে।

তিনি মা। সন্তানের দেহের প্রতিটি অংশই তার চেনা। তমালকে এক পলকেই চিনতে পারতেন। তমালেব বা হাতের কনুইয়ের কাছে একটা লাল জড়ুল জন্মসূত্রেই আঁকা ছিল। আশঙ্কা কম্পিত-দৃষ্টিতে মৃতদেহগুলির হাতে সেই চিহ্নটাকেই তো খোঁজ করতে চেয়েছিলেন। দুর্বল মনের কোণায় জীবনে বোধ হয় সেই প্রথম বার ভগবানের উপর তার আস্থাকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। নিজের সন্তানের এই করুণ পরিণতি যাতে না হয় তার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

'তমাল ভাল আছে'—এই বার্তাটা তাহলে কেন সেই বহুবাঞ্ছিত স্বস্তিকে এনে দিতে পারছিল না? তিনি তো মা। তমাল তার নাড়ি-কাটা অমৃত ফসল। তবু কেন 'তমাল ভালো আছে' শব্দগুলি তাকে স্বস্তির পরিবর্তে এক অস্থির যন্ত্রণার আবর্তে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল? নিজের মনকেই প্রশ্ন করেছিলেন অমিয়া দেবী। তবে তিনিও কি তমালের মৃত্যু কামনা করে বীরমাতাব খেতাব পেতে চেয়েছিলেন?

কুহকের চেহারাটা বার বার তার কাছে জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে উপস্থিত হচ্ছিল। চিন্তার দৈন্যতা থাকতে পারে, মতাদর্শের মধ্যে চূড়ান্ত হঠকারিতা থাকতে পারে, কিন্তু এদের বিশ্বাসের মধ্যে সততার অভাব ছিল, একথা বলতে পারেন নি। এই ছোটো, রোগা ও কালো চেহারাটার মধ্যে কোনো দৃষ্টি আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ছিল না। কিন্তু এই দেহটার মধ্যে নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও দুর্জয় সাহসের যে অফুরন্ত ভাণ্ডারকে দেখেছেন তাব প্রকাশ তো তমালের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ এরই পরিণতি এই করুণ মৃত্যু। মা হয়ে কি সন্তানের এই পরিণতি চাইতে পারেন?

যে পুলিসের প্রতি তমালের কটূক্তি অমিয়া দেবির শালিনতা বোধকেই বিব্রত কবত সেই পুলিস অফিসারই জানাচ্ছেন, তারা তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। তবু তিনি খুশি হতে পারছেন না। কুহকের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল আইভি সান্যাল তাকে জীবনের দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছে। মনের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন, জননী হিসাবে তিনি কি তাহলে অস্বাভাবিক? নয়তো নিজ সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা জানতে পেরে খুশি হতে পারছেন না কেন?

আইভি সান্যালকে কি তিনি মনে মনে হিংসা কবতে শুরু করেছিলেন? নয়তো, শশ্মান ঘাটে নিরাপত্তা বলয়ের ওপারের ভিড়ের মধ্যেও আইভি সান্যালকে আগে কোনোদিন না দেখেও এক পলকে কিভাবে চিনতে পারলেন?

শশ্মানের বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন আইভি। সীমান্ত জোয়াবদারকে না জানিয়েই এসেছিলেন শ্মশানে। বাড়ির গাড়ি নেন নি। ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন। শোধ নিতে চেয়েছিলেন মিতা সান্যালের উপর। মার হবু স্বামীর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে মনে করেছিলেন মিতা সান্যালের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন।

সীমান্ত জোয়ারদার তার মার প্রেমিক। মিতা সান্যাল তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন বলেই সেদিন তাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। মার প্রতি তীব্র ঘৃণা তার প্রেমিকদের প্রতিও আছড়ে পড়েছিল। সীমান্ত জোয়ারদার তার কাছে কতখানি অবাঞ্ছিত তা প্রমাণ করতেই তার ঔরসের সন্তানকে এভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন।

কুহক তার সন্তান। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকাতেই কেন জানি মিতা সান্যালের ছায়াকেই দেখতে পেতেন। মনে হত এই বীজটা তার মায়ের গর্ভেই প্রোথিত হবার কথা ছিল। এর বীজ বপনকারী তো এতদিন মিতা সান্যালের শীৎকারে সিক্ত হত।

কুহকের বিদ্রোহ যখন সীমান্ত জোয়ারদারের সাম্রাজ্য আর মিতা সান্যালের সমাজের

বিরুদ্ধে ঘোষিত হচ্ছিল তখন আইভি সেটাকে তারই বিজয় বলে মনে করেছিলেন। আর সেই বিদ্রোহ যাতে এদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয় তার জন্য নিজেকে আবো উন্মত্ত জীবন ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন আপন রক্ত প্রবাহের বিদ্রোহে সীমান্ত জোয়ারদারদের সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে দিয়ে মিতা সান্যালদের উদ্বাস্তু করতে । আর তার জন্য কুহককেই করেছিলেন তার তূনেব তির। তার অবহেলায় কুহকের মন যতই অভিমানী হযে উঠেছিল ততই মনে হয়েছিল তার তির আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। যেদিন কুহক সীমান্ত জোয়ারদারকে বলেছিল তোমাব চোরাকারবারীর সাম্রাজ্যকে খতম করাই আমার লক্ষ্য, তোমার মেয়ে-বন্ধুদের প্রকাশ্য রাস্তায ফাঁসি দেওয়াই হবে আমাদের কর্মসূচী সেদিন আনন্দে কযেক পেগ বেশি পানীয় পাকস্থলিতে চালান করেছিলেন। সীমান্ত জোয়ারদার কুহককে প্রথমে ইউরোপ বা আমেরিকায় পাঠাতে চেয়েছিলেন। কুহক কাউকে না জানিয়েই বাড়ি থেকে বেবিয়ে পড়েছিল। সীমান্ত জোয়ারদাব ভেবেছিলেন পৃথিবীর শক্ত জমিটা একবার দেখে আসুক। বিপ্লবের উত্তাপ নিজে নিজেই নিবে যাবে। কিন্তু হিসেবটা যে ভুল তা বুঝতে পারলেন যখন তার খিদিরপুরের গোডাউনের গোপন ভল্টের সোনার বিস্কুটের খবর এনফোর্সমেন্ট দপ্তবেব খোদ কর্তার কাছে পৌছে গিয়েছিল। অভিযোগকারী তারই আত্মজ। একমাত্র সন্তান, সাবধানী। সব দপ্তবেই তার লোক। খববটা তল্লাসি চালাবার আগেই তার কাছে পৌছে গিযেছিল। তবে বুঝতে পেবেছিলেন সর্বনাশের তিবটা আসছে তার নিজের ঘর থেকেই। পার্ক স্ট্রীটেব মদেব দোকানে বোমা নিক্ষেপের আগে সীমান্ত জোয়ারদার কুহকের গলা ফোনের মধ্যেই চিনতে পেরেছিলেন।

মিঃ সীমান্ত জোযাবদার, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মদের দোকানটি বন্ধ না করে দিলে আপনার জোয়াবদার এন্ড কোম্পানীর সদব দপ্তরে বোমা পড়বে।

পুলিশেব উপব মহল থেকে বার বার ফোন এসেছে, মিঃ জোয়ারদার আপনার ছেলেকে বাইরে পাঠিযে দিন, ও শুধু আপনার সব গোপন খবর ফাঁস করে দিচ্ছে, তাই নয়, পুলিসকেও মারছে। তার থেকেও মারাত্মক ও অন্যকোনো পুলিস গ্রুপের হাতে ধরা পড়লে আপনার আমাদের গোপন সম্পর্কও ফাঁস করে দেবে। তবু সীমান্ত জোয়ারদার পুলিসের কাছে বলতে পারেন নি, ফাইট টু ফিনিশ। বলেছেন, একমাত্র সন্তান, আমাকে আরেকটু সময় দিন।

আইভিকে বলেছিলেন, সীমান্ত জোয়ারদার, তুমি ওকে একটু কাছে টেনে নাও। আমাকে সহ্য কব না ঠিক আছে। কিন্তু ওতো তোমারও সন্তান। তুমি দাযিত্ব নাও। ওকে আমি আমেরিকায় ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

আইভি বলেছিলেন, তুমি কি তোমাব মাব কথা শুনেছিলে? তোমার মা তো তোমাকে তার হাতের চুড়ি বেচে কলকাতায় পড়তে পাঠিযেছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল তুমি এম. এ. পাস করে সাধারণ এক সৎ ভদ্রলোকের মতন জীবন-যাপন করবে। তুমি শোনো নি। আমার দিদিমা চেয়েছিলেন তার মেয়ে আর সব মেয়ের মতন স্বামীর সংসার করবে। সে মায়ের কথা শোনে নি। তোমার ছেলে তার মায়ের কথা শুনে সাধারণ ভালো ছেলে হবে কেন?

গোয়েন্দা দপ্তর থেকে সীমান্ত জোয়ারদারের কাছে খবর এসেছিল, মিঃ জোয়ারদার আর নয়, আপনার ছেলের কাছে এমন কিছু কাগজ ও ছবি আছে যা ফাঁস হয়ে গেলে আমরা কেউ বাঁচব না।

আপনারা যেটা করণীয় বলে মনে করছেন সেটাই করুন।

সীমান্ত জোয়ারদার ফোনটা নামিয়ে রেখেছিলেন।

ফোনটা বেজে চলেছিল। একেবারে ভিতরের ঘরে প্রাইভেট ফোন। বাড়ির অন্য কেউ

এই ফোনটা ধরে না। কোনো জরুরি গোপন খবর থাকলেই এই ফোনটা বাজে। সীমান্ত জোয়ারদার ঘরে ছিলেন না। সাধারণত এই ফোনটা একবার বাজার সাথে সাথে কেউ না ধরলে থেমে যায়। ওপারের লোক বুঝে যায় সীমান্ত জোয়ারদার ঘরে নেই। সেদিন ফোনটা কিছুক্ষণ পর পরই বেজে উঠেছিল। আইভি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন জানি ফোনটা ধরেছিলেন।

—হ্যালো।

—মিসেস জোয়ারদার?

—হ্যাঁ।

—মিঃ জোয়ারদার কোথায়?

—জানি না।

—শুনুন, কাল রাতে আপনার ছেলে কুহক পুলিসেব গুলিতে মারা গেছে।

কী? কী বললেন? কুহকের মৃত্যু সংবাদ তার হৃদ্‌স্পন্দনকে এভাবে স্তব্ধ করবে তা বুঝতে পারেন নি।

—এছাড়া পুলিসের আর কোনো উপায় ছিল না।

—ওর ডেড্‌বডি কোথায় আছে?

—মর্গে। কিন্তু ওখানে আপনাদের যাওয়া চলবে না।

—কেন?

—কুহক আপনার ছেলে এটা জানাজানি হলে মুশকিল হবে।

ফোনটা ওপার থেকে ছেড়ে দিয়েছিল।

আইভি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। গেটে দারোয়ান তাকে দেখে সেলাম করে গেট খুলে দিয়ে বলেছিল, মেমসাব, গ্যারেজে গাড়ি বের করতে বলব?

হাতের ইসারায় তাকে না বলে একটু এগিয়ে গিয়েই নিজেই একটা ট্যাক্সি ধরেছিলেন।

প্রথমেই গিয়েছিলেন মর্গে। পরিচয় দেন নি। ওরা জানিয়েছিল এ নামে কোনো লাশ আসেনি। তবে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ পুলিস শ্মশানে নিয়ে গেছে। ঐ ট্যাক্সিতেই গিয়েছিলেন শ্মশানে। ভিতরে ঢুকতেই বাধা পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। শুনেছিলেন এক-এক করে লাশ চুল্লীতে ঢোকানো হচ্ছে।

এটাই কি টেলিপ্যাথি? না, মাতৃ হৃদয়ের স্পন্দনকে মাতৃহৃদয় দিয়ে চেনার অনুভূতি? নয়তো আইভিকে দূর থেকে দেখে কিভাবে তার পাসে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

আপনি আইভি?

চমকে উঠেছিলেন আইভি। দুটি চোখকে আঁচলে ঢেকে মাথা নেড়েছিলেন, হ্যাঁ।

কুহকের মা?

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে দুই হাঁটুর মাঝে মুখটা গুঁজে দিয়েছিলেন। অবরুদ্ধ কান্নার স্রোত সারা শরীরকে কাঁপিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

আমি অমিয়া। আইভির পিঠে হাত রেখেছিলেন অমিয়া দেবী।

আইভির শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে।

আরেকটু আগে এলে শেষ দেখাটুকু দেখা হত। ওরা ওকেই সবার আগে ছাই করে দিয়েছে। ওর একটা জামা, গেঞ্জি আর প্যান্ট আমার কাছে আছে। স্মৃতি রাখতে চাইলে আপনি রাখতে পারেন।

আইভি অমিয়া দেবীর হাত দুটোকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, আমি তার যোগ্য নই। তবে আপনার কাছে গেলে আমাকে রাক্ষুসী মা বলে দরজাটা বন্ধ করে দেবেন না।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করে একটা ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। অমিয়া দেবী জানালা দিয়ে মুখ বের করে অবস্থাটা একটু দেখতে চাইলেন। মনে হল জ্যামটা যেন আরো গাঢ় হয়েছে। মাথাটাকে আবার সিটের পিছনে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজেছিলেন।

কুহকের মার কান্নাটা তো আজও চোখ বুজলে দেখতে পান অমিয়া দেবী। অথচ তমালের জন্য তাকে কাঁদতে হল না—এ কথায় তিনি কেন সেই স্বস্তিটা খুঁজে পাচ্ছেন না? আজ নিজের সন্তানের এত বড়ো খবর পেয়েও সন্তানের বিরুদ্ধেই তার ভাবনাগুলি কেন প্রবাহিত হচ্ছে? অথচ এই তমালের খোঁজ পেতে কম চেষ্টা তো করেন নি। সেই পুলিস অফিসারটির খোঁজে লালবাজার ও লর্ড সিনহা রোডে গেছেন। প্রতিদিন ডাক পিয়নের আসার অপেক্ষায় বসে থেকেছেন। চিঠি এলেই খামের উপর তমালের হাতের লেখাটা খুঁজতে চেয়েছেন। পিয়ন চলে যাবার পর প্রতিদিন ভাবতেন কাল নিশ্চয়ই ওর চিঠি আসবে। স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেকদিন ভেবেছেন বাড়িতে গিয়ে হয়তো দেখবেন, তমাল বাড়িতে বসে আছে। জীবনে যা করতে বা বলতে কোনো দিন চান নি, সেই ছোড়দার কাছে অনুরোধ করেছিলেন তমালের খোঁজ এনে দিতে।

ছোড়দা শুধু বলেছিলেন, ওর জন্য চিন্তা নেই। ও ভালো আছে।

যে চিঠির জন্য প্রতিদিন চাতক-তৃষ্ণা নিযে অপেক্ষা করেছেন, সেই চিঠি এসেছে জেনেও আজ তিনি তা দেখার কোনো প্রেরণা অনুভব করলেন না।

তিনি তো স্বপ্ন দেখতেন তমাল মস্ত বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হবে। তাকে বিদেশে পাঠাবেন। স্বামীর টাকাগুলি সব ব্যাঙ্কে রেখেছেন তমালেব বিদেশ যাত্রার খরচ মেটাবেন। আজ খবর এসেছে তমাল আমেরিকাব এক বিশাল প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে আধুনিক জীবনের সব উপকরণ। তিনি মা, তবু কেন খুশি হতে পাবছেন না?

অমিয়া দেবী নিজেকেই বারবার প্রশ্ন করে চলেছিলেন। তবে কি তিনি তার নিজের সন্তানের প্রতি তাব অবচেতন মনে হিংসার বীজকে এতদিন নিজের অজান্তেই সিঞ্চন করে এসেছিলেন? সেটাই বা কি করে সম্ভব? নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

এই তমালকে ঘিরেই তো তিনি তার জীবনের সব স্বপ্নকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তমাল বড়ো হোক, কিন্তু এভাবে তো তিনি তা চান নি।

সারা জীবন ধরে তিনি ভেবে এসেছেন তমাল নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। তাই অনেকবার ওকে পা পিছলে পড়তে দেখেও নিজে ছুটে যান নি তার হাত দুটো ধরতে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে তাকে প্রেরণা দিতে চেয়েছেন, নিজের চলার ভুলটা নিজেই ধরতে শিখুক। সেইজন্যই তিনি কোনো লতানো গাছকে সহ্য করতে পারতেন না। বাড়ির চারিপাশে অনেক ফুল গাছ তিনি লাগিয়েছেন। স্কুলেও মালিকে দিয়ে সুন্দর বাগান করেছেন। কিন্তু কোথাও একটা লতানো গাছ লাগাতে দেন নি। বসুন্ধরা স্কুলের গেটে একটা মাধবীলতার চারা পুঁতেছিল। তিনি পরেই দিনই সেটাকে তুলে দিয়ে সেখানে একটা রাধাচূড়ার চারা পুঁতে ছিলেন।

তমাল যখন নক্সালপন্থী রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িয়েছিল, সে খবরে উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখ পাননি। ভেবেছিলেন ওদের ভাবনাটা ভুল, তবে সেই ভুলটা ও ওর নিজের অভিজ্ঞতার পরখেই আবিষ্কার করুক।

তার সন্তান হয়েও তমাল নিজের ভারে নিজের পা ভেঙে বসল। পুলিস অধিকর্তার

সাথে আত্মীয়তার অবলম্বনকে ভর করে পালিয়ে গেল—এটাকেই তিনি তার পরাজয় ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছেন। অথচ সন্তানের কাছে মার এই পরাজয় তো মধুর হওয়ার কথা ছিল।

সেদিন মর্গের সামনে পুলিস অফিসারের মুখে তমালেব খবরটুকু পেয়ে কাপড়ে মুড়ে ফেলে রাখা কুহকের ক্ষতবিক্ষত দেহটি তৎক্ষণাৎ তার কাছে তমালের তুলনায় অনেক ঋজু ও বলিষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল। মনে মনে কুহকেব মার প্রতি এক অজানা হিংসার অনুভূতি অনুভব করেছিলেন। আর সেই মুহূর্তেই তার দু-চোখ ছাপিযে জলের ধাবা নেমে এসেছিল।

মর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন থানায় ও সির সাথে দেখা করতে জানাতে চেয়েছিলেন কুহককে তিনি চেনেন। ওর বাবা মার খবর তিনি জানেন। কুহককে অজ্ঞাত লাশ বলে চালান করা চলে না।

থানায় এই প্রথম এসেছিলেন অমিয়া দেবী। মেদ জর্জরিত বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে হেলান দিয়ে বসেছিলেন ওসি। অমিয়া দেবী ভাবছিলেন নক্সালরা যদি থানা আক্রমণ করে তবে ও সি চেয়ার থেকে তার শরীরের ভার তুলতে তুলতেই নক্সালরা হেসে-খেলে থানা লুট করে নিয়ে যেতে পারবে।

এই ওসি ভদ্রলোকটি সম্পর্কে নানা দুর্নামের কথাই শুনেছিলেন অমিয়া দেবী। তার নানা অপকীর্তির মুখরোচক খবরে এ অঞ্চলের বাতাস যে ভারী হয়ে আছে সে কথা তিনি জানতেন। তবু সেদিন এক দুর্দমনীয় আবেগের তাড়নায় তিনি ওসির চেম্বারে ঢুকে পড়েছিলেন।

ওসি একটা টুথপিক দিয়ে তার পান-চর্বিত লালচে দাঁতের ফাঁক থেকে সুপারির কুঁচি বের করতে ব্যস্ত ছিলেন। অমিয়া দেবীকে দেখে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনিই তো এই থানার ওসি।

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনার কি দরকার?

—আমি কুহকের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।

—কে কুহক।

—কুহক জোয়ারদার, আপনাদের গুলিতে যারা মারা গেছে, ও তাদের মধ্যে একজন।

—এখানে কুহক জোয়ারদার বলে কেউ মারা যায় নি। যারা মারা গেছে তাদের কাউকেই সনাক্ত করা যায়নি।

—কিন্তু আমি কুহককে সনাক্ত করে এসেছি।

—আপনি কে? কে আপনাকে সনাক্ত করার জন্য ডেকেছে? ওসির কথায় উত্তেজনা।

—আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। এই পরিচয়টাই যথেষ্ট নয় কি?

না, ওসি বলেছিলেন। আপনার নামটা বলুন তো আপনাকেই‌ও নক্সাল বলে মনে হচ্ছে।

অমিয়া দেবী ওসির দিকে একটা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, ওরা তো আপনাদের চোখে মানুষ নয়, তবে আমি নক্সাল নই। আমি নক্সালের মা। আমি নক্সালের মাসি।

দাঁতের ফাঁক থেকে সুপারির একটা কুঁচি টুথপিকের খোঁচায় বের করে জিবের উপর এনে থু করে অমিয়া দেবীব শাড়ির উপর ছুঁড়ে দিয়ে ওসি বলেছিল, সত্যি, কার মুখ দেখে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম! এ যে মেঘ না চাইতেই জল। শালা সব দামড়া-দামড়া আসামীরা হাজতে আছে। জেনানা ফটক একেবারেই খালি। ভালোই হল। আপনাকে রাখলে রাতটা ভালোই লাগবে।

মাথাটা দপ্ করে উঠেছিল। অর্চনা গুহর কথা শুনেছেন। সে কথা মনে পড়তেই মনে হয়েছিল তার সামনে কোনো মানুষ বসে নেই। একটা বীভৎস জন্তু যেন জিব বের করে তার দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার লোমশ হাতে লম্বা লম্বা নোখ, জিব থেকে লালা ঝরছে। বিশাল তীক্ষ্ণ দাঁত করাতের মতন চকচক করছে।

অমিয়া দেবী ওসির চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, হোম সেক্রেটারির ফোন নম্বরটা আপনার কাছে আছে? না থাকলে লিখে নিন।

ওসি সোজা হয়ে বসেছিলেন। হোম সেক্রেটারি? তার ফোন? কেন বলুন তো।?

তাকে ফোন করে বলুন, আপনার ছোট বোন থানায় এসেছে। তাকে হাজতে রেখে রাতটা মধুর করতে চেয়েছেন।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল ওসি। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ম্যাডাম? বসুন। ওসির চেহারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

অমিয়া দেবী বসেছিলেন। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ওসিকে কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু মনে হচ্ছে না। তার চেনা এক অতি সাধারণ মানুষ। বলেছিলেন, আমার নাম অমিয়া মিত্র। আপনাদের হোম সেক্রেটারি মিঃ—

অমিয়া দেবীর কথার মাঝখানেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ওসি। ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিলেন, পুলিসের চাকরিটা এমন ম্যাডাম। নিজের স্ত্রীকেই পারলে হাজতে পুরে দিই। অমিয়া দেবী কিছু বলার আগেই ওসির হাত কপালে স্যালুটের ভঙ্গিতে উঠে পড়েছিল। অমিয়া দেবী শুনছেন।

—আমি বারাসাত থানার ওসি বলছি স্যার।

—ডিস্টার্ব করার জন্য দুঃখিত স্যার।

—হ্যাঁ সার।

—আপনার বোন অমিয়া দেবী আমার সামনের চেয়ারে বসে আছেন স্যার।

—হ্যাঁ স্যার।

—না স্যার।

—কোনো অসুবিধা হবে না স্যার।

—না স্যার।

—হ্যাঁ স্যার।

—দিচ্ছি স্যার।

ওসি ফোনটা অমিয়া দেবীর হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ওর দুটো হাত বুকের কাছে প্রণামের ভঙ্গিতে জোড়া।

অমিয়া দেবী ফোনে বলেছিলেন, বল ছোড়দা।

—তুই এভাবে থানায় না এলে ভালই করতিস।

—গণতন্ত্রে থানায় আসা বারণ বুঝি?

—অমি, অবুঝ হোস না, তুই যে মর্গে গিয়েছিলি সে খবর ওরা আমাকে আগেই দিয়েছিল। তোর যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তা আমি বলে দিয়েছি। তুই বাড়িতে এলে আমার সাথে দেখা করে যাবি।

ফোনটা ওসির হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

ম্যাডাম, চা খান। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কিছুই মুখে দেন নি। পাশেই আমার কোয়ার্টার্স। আমার স্ত্রীকে ডেকে আনছি। সেখানে আপনি একটু ফ্রেশ হয়ে নিন। তারপর আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—ধন্যবাদ, এর কোনোটাই দরকার হবে না।

—ম্যাডাম, তাহলে বুঝব আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। আমি তো ভয়ে কাঁপছিলাম ম্যাডাম। এই বুঝি ফোনে হোম সেক্রেটারিকে বলে দেন, আমি আপনাকে হাজতে পাঠাবার কথা বলেছি।

—আপনি পুলিশ অফিসার। অন্য আর সবার ক্ষেত্রে যা করেন আমার সাথে আপনার সেই ব্যবহার করাই উচিত ছিল। অবশ্য আমারই অন্যায় হয়েছে, হোম সেক্রেটারির সাথে আমার সম্পর্ক জানিয়ে।

—ছোটো ভাইকে ক্ষমা করে দিন ম্যাডাম। আমার থানাতে কোনো ঝামেলা হয় নি। যা কিছু সব ওপর তলার নির্দেশে হচ্ছে।

অমিয়া দেবী হেসে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন আপনার উপর আমার কোনো রাগ নেই। তবে ঐ বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভাসছে। গলা দিয়ে কিছু নামবে না।

ওসিও হেসেছিলেন, বলেছিলেন, আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। আমাদের অবস্থা তাহলে বুঝুন। আমাদের তো সবসময় এদের নিয়ে ঘাঁটতে হয়।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আপনারাই তো এদের মারেন।

ওসি বলেছিলেন, না ম্যাডাম, আমরা মারি না, আমাদের দিয়ে ওদের হত্যা করানো হয়।

—আপনাদের বিবেক বলে কিছু থাকতে নেই?

—আছে। তবে তাকে বাক্স-বন্দি করে রাখতে হয়?

—কেন?

—এর জবাব আমার মতো একজন ছোটো মাপের পুলিস অফিসারের মুখে বড়ো কথা বলে মনে হবে।

ওসিকে অমিয়া দেবীর আর এত খারাপ লাগছিল না। বলেছিলেন, আমিও বড়ো কোনো মানুষ নই। আপনি বলুন, আমার কাছে আপনাব কথা ছোটো মুখে বড়ো কথা মনে হবে না।

আসলে আমরা যখন চাকরিতে প্রথম আসি তখন নানা আদর্শের স্বপ্ন নিয়ে আসি। ঘুষ খাব, থানাতে মেয়েদের কোনো অভিযোগ ধরে আনলে তার উপব সুযোগ নেব এসব কথা একবারের জন্যও চিন্তা করি না। কিন্তু এখানে ঢোকার পর দেখি প্রত্যেকেই আমার মতন ভাবনা নিয়েই ঢুকেছিল। যাদের দূর থেকে সর্বত্যাগী রাজনৈতিক নেতা বলে মনে করতাম তাদের ঘরেই থানার মাসোহারা পৌঁছে দিতে আমার ওপরওলা থেকে হুকুম দেন। যাদের আগে জানতাম ব্রহ্মচারী তাদেরই বাগান বাড়িতে কন্যাসম যুবতীর সাথে রাতকাটানোর ব্যবস্থা করতে আমাদের ডিউটি দিতে হয়। ওদের মাসোহারা পৌঁছে দিতে দিতে যেমন আমবাও হাত পাততে শিখে যাই তেমনি তাদের বাগান-বাড়ি পাহারা দিতে দিতে আমরাও মেয়েদের দিকে হাত বাড়াই।

অমিয়া দেবী শুনছিলেন। মনে হয়েছিল এই মানুষটার ভিতরে মানুষটা এখনো বেঁচে আছে। বলেছিলেন, এর জন্য আপনার কোনো আপশোস হয় না।

হেসেছিলেন ওসি। বলেছিলেন, একদম না। এখন ভাবি এটাই নিয়ম। আজ আপনি অর্চনা গুহর কথা বলছিলেন। মজার কথা কি জানেন? কাল যদি আপনি ক্ষমতায় আসেন তবে আপনার হাতেই সেই অত্যাচারী পুলিস অফিসার বলে যাকে এত গালাগালি করছেন তাকেই সবার আগে প্রমোশন দেবেন।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তা কখনো হবে না।

একটা ফোন এসেছিল। ফোনটা ধরেই বলেছিলেন, ওসি ব্যস্ত আছেন, যা বলার সেকেণ্ড অফিসারকে বলে দিন।

অমিয়া দেবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ওসি বলেছিলেন, দেখুন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর ইংরেজ সরকারের হয়ে এত অত্যাচার চালিয়েছিল, স্বাধীনতার পর কিন্তু তারাই

থানাগুলিতে আরো জাঁকিয়ে বসেছিলেন। আসলে কী জানেন ম্যাডাম? মানুষের মনের কথা বয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতার উপরই আমাদের উন্নতির চাবি-কাঠি।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পুলিস তাহলে শুধু হুকুম তামিলের যন্ত্র।

হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমরা তাই। ভাবুন তো সেই কবে ইংরেজরা তাদের রাজত্ব কায়েম রাখতে পুলিস কোড তৈরি করেছিল স্বাধীন ভারতে আজও তাই চলছে। স্বাধীনতার বিপ্লবীদের দমনের জন্য যে সন্ত্রাসবাদী আইন ইংরেজ সরকার চালু করেছিল আমরা তো সেই আইন দিয়েই এদের দমন করতে চাইছি। এই তো আপনাদের এক বিশাল নেতা পুলিসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ এনে বলেছেন, নকশালদের উপর ব্যবহৃত গুলিতে কি নিরোধ পরানো আছে? এবার ভেবে দেখুন ম্যাডাম, সেই দলের নেতারাই তো ক্ষমতায় আসবেন। সেই নেতারা অর্চনা গুহর উপর যারা অত্যাচার করেছে বলে বলা হচ্ছে, তাদের প্রমোশন না দিয়ে পারবেন? শাসকেরা তো পুলিসের বিবেক চায় না, তারা চায় তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য।

যাকে কিছুক্ষণ আগেও এক হিংস্র নর পিশাচ বলে মনে হচ্ছিল তাঁকেই এখন অমিয়া দেবী এক সংবেদনশীল মানুষ বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন, বলেছিলেন বুঝতে পারছি আপনি পুলিসের চাকরিতে মনের দিক থেকে খুশি নন।

ওসি বলেছিলেন, না ম্যাডাম, আপনার ধারণাটা ঠিক নয়। আমার বাবা ছিলেন স্কুল টিচার। আদর্শবাদী শিক্ষক। ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো দিন পড়াবার জন্য টাকা নেন নি। মায়ের গায়ের মোটা কাপড় ছাড়া কোনো দিন অন্য কোনো কাপড় ওঠে নি। আমরা স্কুলে যেতি প্যান্টের পেছনে বিশাল তালি দিয়ে। আমার বাবার যখন টিবি হয়েছিল তখন আদর্শবাদিতার পুরস্কার হিসাবে হাসপাতালেও জায়গা পান নি। টালির একচালা বাড়ির ছোট্ট কাঠের চৌকিতে শুয়ে কাশির সাথে রক্ত তুলে মারা গিয়েছিলেন। চাকরিটা কিনতে সেই টালির ঘরটা বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। আজ আমার দোতলা বাড়ি হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা দামী স্কুলে পড়ে। ইচ্ছে করলেই কয়েক লাখ টাকা বের করে দিতে পারি। আমি এই চাকরিতে কেন খারাপ ফিল করব না, ম্যাডাম।

অমিয়া দেবী ওসিকে বলেছিলেন, দুকাপ চা আনুন। কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার মনের ভিতর ঘুমন্ত মানুষটা জেগে উঠতে চাইছে। তাই কোনো খুনী পুলিস অফিসারের কাছ থেকে নয়, একজন মানুষের কাছ থেকেই চা খাব।

খুশি হয়েছিলেন ওসি। বলেছিলেন, আপনাকে চা খাওয়াতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এই দলটার সাথে কুহক বলে একটা ছেলেকে আপনারা হত্যা করেছেন। তার সম্বন্ধে আমার কিছু জানার আছে।

ওসি বলেছিলেন, এ ছেলেগুলিকে আমরা মেরেছি একথা কে বলল? ওরা পুলিস পার্টিকে আক্রমণ করেছিল। পুলিস আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালালে এরা মারা গেছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, মৃতদেহের উপর বুঝি জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিতে হয়? তাদের মাথা ভারী কিছুর আঘাতে থেঁতলে দিতে হয়? মুখে জ্বলন্ত আলকাতরা দিয়ে তার পরিচয়কে এভাবে মুছে দিতে হয়?

ওসি টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলেছিলেন, এসবের জবাব তো আমার কাছে নেই। আপনার দাদাই তো স্বরাষ্ট্র-সচিব। এসবের জবাব তার কাছ থেকেই জেনে নেওয়া ভালো।

অমিয়া দেবী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কুহকের বাড়িতে আপনারা খবর পাঠান নি?

ওসি চাপা গলায় বলেছিলেন, ম্যাডাম এরা তো সরকারি খাতায় অপরিচিত ব্যক্তি বলে চিহ্নিত। যাদের চেনাই যায় নি, তাদের বাড়িতে তো খবর পাঠানো যায় না। তবু আপনাকেই বলছি, কুহকের বাবা-মা খবরটা পেয়েছেন। মিঃ জোয়ারদার চান না, কুহক পুলিসের গুলিতে মারা গেছে এটা জানাজানি হয়ে যাক। বুঝতেই পারছেন, বড়ো বড়ো লোকের বড়ো বড়ো ব্যাপার। আমরা তো হুকুম তামিল করি মাত্র।

| ২৯ |

জ্যাম মুক্ত হয়ে কখন যে ট্যাক্সিটা আবার চলতে শুরু করেছিল তা টের পান নি অমিয়া দেবী। চমক ভেঙেছিল ট্যাক্সি ড্রাইভারের ডাকে।

কোথায় থামাব, দিদিমণি।

হঠাৎই যেন ঘুম থেকে উঠেছিলেন অমিয়া দেবী। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন নার্সিং হোম ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছেন। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ট্যাক্সি ঘুরিযে নিতে বলতে গিয়েও মনে করেছিলেন সল্টলেকে বসুন্ধরার বাড়িতেই প্রথমে ওর খোঁজ করে যাবেন।

ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলে অমিয়া দেবী বসুন্ধরার মামার বাড়িতে ঢুকেই দেখতে পেলেন ওরা কেউ নেই। তখনো নার্সিং হোমেই সবাই আছে ভেবে অমিয়া দেবী ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েই দেখতে পেলেন ওদের বাড়ির কাজের মেয়েটা আসছে। ওকে দেখে ট্যাক্সিতে না উঠেই এগিয়ে এসেছিলেন অমিয়া দেবী।

মেয়েটা অমিয়া দেবীকে দেখে নিজের থেকেই বলে উঠেছিল, বাড়িতে কেউ নেই বড়দি মণি।

কোথায় গেছে রে? নার্সিং হোমে?

বড়ো দাদা বাবু আর বৌদিমণি ন্যার্সিং হোমে গেছে।

আর ছোটো দিদিমণি?

ছোটো দিদিমণি তো তার অনেক আগেই স্যুটকেশ হাতে বেরিয়ে গেছে।

—স্যুটকেশ হাতে?

—হ্যাঁ, বড়দি মণি।

অবাকই হয়েছিলেন অমিয়া দেবী। বসুন্ধরা স্যুটকেশ হাতে নার্সিং হোমে যাবে কেন?

ট্যাক্সিতে উঠে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি নার্সিং হোমে যাচ্ছি। বসুন্ধরা যদি চলে আসে ওকে বলিস আমার শরীরটা খুব খারাপ, ও যেন আমার কাছে চলে আসে।

নার্সিং হোমে যাবার পথে অমিয়া দেবী ভাবতে চেষ্টা করছিলেন, স্যুটকেশ নিয়ে বসুন্ধরা কেন নার্সিং হোমে যাবে?

নার্সিং হোমে ঢুকতেই দেখেছিলেন বসুন্ধরার বড়মামা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। সিগারেটের টান দেখলেই বোঝা যায় তার ভিতর টেনশনের স্রোত বয়ে চলেছে।

অমিয়া দেবী ধীর পদক্ষেপে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা কেমন আছেন?

হতাশার ভঙ্গিতে হাত নেড়েছিলেন, বসুন্ধরার বড়মামা, তারপর অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, মার ব্যাপারে তো আর কিছু করার নেই। ডাক্তার এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা করতে বলেছেন। যে কোনো মুহূর্তেই সেই ভয়াবহ সময় এসে পড়বে। এখন শুধু ভাবছি বসুন্ধরার কথা। মার অসুখে ও এখনই যে রকম ভেঙে পড়েছে, সেই সময়টা ওকে সামলানো যাবে কিভাবে?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ওকে নিয়ে কিছু ভেবেছেন?

—সেই ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু আলোচনা করা দরকার।

—বসুন্ধরার ব্যাপারে মা কি আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন?

বসুন্ধরার বড়মামা আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেছিলেন, মা অসুস্থ হবার আগেই তার মনের ইচ্ছে ও আপনার কথা আমাদের চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

একটু অবাকই হয়েছিলেন অমিয়া দেবী। স্বর্ণপ্রভা বসুন্ধরার ব্যাপারে তার ছেলেদের কাছে অনেক আগেই তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ তার কাছে কিছু বলেন নি। তিনি নিজেও অবশ্য বসুন্ধরাকে নিয়ে তার স্বপ্নকে অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। মনের কোণে একটা অভিমানের খোঁচা অনুভব করেই নিজের মনকে শাসন করতে চেয়েছিলেন. স্বর্ণপ্রভার সাথে তার সম্পর্কের দাবিটুকুকে তিনি তার সন্তানদের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন।

মৃদুস্বরে অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই চিঠিতে মা কী লিখেছেন, আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমাকে জানাতে পারেন।

ছিঃ ছিঃ আপনি একি বলছেন? প্রচণ্ড অপ্রস্তুত হয়েই বসুন্ধরার বড়মামা বলেছিলেন, আপনিই তো বসুন্ধরার মা। অনেক আগেই মার চিঠি নিয়ে আপনার সাথে আমাদের কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু সুযোগ পাইনি। মার ইচ্ছের কথাটা মনে হয় আপনাকে এখনই জানিয়ে দেওয়া উচিত। নয়তো, শোকের পরিবেশে বলাটা ঠিক মতো নাও হতে পারে।

বলুন, অমিয়া দেবীর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা দ্বিধা।

মা, বসুন্ধরাকে আপনার হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন। বসুন্ধরাও তাই চায়।

আমার হাতে? যন্ত্রণা যে এত তীব্র হয় আগে কোনো দিন বুঝতে পারেন নি। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদও তাকে এত তীব্র যন্ত্রণা দিতে পারে নি। মনে হয়েছিল তার সমস্ত শরীর অবস হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, বসুন্ধরার বড়মামা বলে চলেছিলেন, মা জানিয়েছেন আপনার মনের ইচ্ছেও তাই। তমালকে আমাদের বাড়ির সবার পছন্দ। আমার ছোট ভাই তো খবরটা পেয়ে তমাল ও বসুন্ধরাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেবার কথা লিখেছে। আরেকটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আপনি অন্যভাবে নেবেন না। মা তমালের বিদেশ যাত্রার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার জন্য টাকা আলাদা করে রেখেছেন। আর তার সম্পত্তি বসুন্ধরার নামে উইল করে দিয়েছেন। এতে কিন্তু আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দের সাথে সম্মতি দিয়েছি।

সমস্ত পৃথিবীটা অমিয়া দেবীর চোখের সামনে দুলে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, দেওয়ালগুলি যেন ক্রমশ ছোটো হয়ে তাকে পিষে ধরতে এগিয়ে আসছে। মুখে একটা ছোট্ট আর্তনাদ তুলে দুহাতে মুখ ঢেকেছিলেন।

আপনার শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বসুন্ধরার বড় মামা।

হাতের তালু থেকে মুখটাকে মুক্ত করে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

আপনার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। বিব্রত ভঙ্গিতে বলেছিলেন বসুন্ধরার বড় মামা।

নিজের এই ভাবান্তরের বহিঃপ্রকাশে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন, অমিয়া দেবী। কুণ্ঠিত স্বরে বলেছিলেন, আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমিও তো বসুন্ধরাকে অনেক আগেই নিজের মনের মধ্যে টেনে নিয়েছি। ও তো এখন আমারই মেয়ে।

বসুন্ধরার বড়মামা বলেছিলেন, আপনি জানেন না, আমাদের পরিজনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ গুঞ্জন উঠেছিল। ওর মামারা থাকতে ও কেন আমাদের গ্রামের বাড়িতে একা থাকবে? বসুন্ধরাই জবাব দিয়েছিল, বুলবুল চণ্ডিতে আমার মা থাকে। আমি তার কাছেই থাকব। অথচ আমরা কিন্তু মা আর বসুন্ধরাকে বারবার আমাদের কাছে আনতে চেয়েছি। আমার ছোট ভাই তার ওখানে নিয়ে যেতে চেয়েছে। মা বলতেন বসুন্ধরা তার মাকে হারিয়ে আবার তার মাকে ফিরে পেয়েছে। আমি ফিরে পেয়েছি আমার খুকিকে।

একটা কান্না বুকের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। গলার কাছে তাকে কোনো মতে ঠেকিয়ে রেখে ধরা গলায় অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি জানি।

হাতে গরম ফোঁটার স্পর্শে অমিয়া দেবী বুঝতে পারছিলেন, তার আপ্রাণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও চোখ দুটি বিদ্রোহ করে বসে আছে। গলাটা ঝেড়ে থুথু ফেলার নাম করে বারান্দার কোণে গিয়ে আঁচলের কোনায় চোখ দুটিকে মুছে এসে বলেছিলেন, বসুন্ধরা তো আমারই মেয়ে।

আমরা জানি, বসুন্ধরার বড় মামার গলার স্বর আর্দ্র। ও যে আপনার কাছেই সবচেয়ে সুখে ও নিরাপদে থাকবে এতে কারো সন্দেহ নেই। তাই আমরা নিশ্চিন্ত। মাও সেই নিশ্চয়তা নিয়েই চলে যাচ্ছেন।

মানুষের বিশ্বাসের ভার যে কত দুঃসহনীয় হতে পারে সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন অমিয়া দেবী। সেই ভারের ভয়াবহ চাপে তার দুটি হাঁটু আপনা থেকেই মুড়ে এসেছিল। মুখে উঃ শব্দ তুলে বারান্দাতেই বসে পড়েছিলেন।

আপনি সত্যিই অসুস্থ। বসুন্ধরার বড়ো মামা অমিয়া দেবীকে বাধা দেবার কোনো সুযোগ না দিয়েই নার্সিং হোমের এমার্জেন্সিতে ডাক্তার আনতে ছুটে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার ও নার্স সবাই ছুটে এসেছিল। বসুন্ধরার বড়োমামীকে দেখে অমিয়া দেবী লজ্জিত হাসি হেসে বলেছিলেন, কি বিশ্রি কাণ্ড। সামান্য একটু মাথা ঘোরাকে নিয়ে সবাই কি রকম মহাযজ্ঞের আয়োজন করে ফেলেছেন।

স্নিগ্ধা অমিয়া দেবীর হাত ধরে বলেছিলেন, বড্ড পরিশ্রম যাচ্ছে তোমার। তার উপর মাকে নিয়ে এই টেনশন। আমরা দূরে থেকে মাঝে মধ্যে আসি। সব কিছুর ধাক্কা তো তোমাকেই সামলাতে হয়।

ডাক্তার প্রেসার পরীক্ষা করে বলেছিলেন, সব ঠিক আছে। মনে হয় কোনো কারণে আপনি খুব টেনশনের কবলে পড়েছিলেন। আপনার দরকার একটা গাঢ় ঘুম।

বসুন্ধরার বড়োমামা বলেছিলেন, আপনাকে আর নার্সিং হোমে থাকতে হবে না। আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, একটু পরে যাব। আমি মার কাছে একটু বসি। বসুন্ধরা এলে ওকে নিয়েই আমি যাব। ভাবছি আজকে ওকে আমার কাছেই রেখে দেব।

স্নিগ্ধা বলেছিলেন, বসুন্ধরা ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে। তুমি আসার কিছুক্ষণ আগেই ফোন করেছিল। আজকে হয়তো ও আসবে না।

স্বর্ণপ্রভার কেবিনের সামনে গিয়ে পা দুটোকে ভারী সীসার মতন মনে হয়েছিল অমিয়া দেবীর। দরজাটাকে ঠেলতে গিয়ে মনে হয়েছিল হাত দুটো যেন অসাড় হয়ে পড়েছে।

স্নিগ্ধা দরজাটাকে ঠেলে বলেছিলেন, চল, ভিতরে চল।

শুয়ে আছেন বিশ্বাসের ময়ূরপঙ্খীতে স্বর্ণপ্রভা। এক নিরাপদ স্থির বিশ্বাসের ডানা মেলে কি নিশ্চিন্ত ঘুমে ঘুমিয়ে আছেন তিনি।

স্বর্ণপ্রভার দিকে তাকাতেই সেই চেপে রাখা কান্নাটা আবার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে

চাইছিল অমিয়া দেবীর। এই অনাত্মীয়া মহিলাই এখন তার নিকটতম আত্মীয়া। তিনি কি পরম নিশ্চয়তায় তার জীবনের প্রিয়তম সম্পদকে নিজের সন্তানের কাছে গচ্ছিত না রেখে তার কাছেই সমর্পণ করে দিয়েছেন। আজ আর কোনো বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এত ভীষণ ভয় জীবনে কোনোদিন পান নি অমিয়া দেবী। এই ভয় সেই পরম বিশ্বাসের সামনে দাঁড়াবার ভয়। আজ তার সারা শরীর জুড়ে বিশ্বাসঘাতকতার বিষ্ঠা। কোমায় আচ্ছন্ন এই অসীম ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা যদি হঠাৎ চোখের পাতা দুটিকে মেলে ধরেন তবে তার দৃষ্টি পথে তিনি দাঁড়াবেন কোন সাহসে?

অথচ আজ যদি স্বর্ণপ্রভা সুস্থ থাকতেন তবে তার কাছে গিয়ে নিজের এই শোচনীয় পরাজয়কে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করতেন না। বরং বসুন্ধরার মতন এক অমূল্য রত্নকে তমালের মতো এক ভীরু ·ঞ্চকের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতেন।

স্বর্ণপ্রভার এই বন্ধ চোখ দুটির সামনে দাঁড়াতেই তার যত ভয়। অথচ তার খোলা-দৃষ্টির সামনে তিনি বিনা সঙ্কোচে দাঁড়াতে পারতেন। খোলা দৃষ্টি যে তার মনের দরজাকে খুলে দিয়ে ভিতরটাকে দেখতে পারত। কিন্তু দুটি বোঁজা চোখের দৃষ্টিতে তার উপর ন্যস্ত বিশ্বাসটি বন্দি হয়ে আছে। সেই বন্দি বিশ্বাসকে মুক্তি দিতে পারছেন না বলেই তো স্বর্ণপ্রভার বুঁজে থাকা চোখের সামনে দাঁড়াতে তার এত আতঙ্ক।

তাই সেদিন স্বর্ণপ্রভার কাছ থেকে তিনি পালিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

তমালের সাথে বসুন্ধরার বিয়ের স্বপ্ন যে তিনি দেখতেন তা স্বর্ণপ্রভার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল এটাই তো তার চরম লজ্জা। মনে হয়েছিল, স্বর্ণপ্রভার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তিনি স্বর্ণপ্রভারই ঘরের মূল্যবানতম রত্নটিকে চুরি করতে গিয়েছিলেন। তার এই চুরির পরিকল্পনাটি যে স্বর্ণপ্রভার চোখে অনেক আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিল এ সত্যটি তিনি এতদিন জানতেন না। অথচ কি পরম উদারতায় এই মহিলাই তার মতন চোরের হাতেই তার এই অমূল্য সম্পদটিকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। আর এই ভাবনাগুলিই যে তাকে সেদিন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

কেবিন থেকে বেরোতেই দেখা হয়ে গিয়েছিল বসুন্ধরার বড়োমামার সাথে। তিনিও কেবিনে ঢুকছিলেন।

মাকে দেখলেন? তিনিই প্রথমে কথা বলেছিলেন।

হ্যাঁ। মাথা নেড়েছিলেন অমিয়া দেবী।

বসুন্ধরার বড়োমামা তার হাতে ওষুধের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আপনার ওষুধ। ডাক্তার বলেছেন, অতিরিক্ত টেনশনে রয়েছেন আপনি। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।

ওষুধগুলি নিতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন অমিয়া দেবী। জানেন এর দামের কথা বলা যাবে না। অন্য সময় হলে নিতে এত সঙ্কোচ হতো না। আজ ওষুধগুলি হাত পেতে নিতে একটা দ্বিধার প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, ছিঃ এতগুলো ওষুধ আপনি শুধু শুধু আনতে গেলেন। আমার তো কিছুই হয়নি। বাড়িতে গিয়ে ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যেত।

তাই তো যাবেন। এবার ওষুধটা ধরুন তো। বসুন্ধরার বড়োমামার কথায় একটা গভীর আন্তরিকতা।

হাত বাড়িয়ে ওষুধটা নিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। বলেছিলেন, হঠাৎ মনে পড়ল জরুরি

একটা চেকে সই করতে ভুলে গেছি। টিচারদের পেমেন্ট আটকে যাবে। এক্ষুনি রওনা দিলে সাড়ে দশটার গৌড় এক্সপ্রেস ধরতে পারব।

তীব্র আপত্তির ঝড় তুলেছিলেন বসুন্ধরার বড়োমামা। এই শরীর নিয়ে আপনি যাবেন কী ভাবে?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, দায়িত্বের বোঝা যে নামাতে পারছি না। নয়তো, মাকে এই অবস্থায় রেখে যাবার কথা ভাবার কথা নয়। আমি পরশু সকাল বেলাতেই চলে আসব। বাবাও জানেন না, আমাকে যেতে হবে। তাই বাড়ি হয়ে বাবার সাথে দেখা করে যাব।

বুলবুল চণ্ডিতে যাওয়া খুব জরুরি ছিল না। অমিয়া দেবী এই মুহূর্তে নিজেকে দু-দিনের জন্য নির্জনতার কোলে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন। বুলবুল চণ্ডির ঐ ঘরটার মধ্যে তিনি এক শান্তির স্পর্শ খুজে পান। ভোরে ট্যাঙ্গনের পাড়ে বসে নিজের দুঃখকে স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার কল্পনায় মনটাকে হালকা করতে পারেন।

বসুন্ধরার বড়ো মামা বলেছিলেন, চলুন, আপনাকে বাড়ি থেকে শেয়ালদাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

অমিয়া দেবী জানেন, আপত্তি করে লাভ নেই। শুধু বলেছিলেন, চলুন।

সেদিন গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত বসুন্ধরার মামা স্টেশনে ছিলেন। টিকিট পর্যন্ত কাটতে দেন নি। এসি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে এনে অমিয়া দেবীর হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন।

গাড়ি ছাড়ার আগে বলেছিলেন, মা চিঠিতে লিখেছিলেন, বসুন্ধরা আবার তার মাকে ফিরে পেয়েছে। আমার আর কোনো চিন্তা নেই। তবে খুব ইচ্ছে হয়, নিজের হাতে তমালের সাথে বসুন্ধরার বিয়েটা দিয়ে যাই। তমালের মায়ের মনের কথা আমার থেকে আর বেশি কে জানে? ও চায় তমালের সাথে বসুন্ধরার বিয়েটা হোক। তবে ছেলের মা বলে কথা। অহংকার তো থাকবেই। আমিও জমিদারের বৌ, নাতনি আমার কম কিসের? তাই আমিও দেখছি ও কতদিন প্রস্তাবটা না দিয়ে পারে?'

অমিয়া দেবী স্তব্ধ হয়ে স্বর্ণপ্রভার চিঠির কথাগুলি শুনে চলেছিলেন।

বসুন্ধরার বড়োমামা হেসে বলেছিলেন, মা যে শেষের কথাগুলি ঠাট্টার ছলে লিখেছিলেন, তা তো আপনি বুঝতে পারছেন।

কোনো জবাব দেন নি, অমিয়া দেবী। দুহাতে মুখ ঢেকে অপেক্ষা করেছিলেন গাড়ি ছাড়ার। নিজেকে এত অসহায়, এত রিক্ত, এর আগে কখনো অনুভব করেন নি।

গাড়ি ছাড়ার সময় বলেছিলেন, বসুন্ধরাকে বলবেন, আমার শরীরটা সত্যিই খারাপ। ও যেন আমার একটু খোঁজ নেয়।

[৩০]

বসুন্ধরা জানত বড়োমার চোখকে সে এড়াতে পারবে না। মামা-মামীদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারলেও বড়োমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে সে ধরা পড়বেই। ধরা অবশ্য সেই ঝড়ের রাত্রেই সে বড়োমার কাছে পড়েছিল। বড়োমা সেদিন যে ভাবে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন সেদিনই বুঝেছিল বড়োমা সবই ধরে ফেলেছেন। গায়ে জ্বর ছিল ঠিকই। কিন্তু বড়োমার সেই চোখের চাউনির সামনে তাকাবার সাহস ছিল না। বড়োমার জেরার কাছে সেদিনই হয়তো সেই রাতের ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যেত। দিদার স্ট্রোক তাকে সেদিন রেহাই দিয়েছিল।

পারার বিষ যেমন চেপে রাখা যায় না, তেমনি নারীর জীবনের এই একটা মুহূর্তের

ঘটনাকে বেশিদিন ঢেকে রাখা যায় না। সৃষ্টি-কর্তার কি একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। ক্ষণিকের সেই উন্মাদনা পুরুষও উপভোগ করে। তার ভূমিকা এখানেই শেষ। অথচ নারীকে বইতে হয় দায়-ভার।

নারীত্বের সহজাত চেতনাই তাকে জানান দিয়েছিল, তার শরীরের এক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। বড়োমার কাছেই তার শরীরকে মেলে ধরার কথা ছিল। দিদার পর এই জায়গাই তো ছিল তার নিরাপদ আশ্রয়। বড়োমার কাছে যেতে চেয়েছে বসুন্ধরা। কিন্তু দিদার স্ট্রোকের ঘটনায় ব্যস্ততার ভিড়ে সময় ও সুযোগ খুঁজে পায় নি। অবশ্য প্রথম দুমাস কোনো কিছু বোঝে নি। দিদাকে নার্সিং হোমে আনার ব্যস্ততায় সেই ঝড়ের রাতের কথা ভুলেই গিয়েছিল।

মাস তিনেকের মাথায় উপসর্গগুলি যখন একের পর এক ভিড় করতে শুরু করেছিল বসুন্ধরা বুঝতে পেরেছিল কেন নারীকে শিকারির দৃষ্টির আড়ালে থাকার কৌশলকে রপ্ত করতে হয়। বড়োমার কাছেই সে সব বলতে চেয়েছিল। সঙ্কোচের লক্ষণ-রেখা অতিক্রম করে সে কিছুতেই বড়োমার কাছে যেতে পারছিল না। মনের অস্থিরতা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই বড়োমার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছে।

সেদিন ঝড়ের রাতে যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে তো তারও সাড়া ছিল। যে ঘটনাকে নিজেই প্রশ্রয় দিয়েছিল তার জন্য কাউকে অভিযোগের কাঠগড়ায় তুলতে সে চায় নি। আবার তারই প্রশ্রয়ের ফল যখন তার গর্ভে অঙ্কুরিত হয়েছিল তার জন্য সে অস্থির বিহ্বলতায় ছোটাছুটি করেছে বটে কিন্তু অনুকম্পা চায় নি। অপেক্ষা করেছে ওর কাছ থেকে ডাক আসবে বলে।

বসুন্ধরা আজ গিয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার এক ক্লিনিকে। দশ মিনিটে সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞাপনের মিছিলে এই ক্লিনিকের নামটাই তার চোখে বেশি করে পড়েছিল। ফোনেই কথা বলেছিল। ওরা ওকে দুপুর নাগাদ চলে আসতে বলেছিল। তবে বলেছিল, খুব যদি প্রয়োজন হয় তবে আজ রাতটা ওদের ক্লিনিকে থেকে যেতে হতে পারে।

বড়োমামীকে বলেছিল, ও ওর এক বান্ধবীর বাড়িতে যাচ্ছে। বান্ধবীর বিয়ে, না গেলেই না। চেষ্টা করবে বিয়েটা শুরু হলেই ও চলে আসবে।

নার্সিং হোম আগলে রেখেছে মেয়েটা। শত চেষ্টা করেও একদিনের জন্যও বিশ্রাম নেওয়াতে পারেন নি। বরং তিনিই মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বসুন্ধরা বলেছে, বড়োমামী, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি আজকে নার্সিং হোমে যেও না। আমিই সামলে নেব।

এই প্রথম বলেছে সে আজ বান্ধবীর বাড়িতে এই একবেলার জন্য ঘুরে আসবে।

বড়োমামী আগ্রহের সাথে বলেছিলেন, যা মা, তুই যা। আমি আছি তোর বড়ো মামা আছে। তার থেকেও বড়ো কথা বড়দি চলে এসেছেন। তুই কোনো চিন্তা করিস না। তুই আজকের রাতটা বান্ধবীর কাছেই থাক। মনটা একটু হালকা হবে।

যাবার সময় বড়োমামা ও বড়োমামীকে প্রণাম করেছিল বসুন্ধরা।

বড়োমামা ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, পাগলি মেয়ের কাণ্ড দেখ। একবেলার জন্য বন্ধুর বিয়েতে যাচ্ছে, তাতেই প্রণাম। নিজের বিয়ের সময় কি করবি?

বড়োমামী বলেছিলেন, ওকে আর লজ্জা দিও না। বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোকে নিয়ে আর পারি না। তুই বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিস, না নার্সিং হোমে যাচ্ছিস? এটা কি বিয়ে বাড়ির পোষাক হল?

বসুন্ধরা বলেছিল, বাড়ি থেকে এভাবেই যাচ্ছি। স্যুটকেসে সব নিয়েছি। ওখানেই ড্রেস করে নেব।

বড়োমামা বলেছিলেন, ভুইভাবাকে বল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বসুন্ধরা বলেছিল, না মামা, আমি ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা বরং একটু তাড়াতাড়ি নার্সিং হোমে চলে যেও।

ক্লিনিকটার বিজ্ঞাপন দেখে যা কল্পনা করেছিল তার সাথে কোনো মিল নেই। একটা গলির মধ্যে ছোট্ট বাড়ি। অপরিচ্ছন্নতার ছাপ। অথচ বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে আধুনিকতম ক্লিনিক। মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত।

ছোটো একটা দশ বাই দশ ঘরে অনুসন্ধান অফিস। মধ্যবয়সী এক মহিলা কাউন্টারে বসে আছে। সামনের সোফায় জনা চারেক মহিলা। তাকে ঢুকতে দেখেই সবার কৌতূহলী দৃষ্টি যে তার প্রতি বিদ্ধ হয়েছিল সে বুঝতে পারছিল।

বসুন্ধরা কাউন্টারের মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ডাঃ গুপ্ত আছেন? আমার সাথে তার ফোনে কথা হয়েছে।

মহিলা বলেছিলেন, বসতে হবে, উনি ও টি-তে আছেন।

বসুন্ধরা সামনের সোফায় বসতে যেতেই ভদ্রমহিলা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পেটখালাশ? মানে অ্যাবরশন তো?

ভদ্রমহিলার বলার ভঙ্গিটা বসুন্ধরার মাথার ভিতর বিদ্যুত তরঙ্গের মতন আঘাত করেছিল। শান্ত ভাবেই মাথা নেড়েছিল।

বিয়ে হয় নি বুঝি?

বসুন্ধরা চুপ করেই ছিল।

বুঝেছি, ভদ্রমহিলার ঠোঁটে একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি। মধু লুটে কেটে পড়েছে। ভয় নেই ডাক্তার গুপ্তের কাছে জল-ভাত। তার সাথে যখন আপনার কথা হয়েই গেছে তখন এখানকার খরচের ব্যাপারটা তো জানেন। আজ সকাল থেকে তিনজনের খালাশ হয়েছে। এখন চলছে চার। আপনার আগে আরো একজন আছে।

বসুন্ধরা সোফার দিকে এগিয়ে যেতেই একটা লোক ভিতর থেকে সাদা কাপড়ে মোড়া একটা পুটলির মতন জিনিস নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা তাকে ডেকে বললেন, এই বিষ্ণু, এটাকে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে একটু বেশি গর্ত করে পুতে দিস। পাঁচমাসের ভ্রূণ, পুরো বাচ্চা। একটু দেখে নি দাঁড়া। কাপড়টা তুলতেই বসুন্ধরা দেখেছিল তুলতুলে নরম লাল এক ক্ষুদ্র শিশু। চোখ, মুখ, নাক, চুল সবই হয়েছে।

ভদ্রমহিলা তখনও বলে চলেছেন, তোর তো কোনো কাণ্ড-জ্ঞান নেই—সেবার একটা খালাশ বাচ্চাকে এমন গর্তে বোজালি, কুকুর টেনে বের করে আনল। আর সেই নিয়ে পাড়ার ছেলেদের হামলা সামলাতে প্রাণ যাবার অবস্থা।

বসুন্ধরা তখনও দাঁড়িয়েছিল।

ভদ্রমহিলা তাকে বলেছিলেন, আপনার কত মাস?

তিন।

আপনি বসুন ভাই। আপনার তো সবে মানুষের আকৃতি এসেছে। অসুবিধা হবে না।

শরীরটা গুলিয়ে এসেছিল। নিজেকে কোনো মতে সামলে সোফাটাতে এসে বসেছিল বসুন্ধরা। সারা শরীর জুড়ে ঘাম বয়ে চলেছে। চোখটা বুজতেই সেই লাল মাংস-পিণ্ডের ভ্রূণটা ভেসে উঠল। মনে হল ও তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। ভয়ে চোখের পাতা দুটো আবার মেলে ধরতেই দেয়ালের দিকে চোখ পড়েছিল অ্যালেম্বিক কোম্পানীর হেমেগার বিজ্ঞাপন। মাতা মেরীর কোলে শিশু যীশু। কুমারী মাতার সন্তান। এক অপূর্ব সৌন্দয

মনকে চুম্বকের মতন আকৃষ্ট করে রাখে। অজান্তেই একটা হাত বসুন্ধরা তার পেটের উপর রেখেছিল। মনে হয়েছিল সে যেন তার গর্ভের সেই সন্তানের হৃদস্পন্দনকে হাতের তালুতে অনুভব করতে পারছে। একটা অবসাদ তাকে আবার চোখ দুটিকে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু বন্ধ চোখের পর্দায় আবার ভেসে উঠেছিল সেই লাল মাংস-পিণ্ডের ভ্রূণ। চোখ খুললেই মাতা মেরীর কোলে শিশু যীশুর দেয়াল-বিজ্ঞাপনের ছবি।

বসুন্ধরা দুটি ছবির থেকেই তার মনকে সরিয়ে নিতে পাশের টি-টেবিলের উপর কয়েকটা পুরানো খবরের কাগজ থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়েছিল। বেশ কয়েক দিনের পুরানো কাগজ হলেও অনেকদিন খবরের কাগজের দিকে চোখ বোলাতে সময় পায়নি। পাতা উল্টাতেই একটা খবরের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠেছিল বসুন্ধরা। সংবাদ শিরোনামটা বেশ বড়ো করেই দিয়েছে।

গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে তরুণী অধ্যাপিকার মৃত্যু। শোকে প্রেমিকের আত্মহত্যা।

খবরটা পড়তে গিয়েই চমকে উঠেছিল বসুন্ধরা। খবরে লিখেছে মালদার এক কলেজের অধ্যাপিকা অনিতা মণ্ডল তার প্রেমিকের সাথে দক্ষিণ কলকাতার এক ক্লিনিকে গর্ভপাত ঘটাতে এসে অত্যধিক রক্ত ক্ষরণের জন্য মারা গেছেন। প্রেমিকার এই শোচনীয় মৃত্যুকে সইতে না পেরে তার প্রেমিক রেলের তলায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

বসুন্ধরা সংবাদটি পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকেছিল। অনিতা মণ্ডলকে সে চেনে। বোলপুরের মেয়ে। ইউনিভার্সিটিতে একই সাথে পড়েছে। ছোটোখাটো মিষ্টি চেহারা। মাথা ভর্তি ঘন চুল। প্রতিটি কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ত। অনর্গল কথা বলত। বলার ভঙ্গিটাও ছিল চমৎকার, না শুনে পারা যেত না। বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটা ছেলের সাথে তার ভাব হয়েছিল। তাকে দেখেছে বসুন্ধরা। কিন্তু তার চেহারা আজ আর মনে করতে পারছে না।

মালদার একটা কলেজেই চাকরি পেয়েছিল অনিতা। বসুন্ধরাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে লিখেছিল, তোদের দেশে যাচ্ছি। তুই আগে দেখা করবি, না আমাকে আগে গিয়ে তোর মান ভাঙাতে হবে, জানাস।

বসুন্ধরাই গিয়েছিল দেখা করতে। অনেকক্ষণ ছিল ওর সাথে। সারাক্ষণ দুজনে কথা বলেছে। কিন্তু একবারও ও ওর প্রেমিকের প্রসঙ্গ তোলেনি। বসুন্ধরারও মনে ছিল না ওর প্রেমিকের কথা।

অনিতা পরের রবিবার এসেছিল বুলবুল চণ্ডির বসুন্ধরার বাড়িতে। স্বর্ণপ্রভা ছাড়েন নি তাকে। নতুন চাকরি তাই স্বর্ণপ্রভাকে অনেক বুঝিয়ে পরের দিন রওনা হতে পেরেছিল। সেদিনও দুই বন্ধু, পাশাপাশি শুয়ে গল্প করেই রাত কাটিয়ে দিয়েছিল। অথচ অনিতা সেদিনও তার প্রেমিকের কথা একবারের জন্যও বলেনি।

সেই অনিতা গর্ভপাত করাতে এসে মারা গেছে, ভাবতেই চোখ বুজে ফেলেছিল বসুন্ধরা। মনে হয়েছিল তাকেও ডাক্তার কসাইয়ের ছুরি হাতে করে তেড়ে আসছে।

চোখ মেলতেই আবার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়েছিল মাতা মেরীর কোলে শিশু যীশুর ছবিটার উপর। একটা অদ্ভুত শিহরণ তার শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। বসুন্ধরা স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

রিসেপসনিষ্ট ভদ্রমহিলা বসুন্ধরাকে দেখে বলেছিলেন, আগের পেশেন্টের কেসটা একটু জটিল। তাই ডাক্তারবাবুর ও টি তে এত দেরি হচ্ছে। তারপর চাপা গলায় বলেছিলেন, আপনার তাড়া থাকলে আপনাকেই এর পর পাঠিয়ে দেব।

বসুন্ধরা জবাব দিয়েছিল, তার দরকার হবে না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভদ্রমহিলা, কেন?

ডাক্তারবাবুকে বলে দেবেন, যার জন্য ওনাকে আমি ফোন করেছিলাম তার দরকার নেই।

বসুন্ধরা কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে স্যুটকেসটা শক্ত মুঠোয় ধরে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরে বলেছিল, সল্ট লেক।

কাঁকুড়গাছির মোড়ে অবরোধ। ভেবেছিল নার্সিং হোমে আজ আর যাবে না। শরীর জুড়ে এক তীব্র অবসাদ। মাথাটা মনে হচ্ছিল ব্যথায় ছিঁড়ে যাবে। ট্যাক্সিটা আর দাঁড়াতে চাইছিল না। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা ওষুধের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। মাথার ব্যথাটা আরো যেন বেড়ে চলেছে। দুটো নোভালজিন এক সাথে খেয়ে নিয়ে কাউণ্টারে জিজ্ঞাসা করল।

একটা ফোন করতে পারি?

দু-টাকা।

ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে কাউণ্টারের উপর রেখে ডায়াল ঘোরাল।

—হ্যালো, ডায়মণ্ড নার্সিং হোম, স্পিকিং।

—এক নম্বর কেবিনের কাউকে একটু দয়া করে ডেকে দেবেন?

—ধরুন।

বড়ো মামী ফোন ধরেছিল।

আমি বসুন্ধরা, বড়ো মামী। দিদা কেমন আছে?

একই রকম। শোনো অমিয়া দেবী এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন,—

কি বললে? বড়োমা অসুস্থ? আমি এক্ষুনি আসছি।

বড়োমামীকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটা রেখে দিয়ে একরকম ছুটেই স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়েছিল। কাউণ্টার থেকে বাকি টাকা ফেরত নেওয়ার কথা মনে ছিল না।

অবরোধের ঢেউ অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে উল্টাডাঙ্গার কাছে এসে একটা ট্যাক্সি পেয়েছিল। ট্যাক্সি দাঁড়াবার আগেই ভাড়ার টাকা ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল, বাকি টাকা ফেরৎত নেবার সময় নেই। ট্যাক্সি দাঁড়াবার সাথে সাথেই ট্যাক্সি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতেই নার্সিং হোমে ঢুকেছিল।

কেবিনের ভিতর ঢুকেই বড়োমামীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বড়োমা কোথায়, বড়োমামী?

বড়োমামী বলেছিলেন, তুই তো আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটা রেখে দিলি। তোর বড়োমামা ওনাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেছে।

সে কি? তুমি যে বললে বড়োমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তবে তাকে যেতে দিলে কেন? পাশেই যে দিদা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে শুয়ে আছে তা ভুলে গিয়ে কথাটা জোরেই বলে ফেলেছিল বসুন্ধরা।

আমি আর তোর বড়োমামা অনেক করে বলেছিলাম। উনি যে কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, তাকে যেতেই হবে।

বড়োমামী তার কথায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন দেখে লজ্জা পেয়েছিল বসুন্ধরা। বলেছিল, আমি এরকমভাবে কথা বলে ফেলেছি বলে তুমি কিছু মনে করো না বড়োমামী। আসলে বড়োমা এত অসুস্থ, তাও জোর করে চলে গেলেন ভেবে খুব খারাপ লাগছে। আমি তো তাকে চিনি। আমি থাকলেও তার যাওয়া আটকাতে পারতাম না।

বড়োমামী বসুন্ধরাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার কপালে একটা স্নেহের চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেছিলেন, পাগলি মেয়ে আমার। তোর কথায় আমি আবার কি মনে করব? আমার নিজেরই কি কম খারাপ লাগছে? তবে কি জানিস? মাকে এই অবস্থাতে দেখেও যখন তিনি যেতে চাইলেন তখন বুঝতেই পারিস, না গিয়ে তার কোনো উপায় ছিল না।

একটা ফোন এসেছিল লণ্ডন থেকে।

বসুন্ধরা বলেছিল, ছোটোমামার ফোন, তুমি যাও বড়োমামী। আমি দিদার কাছে বসছি।

বড়োমামা সে সময়ই এসেছিলেন। তাকে দেখেই বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি যাও। ছোটোর ফোন এসেছে।

বড়োমামী বসুন্ধরার একেবারে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলেছিলেন এই ড্রেসেই বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলে?

বসুন্ধরার শরীরটা কেঁপে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি আঁচলটা দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে বলেছিল, আমি শুধু বান্ধবীর সাথে দেখা করেই চলে এসেছি। দিদার জন্য মনটা ভালো লাগছিল না, বড়োমামী।

ভালো করেছিস। বড়োমামীর গলাটা কান্না-ভেজা, তোরা এতক্ষণ ছিলি না। ডাক্তারবাবু আমাকে বলে গেছেন প্রেসার কমে গেছে। রেনাল ফাংশন বন্ধ হয়ে এসেছে। অবস্থা ভালো নয়।

বসুন্ধরা মামীর একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলেছিল, কি হবে তবে বড়োমামী?

বসুন্ধরার মাথাটা বুকের ভিতর টেনে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বড়োমামী। কপালে এসে পড়েছিল তপ্ত চোখের জল। বড়োমামী কাঁদছেন।

বসুন্ধবা কোনো মতে বলেছিল, দিদা কি তাহলে চলেই যাবে?

বড়োমামী বসুন্ধরার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, তোকেই শক্ত হতে হবে বসুন্ধরা। তোকেই তো তোর বড়োমামাকে সামলাতে হবে।

বসুন্ধরা বড়োমামীর বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল, আমি পারব না, বড় মামী।

মা, আমার, ধরা গলায় বলেছিলেন, বড়োমামী। তুই আমাদের মা-মেয়ে দুটোই। তুই না পারলে আর কে পারবে?

বড়োমামা এখনো আসছে না কেন মামী? তুমি ছোটো মামা ও ছোটো মামীকে আসতে বলে দাও। বসুন্ধরা বড়োমামীর বুক থেকে মুখটা তুলে এনে বলেছিল।

মামী বলেছিলেন, তুই তাহলে দিদার কাছে বস। আমি তোর ছোটোমামাকেও আসতে বলি।

বসুন্ধরা শুধু বলেছিল, তাড়াতাড়ি এসো বড়োমামী।

| ৩১ |

স্বর্ণপ্রভার স্বর্ণকান্তি দেহটা আজ বিকেল থেকেই কেমন একটা সোনালি দ্যুতির আভায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সাদা চাদরে বুক পর্যন্ত ঢাকা। ডান হাতটা চাদরের বাইরে। স্যালাইনের সূচ বিঁধে আছে। বাঁ হাতটা চাদরের ভিতর দিয়েই বুকের উপর রাখা।

বসুন্ধরা দিদার মাথার কাছের চেয়ারে বসেছিল।

দু চোখ বোঁজা দিদিমার মুখের দিকে তাকাতেই তার শরীর জুড়ে এক অজানা কম্পনের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। কি প্রশান্ত নির্লিপ্ততায় তার দিদিমা ঘুমিয়ে আছে। মনে হচ্ছিল, দিদা তার সারা জীবনের বিশ্বাসের পুঁজিকে এই বুকে রেখে এত নিশ্চিন্তের ঘুমে ঘুমিয়ে আছে।

দিদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই স্নায়ু-কোষগুলি শবীবেব সমস্ত আর্দ্রতাকে নিংড়ে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে বেব করে দিতে চেয়েছিল। অবিশ্রান্ত অশ্রুধাব'ব পর্দাব মধ্যে দিয়ে বসুন্ধবার মনে হয়েছিল দিদা যেন তাব দিকে বিশ্বাসভঙ্গেব যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

দিদা, একটা চাপা স্বব বেবিয়ে এসেছিল বসুন্ধবাব গলা দিযে। নিজেব মুখটা দিদাব মুখেব কাছে নামিয়ে এনে বলেছিল, দিদা, আমি যে তোমাব বিশ্বাসেব দাম দিতে পাবলাম না।

বসুন্ধবার মনে পড়েছিল, সে দিদাকে জিজ্ঞাসা কবেছিল, দিদা, তুমি আমাকে কতখানি বিশ্বাস কব?

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, কেন বে? তুই কি কিছু কবেছিস?

বসুন্ধবা স্বর্ণপ্রভাব কোলে মাথা বেখে বলেছিল, তাহলেই বোঝ, তুমি আমাকে কেমন বিশ্বাস কব।

স্বর্ণপ্রভা তাকে বুকেব মধ্যে টেনে নিযে বলেছিলেন, আকাশেব চাঁদ আব সূর্যকে যেমন বিশ্বাস কবি তোকেও যে আমি সে বকম বিশ্বাস কবি। আমি জানি তুই কোনো অন্যায কাজ কবতে পাবিস না।

বসুন্ধবা স্বর্ণপ্রভাব গলাটা জড়িয়ে ধবে বলেছিল, কিসেব জোবে তুমি আমাকে এত বিশ্বাস কব দিদু?

স্বর্ণপ্রভা ওব গালে তাব ঠোঁট দুটো ছুঁইয়ে দিযে বলেছিলেন, আমাব আদবেব নাতনি বলে। আমি তো এটাও জানি, তুই যেমন কোনো অন্যায কবতে পাবিস না তেমনি কোনো অন্যায মুখ বুজে সইতেও পাবিস না।

কিন্তু দিদু তুমিই তো আমাব নাম বেখেছ বসুন্ধবা। ভেব দেখ, এই পৃথিবী প্রতিদিন তাব উপব সমস্ত অন্যায-অবিচাব কি ভাবে নীববে সযে চলেছে।

খুব ভুল কথা, দিদিভাই। স্বর্ণপ্রভাব চোখ দুটো সেদিন যেন জ্বলে উঠেছিল। বলেছিলেন, তুই শুধু পৃথিবীকে নীববে সব সইতেই দেখেছিস। এই বসুন্ধবাব প্রতিবাদী রূপ যে কি ভযঙ্কব হতে পাবে, তা তো ভাবিস নি। ভাবছিস বসুন্ধবা শুধু সইতেই জানে। সে যখন প্রতিবাদে সামান্য গা ঝাড়া দেয তাতেই তো সব তাসেব ঘবেব মতন ভেঙে পড়ে। বসুন্ধবা জানে তাব অমিত শক্তিব কথা। যাব শক্তি আছে সেই তো ক্ষমা প্রদর্শন কবতে পাবে। সেটাই তার মহত্ত্ব। অক্ষমেব ক্ষমা তো তাব কাপুরুষতাব পবিচয।

বসুন্ধরা বলেছিল, মাকে কেন তুমি এত ভীতু কবে গড়ে তুলেছিলে? বাবাব পাশবিব ব্যবহাবেব বিরুদ্ধে কেন তুমি তাকে বিদ্রোহ কবাব প্রেবণা দিতে পাবনি?

সেটাই তো আমাব জীবনেব চরম শিক্ষা। স্বর্ণপ্রভা বসুন্ধবাব হাত দুটো নিজেব হাতেব মুঠোয তুলে নিযে বলেছিলেন, এটাই ছিল আমাব চবম ভুল। আমি তোব মাকে বামাযণ পড়ে শোনাতাম। সীতাব মতো সতী-সাধ্বী হবাব কথা বলতাম। কিন্তু দিদি তোকে তো আমি রামায়ণেব গল্প বলিনি। তোকে আমি মহাভাবতেব চিত্রাঙ্গদাব কথা শুনিযেছি। তাই তোকে বলি, সীতার মতন পাতালে প্রবেশ না কবে সত্যেব ধ্বজাকে সবাব সামনে বুক ফুলিযে তুলে ধববি। নিজেব মনকে প্রশ্ন কবে যদি উত্তব পাস সেটিই সত্যি, তবে কে কী ভাবল বা ভাববে তাব জন্য তোযাক্কা না কবেই এগিযে যাবি।

বসুন্ধরা বলেছিল, কিন্তু দিদা, তোমাব সমাজ তা মানবে তো?

কিসেব সমাজ? কার জন্য সমাজ? দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলেন স্বর্ণপ্রভা। এই সমাজেব কথা ভেবেই তো তোর মাকে আমি হাবিযেছি। এই সমাজ তোব মাকে কি ফিবিযে দিতে

পারবে? অথচ সমাজ কিন্তু একবারও প্রশ্ন করল না, ঐ লোকটা কী করে আবার বিয়ে করল? আর আমি সেই সমাজের ভয়ে তোর মাকে বলতে পারলাম না এই সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে তুই ফিরে আয় আমার কাছে। শুরু কর নূতন জীবন।

বসুন্ধরা বলেছিল, আমি বুঝি তোমার কষ্ট। তুমি যা মাকে শিখিয়েছ তা তোমার জীবনের শেখা থেকেই শিখিয়েছ দিদা। আর এটাই স্বাভাবিক। তবে তোমার সাথে অন্যদের পার্থক্য হল, অন্য সাধারণ মানুষ যখন এটাকেই নিয়তি বলে মেনে নেয়, তুমি সেখানে নিয়তির বিধানকে পরাস্ত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলছ।

দিদা আজ নির্বাক। বসুন্ধরা স্বর্ণপ্রভার মুখের কাছে নিজের মুখটা প্রায় মিশিয়ে দিয়ে কেঁদে ফেলেছিল।

আমি যে তোমার কাছে আমার সেই সত্যটিই বলতে চাই। তুমি শুধু একবার চোখ মেলে তাকাও দিদা।

বসুন্ধরার মনে হয়েছিল, দিদার শরীরটা যেন নড়ে উঠেছিল। মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দে চমকে উঠেছিল।

স্বর্ণপ্রভা চোখ দুটো মেলেছিলেন। তার দৃষ্টির মধ্যে ছিল ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টির প্রলেপ। বসুন্ধরার মনে হয়েছিল, দিদা বলতে চাইছে তোর সব খবর আমি জানি।

বসুন্ধরা স্বর্ণপ্রভার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, আমি যে পাপ করেছি দিদা। তোমার এত বড়ো বিশ্বাসের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

বসুন্ধরার মনে হয়েছিল দিদা মাথাটা নাড়িয়েছিল। যেন বলতে চাইছেন, তোর কোনো পাপ হয়নি। তুই কোনো বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করিস নি। তুই যা করেছিস তা তো তুই তোর বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়েই করেছিস। যেমন দিদা আগে বলতেন তোর যা ভালো লাগবে, যা ভালো মনে হবে তাই করবি। চুরি করে? করবি না। সেটাই হবে অপরাধ।

বসুন্ধরা স্বর্ণপ্রভার চোখের তারার দিকে নিজের চোখ রাখতেই কেঁপে উঠেছিল। বলেছিল, দিদা তুমি বলে যাও আমি কী করব? আমি যে মা হতে চলেছি। তমালের সন্তান আমার গর্ভে বেড়ে চলেছে। আমি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। মাতা মেরী তাকে হত্যা করতে দেয় নি। আমি নিজেকে মারতে চেয়েছিলাম। অনিতার মৃত্যুর খবর আমাকে বাঁচার শক্তি দিয়েছে।

আবার একটা ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে এসেছিল স্বর্ণপ্রভার গলা দিয়ে।

স্বর্ণপ্রভার মুখের কাছে নিজের কানকে এগিয়ে নিয়ে এসে বসুন্ধরা শুনতে চেয়েছিল সেই শব্দের ভাষাকে। বসুন্ধরার মনে হয়েছিল, দিদা যেন তাকে বলছে, তোর পাপ হয়নি। যে আসতে চাইছে তাকে আসতে দে। সত্যিকে চেপে রাখার চেষ্টা করিস না। সত্যি বড় নিষ্ঠুর। চাপা পড়ার অপমান সে সইতে পারে না। দেখেছিস তো তোর মা সত্যিকে সকলের সামনে চেপে রাখতে গিয়ে নিজেই কিভাবে সেই খুনির হাতে খুন হল।

বসুন্ধরা স্বর্ণপ্রভার বুকে নিজের মুখটা চেপে ধরে কতক্ষণ কেঁদেছিল জানে না। মাঝখানে শুধু বলেছিল, দিদা, তোমার কথাই আমি রাখব। যা সত্যি তা আমি সবার সামনে হাজির করব। যে আসছে সে আসুক। সেই হবে আমার কর্ণ। আমি তাকে কুন্তির মতন ভাসিয়ে দেব না। সে বাড়বে তার আপন পরিচয়ে। সে হবে আমার আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞান। শুধু তুমি একবার বলে দাও, আমি যা ভাবছি তা ঠিক।

বসুন্ধরা আজও জানে না সেদিন সেটা তার মনের ভুল কিনা। হয়ত অবচেতন মনের ভাবনাটাই দিদার গলার ঘড় ঘড় শব্দের মধ্যে শুনতে চেয়েছিল। মনে হয়েছিল দিদা যেন বলেছিলেন, তুই যা ভাবছিস সেটাই সত্যি।

সেই আগন্তুক অতিথির পরিচয় কি হবে তা স্বর্ণপ্রভার কাছ থেকে জেনে নিতে পাবে নি। হয়ত সে জানাতেও চায়নি। অথচ সে দিদার কাছে তার মনেব দরজা খুলে দিয়ে সব প্রশ্নেরও জবাব খুঁজেছিল। সত্যকে নিজের আয়নায় দাঁড় কবানো যে কত কঠিন তা বসুন্ধবা বুঝতে চেয়েছিল। ভেবেছিল সে কথাও দিদা বলে যাবে। কিন্তু স্বর্ণপ্রভাব খোলা চোখ দুটি ধীরে ধীরে বুজে যেতেই হাতের স্পর্শে একটা শীতল স্রোত অনুভব কবেছিল।

স্বর্ণপ্রভার চোখের পাতা স্থির। বুকের সেই ওঠা-নামার ঢেউ-এব ছন্দ একেবারেই স্তব্ধ। স্বর্ণাভ মুখের উপর একটা ধূসর ঢাকনা।

বসুন্ধরা চীৎকার করে উঠেছিল, দিদা।

তার সেই চীৎকার কতদূব পর্যন্ত পৌঁছেছিল সে জানতে পাবে নি। যখন জ্ঞান ফিবেছিল ততক্ষণে দিদার নিস্পন্দ মুখটাকে চন্দনেব ফোঁটা দিয়ে সাজানো চলছে।

| ৩২ |

বুলবুল চণ্ডি। এখানেই কেটে গেছে চৌদ্দোটা বসন্ত। দিদার মুখে শুনেছিল, সে যখন এখানে এসেছিল তার বয়স ছিল সাত বছব। সেই বাড়ি, সেই ঘব, এব প্রতিটি ইঁটে দিদাব স্পর্শ। দিদা নেই, অথচ সে এবাড়ির ঘরে শুযে আছে, থেকে থেকেই মনে হচ্ছে, দিদা বুঝি বাবান্দা দিয়ে হেঁটে চলেছে, এক্ষুনি তাব ঘবে ঢুকে বলবে।

কি রে, এমন অসময়ে শুয়ে আছিস? দেখি তোব কপালটা, জ্বব বাঁধিয়ে বসিস নি তো?

দেয়াল ঘড়িটা টিক টিক করে চলছে। দাদুর আমলের ঘড়ি। এখনও চলছে। এ বাড়িব প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী থেকে একনিষ্ঠ প্রহরীর কাজ করে চলেছে।

বসুন্ধরা বালিশে মাথা রেখে নিষ্পলক চোখে সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিযে ছিল। প্রচণ্ড গতিতে ফ্যানের ব্লেডগুলো ঘুরে চলেছে। বসুন্ধরা খোঁজাব চেষ্টা করছিল ব্লেডেব মাঝখানেব ফাঁকা জায়গাগুলিকে। অথচ একটা আবছা ছায়া-ছাড়া আব কিছুর খোঁজ পাচ্ছিল না। ভিতবেব ফাঁকগুলি গতির দৃষ্টি-বিভ্রমে ঢেকে গেছে।

বসুন্ধরার জীবনেও একুশটি ঋতুর আগমনেব যে নিরবচ্ছিন্ন ধাবা বয়ে গেছে তার ভিতবে সময়ের ফাঁকগুলিও যেন মাঝে মধ্যে এমন আবছা মনে হয়। সুইচটা অফ্ কবে দিলে যেমন ব্লেডের ফাঁকগুলি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তেমনি আজ যেন বসুন্ধরাব জীবনের বসন্তেব মাঝেব ঘটনাগুলি তার কাছে জীবন্ত হয়ে হাজির হচ্ছিল। অথচ পাখার এই বৈদ্যুতিক গতিব মতোই তার জীবনের ঘটনাগুলি এত দ্রুত পটপরিবর্তন করছিল যে সে সেই পরিবর্তনেব মাঝেব সময়গুলিকে দেখতে পায় নি।

যখন মায়ের অগ্নিদগ্ধ দেহটার স্মৃতি তাব শিশু মনেব কোমল ভাবনাকে পুড়িয়ে দিযে অসহ্য যন্ত্রণায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখনই বড়দি এসেছিলেন তাদের বাড়িতে। সঙ্গে তমাল, লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, মুখের আদলে মায়ের ছাপ। বড় বড় দুটি চোখ, জোড়া ভুরু। মায়েব আঁচল ঘেঁসে বসুন্ধরার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল।

দুটি শিশু কৈশোরের সিঁড়িতে সবে পা দিয়েছে। একজন সদ্য পিতৃহারা, অপর জন মাতৃহারা। কি হারিয়েছে বুঝতেই হয়তো দুটি মন একে অপরের হাত ধরেছিল।

স্বর্ণপ্রভা অমিয়া দেবীর আসার খবর পেয়ে নীচে নেমে এসে তমালকে বুকে টেনে এনে ওর কপালে একটা স্নেহচুম্বন এঁকে স্বর্ণপ্রভার হাত ধরে বলেছিলেন, এরপর যদি বাড়ির নীচে থেকে আসার খবর পাঠাস তবে চুলের মুঠি ধরে কিল মারব। বড় দিদিমনি হলেও মার কাছে মেয়েই থাকবি। সোজা চলে আসবি।

তমাল মজা পেয়েছিল। তার মাকে কেউ বকতে পারে এটা ভেবে প্রথমে খুব আনন্দ পেলেও মাকে মারবে শুনে সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

তুমি আমার মাকে মারবে কেন?

ওরে দাদু ভাই আমার, তোর মা যে আমার মেয়ে। ওকে কি আমি মারতে পারি? স্বর্ণপ্রভা তমালকে দু-হাতে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

বসুন্ধরা এগিয়ে এসে তমালের হাত ধরেছিল। বলেছিল, চল, তোমাকে একটা মজার খেলনা দেখাব।

বৈশাখীর ঘরটাকেই স্বর্ণপ্রভা বসুন্ধরার পড়া আর পুতুল ঘর করে দিয়েছিলেন। দুই মামাই এনে দিয়েছে নানা পুতুল আর বই। মাতৃহারা এই ভাগ্নীর প্রতি তাদের স্নেহ ছিল নিখাদ।

লণ্ডন থেকে কয়েক দিন আগে ছোটো মামা বসুন্ধরাকে একটা মিনি কম্পিউটার পাঠিয়েছিলেন। সেটা কথা বলতে পারে। কথার জবাবও দেয়। বসুন্ধরা কদিন সেটা নিয়েই মেতে আছে। যেই আসে তাকেই দেখাতে হাত ধরে টেনে আনে।

তমাল টেবিলের কাছে যেতেই বসুন্ধরা সুইচটা অন করে দিয়েছিল।

খেলনা কম্পিউটারটি কথা বলে উঠেছিল, গুড মর্নিং, আস্ক মি।

প্রথমে বেশ ভয় পেয়েছিল তমাল। তারপর মজা পেয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, টেল মি, হোয়াট ইজ মাই নেম?

কম্পিউটার জবাব দিয়েছিল, ডোণ্ট আস্ক মি হোয়াট ইউ নো ইয়োর সেল্ফ।

লজ্জা পেয়ে বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তমাল।

বসুন্ধরা হেসে বলেছিল, কেমন জব্দ! আর কিছু জিজ্ঞাসা কর।

সারাটা বিকেল তমাল এই ঘরে কাটিয়েছিল। খেতে ডাকলেও যেতে চায়নি। স্বর্ণপ্রভা এই ঘরেই ওদের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, খেলনাটা খুব মজার তাই-না?

তমাল বলেছিল, খুব সুন্দর, এটা আমাকে দেবে?

মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল বসুন্ধরার। এটা তার বড্ড প্রিয়। কিন্তু কেউ চাইলে যে সে না করতে পারে না। বলেছিল দেব।

তমাল বলেছিল, তবে এটাকে আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই।

ঢোক গিলেছিল বসুন্ধরা। বলেছিল, আজকেই নেবে?

তমাল বলেছিল, আজকেই নিয়ে যাব।

এটা তো অনেক ভারী। তুমি তুলতে পারবে না।

দাঁড়াও মাকে ডেকে আনি।

তমাল একরকম ছুটে এসেই পাশের ঘরে অমিয়া দেবীর কাছে এসেছিল।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, আয় দাদু ভাই।

তমালের সে কথা শোনার সময় নেই। মার হাত ধরে টানতে শুরু করে বলেছিল, মা তাড়াতাড়ি চল, বসুন্ধরা ওর কথা-বলা খেলনাটাকে আমাকে দিয়ে দিয়েছে।

অমিয়া দেবী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওর খেলনা তুমি নেবে কেন?

ও তো দিতে রাজি হয়ে গেল। তুমি ওকে জিজ্ঞাসা কর।

বসুন্ধরা তমালের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অমিয়া দেবী তাকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলেছিলেন, কেউ কাউকে যখন ভালোবেসে কিছু দেন তখন সেটাকে নিজের কাছে খুব যত্ন করে রাখতে হয়, নয়তো তিনি খুব দুঃখ পান।

বসুন্ধরা তমালের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেছিল, ও যে চাইল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তাতে কি হলো? জানো তমালকে ওর মামা একটা খুব সুন্দর রেলগাড়ি দিয়েছে। ওটা নিজে নিজে স্টেশনে এলে থেমে যায় আবার নিজে থেকে কু-শব্দ করে চলতে থাকে। তুমি ওটা ওর কাছে চেয়ে দেখ, ও দেবে না।

অমিয়া দেবী তমালের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কি রে তোর রেলগাড়িটা ওকে দিবি?

তমাল মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছিল, বারে ওটা যে আমার ছোটো মামা দিয়েছে।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, এটা কিন্তু তোর ঠিক হচ্ছে না। তমাল নিক না খেলনাটা। তুই এদের মধ্যে আর এসব ঢোকাস না। আমি ওটা তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, না, দুজনে মিলে খেলুক। কিন্তু সব কিছু এখনই কেন নিজের দখলে আনার চেষ্টা করবে? মাসীমা।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, খেলনাটা তাহলে তোমাদের দুজনেরই থাকল, কেমন?

এই জগৎটাকে তো তমালের সাথে ভাগ করেই নিতে চেয়েছিল বসুন্ধরা।

ছুটিতে তমাল আসত। রাত্রিতে ঘুমোনো ছাড়া এ বাড়িতেই ছিল আস্তানা। স্বর্ণপ্রভা বলতেন আমার দুই নাতি-নাতনি। তমালের আসার হিসেব অমিয়া দেবীর থেকে বসুন্ধরাই অনেক সঠিক ভাবে বলে দিত।

বুলবুল চণ্ডির ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে স্বর্ণপ্রভার বাড়ি। তাকে ছাড়িয়ে যেতে হয় অমিয়া দেবীর বাসায়। তমাল নেমেই আসত স্বর্ণপ্রভার কাছে। বসুন্ধরা আগেই জানিয়ে রাখত দিদাকে,

কাল তমালদার আসার দিন।

বাজারের ফর্দটা নিজের হাতে করতেন স্বর্ণপ্রভা। আইহোর বাজারে পাঠাতেন কৈ মাছ আনতে। পদ্মার ইলিশ পাওয়া যায় হাবিবপুরের ভিতরে বাংলাদেশের সীমান্তে। ইলিশ ভাপে সিদ্ধ তমালের প্রিয়। সাইকেল দিয়ে পাঠাতেন ইলিশ কিনতে।

অমিয়া দেবী আপত্তি তুললে স্বর্ণপ্রভা রাগ করতেন। বলতেন আমার নাতিকে যদি একটু প্রাণ ভরে খাওয়াতে চাই তুই কেন আপত্তি করবি?

স্বর্ণপ্রভার রাগ দেখে অমিয়া দেবী হাসতেন, বলতেন, ঠিক আছে, মা, তুমি তোমার নাতিকে প্রাণ ভরে খাওয়াও। তবে আমার মেয়ের একটুকুও অযত্ন যাতে না হয় সে দিকে যেন লক্ষ থাকে।

স্বর্ণপ্রভা বলতেন, মেয়ের জন্য তোর কত দরদ বোঝা গেছে।

অমিয়া দেবী জানতেন, এটা স্বর্ণপ্রভার অভিমানের কথা। তবু কপট রাগের ভঙ্গি দেখিয়ে বলতেন, তুমি এমন কথা বলতে পারলে, মা?

বলব না কেন? হাজার বার বলব। স্বর্ণপ্রভার অভিমান আরো তীব্র হতো। তোকে এত করে বলি এত বড় বাড়িতে আমরা দুটো প্রাণী। তুই নিভাকে নিয়ে চলে আয়। শুনেছিস সে কথা?

অমিয়া দেবী কথা বাড়াতেন না। চুপ করে যেতেন।

ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বসুন্ধরার কিশোরী দেহের পরিবর্তনগুলি সূক্ষ্ম তুলির টানের মতন যে ধীরে ধীরে মোহময় ভেদ রেখা সৃষ্টি করে চলেছিল তা শুধু আয়নার প্রতিবিম্বেই ধরা পড়েছিল তা নয়, আরেক জনের দৃষ্টি-দর্পণেও যে প্রতিফলিত হচ্ছিল তা তার মুগ্ধ চাউনির মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ছিল।

তমালের নিশ্বাসে যে আগের সেই স্নিগ্ধ উত্তাপ নেই তা বুঝতে পারত বসুন্ধরা। বরং এখনকার এই উত্তাপ যে তার কপালে দহনের অনুভূতি এনে দেয় তা টের পেত। এই দহন-জ্বালার মধ্যে ছিল এক অনাস্বাদিত ভালো লাগার অনুভূতি।

কিছুদিন আগেও লুকোচুরি খেলতে গিয়ে তমাল যখন তাকে জাপটে ধরত তখন গায়ে সুড়সুড়ি লাগত। অস্বস্তিকর গবমে ঘেমে উঠত। ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য ছটফট করত। তমালের গা ঘেঁসে বসতে তার কোনো সঙ্কোচ হতো না। অমিয়া দেবীর কাছে তমালের পক্ষে তুমুল তর্ক জুড়তে কোনো দ্বিধাবোধ হতো না।

আজ কিন্তু ভালোলাগাব অনুভূতি তাকে ঘিরে একটা সঙ্কোচের প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছিল। তমালেব নিশ্বাস ও হাতের স্পর্শ তাকে ভালোলাগার শিহরণ জোগালেও সেই নিশ্বাস ও স্পর্শ তার কাছে নিষিদ্ধ ফল বলেই মনে হত। মনে হতো এ পাপ। একে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

তমালেব কথা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচের বোঝা মনের উপর চেপে বসত। অমিয়া দেবী যখন জিজ্ঞাসা করতেন, হ্যাঁরে, তমালের আসার আর কতদিন বাকি?

বসুন্ধবা আগেব মতন বলে উঠতে পারত না। ওমা, তাও জান না বুঝি? তমালদার আসতে আব এগারো দিন এক ঘণ্টা তেত্রিশ মিনিট দশ সেকেণ্ড দেরি আছে।

অমিয়া দেবী হেসে বলতেন, তুই এর মধ্যে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড আবার কিভাবে খুঁজে পেলি?

বসুন্ধরা বসে যেত হিসেব বোঝাতে। কিছুই বোঝ না। আজ পনেরো তারিখ। তমালদা আসবে ২৬ তারিখ। কত দিন হল?

অমিযা দেবী এখন বসুন্ধরার ছাত্রী। বলতেন এগারো দিন।

বেশ। বসুন্ধরা গম্ভীর হয়ে বলত। মালদার ষ্টেশন মানেই তো তোমার বুলবুল চণ্ডি নয। ওখান থেকে রিকসা নিয়ে বুলবুল চণ্ডি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে আসতে পনেরো মিনিট। স্ট্যাণ্ডে এলেই তো আব তোমাব ছেলেব সুন্দব চেহাবা দেখে ট্যাক্সি ছেড়ে দেবে না। কম করেও বারো জন অ্যামবাসাডরে চড়বে ·· বেই ছাড়বে। আর তোমার ছেলে যা কিপটে ট্যাক্সি রিজার্ভ করে আসার কথা ও ভাবতেই পারবে না। সেখানে ধর আধ ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। কত মিনিট হল?

অমিয়া দেবী বলতেন পঁযতাল্লিশ মিনিট।

বসুন্ধবা বলত, বুলবুল চণ্ডিতে আসতে আরো পয়তাল্লিশ মিনিট যোগ করলে হয় এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট। বাড়িতে আসতে তিন মিনিট।

আব দশ সেকেণ্ড কিসের জন্য রাখলি? অমিয়া দেবীর কণ্ঠস্বরে কৌতুকের ছোঁওয়া থাকত।

বসুন্ধবা বলত ওটা তোমার জন্য। তোমার আদরের ছেলে মা বলে ডাকলে দরজা খুলে দিতে দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম।

তমালকে নিয়ে আলোচনা কবতে, তার কথা শুনতে আগ্রহটা যখন মনের কোণে জমা হতে শুরু করেছিল তখনই সঙ্কোচও তার পাশাপাশি গুটি গুটি পায়ে চোখ রাঙাতে হাজিব হয়েছিল।

অমিয়া দেবী সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করতেন, দেখ তো তমালেব আসাব আর কতদিন বাকি আছে?

বসুন্ধরা সেই হিসেব বলতে পারত না। বলত, তোমার ছেলে এখনও ছোটো বাচ্চা আছে নাকি? তার আসার হিসেব আমি কি ভাবে রাখব?

হাসতেন অমিয়া দেবী, বলতেন, তাহলে তুইও বড়ো হয়ে গেছিস বল। তাই তো আমার ছেলে আমার কাছে খবর না পাঠিয়ে তোর কাছেই খবর পাঠায়।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত বসুন্ধরার মুখ। বলত, তোমার ছেলের খবর রাখতে আমার ভারী বয়ে গেছে।

সে যে বড়ো হয়ে গেছে, সেই আবিষ্কারও তার নিজের। প্রতিটি মেয়েই যে ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করে বসুন্ধরাও নিজেকে নিজেই দেখতে শিখেছিল।

বাথরুমের দেয়ালে আছে পূর্ণদৈর্ঘ্যের বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না। দাদুর ছিল স্নানেব বিলাসিতা। দোতলার উপরে দুটো ঘর ভেঙে তৈরি করেছিলেন এই বিশাল স্নানের ঘর। দিদার কাছে শুনেছে, দাদু এই আয়নাটা কলকাতার এক নামী সাহেব কোম্পানীকে দিয়ে বেলজিয়াম থেকে আনিয়েছিলেন। এর দৈর্ঘ্য ছিল দাদুর দৈর্ঘ্যের সমান।

বাথরুমের তিনপাশের দেয়াল সাদা মার্বেল পাথরে তৈরী। যে দিকে আয়না আছে সেই দেয়ালটা হালকা গোলাপি টাইলসে ঢাকা।

শ্বেত পাথরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে এতদিন নিরাভরণ দেহে স্নান করেছে। হঠাৎই একদিন আয়নার প্রতিবিম্বে নিজেকে দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল বসুন্ধরা।

সাওয়ারের জলের ধারা তার শরীর বেয়ে আঁকাবাঁকা চড়াই উতরাই পথে নেমে চলেছে। এর আগেও সে আয়নায় তার নগ্ন প্রতিবিম্ব দেখেছে। জলসিক্ত দেহটাকে এর আগে কখনও এত মসৃণ, এত উজ্জ্বল দেখায় নি।

বসুন্ধরা তার শবীরের উপর দিয়ে প্রবাহিত এই রূপালি জলস্রোতের প্রতিবিম্বকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের শরীরকেই নতুন করে চিনেছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরীরের প্রতিটি অংশই স্পর্শ করে পরখ করে চলেছিল। সবই মনে হচ্ছিল অচেনা। নিজেকে যেন এই প্রথম দেখেছিল। সেতারের প্রতিটি তাব যেমন শিল্পীব আঙ্গুলের ছোঁওয়ায় পৃথক পৃথক সুর ঝঙ্কার সৃষ্টি করে সেদিন যেন বসুন্ধরার আঙুলের স্পর্শেও তার নিজ দেহের স্নায়ুতন্ত্রগুলি সুখানুভূতির সুরে সাবা দেহে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

সেদিন দিদা তাকে বাথরুমে এতক্ষণ স্নান করতে দেখে না ডাকলে সে যে কতক্ষণ আয়নার সামনে নিজেকে আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত তা বলা মুশকিল ছিল।

বাথরুম থেকে সেদিন বড়ো হয়েই বেরিয়েছিল বসুন্ধরা। দিদার কৌতূহলী চোখের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জা পেয়েছিল। নিজের শরীর নিয়ে এটাই তার প্রথম লজ্জা। দিদার চোখ থেকে নিজের চোখকে নামিয়ে নিয়ে এক ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

সেদিন বিকেলে এসেছিল তমাল। সোজা ঢুকে পড়েছিল বসুন্ধরার ঘরে।

স্বর্ণপ্রভা বাগানে ছিলেন। এসময় বাগানের ফুলগাছগুলিকে যত্ন করেন। তাদের গায়ে হাত বোলান। গোড়ায় জল দেন। তমালকে দেখেই বসুন্ধরার চোখে-মুখে সঙ্কোচের ছায়া পড়েছিল। নিজের থেকেই ফ্রকের দিকে চোখ পড়েছিল। ফ্রকটা হাঁটুর সামান্য ওপরে উঠেছিল। তাতেই সেদিন তমালের কাছে লজ্জা পেয়েছিল। গতকাল পর্যন্ত তমালের সাথে লুটোপুটি করেছে। ফ্রক হাঁটুর অনেক ওপরে বহুবার গুটিয়ে এসেছিল। অথচ তখন কোনো সঙ্কোচের খোঁচা মনের কোথাও উঁকি দেয় নি।

তমালকে দেখে বসুন্ধরা তাড়াতাড়ি ফ্রকটা টেনে হাঁটুর নীচে নামিয়ে এনে বলেছিল, দাঁড়াও তমালদা, দিদাকে ডেকে আনি।

তমাল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, দিদাকে ডাকবে কেন? দিদা তো বাগানের কাজ করছে।

বসুন্ধরা বলেছিল, তাহলে চল বাগানেই যাই। দিদার পাশে গিয়ে বসি।

তমাল আরো অবাক হয়েছিল, বলেছিল, তোমার কি হয়েছে বলত? আমি তো তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। তুমি তখন থেকেই খালি দিদা দিদা করছ কেন?

এবার বসুন্ধরা সত্যিই অপ্রস্তুত হয়েছিল। বলেছিল, চল বারান্দায় বসি। ঘরটা কেমন গুমোট লাগছে।

বসুন্ধরার এই পরিবর্তন কৈশোর উত্তীর্ণ তমালের চোখে ধরা পড়েছিল। সে বলেছিল, তোমার কি হয়েছে বল তো? আমাকে তুমি কেন জানি এড়িয়ে চলতে চাইছ।

কে বলল? বসুন্ধরা তমালের প্রশ্নকে এড়াতে চাইছিল।

তোমার ব্যবহার বলছে। তমাল বসুন্ধরার ভান গালে ডান হাতের তালুটাকে রেখেছিল।

বসুন্ধরার মনে হয়েছিল তমালের হাতের স্পর্শে এত উত্তাপ আগে কখনো পায় নি। অথচ গত কালই এসেছিল তমাল। তোমাব চোখে এটা কি পড়েছে, দেখি বলে সে তার মুখটা ঠোঁটের কাছে এনেছিল। দুহাতে তার গাল দুটোকে ধরে রেখেছিল। কই কালকে তো তাব নিশ্বাসে ও হাতের স্পর্শে কোনো উত্তাপের ছোঁওয়া পায়নি। বলেছিল, গাল দুটোকে এত জোরে চেপে ধরছ কেন? লাগছে।

আজকে মনে হয়েছিল, তমালের হাতেব এই স্পর্শ তার বড়ো হয়ে যাওয়া শরীরে এক অচেনা অনুভূতি এনে দিতে চাইছে। তমালের শরীর থেকেও একটা অজানা গন্ধ তাকে কেমন একটা মাদকতা এনে দিয়েছিল। সেদিন হঠাৎই যেন আবিষ্কার করেছিল, সে নারী। পুরুষের স্পর্শ, তার ঘ্রাণ তার ভালো লাগে। তাই পুরুষ সম্পর্কে তার সাবধান হওয়া প্রয়োজন। নয়তো এই ভালো লাগাই অজগরের সম্মোহনী দৃষ্টিব টানের মতন তাকে কোনো অন্ধকারের গভীরে টেনে নিয়ে যেতে পাবে।

সেদিন বসুন্ধরা তমালের হাতটা তার গাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, চল বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসি। আমি এখন বড় হয়ে গেছি তমালদা। এভাবে দুজনে ঘরের মধ্যে বসে থাকা ভালো দেখায় না।

[৩৩]

এমন একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে সে হায়াব সেকেণ্ডারির রেজাল্ট করে ফেলবে তা কেউ কল্পনা করতে পাবেনি। অমিয়া দেবী বলতেন, বসুন্ধরা এবার কিছু একটা করে দেখাবে। তবে অজ পাড়াগাঁয়ের এই স্কুল যে রাজ্যেব দশটি স্কুলের মধ্যে জায়গা করে নেবে এটা তিনিও ভাবেন নি।

কলকাতায় আগের দিনই খবরটা প্রকাশিত হয়েছে। পোষ্ট অফিস থেকে ফোন করেছিলেন অমিয়া দেবী। খবরটা পেয়েই ছুটতে শুরু করেছিলেন। বড়দিমণি রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছেন। ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছিল। অমিয়া দেবীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কাপড়টা গোড়ালির উপর উঠে এসেছিল—সে দিকে কোনও লক্ষ নেই। তিনি চীৎকার করে বলে চলেছেন, আমার স্কুল তৃতীয় হয়েছে। বসুন্ধরা হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় থার্ড হয়েছে।

বাড়ির গেটের বাইরে যখন পৌঁছেছিলেন তখন রীতিমত হাঁফিয়ে উঠেছেন। ওখান থেকেই চীৎকার করে ডাকছিলেন, মা মিষ্টি খেতে দাও।

স্বর্ণপ্রভা বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, ওপর থেকে তোকে মিষ্টি ছুঁড়ে দেব নাকি রে? ঘরে আয়, দেখি, এমন কি মিষ্টি খবর এনেছিস যে তোকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে।

অমিয়া দেবীর সেদিন কিশোরীর গতিতে প্রায় ওড়ার ভঙ্গি করেই সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে এসেছিলেন। আনন্দে আর সারাটা পথ প্রায় দৌড়ে আসার পরিশ্রমে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন নি। স্বর্ণপ্রভাকে জড়িয়ে ধরে হাঁফিয়ে চলেছেন।

স্বর্ণপ্রভা আঁচ করতে পেরেছিলেন, বসুন্ধরা খুব ভালোভাবে পাশ করেছে। অমিয়া দেবীকে জড়িয়ে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বসুন্ধরা ভালো ফল করবে এতে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এত ভালো করবে তা ভাবতে পারেন নি। স্বর্ণপ্রভার সারা মুখ জুড়ে ফুটে উঠেছিল আনন্দের হাসি। বলেছিলেন, বলিস কিরে! ও এতো ভালো রেজাল্ট করেছে?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, মিষ্টি খাওয়াও।

স্বর্ণপ্রভা অমিয়া দেবীর কপালে একটা দীর্ঘ চুম্বন দিয়ে বলেছিলেন, মিষ্টি তো তুই আমাকে খাওয়াবি। তোর মেয়ে এত ভালো ফল করল, আর তুই আমার কাছে মিষ্টি খেতে চাইছিস?

অমিয়া দেবী জবাব দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিলেন। স্বর্ণপ্রভার চোখের দিকে তাকাতেই চোখ পড়েছিল তার চোখের কোনায় অশ্রুর ফোঁটা টলটল করছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আজকের এই আনন্দের দিনে, তোমার চোখে জল কেন মা?

স্বর্ণপ্রভা আঁচল দিয়ে চোখ দুটিকে মুছে বলেছিলেন, কাঁদছি কোথায়?

পর মুহূর্তেই কালবৈশাখীর মেঘের মতন অমিয়া দেবীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই ভারী শরীরের ধাক্কা কোনো মতে সামলে নিয়ে সেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, হৃদয় নিঙড়ানো কান্নার উৎস কতখানি গভীর হতে পারে।

স্বর্ণপ্রভাকে বাধা দেন নি। তার পিঠে হাত বুলিয়ে শোকের এই প্রবাহকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রবল জলস্রোতেরও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। স্বর্ণপ্রভার শরীরে কম্পন স্তিমিত হয়ে আসার পর মৃদু স্বরে ডেকেছিলেন, অমিয়া দেবী।

মা, তুমিই আমাকে তোমার খুকি বলে বুকে টেনে নিয়েছ। আমি তো তোমার খুকির জায়গাতে ফিরে এসেছি। বসুন্ধরাকে ডেকে তোমার বুকে টেনে নাও। তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া খুকি তার মধ্যে দিয়েই মেয়ের এই সাফল্যের আনন্দটুকু পেতে পারবে।

স্বর্ণপ্রভা আঁচলে চোখ মুছে বলেছিলেন, আর কোনো দিন খুকির কথা ভেবে কাঁদব না। তুই তো বসুন্ধরার মা। তোকে যেদিন দেখেছিলাম সেদিনই ওকে তোর কোলে দিয়ে আমি সব শোক ভুলে গেছি।

সেদিন কথার ফাঁকে কেউ টের পায় নি, বসুন্ধরা কখন এসে তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে। অমিয়া দেবী স্বর্ণপ্রভার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাতেই বসুন্ধরাকে দেখতে পেয়েছিলেন। ওর ভিজে চোখের পাতা ও ভারী মুখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পেরেছিলেন, বসুন্ধরাও তাদের আড়ালে কেঁদে এসেছে।

বসুন্ধরাকে কাছে টেনে স্বর্ণপ্রভার পাশে বসিয়ে দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

বসুন্ধরা স্বর্ণপ্রভার বুকে মুখ গুঁজে নিশ্চল হয়ে বসেছিল। স্বর্ণপ্রভা ওর মাথায় গালটা চেপে ধরে বসেছিলেন। খানিকক্ষণ পরে বসুন্ধরার মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে এনে তার কপালে একটা চুম্বন দিয়ে মাথাটা অমিয়া দেবীর বুকের উপর গভীর মমতায় বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুই তোর বড়মার কাছে থাক। আমি নারায়ণকে পুজো দিয়ে আসি।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর কোলে মুখটা রেখে বলেছিল, বড়োমা, মার কথা আজ এত বেশি করে মনে পড়ছে কেন?

অমিয়া দেবী ওর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, তোর মা যে তোকে ওপর থেকে আশীর্বাদ করে আসছিলেন। আজ তোর এই সাফল্যে সবার আগে সেই তোর মাথায় হাত রেখেছে বলে তার কথাই তো মনে পড়বে রে।

স্বর্ণপ্রভা ঠাকুরঘরে যান নি। সকালেই পুজো সেরে নেন। সোজা চলে গিয়েছিলেন বৈশাখীর সেই ঘরে। এই ঘরটাতেই বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে সে থাকত। সে ভাবেই

রেখেছেন ঘরটা। সেই খাট, সেই বিছানা। দেয়ালে বৈশাখীর ছবি। দুপুরে একা বাড়িতে এ ঘরে আসেন স্বর্ণপ্রভা। নিজের হাতে বিছানার চাদর পালটে দেন। টেবিল, চেয়ার পরিষ্কার করেন। আগে বৈশাখীর ছবিটা ছিল উঁচুতে। নাগাল পেতেন না। ছবিটা নামিয়ে এনেছেন হাতের নাগালের মধ্যে। আঁচল দিয়ে ফটোটাকে মুছতেন। বৈশাখীর প্রিয় ফুল ছিল গোলাপ। বাগানে লাগিয়েছেন অসংখ্য গোলাপ। সারা বছর ফুটে থাকে। ঘরে আসার আগে সাজি ভরে আনতেন গোলাপ। নীচের টেবিলে সাজিয়ে দিতেন।

স্বর্ণপ্রভা বৈশাখীর ফটোতে গালটা চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন।

খুকি, তোর মেয়ে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশ জুড়ে ওর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। তুই তো ওপর থেকে সব দেখছিস। আমি বুঝতে পারি তুই ওকে সবসময় আশীর্বাদ করছিস, ওকে ছুঁয়ে আছিস। কোনো অশুভ চোখ তোর আশীর্বাদের বেড়া ডিঙিয়ে ওর কাছে পৌঁছাতে পারবে না।

বসুন্ধরা তার পাশে কখন যে এসে দাঁড়িয়েছিল স্বর্ণপ্রভা টের পান নি। সে তার পিঠে মাথা রেখে বলেছিল, দিদা, আমিও মার কাছে একই কথা বলতে এসেছি।

তমালের চিঠি এসেছিল। অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিল :—

তোমার তো এখন অনেক নাম। চারিপাশের অভিনন্দনের জোয়ারে সাঁতার কেটে চলেছ। আমার মতন সাধারণ এক ছাত্রের এই অভিনন্দন-বার্তাটা সময় করে খুলে দেখো।

কেমন লাগছে মাথা ঘুরে যাবার মতো এই রেজাল্ট? দেমাকে নিশ্চয়ই মাটিতে পা রাখছ না। তবে তোমার থেকেও নিশ্চয়ই দেমাক দেখাচ্ছেন আমার মা।

শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি। সস্তা সেন্টিমেন্টের কোনো দাম নেই। আমার মা এই সস্তা ভাবাবেগে এক অজ পাড়াগাঁয়ে বনবাসিনী হয়েছে বলে তুমিও আবার তার পাল্লায় পড়ো না। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবে। আমি এখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হস্টেলে চলে এসেছি। দাদু চেয়েছিলেন বাড়ি থেকেই ক্লাস করি। এটাও একটা সস্তা সেন্টিমেন্ট। তবে তুমি কলকাতায় এলে তোমাকে প্রতিদিন কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার চাকরিটা নিয়ে এই সেন্টিমেন্টের সাথে আপোশ করতে রাজি আছি।

স্বর্ণপ্রভাও বলেছিলেন, তুই কলকাতায় পড়াশোনা কর।

আর তুমি?

আমার জন্য তোর এত চিন্তা কেন রে? আমি কি তোর মতন সুন্দরী যুবতি? আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যাবে না। তোর বড়োমা তো আমাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে।

রাজি হয়নি বসুন্ধরা। সে এখানকার কলেজেই ভর্তি হয়েছিল।

স্বর্ণপ্রভা বলেছিলেন, আমি যদি তোর সাথে কলকাতায় গিয়ে থাকি?

না, দিদা, আমি এখানেই পড়ব।

বসুন্ধরা জানত, এই বাড়ি, এই ঘর, এই মাটি দিদার জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। এখানে দিদা মার ঘরে বসে তার স্পর্শ অনুভব করে। বুলবুল চণ্ডির মাটি থেকে দিদাকে তুলে নেওয়ার অর্থ হবে বিশাল বটগাছকে মাটি থেকে উপড়ে এনে অন্য জায়গায় ফেলে আসা।

তমাল এসেছিল ছুটিতে। বলেছিল, তোমাকে আমার মনে হয়েছিল তুমি অন্তত্পক্ষে ঘরকুনো বাঙালি মেয়েদের মতন নও। এত ভালো রেজাল্ট করে এখানের এই কলেজেই পড়ে থাকলে? তোমার বড়োমা তো জিদ করে শহর থেকে গ্রামে এসেছিলেন। তা তোমাকে গ্রাম থেকে শহরে পাঠাতে পারলেন না?

বসুন্ধরা বলেছিল, তুমি বড়োমা কে এর মধ্যে জড়াতে চাইছ কেন? বড়োমা আমাকে কলকাতায় পড়তে বলেছিলেন। দিদা আমার সাথে কলকাতায় গিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হই নি।

কেন? তমালের ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল।

বসুন্ধরা হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, বড়োমা বলছিল তোমরা নাকি গ্রাম দিয়ে শহর ঘেবার কথা বলছ। আমি ভাবলাম, প্রেসিডেন্সির দেয়ালে গ্রাম থেকে শহর ঘেরার কথা লিখে বিপ্লবের উত্তাপ না নিয়ে নিজেই গ্রামে থেকে গ্রামের কথা ভাবি। এখান থেকে পড়াশোনা করে যদি প্রেসিডেন্সিতে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি তবে এই কলেজে পড়ে তোমার প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের মানে কেন পৌঁছাতে পারব না, তমালদা?

তমাল বলেছিল, রাজনীতি নিয়ে কটাক্ষ করতে শুরু করলে কবে থেকে? বড়োমা এ ব্যাপারেও তোমার ক্লাস নিতে শুরু করেছেন নাকি?

বসুন্ধরা পালটা প্রশ্ন করেছিল, বড়োমা কি তোমাকে ক্লাস নিয়ে রাজনীতির মিছিলে যোগ দিতে বলেছিল?

তমাল বলেছিল, মা এই কাজটা করেনি বলেই তো নিজে ভাবতে শিখেছি।

বসুন্ধরা বলেছিল, আমাকেও বড়োমা কিছু বলেনি। সেটা যে তার স্বভাবের মধ্যে পড়ে না তা তুমি ভালো করেই জান। এবার বল তোমার কথা। এতদিন বাদে এলে। ঝগড়াই করে চলেছ। তোমাকে চিঠি দিয়েছিলাম। পেয়েছ?

পেয়েছি?

জবাব দাও নি কেন? গ্রামের মেয়ের চিঠির জবাব দিতে নেই বুঝি?

তমাল হেসে ফেলেছিল। তোমার মতো গ্রামের মেয়ে আর কয়েকজন থাকলে সারা গ্রামই শহর হয়ে যাবে।

—স্বীকার করছ তাহলে?

—হাজার বার স্বীকার করি।

বসুন্ধরা তমালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কলকাতায় তো আমাকে একবার যেতেই হবে। এম. এ.-টা ওখান থেকে করব। ততদিনে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কোনো দেশে চলে যাবে কে জানে?

তমাল বলেছিল, তুমি যদি যাও তবে আমি কোথাও যাব না।

কেন? আমার মতন একটা গ্রাম্য মেয়ের জন্য তুমি পড়ে থাকবে কেন?

তমাল বলেছিল, তুমি সেদিন দাবি করেছিলে, তুমি বড়ো হয়ে গেছ। আসলে তুমি একটুকুও বড়ো হও নি। সেই ছোট্ট শিশুই থেকে গেছ।

বসুন্ধরা বলেছিল, তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তা না হলে আমি কি বলতে চাইছি, তা তুমি বুঝতে পারতে।

বসুন্ধরা বড়ো হয়েছিল। মেয়েরা ছেলেদের থেকে তাড়াতাড়িই বড়ো হয়। হরিণকে যেমন জানতে হয় বনের ভাষা, চিনতে হয় ডোরাকাটার চাতুরী, তেমনি মেয়েদের জানতে হয় পুরুষের চোখের ভাষা, বুঝতে হয় পুরুষের মনের বাসনা। এটা যেমন তার আত্মরক্ষার হাতিয়ার তেমনি পুরুষের বশীকরণের উপকরণ।

বসুন্ধরা বড়ো হয়েছে বলেই নারী। আর নারীর আরেক নাম ত্যাগ ও সংযম। পুরুষের ভাষা পড়তে জানে বলে নারী নিজেরে ভাষাকে নিজের মনের মাঝে লুকিয়ে রাখতে পারে। পুরুষ নারীর ভাষাকে আবিষ্কার করার প্রচেষ্টার মধ্যে তার প্রভুত্বকামী মানসিকতাকে হারাতেও

রাজি থাকে। তাই দুর্দান্ত প্রকৃতির পুরুষও নারীর ভালবাসা পেতে ও নারীর ভালোবাসার ছোঁওয়ায় নিজের অহমিকাকে বিসর্জন দেয়।

বসুন্ধরা তমালের চোখের ভাষা পড়তে পেরেছিল বলেই নিজের মনের ভাষাকে গুটিয়ে রেখেছিল। এত সহজে তার মনের দরজাকে খুলে দিলে সব কিছুই যে অতি সহজলভ্য হয়ে যায়। কয়লা হীরার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়, কিন্তু এত সহজলভ্য বলেই যে কালো-মাণিকের কদর নেই। আর হীরাকে খুঁজে বের করতে হয়। তাই হীরা জায়গা পায় রাজমুকুটের মধ্যস্থলে।

বসুন্ধরা জবাব দিয়েছিল, কলকাতায় গেলে, তুমি থাকলে অবশ্য আমার সুবিধা হবে। তোমাকে দিয়ে আমার কিছু কাজ হবে কিনা জানি না। কারণ তোমার এই লোহালক্কড়ের জ্ঞান আমার এম. এ. পরীক্ষায় কোনো সাহায্য করবে না।

একটা সময় আসে যখন একের ভাষা অপরের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর সেই মুহূর্তটাই উভয়ের কাছে যে নান্দনিক বার্তা বয়ে আনে তার রূপই আলাদা। একে অপরের আবিষ্কারের মধ্যে খুঁজে পায় পারিজাত ফুলের সৌরভ। তখন তো কোনো কিছুই অদেয় থাকে না। একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চাইলেও নারী এখানেও সাবধানি। বিধাতাই তাকে সাবধানি হতে বাধ্য করেছে। নারীকেই যে প্রেমের অমৃত ফসলকে ধারণ করতে হয়।

বি. এ.-তেও একই ফল। এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছিল কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ে। তমাল তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। কলকাতা তার কাছে নতুন না হলেও কলকাতায় থাকা এই প্রথম।

অমিয়া দেবী এসেছিলেন, বসুন্ধরার সাথে। স্বর্ণপ্রভা আসতে চেয়েছিলেন। বসুন্ধরাই বারণ করেছিল। বলেছিল, আমি তো এখন শুধু ভর্তি হতে যাচ্ছি। ভর্তি হয়ে চলে আসব। তারপর যখন যাব তখন তুমি যেও।

স্টেশনে নেমে অমিয়া দেবী অবাকই হয়েছিলেন। তমাল তাদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছে। এতদিন কলকাতায় এসেছেন। আসার আগে বেশির ভাগ সময়েই তমালকে চিঠি দিয়ে এসেছেন। কোনোবার তমাল তার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করেনি।

তমালকে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিরে? তুই? তোর কারো আসার কথা আছে নাকি?

তমাল বলেছিল, বারে, তোমরা আসবে বলেই তো এসেছি।

তাই বুঝি? বসুন্ধরার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তুই বুঝি ভেবেছিলি, আমি তোকে কলকাতায় ঠিকমত নিয়ে যেতে পারব না।

বারে, আমি তমালদাকে আসতে লিখেছি নাকি? বসুন্ধরা লজ্জা পেয়েছিল।

অমিয়া দেবী ঠোঁট টিপে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, কি জানি বাপু, কে যে কাকে কী লিখছে তা কে জানে?

তমাল বাড়িতেই ছিল। হোস্টেলের কথা জিজ্ঞাসা করেন নি অমিয়া দেবী। দুটি হৃদয় যে কাছাকাছি থাকতে চায় সেটা তার সন্ধানী দৃষ্টিতে অনেক আগেই ধরা পড়েছিল।

বসুন্ধরাকে নিয়ে এই স্বপ্ন তো তার সেই প্রথম থেকেই। মুখ ফুটে কোথাও প্রকাশ করেন নি। ভেবেছেন ওরাই চিনে নিক নিজেদের। তমাল স্টেশনে এসেছে, হোস্টেল থেকে চলে এসে তাদের সাথে আছে—অমিয়া দেবী এই প্রথম তমালের মধ্যে তার ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলেন। তবু লাগাম ছাড়তে চান নি। বসুন্ধরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোরা কি তোদের মধ্যে কোনো কথা বলেছিস?

বসুন্ধরা কিছু না বুঝেই জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন কথার কথা বলছ, বড়োমা?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তুই বড়ো হয়েছিস। সব কথা তোকে এখন বলার দরকার নেই। তবে একটা কথা বলা দরকার। মনে রাখিস ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে সামান্য অসর্তকতায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। তোরা ছোটোবেলা থেকেই পাশাপাশি বড়ো হয়েছিস। একে অপরকে চিনতে শিখেছিস। তবে ভালোলাগা ও ভালোবাসার মধ্যে যে পার্থক্য তা কিন্তু অনেক সময় বোঝা কষ্টকর। ভালোলাগা সাময়িক। কাঁচের মতন যে কোনো মুহূর্তেই সামান্য আঘাতে তা খণ্ডখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়তে পারে। ভালোলাগার বিপদ হচ্ছে তাকে তৎক্ষণাৎ পেতে ইচ্ছে করে। যাকে ভালো লেগেছে তার ভালোলাগা বা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভাবনা এখানে প্রাধান্য পায় না।

ভালোবাসার রূপ আলাদা। ভালোবাসার জন্য সিংহাসন ছাড়া যায়। ভালোবাসার জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করা যায়। ভালোবাসার জন্য দিতে ইচ্ছে করে। পাবার প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। তবে এটাও ঠিক, ভালোলাগাই ধীরে ধীরে ভালোবাসাতে রূপান্তরিত হয়।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোকে এত সব কথা বলছি বলে বিরক্ত হচ্ছিস না তো?

বসুন্ধরা বলেছিল, না বড়োমা। তোমাকে নতুন করে আবিষ্কার করছি। তুমিই তো আমার ভাবনার আলোক-বর্তিকা। এই পৃথিবীটা চেনার আলো আমি তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। তুমি বল। তোমার কথাগুলি আমার শুধু ভালোলাগাই নয়, আমার পক্ষে জানাও তো জরুরি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, নারী ও পুরুষের মধ্যেও জন্মায় দেহজ ভালো লাগা। একটা নারী ও পুরুষ যখন পরস্পর পরস্পরের কাছে আসে তখন যে সর্বক্ষেত্রেই দেহজ সম্পর্ক প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তা নয়। যেমন মা-ছেলের সম্পর্ক, বাবা-মায়ের সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক। তবুও বিপদ আসে। আদি যুগে তো মা-ছেলে, ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে, সবার সাথেই গড়ে উঠত দেহজ সম্পর্ক। এটাও ক্ষণিকের ভালোলাগার উদাহরণ। সভ্যতা যে পরিণত মনের জন্ম দিয়েছিল তারই ফসল ভালোবাসার পবিত্র সম্পর্ক।

অমিয়া দেবী জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে এসে বসেছিলেন। বলেছিলেন, আমি বলতে চাইছি রক্তের সম্পর্কহীন দুটি নবনারীর সম্পর্কের কথা। দুটি অচেনা পুরুষ ও নারী যখন বিয়ের প্রথম রাতে কাছাকাছি আসে তখন একে অপরকে আবিষ্কার করার মধ্যে যে ভালোলাগা তাকে নিয়েই মত্ত হয়ে পড়ে। তুই বলতে পারিস ভালোলাগাটা যখন তাৎক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী, তখন সেই ভালোলাগার কারণটা মিটে গেলেও দুটো নারী-পুরুষ কেন একত্রে বাসা বাঁধে? এখানেই বিয়ে নামের বন্ধনটির যাদু। স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্কটি বিছানায় ভালোলাগার সম্পর্কের বাইরে যে দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার জন্ম দেয় তাই ধীরে ধীরে ভালোবাসাতে রূপান্তরিত হয়। বিবাহিত জীবনে তাই দৈহিক ভালোলাগার ক্ষণিকের মুহূর্তটি পার হয়ে গেলেও সম্পর্কের বন্ধনের দড়ি বেয়ে ভালোবাসা গুটি-গুটি পায়ে বাসা বাঁধে।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা বড়োমা, তুমি কি তমালদাকে নিয়ে কিছু ভাবনায় আছ?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তুই অজান্তেই সত্যি কথাটা বলে ফেলেছিস। তমাল আমার ছেলে বলেই ওকে আমি তোর থেকে ভালো করে চিনি। দেখ, বিয়ের আগে চেনা পরিচয়ের ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। যার সাথে সারাজীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছিস তাকে যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পাবি। কিন্তু একবারই যদি সব কিছু আবিষ্কার করে ফেলিস তবে আবিষ্কারের অপেক্ষার মধ্যে যে ভালোলাগা তা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। বিপদটা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যে বাঁধন তা এখানে নেই। তাই ছেলেদের পক্ষে ভালোলাগার স্বাদ মিটে যাবার পর তাদের ভাবনার পরিবর্তন ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়।

ঝড়ের হাওয়া যখন ঘবের ভিতর ঢুকে পড়ে তখন দরজাকে বন্ধ করে রাখলেও সেই হাওয়া তার পথ খুঁজে বেরিয়ে পড়ে। তমালের কাছেও তার মনের দরজা এভাবে খুলে গিয়েছিল।

তমাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে সে খবর মালদা থাকতেই শুনেছিল বসুন্ধরা। রাজনীতির ব্যাপারটাতে মাথা ঘামায় নি কোনো দিন। কিন্তু কলকাতায় এসে তমালকে দেখে বেশ ভালো লেগেছিল বসুন্ধরার। ছাত্র নেতা রূপে তমালের নাম-ডাক দেখে অবাকই হয়েছিল। একে সুদর্শন, তার উপর শিবপুরের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র তমালের একটা রোমান্টিক নায়ক ইমেজ। মেয়ে মহলে তমালকে নিয়ে নানা গুঞ্জনে পুলকিত হতো। ভালোলাগাটা ধীরে ধীরে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হচ্ছিল কিনা সেটা অবশ্য তখনও বুঝতে পারছিল না, তবে তমালের একটা অদৃশ্য স্পর্শ যেন তাকে সবসময় ঘিরে রাখতে চাইত। তমালের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা যে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা সে বুঝতে পারত।

ভালোবাসা কি মানুষকে হিংসুটে করে তোলে? বসুন্ধরা নিজের মনকেই প্রশ্ন করত। নয়তো তমালকে নিয়ে মেয়ে মহলের গুঞ্জন কেন তাকে পুলকের পরিবর্তে ঈর্ষাকাতর করে তুলতে শুরু করেছিল?

তমাল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে বক্তৃতা করত বসুন্ধরা ক্লাসের কথা ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে তার কথাগুলো গিলত অথচ রাজনীতির আলোচনা করতে তার কোনো উৎসাহ হতো না। তবু মনে হতো তমালের কথাগুলো এত সুন্দর লাগে কেন?

তমালের সাথেই গিয়েছিল কফি হাউসে। সে যে তমালের বিশেষ বান্ধবী সেই পরিচয়টুকু প্রকাশ করার মধ্যে গর্বিত অনুভূতির একটা রেশ টের পেত। তাকে নিয়েও যে তমালের মনের কোণে ঈর্ষার মেঘ জমা হতে পারে সেটা আবিষ্কার করে গভীর এক তৃপ্তি অনুভব করেছিল।

কফি হাউসের আড্ডায় তমাল ছিল অনিয়মিত। ফাইনাল পরীক্ষার মাস দুয়েক আগে থাকতেই কলেজস্ট্রীট পাড়ায় তমালের যাতায়াত বন্ধ ছিল। বসুন্ধরা কফি হাউসের আড্ডায় কেমন একটা আনন্দ পেত। পরিচিতির পরিধিটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এখানে পরিচয় ঘটেছিল প্রভাকরের সাথে। ইকনমিক্সের ছাত্র। মেদিনীপুর থেকে পড়তে এসেছিল। রোগা, লম্বা, ফর্সা চেহারা। উজ্জ্বল চোখ দুটিতে কেমন একটা স্বপ্নালু দৃষ্টি।

প্রভাকরই বলেছিল, তার মা স্টোভের আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

বসুন্ধরার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল সহানুভূতির একটা শব্দ, ইশ্।

প্রভাকর বলেছিল, জানো, তখন এত ছোটো ছিলাম যে মার মুখটা স্পষ্ট মনে করতে পারি না। তবু চোখ বুজলেই মনে হয় আমার চারিপাশে আগুন জ্বলছে।

তুমি তখন কোথায় ছিলে? বসুন্ধরার ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

প্রভাকর বলেছিল, ঠিক মনে নেই। তবে আমি মার কাছেই ছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল মা বুঝি আগুন নিয়ে আমাকে খেলা দেখাচ্ছে। আমি হাত তালি দিয়ে নাকি আনন্দে নেচে ছিলাম। পরে যখন দেখলাম মার সারা শরীর জ্বলছে তখন আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। আমি এখনও মাঝে মাঝে আগুন আগুন বলে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যাই।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার বাবা তখন কোথায় ছিলেন?

প্রভাকর বলেছিল, বাবা বাড়িতে ছিলেন না। আমাদের ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। বাবাকে তাই মাঝে মধ্যেই বাড়ির বাইরে যেতে হতো। বাবা দুদিন পরে ফিরেছিলেন।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার বাবা নিশ্চই আবার বিয়ে করেছেন?

প্রভাকর বলেছিল, তুমি এমন কথা জিজ্ঞাসা করলে কেন?

সব বাবারাই তা করে বলে বললাম। বসুন্ধরা জবাব দিয়েছিল।

প্রভাকর বলেছিল, তুমি আমার বাবাকে যা ভাবছ তিনি কিন্তু সে রকম নন। আমার বাবা আর বিয়ে করেন নি। তিনিই আমাকে মার মতন মানুষ করেছেন।

বসুন্ধরা তার মার কথা কিছু বলেনি। তবে প্রভাকরকে নিয়ে গিয়েছিলে সল্ট লেকের বাড়িতে স্বর্ণপ্রভার কাছে। প্রভাকরের উপর একটা সহানুভূতির ঢেউ বসুন্ধরার মনের কোণে বইতে শুরু করেছিল।

তমালের চোখের কোণে ঈর্ষার ঝলক দেখে সেদিন কিন্তু বসুন্ধরা আনন্দই পেয়েছিল। মনে হয়েছিল এটাই তো ভালোবাসা। যাকে ভালোবাসা যায় তাকেই হারাবার ভয় থাকে। আর সেই ভয় ভালোবাসার বস্তুকে আরো দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে রাখার প্ররোচনা যোগায়।

তমালের পরীক্ষা শেষ। রাজনীতির আবর্তে তখন নক্সালবাড়ির ঝড়ো হাওয়া। কলেজ স্ট্রীটে নক্সালপন্থীদের সাথে এস. এফ. আই.-এর ধর্মযুদ্ধে একে অপরের আত্মীয় নিধনে মত্ত। খবরের কাগজে প্রতিদিনের খবরে নয়া সংশোধনবাদী ও বাম হঠকারীদের এই শ্রেণী সংগ্রামের খবর।

বসুন্ধরা প্রথমেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিহত ও আহতদের তালিকায়। যেখানে সংঘর্ষ হয়েছে খোঁজ নেয় সেখানে। হাসপাতালে ফোন করে তমাল মিত্র বলে কেউ ভর্তি হয়েছে কিনা। প্রভাকরকে ডেকে পাঠায়। ওকে নিয়ে যায় তমালের খোঁজে।

মাঝে মাঝে মনে হতো বসুন্ধরার, প্রভাকরের সাথে ও কোনো অন্যায় করছে না তো? প্রভাকর যেন ওর ডাকের অপেক্ষাতেই বসে থাকে। একটা অপবাধবোধ বসুন্ধরাকে খোঁচা দিত। ভয় হতো তাকে নিয়ে প্রভাকরের মনে কোনো প্রত্যাশার জন্ম হচ্ছে কিনা। প্রভাকরের মনের ভাষা তার চাউনির মধ্যে পড়তে চাইত, কিন্তু তার ঘন স্বপ্নীল দৃষ্টির মাঝে কোনো প্রত্যাশার ভাষা খুঁজে পেত না।

তমাল জিজ্ঞাসা করেছিল, প্রভাকর তোমার কাছে কেন আসে?

বসুন্ধরা বলেছিল, বন্ধু বলে।

ওকে আসতে না বলবে।

কেন?

আমার ভালো লাগে না।

আমারও তো তোমার অনেক কিছু ভালো লাগে না। তুমি কি সেগুলি শুনবে?

মানে? তমালের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল।

কেন? বসুন্ধরার ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঝলক ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, তুমি ছাত্রনেতা, তোমার আশে পাশে তো কত মেয়ে ঘোরাঘুরি করে। আমি যদি বলি সেটা আমার ভালো লাগে না, তুমি শুনবে?

তমাল অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বসুন্ধরার মুখের দিকে। যেন, এ বসুন্ধরাকে সে এই প্রথম দেখছে। বলেছিল, আমার কাছে যে সব মেয়েরা আসে তারা আসে সংগঠনের কাজে। কোনো মেয়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

বসুন্ধরার মুখে সেই কৌতুকের হাসি। বলেছিল, তা অবশ্য ঠিক। কোনো মেয়ের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে প্রভাকর বেচারিকে তোমার পাশে জায়গা দিতে চেয়ো না।

তমাল বলেছিল, তুমিই তো জায়গা দিতে চাইছ।

বসুন্ধরার চোখে ফুটে উঠেছিল মৃদু তিরস্কার। ছিঃ, তমালদা, নিজেকে এত সামান্যের স্তরে নামিয়ে এনো না।

খবর পেয়েছিল তমাল আহত। প্রভাকরই এনেছিল খবরটা। যাদবপুর স্টেশনে সি. পি. এমের লোকেরা তমালকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়েছিল। গুলিটা ওর গায়ে লাগেনি। তবে তমাল রেললাইনের উপর পড়ে গিয়েছিল। সি. পি. এমের লোকেরা ভেবেছিল, ও গুলির আঘাতে পড়ে গেছে। তাই মৃত ভেবে প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিক দিয়ে বোমা ফাটাতে ফাটাতে চলে গিয়েছিল।

প্রভাকর খবরটা পেয়েই ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছিল। বসুন্ধরা তখন সবে ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিতে ঢুকেছিল। প্রভাকরের সাড়া পেয়ে বলেছিল, বসো প্রভাকর, প্রদীপটা জ্বালিয়ে আসি।

প্রভাকর অপেক্ষা না করে ঠাকুরঘরে চলে এসেছিল। সন্ধ্যাবাতি দেবার সময় বসুন্ধরা ব্লাউজ-সায়া পরে না। ঠাকুর ঘরেই থাকে গরদের কাপড়। সেটা পরে প্রদীপ জ্বালিয়ে পাশের ঘরে এসে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ পরে বের হয়। অভ্যেসটা পেয়েছে বুলবুল চণ্ডির বাড়ি থেকেই। ওখানেও কোনো পুরুষ মানুষ ঠাকুরঘরে আসত না, এখানেও আসার মতন কেউ নেই। প্রভাকর যে এভাবে সোজা ঠাকুরঘর পর্যন্ত এসে যাবে সেটা কল্পনা করতে পারেনি, বসুন্ধরা। নিজের শরীরটাকে আঁচল দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে তাকে প্রচণ্ড কড়া কথা বলতে গিয়েছিল।

প্রভাকরের কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ঝড়ের গতিতে বলেছিল, প্রদীপ পরে জ্বালিও। এক্ষুণি বেরোতে হবে। তমালদা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। দু বোতল রক্ত দরকার। ওর রক্তের গ্রুপ আমার সঙ্গে মিলে গেছে। সেই বোতলটা চলছে, আরেক বোতল রক্ত জোগাড় করতে হবে। তার আগে তোমাকে এন. আর. এস-এ নামিয়ে দিচ্ছি। ও ওখানে আছে।

প্রভাকর বসুন্ধরার উত্তরের অপেক্ষা না করে বাইরের ঘরে চলে গিয়েছিল।

সন্ধ্যা-প্রদীপ দেওয়া হয়নি বসুন্ধরার। কোনো মতে কাপড়টা পরে ঘর থেকে এক রকম ছুটে বেরিয়ে এসেছিল।

প্রভাকরকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই জিজ্ঞাসা করেছিল, ও কেমন আছে? বেঁচে যাবে তো?

প্রভাকর বলেছিল, তোমার এত চিন্তার কারণ নেই। ওর শরীরে গুলি লাগেনি। পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছে। ডাক্তার বলেছে, এত চিন্তার কিছু নেই। তবে মাথার চোট তো, আটচল্লিশ ঘণ্টা একটু ভয় থাকে।

তমাল ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের ওষুধ দেওয়া আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। বসুন্ধরা ওর কপালে হাত রেখেছিল।

সিস্টার বলেছিলেন, ওকে এখন ঘুমোতে দিন। আজকের রাতটা ভালো ভাবে কেটে গেলে কালকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সারারাত বাইরের বারান্দায় বসে কাটিয়েছিল বসুন্ধরা। তমালের দলের ছেলেরা একের পর এক এসেছে। কাউকে সে চেনে না। ওদের কথাবার্তা তার ভালো লাগেনি। তমালের সুস্থ হবার পরিবর্তে বদলার কামনাটাই যেন তাদের কাছে অনেক জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছিল। মাঝখানে আমি একটু আসছি বলে প্রভাকর বেরিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক পরে সে আসতেই বসুন্ধরা একটু অনুযোগ করে বলেছিল,

আমাকে একা রেখে এভাবে তোমার চলে যাওয়া ঠিক হয় নি।

প্রভাকর কুণ্ঠিত স্বরেই বলেছিল, তুমি হাসপাতালে রাত কাটাবে বুঝতে পেরে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে মাসিকে বলে এসেছি সে যেন কোনো চিন্তা না করে। শেষ রাতের দিকে ঠান্ডা পড়ে তাই তোমার জন্য একটা চাদরও নিয়ে এলাম। বুঝি এত চিন্তায় খেতে ইচ্ছে করবে না। তবু রাতের জন্য চিকেন-চাউমিন নিয়ে এসেছি।

চিন্তার অস্থিরতায় বসুন্ধরা লক্ষ করেনি প্রভাকরের হাতের ব্যাগটাকে। খারাপ লেগেছিল, একটু আগেই সে প্রভাকরকে কড়া কথা বলতে গিয়েছিল ভেবে। প্রভাকরকে বলেছিল, পাশে জায়গা আছে, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?

প্রভাকর বসেছিল জড়সড় হয়ে তার শরীরের সাথে যাতে স্পর্শ না লাগে।

বসুন্ধরা বলেছিল, তুমি এমন ভাবে বসেছ যেন আমি ছোঁয়াচে রোগের এক রোগি। আমার গায়ের সাথে তোমার গা লাগলে তুমি অশুচি হয়ে যাবে? ভালোভাবে আরাম করে বসো।

প্রভাকরের মুখে-চোখে লজ্জার আভা ফুটে উঠেছিল। একটু নড়ে-চড়ে বসে বলেছিল, ঠিক ভাবেই তো বসেছি। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

বসুন্ধরা প্রভাকরের কাঁধে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, হাত-পা ছড়িয়ে বসো। কোনো মেয়ের পাশে কোনো পুরুষ মানুষ যদি নতুন বৌ এব মতন এমন লজ্জালজ্জা ভাব নিয়ে বসে থাকে তবে খুব বিশ্রি লাগে।

প্রভাকর যেন আরো বেশি কবে লজ্জা পেযেছিল। বলেছিল তুমি এরকম বললে আমি কিন্তু উঠে যাব।

বসুন্ধরা বলেছিল, ঠিক আছে। তোমায় কিছু বলব না। তোমাব যে ভাবে খুশি বসো।

রাত্রি কত দীর্ঘ হতে পারে তা রাত জাগলেই টের পাওয়া যায। প্রভাকর বেঞ্চেব উপর চাদরটা পেতে দিয়ে বলেছিল, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি তো আছি। তমালদার কিছু দরকার হলে আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব।

বসুন্ধরা বলেছিল, তুমি সারাদিন ছোটাছুটি করেছ। তোমারই একটু ঘুমানো দরকার।

প্রভাকর বলেছিল, ধ্যাৎ, তা হয় নাকি?

ধ্যাৎ কেন?

বারে আমি ঘুমোব আর তুমি জেগে থাকবে। এটা হয় নাকি?

তবে আমি ঘুমোব আব তুমি জেগে থাকবে সেটা হবে কি করে?

মনে রেখ আমি ছেলে, প্রভাকব সোজা হয়ে দাঁড়িযে বলেছিল।

বসুন্ধরা হেসে ফেলেছিল। বলেছিল তাই তো, তুমি যে ছেলে এটা বুঝতে পারছিলাম না। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে পাহারা না দিলে তোমার পুরুষত্বের প্রমাণ পাওয়া যাবে না। তার থেকে দুজনেই বসে রাতটা কাটিয়ে দিই।

তমালের দলের একটা ছেলে এসে বলে গিয়েছিল তারা আশেপাশেই আছে। মাঝে-মাঝেই তমালের খোঁজ নিয়ে যাবে।

প্রভাকর বলেছিল, আপনারা কোথায় থাকবেন বলে যান। দরকার পড়লে আমি আপনাদের ডেকে আনব।

ছেলেটি বলেছিল, তা আপনাকে বলা যাবে না।

কেন?

আমাদের উপর পুলিসের নজর আছে। পুলিস ও শাসক পার্টির লোকজন আমাদের খবর পেলে হামলা করতে পারে।

প্রভাকর একটু উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, আমাকে কি আপনার পুলিসের লোক বলে মনে হচ্ছে?

ছেলেটি বলেছিল, আপনাকে যখন আমি চিনি না, তখন আপনাকে বিশ্বাস করারও কারণ নেই। যাক্‌গে এসব কথা। আপনারাও যে তমালদার লোক তা জানাজানি না হওয়াই ভালো।

ছেলেটা দ্রুত পায়ে বারান্দাব ও পাড়ের সিঁড়ি ধরে দ্রুত নেমে গিয়েছিল।

প্রভাকর বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, দেখলে ছেলেটা কেমন কট্‌ কট্‌ করে বলে গেল।

বসুন্ধরা বলেছিল, এসব কথা মনে রেখ না। রাজনীতির লোকেরা নিজের ছায়ার মধ্যেই ভূত দেখে।

সকালের দিকে জ্ঞান ফিরেছিল তমালের। সিস্টার বসুন্ধবাকে বলেছিল, যান, দেখে আসতে পারেন। তবে বেশি কথা বলবেন না।

বসুন্ধরা প্রভাকরের দিকে তাকিয়েছিল।

প্রভাকর বলেছিল, তুমি দেখে আস। এখন ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

বসুন্ধরাকে দেখেই তমাল হাতটা তুলেছিল।

তমালের হাতটা দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে বসুন্ধরা গাঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, এখন কেমন আছ?

তমাল মাথা নাড়িয়েছিল। বলেছিল অনেকটা ভালো।

গুলিটা লাগেনি। কিন্তু লাইনের উপর মাথাটা ঠুকে যাওয়ায় কপালটা অনেক গভীরভাবে কেটে গিয়েছিল।

বসুন্ধরা কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, তমালদা তুমি কেন আমার কথা একবারের জন্যও ভাবনা। তুমি কি জাননা, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। তুমি কেন বোঝ না তোমাকে ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারব না।

তমালের একটা হাত বসুন্ধরার পিঠে উঠে এসেছিল, ওর চোখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, মাথা ফেটে আমার যে এত বড়ো প্রাপ্তি হবে তা ভাবতে পারি নি।

বসুন্ধরা বলেছিল, কী এমন অমৃত পেলে যার জন্য তোমাকে মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হচ্ছে?

তমাল হেসে বলেছিল, তোমার মনের এই খবরটা তো আমার জানা হতো না।

বসুন্ধরা তমালের বুকের উপর হাতটা রেখে ওর কানের কাছে মুখটা এনে বলেছিল, এর জন্য চোখ ও মন দুটোই খোলা রাখতে হয়। তুমি মনের দিক থেকে অন্ধ তাই আমার খবরটা পড়তে পারনি।

তমাল বলেছিল, আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো পাহাড়ের কোলে নির্জন খাদের পাশে বসি। নীচে ঝরনার জল, ওপরে সাদা মেঘ, মাঝখানে শুধু তুমি। তোমার কোলে আমি মাথা রেখে শুয়ে থাকব। তুমি গান গাইবে আর আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব।

বসুন্ধরা কপট গাম্ভীর্যে বলেছিল, জায়গাটা অবশ্য ভালো বেছেছ। নির্জন, গভীর খাদ। গান শেষ হলেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়ে তুমি শিস দিতে দিতে নেমে আসবে।

তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

মোটেই না, বিপ্লবী বাবুদের কাব্যিক ভাবনা দেখলে ভয় হয়।

বসুন্ধরা, তুমি জান না, কাস্ত্রো, চে, তাদের প্রেমিকার কাছে যে সমস্ত চিঠি লিখেছেন তা ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদা পায়।

বসুন্ধরা হেসে সোজা হয়ে বসেছিল। বলেছিল, তোমার কাস্ত্রো, চে, মাও-সে-তুং তোমারই থাক। আমি এখন হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বুলবুল চণ্ডির ট্যাঙ্গনের ধারে বড়মার বুড়ো ছেলেকে তার কোলে দিয়ে আসার কথা ভাবছি।

তমাল জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি মাকে খবর দিয়েছ?

—আমি নিজেই তো কাল সন্ধ্যায় খবর পেলাম, তুমি হাসপাতালে শুয়ে আছ।

—তোমাকে কে খবর দিল?

প্রভাকর সন্ধেবেলায় আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে।

প্রভাকর? তমালের মুখের রঙে একটা কালচে আভা ফুটে উঠেছিল।

হ্যাঁ, বসুন্ধরা জবাব দিয়েছিল। ঐ তো তোমাকে রক্ত দিয়েছে। কাল সারারাত আমার সাথে হাসপাতালের বারান্দায় রাত কাটিয়েছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোমার খবর নিয়েছে।

তমাল বলেছিল, ও তোমার কাছে আসে এটা আমার ভালো লাগে না। ও তোমার কাছে নিশ্চয়ই কিছু প্রত্যাশা নিয়ে আসে।

বসুন্ধরা তমালের মুখে হাত চাপা দিয়েছিল। ছিঃ তমালদা, তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস কর?

—তমাল বলেছিল, আমার ভয় করে।

—তোমার ভয়? কিসের ভয়?

—তোমাকে হারাবার ভয়।

তমালের মুখের কাছে আবার নিজের মুখটা নামিয়ে এনেছিল বসুন্ধরা। ওর গালে নিজের গালটা চেপে ধরে বলেছিল, তুমি নিজে যদি হারাতে না চাও তবে আমি কোনো দিন তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যাব না।

বসুন্ধরা মুখ ফেরাতেই দেখতে পেয়েছিল প্রভাকর দরজার বাইরে থেকে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তমালের কাছ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল বসুন্ধরা। বলেছিল, তোমাকে দেখতে আসার সময় সিস্টার বার বার বলে দিয়েছে, তোমার সাথে যেন কম কথা বলি। তুমি একটু ঘুমিয়ে থাক। আমি চট করে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তাছাড়া, বড়োমাকে খবর দেওয়া হয়নি। এখন ফোন করে দিলে কাল সকালেই পৌঁছে যাবে। দিদাও হয়ত হবু নাতজামাইয়ের ফাটা কপাল দেখতে চলে আসতে পারে।

তমাল খুশির উত্তেজনায় মাথাটা তুলতে গিয়ে আবার যন্ত্রণায় উঃ করে মাথাটা বালিশে নামিয়ে এনেছিল।

বসুন্ধরা ব্যস্ত হয়ে বসে পড়েছিল। বলেছিল, কী হল বলত? এভাবে উঠতে গেলে কেন? এর জন্যই তোমার কাছে আমার এতক্ষণ বসে থাকা উচিত হয়নি।

তমাল বলেছিল, আমার কিছু হয়নি। তুমি আরেকবার ঐ কথাটা বল।

কোন কথাটা? বসুন্ধরা তমালের চোখে চোখ রেখে বলেছিল।

ঐ যে দিদা কার ফাটা কাপল দেখতে আসবে।

বসুন্ধরা ঠোঁট টিপে হেসে বলেছিল, বড্ড লোভী হয়ে উঠেছ। এমন অনেক কথা আছে যা মেয়েরা দুবার বলে না।

বসুন্ধরা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি এখন আসি।

শোনো, তমালের ডাকে বসুন্ধরা আবার বসেছিল।

তমাল বলেছিল, মাকে খবর দিও না।

কেন?

তমাল বসুন্ধরার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বলেছিল, তুমি একা এলেই আমার বেশি ভালো লাগবে। তাছাড়া আমার তো আর কোনো বিপদ নেই। ছোটোমামার কাছে খবরটা পৌঁছে গেছে। এখানে আমার তাই খাতিরটা একটু বেশিই হচ্ছে। তোমাকে ভিজিটিং আওয়ার্স ছাড়াই যে সিস্টার এতক্ষণ বসতে দিচ্ছে মনে হচ্ছে এটাও তার কারণ। ছোট মামা দাদুকেও খবরটা জানায়নি। অযথা চিন্তা বাড়িয়ে লাভ কী?

বসুন্ধরা বলেছিল, ছোটো মামা এসেছিলেন?

না, তার আসার অসুবিধা আছে। ছোটো মামা এলে আমারও অসুবিধা হতো।

কেন?

সেটা তুমি বুঝবে না, এ নিয়ে আমাদের পার্টির মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে তিনি সাদা পোশাকের পুলিশেব লোক পাঠিয়ে আমার খোঁজ নিয়ে গেছেন।

প্রভাকর তখনও দরজাব কাছে দাঁড়িয়েছিল।

বসুন্ধরা তমালের বুকের উপর হাত রেখে বলেছিল, বেশ, আমি একাই আসব। তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে কিন্তু তোমাকে নিয়ে বুলবুল চণ্ডিতে চলে যাব।

তমাল ঘাড় নেড়েছিল, আচ্ছা।

প্রভাকরও তার সাথে বেরিয়ে এসেছিল।

বসুন্ধরা বলেছিল, প্রভাকর, তুমি সারাবাত জেগেছ। তমালদার কাছে এখন কারো থাকার দরকার নেই। তুমি বরং বাড়িতে গিয়ে এ বেলাটা বিশ্রাম নাও।

প্রভাকর বলেছিল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি যাব। রাত জাগলে আমার কোনো অসুবিধা হয় না।

বসুন্ধরা বলেছিল, তাব দরকার নেই প্রভাকর। আমি একাই যেতে পারব।

প্রভাকব কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমি যদি তোমার সাথে তোমার বাড়ি পর্যন্ত যাই তবে কি তোমার খুব অসুবিধা হবে?

বসুন্ধরা বলেছিল, অসুবিধা হবার কোনো কাবণ নেই। সারাটা রাস্তা তোমার সাথে গল্প করতে করতে যেতে পারব।

প্রভাকরের মুখে একটা খুশির ঝিলিক ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, তবে চল, তোমার বাড়ি পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

না।

কেন?

এতে আমার খুব অস্বস্তি হবে প্রভাকর।

প্রভাকর নীরবে বসুন্ধরার সাথে হেঁটে চলেছিল।

বসুন্ধরা বলেছিল, প্রভাকর, তুমি আমার বন্ধু। বলতে প্রায় সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তোমাকে আমি নিশ্চয়ই ভালোবাসি। তবে এ ভালোবাসা বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালোবাসা। তাই তুমি কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পাই। আমি জানি তুমি আমার সাথে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত গেলে খুশি হতে। আমারও ভালো লাগত। কিন্তু তারপর তো তোমাকে একা ফিরে আসতে হবে। আমাকেও একা ঘরে ঢুকে যেতে হতো। তোমারও একা ফিরতে খারাপ লাগবে। আর তোমার কষ্টের কথা ভেবে আমারও খুব কষ্ট হবে। তাই কষ্টের মাত্রাটা বাড়িয়ে লাভ কি বল?

প্রভাকর কোনো উত্তর দেয়নি। বসুন্ধরার মুখের উপব সেই স্বপ্নালু চোখেব দৃষ্টি ছড়িয়ে একটা চাপা নিশ্বাস ছেড়ে মাথাটা নিচু করে নিয়েছিল।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি তো সন্তোষপুর যাবে?

প্রভাকর চুপ করেই ছিল।

বসুন্ধরা বলেছিল, আচ্ছা প্রভাকর, আমি যদি তোমাকে এগিয়ে দিই তবে কেমন হয়?

প্রভাকর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি আমাকে আবার কোথায় এগিয়ে দেবে?

বসুন্ধরা বলেছিল, ধর এক সাথে এইট বি. বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত তোমার সাথে আমি গেলাম। সেখান থেকে তুমি সন্তোষপুরে চলে গেলে আর আমি সল্টলেকের মিনিবাস ধরে বাড়ি চলে যাব।

প্রভাকর বলেছিল, দূর, তা হয় নাকি? তুমি এতটা পথ উল্টো দিকে যাবে কেন?

বসুন্ধরা বলেছিল, একটু আগেই তুমি কিন্তু একেবারে উল্টোপথে আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চেয়েছিলে।

প্রভাকর বলেছিল, দুটো বুঝি এক হল?

কেন হবে না? তুমি ছেলে বলে, আমাকে পৌঁছে দিতে পার, আর আমি মেয়ে, তাই তোমাকে এগিয়ে দিতে পারি না? বসুন্ধবা চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

প্রভাকর কি একটা জবাব দিতে গিয়েছিল। কিন্তু একটা পুলিসেব জীপ তাদের সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াতেই দুজনে চমকে উঠেছিল।

জীপ থেকে একজন পুলিস অফিসার নেমে এসে বসুন্ধরাকে বলেছিল, পিছনের গাড়িতে হোম সেক্রেটারি আপনাকে ডাকছেন।

বসুন্ধরা এগিয়ে যেতেই তমালের ছোটো মামা গাড়ির দরজা খুলে বলেছিলেন, তোমাকে দেখেই দাঁড়ালাম। ভিতরে এসো, তোমাকে তোমার বাড়িতে নামিয়ে দেব।

বসুন্ধরা বলেছিল, আমার সাথে আমার বন্ধু প্রভাকর আছে, ও কাল সারারাত তমালদার জন্য হাসপাতালে রাত কাটিয়েছে। তমালদাকে নিজের রক্ত দিয়েছে। ওকে আমি সন্তোষপুব পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে চলেছি।

ছোটো মামা বলেছিলেন, ঠিক আছে, ওকে আমি সন্তোষপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। যেতে যেতে গাড়িতেই বলব।

বসুন্ধরা প্রভাকরকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, তমালদার ছোটো মামা।

প্রভাকর প্রণাম করতে গিয়েছিল।

ছোটো মামা বলেছিলেন, আমি কারো প্রণাম নিই না। তোমাকে সামনের পুলিস ভ্যানটা সন্তোষপুরে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

প্রভাকর আপত্তি করেছিল। আমি বাসে চলে যাব।

বসুন্ধরা বলেছিল, তুমি ছোটো মামার দপ্তরের গাড়িতে চড়ে গেলে কোনো পাপ হবে না। বরং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে আসতে পারবে। আমিও তাড়াতাড়ি আসব।

প্রভাকর বলেছিল, ঠিক আছে।

প্রভাকর পুলিসের গাড়িতে উঠেছিল।

পুলিস ইন্‌সপেক্টর জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি নক্সালবাড়ি রাজনীতির সাথে যুক্ত?

প্রভাকর উত্তর দিয়েছিল, আমি কোনো রাজনীতি করি না। রাজনীতি আমার ভালো লাগে না।

তমাল বাবু তো নক্সাল নেতা। তার জন্য আপনি সারা রাত হাসপাতালে কাটালেন কেন?

—তমালদা আমার বন্ধু।

—ও! ত। এরকম আরো নক্সাল বন্ধু আপনার আছে?

—আমার অনেক বন্ধু যেমন নক্সাল, তেমনি সি. পি. এম. বন্ধুও আছে।

—সি. পি. এম. বন্ধুদের দবকাব নেই। আপনাব দু একজন নক্সাল বন্ধুর নাম বলতে পাবেন?

—কেন?

ইন্‌সপেক্টর প্রভাকরের ঘাড়ে হাত বেখে মৃদু হেসে বলেছিল, এই পোশাকের তলায় আমাদেরও তো রক্ত-মাংসের শরীর। আমবাও চাই এ সমাজের পরিবর্তন ঘটুক। আপনারা যারা, নক্সাল রাজনীতি করেন তাদের প্রতি তো আমারও সহানুভূতি আছে।

প্রভাকর বলেছিল, আমি নক্সাল বাজনীতি কবি না।

—স্যরি, আমি আপনার নক্সাল বন্ধুদেব কথা বলছি।

—কিন্তু তাদের নাম জেনে আপনারা কী করবেন? আপনারা তো তাদেব বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন না?

এটাই আপনাদের ভুল ধারণা। ইন্‌সপেক্টর প্রভাকরের ঘাড়ে একটা মৃদু চাপ দিয়েছিল। এই যে তমালবাবুর জন্য আপনারা কাল সারারাত হাসপাতালে কাটিয়েছিলেন, আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা যে সারারাত পাহারা দিয়েছি তা কি আপনি জানেন?

প্রভাকর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ইন্‌সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কাল সারারাত আপনারা আমাদের পাহারা দিয়েছিলেন?

হেসেছিলেন ইন্‌সপেক্টর। আপনারা তো আমাদের শত্রু বলেই মনে করেন। আমরা জানি তমালবাবু বড় নক্সাল নেতা। তাকে সি পি এমের লোকেরা খুন করতে চেয়েছিল। আমরাই তো তাকে তুলে এনে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। নয়তো, তমালবাবুকে আপনাদের শ্মশানে নিয়ে যেতে হতো।

প্রভাকরের মুখে সরল বিশ্বাসের ছাপ। বলেছিল, তা ঠিক, কোনো লোকই তো তমালদার আহত দেহটাকে তুলে হাসপাতালে আনতে সাহস করেনি। পুলিস গিয়েই তাকে গাড়িতে তুলে এনে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল।

তাহলেই বলুন, ইন্‌সপেক্টরের মুখে একটা বিজয়ের হাসি। এই তো আমরা যখন খবর পেলাম আপনারা হাসপাতালে রাত কাটাবেন, আমাদের লোককেও পাঠাতে হল আপনাদের সাথে রাত কাটাতে।

কেন বলুন তো?

তমালবাবুকে যারা গুলি করেছিল তারা তমালবাবু মরে গেছেন ভেবে তাকে ঐখানে ফেলে চলে গিয়েছিল। তমালবাবু নিশ্চয়ই তাদের চিনে ফেলেছেন। তমালবাবু বেঁচে থাকলে এবার হবে তমালবাবুর বদলা নেবার পালা। তাই তারা নিশ্চয়ই তমালবাবুকে আবার মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। আপনারা যে তমালবাবুর লোক, সেটা নিশ্চয়ই তারা জানে। আপনারাও তাদের হাতে মরতে পারেন।

আমাদেরও গুলি করতে পারে? প্রভাকরের গলাটা কেঁপে উঠেছিল।

যারা তমালবাবুকে গুলি করেছে তারা তমালবাবুর চেনা লোকদের উপর হামলা করার সুযোগ তো নেবেই। কিন্তু আমরা তমালবাবুদের সব বন্ধুদের তো চিনি না, যে তাদের উপর নজর রাখব।

প্রভাকরের চোখে-মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, তমালদাকে সব বলেছেন? তমালদা নিশ্চয়ই তাদের দলের লোকেদের নামগুলি বলে দিত।

পুলিস অফিসারটি হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলেছিল, সে সময় ও সুযোগ পাচ্ছি কোথায়? হাসপাতালের এই ভিড়ের মধ্যে তো আর এসব কথা বলা যায় না।

কেন?

বুঝতেই পারছেন, পুলিসের চাকরি করি। সি পি এমের লোকেরা যদি জেনে যায় আমি নক্সালদের বাঁচাতে এসব করছি, কালই আমাকে নক্সাল বানিয়ে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে জেলে পুরে দেবে?

প্রভাকর জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি বুঝি মনে মনে নক্সালদের সমর্থন করেন?

পুলিস অফিসার তার ঠোঁটের উপর হাত দিয়ে চুপ করার ভঙ্গি করে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল, আস্তে মশাই আস্তে। দেওয়ালেরও কান আছে। প্রভাকরের কানের কাছে মুখটা এনে বলেছিল আমার ছোটো ভাইটাই যে আপনাদের দলে ঢুকে গেছে। আপনাদের মধ্যে আমি তাকেই খুঁজে বেড়াই।

প্রভাকর জিজ্ঞাসা করেছিল, তমালদা জানে আপনার ভাই-এর কথা?

তমালবাবু আমাকে চেনেন না। তাকে আমার ভাইযের কথা জিজ্ঞাসা করাব সুযোগ কোথায়? জানেন প্রভাকর বাবু? অফিসারটি পকেট থেকে রুমাল বের কবে চোখ মুছে বলেছিল, মা আমার মৃত্যুশয্যায়। দরজার দিকে তাকিয়ে শুধু খোকা, খোকা বলে চোখেব জল ফেলে চলেছে।

কী হয়েছে আপনার মার? প্রভাকরের গলাটা ধরে এসেছিল।

পুলিস অফিসারটি তার গলার স্বরকে ততোধিক তরল করে বলেছিল, গলায় ক্যানসার।

প্রভাকরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ইস।

অফিসার প্রভাকরের হাতটা ধরে বলেছিল, দেখুন, আপনিই বুঝতে পারবেন মার যন্ত্রণা। মা থাকলে মার অভাব বোঝা যায় না।

প্রভাকর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার মা যে নেই তা আপনি জানেন?

একটা বিষম খেয়েছিল অফিসারটি। গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলেছিল, আপনাদের সব খবর রাখি বলেই তো কাল সারারাত আপনাদের পাহারা দিতে আমাদের একজনকে আপনাদের বেঞ্চের সামনে বসিয়ে রেখেছিলাম।

প্রভাকর উত্তেজনায় বেশ জোরে বলে উঠেছিল, ও, একজন নীল শার্ট পরা লোক আমাদের সামনে সারা রাত বসে ছিল। সে তাহলে পুলিসের লোক। আমাদের পাহাবা দিতে পাঠিয়েছিলেন।

চুপ, ঠোঁটে হাত রেখেছিল অফিসার। পেছনে বসা পুলিসের দিকে ইশারায় দেখিয়ে বলেছিল, ওরা শুনতে পাবে।

প্রভাকর চুপ হয়ে গিয়েছিল।

অফিসারটি আবার আর্দ্র স্বরে বলেছিল, মার এই যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না। ডাক্তার বলছেন, একমাত্র মৃত্যুই মাকে এই অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি এনে দিতে পাবে। কিন্তু মার মৃত্যুর আগে যদি একবার ছোটো ভাইটাকে এনে দেখাতে পারতাম, তবে মা একটা সান্ত্বনা নিয়ে এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেত।

আপনার ভাই-এর নাম কি বলুন তো?

সত্যেন। চেনেন তাকে? প্রভাকরের দুটো হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে পুলিস অফিসারটি বলেছিল।

প্রভাকর বলেছিল, এই নামে আমি কোনো নক্সাল নেতাকে চিনি না। তবে আমি একজন বড় নেতাকে চিনি। তিনি নিশ্চয়ই আপনার ভাইকে চিনতে পারবেন।

অফিসারটি প্রভাকবেব দুটো হাঁটু চেপে ধরে বলেছিল, আমার ভাই-এর বয়স তোমার মতনই হবে ভাই। নয়তো, তোমার দুটো পা ধরতাম। আমার মার কথা ভেবে তার সাথে আজকেই আমাকে যোগযোগ করিয়ে দাও। আমি আমার মাকে মৃত্যু-সজ্জা থেকে তুলে তার কাছে নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করব তিনি যেন আমার ভাইকে একবারের জন্য মাকে দেখে আসতে বলেন।

প্রভাকর বলেছিল, তার বাড়ির ঠিকানা আপনাকে বলতে পারব না। আমি একবার সেই বাড়িতে গিয়েছিলাম।

অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিল, তার নামটা বলতে পার ভাই?

প্রভাকর চুপ করে ছিল।

অফিসারটি বলেছিল, থাক, তোমার আপত্তি থাকলে বলতে হবে না। আসলে ভাইটাকে একবার শেষ বারের মতন মাকে দেখাতে চেয়েছিলাম। ওতো আমাকে অনেক নক্সাল নেতার নাম বলত। কয়েকজনের সাথে পরিচয়ও করে দিয়েছিল। নামটা জানতে পারলে বুঝতে পারতাম উনি আমার ভাইকে চেনেন কিনা।

প্রভাকর বলেছিল, আমি নক্সাল রাজনীতি বুঝি না। তবে জানি ওরা খুব ভালো লোক। গরীব মানুষের জন্য ওরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। তমালদার কথাই ভাবুন না। কত ভালো ছাত্র। শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ার অথচ গরীব মানুষগুলির জন্য সব ছেড়ে লড়াই করছে।

অফিসারটি বলেছিল, আমিও তো আপনার মতো ওদের কথা ভাবি। এত সব শিক্ষিত ছেলে দেশের জন্য বেরিয়ে পড়েছে। এরকম আত্মত্যাগ, শ্রদ্ধা না করে পারা যায়? আমার ভাইয়ের কথাই ভাবুন। সবার ছোটো ভাই। কত আদরের। পড়াশোনায় ওর ধারে কাছে যাবার যোগ্যতা আমাদের কারো নেই। ডাক্তারি পড়ছিল। ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। ওর মাস্টারমশাইরা সবাই বলেছেন ও এত ভালো ছেলে এর আগে কলেজে আসেনি। সে এখন বেঁচে আছে কিনা কে জানে?

প্রভাকর বলেছিল, আপনার ভাই ডাক্তার?

অফিসারটি চোখ দুটি মুছে বলেছিল, হ্যাঁ ভাই।

প্রভাকর বলেছিল, ফরসা, লম্বা। কপালের বাঁ পাশে একটা কাটা দাগ আছে?

অফিসারটি প্রভাকরের হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, হ্যাঁ ভাই, ঐ তো আমার ভাই। আপনি ওকে কোথায় দেখেছেন?

প্রভাকর বলেছিল, আমার মামার বাড়ির পাশের বাড়িতে একটা বাড়িতে একজন রোগা ভদ্রলোক থাকেন। উনি খুব অসুস্থ। আমার মামার ওষুধের দেকান। একদিন গভীর রাতে তমালদা মামাকে ডাকতে এসেছিলেন, সেদিন আমি মামার বাড়িতে ছিলাম। দরজাটা আমিই খুলেছিলাম। আমাকে দেখে তমালদা চিনতে পারেন নি। শুধু বলেছিলেন, সুবোধ বাবুকে ডেকে দিন।

মামা সে রাতে বাড়িতে ছিলেন না। আমি তাই বলেছিলাম, মামা তো বাড়িতে নেই। তমালদা বলেছিল, দোকানের চাবিটা নিয়ে আসুন। আমাদের একটা ওষুধ দরকার। আমি বলেছিলাম, আমি ওষুধ চিনি না।

আরেকজন রোগা কালো লম্বা অল্প বয়সের একটা ছেলে তমালদার কাছে এসে বলেছিল, ওষুধটা পেলে? চেয়ারম্যানের ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

আমি বলেছিলাম, আমি মামীর কাছ থেকে দোকানের চাবিটা নিয়ে আসছি। আপনারা কি ওষুধটা চিনে নিতে পারবেন?

তমালদা ছেলেটিকে বলেছিল, কুহক, তুই যা, না পেলে ডাক্তারকে পাঠাচ্ছি।

অফিসারটি জিজ্ঞাসা করেছিল, কি নাম বললেন? কুহক?

প্রভাকর বলেছিল, হ্যাঁ, আপনি বুঝি চেনেন কুহককে?

অফিসার বলেছিল, ভাইয়ের মুখে ওর নামটা আমি শুনেছি। তারপর কি করলেন?

আমি শার্টার খুলতে গেলে কুহকও দু-হাত দিয়ে শার্টার টেনে ধরেছিল। ওর শার্টটা কোমরের উপর উঠে গিয়েছিল। তাই তো দেখতে পেলাম ওর কোমরে রিভলভার বেল্টের সাথে বাঁধা। বুঝতে পেরেছিলাম, কুহকও তমালদার মতন নক্সাল।

তারপর?

ওষুধটা একটা ইনজেকশন। কুহক আমাকে বলেছিল, আপনি চট্ করে এই বাড়ির দোতলায় চলে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনুন তো, যদি কোনো ওষুধ লাগে এক সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

আমি এক ছুটে ওপরে চলে গিয়েছিলাম। দরজা খোলাই ছিল। আমি একদম ভিতরের ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। দেখেছিলাম একজন রোগা, ফর্সা ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। ভীষণ হাঁপানির টান উঠেছে।

কী রকম দেখতে বললেন? অফিসারের স্বরে তীব্র উত্তেজনা।

প্রভাকর বলেছিল, ঐ যে বললাম অসম্ভব রোগা, ফরসা, কিন্তু চোখ দুটি প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত।

ঠিক আছে। সেখানেই বুঝি আমার ভাইকে দেখলেন?

আপনার ভাই কিনা বলতে পারব না, তবে আপনি আপনার ভাইয়ের যে বর্ণনা দিলেন তার সাথে মিলে যাচ্ছে।

আপনার মামার বাড়িটা কোথায় বলুন তো?

ঝাউতলা রোডে।

পুলিস অফিসারটি সোজা হয়ে বসে বলেছিল, আমাদের কাছে খবর আছে, তমালবাবুকে যারা গুলি করেছে তাদের আপনি চেনেন, তারা আপনাকে খুঁজে চলেছে।

প্রভাকর ভীত কণ্ঠে বলেছিল, আমাকে খুঁজছে কেন? আমি নক্সাল নই, ওদের ক্ষতিও করিনি।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিল, ওরা যখন তমাল বাবুকে গুলি করেছিল, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

প্রভাকর বলেছিল, আমি সোনারপুর যাব বলে যাদবপুর স্টেশনের ওভার-ব্রীজ ধরে যখন দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছিলাম তখন গুলির শব্দ শুনে সকলের সাথে আমিও ছুট লাগিয়ে ছিলাম। তখনও তো জানিনা গুলিটা ওরা তমালদাকেই করেছে।

আপনি আসল কথাটি বলুন। অফিসারের কণ্ঠে অধৈর্যের সুর। ওদের চিনলেন কি ভাবে?

প্রভাকর বলেছিল, আমি যখন ওভার-ব্রীজের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন ওরা লাইন ধরে ছুটতে শুরু করেছিল। দু'জনের মুখের ঢাকনা খুলে গিয়েছিল। আমি চিনতে পেরেছিলাম, একজনের নাম অভয়, সি. পি. এম. করে। অপর জনের নাম সাধন। মজা হচ্ছে সেই সাধন কিন্তু আপনাদের পুলিস দপ্তরেই কাজ করে।

পুলিস অফিসার গম্ভীর হয়ে বলেছিল, আপনাকে সন্তোষপুরে নামিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। আপনি বরং আমাদের সাথে লালবাজারে চলুন।

কেন?

আপনি সন্তোষপুরে গেলেই ওরা আপনাকে গুলি করবে। রাত্রি হলে আমরা আপনাকে চুপি চুপি বাড়ি পৌঁছে দেব। আপনাব যা জানাব কথা নয় আপনি তা জেনে গেছেন।

পুলিসের জীপটা আচমকা তার চলাব দিক পরিবর্তন কবে লালবাজারের দিকে ছুটে চলেছিল।

পরের দিন সংবাদ পত্র জুড়ে খবর বেরিয়েছিল, ঝাউতলা রোডের গোপন আস্তানা থেকে শীর্ষ স্থানীয় নক্সাল নেতারা গ্রেপ্তার। তারই নীচে এক কোণে আরো একটা সংবাদ সেদিন প্রতিদিনকার মৃত্যু তালিকায় জায়গা পেয়েছিল।

পুলিসেব উপর গুলি চালাতে গিয়ে পুলিসের পালটা গুলিতে প্রভাকর মিশ্র বলে এক নক্সাল নেতা নিহত।

[৩৫]

বেডসুইচটা নিজেব অজান্তেই অফ করে দিয়েছিল বসুন্ধবা। ফ্যানটা তাব গতি হারিয়ে ধীরে ধীরে স্থির হয়ে ঝুলে ছিল। বসুন্ধবা শুয়ে শুয়েই ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন ব্লেডগুলির মধ্যেকার ফাঁকা জায়গা দিয়ে সিলিংটাকে স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায। দক্ষিণ কোণে ঘন কালো মেঘ। বিদ্যুতের চমক দেখেই বোঝা যায় সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্তির মুখে।

সেদিনও এরকম মেঘ জমেছিল দক্ষিণের আকাশে। সন্ধেবেলাতেই একটা শীত শীত ভাব সেই সাথে গায়ে ব্যথা যে জ্বরের আগমন বার্তা বুঝতে পেরেছিল বসুন্ধরা। দিদাকে জানাযনি। দিদাব শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। জ্বর জ্বর লাগছে এই খবরটুকুতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ইদানিং তাকে নিযে অল্পতেই অস্থিব হয়ে পড়েন।

বসুন্ধরা বলত, দিদা আমাকে নিয়ে তুমি এত চিন্তা কর কেন বলত?

স্বর্ণপ্রভা বলতেন, তুই যে বড়ো হয়েছিস দিদি।

বসুন্ধবা বাগ করে বলত, বড়ো হলে যদি চিন্তার কারণ হয় তবে তো আমার চিরকাল শিশু থাকলেই ভালো হতো।

স্বর্ণপ্রভা বসুন্ধরাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায হাত বুলিয়ে বলতেন, রাগ করিস না দিদি। মেয়ের মা হলে বুঝবি মেয়ে বড়ো হলে মা-দিদিমার চিন্তা কেন বাড়ে।

দিদাকে জ্বরের খবরটা না দিয়ে বসুন্ধরা বলেছিল, দিদা আজ রাতে লুচি খেতে ইচ্ছে করছে।

স্বর্ণপ্রভা সন্ধ্যের মধ্যে দুধ খই খেয়ে নেন। রাতে আর কিছু খান না। তবে বসুন্ধরার খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত জেগে থাকতে চান। বসুন্ধরা তাই তাড়াতাড়িই খেয়ে নেয়। দিদার মশারী গুঁজে দিয়ে নিজের ঘরে এসে পড়তে থাকে। আগে দরজাটা খোলাই থাকত। এখন বসুন্ধরা বাত জেগে পড়াশোনা করে বলে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। না হলে ঘরের আলো দিদার চোখে পড়ে।

মুখে সেদিন লুচিটা তিতা লেগেছিল। বসুন্ধরা বুঝতে পেরেছিল জ্বর তার শরীরে সংসার পেতে নিয়েছে। দিদা যাতে বুঝতে না পারে তাই জোর করে চারটে লুচি খেয়ে উঠে পড়েছিল।

স্বর্ণপ্রভা গজগজ করেছিলেন, এইটুকু খেলে এত বড়ো মেয়ের শরীর টিকবে? এই হচ্ছে

আধুনিক মেয়েদের স্টাইল। খাওয়া কমিয়ে রোগা থাকবে। আর কটা দিন অপেক্ষা করে এসব কর। আমি দুচোখ বুঁজি তাবপর যত খুশি স্টাইল কর। উপর থেকে কিছু বলতে আসব না।

স্বর্ণপ্রভা ইদানিং কানে কম শুনতেন। সেই সাথে একটা নতুন অভ্যাস দেখা দিয়েছিল। একটা কথা বার বার বলতেন।

বসুন্ধরা বলেছিল, আমি কোনো দিন কম খাই? তুমি ভুলে গেছ আজ বড়োমার ওখানে খেতে গিয়েছিলাম। বড়মা যা খাইয়েছে তুমি থাকলে বলতে এ আমাব বসুন্ধরা নয়। এ নিশ্চয়ই ঘটোৎকচের মা হিড়িম্বা।

তবু থামানো মুশকিল স্বর্ণপ্রভাকে। কি জানি বাপু, তোমবা এখন কলকাতার মেয়ে। আমাদের খাওয়া দেখে তো হিড়িম্বার কথাই মনে হবে।

এই দেখে বসুন্ধরা হেসে ফেলেছিল। আমি আবার তোমাকে কখন হিড়িম্বা বললাম?

বলতে আর বাকি রাখলে কী? যাও এবাব মুখ ধুয়ে নাও। বেশি রাত জেগ না। স্বর্ণপ্রভা উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন।

মশারির কোজাগুলি গুঁজতে গুঁজতে বসুন্ধরা বলেছিল, দিদা কাল সকালে রাধুনি মাসিকে বসহ হাঁড়িতে ভাত বসাতে বলবে।

কেন?

কাল থেকে আমি পাক্কা এক কেজি চালেব ভাত খাব।

স্বর্ণপ্রভার রাগ জল হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, বুড়ি দিদার উপর রাগ করিস না দিদি। তুই ভালো থাকলেই যে আমার আনন্দ।

বসুন্ধরা দিদার গালে একটা চুমু দিতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল। এই দিদাই তো তার গাল দিয়ে শরীরের উত্তাপ পরখ করত।

সেদিন ঝড়টা শুরু হয়েছিল বেশ ধাপে ধাপে। প্রথমে বৃষ্টি, তারপব মৃদু মৃদু হাওয়া। শেষে প্রবল তাণ্ডব।

দিদার ঘরে এর মধ্যেই কয়েক বার উঁকি দিয়ে এসেছিল বসুন্ধরা। কানে কম শোনার এই সুবিধা। ঝড়ের এই প্রচণ্ড তাণ্ডবেও দিদা গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে।

প্রভাকরের মৃত্যুটা বুকে বড্ড বিঁধেছিল। ও সেদিন তার কাছেই থাকতে চেয়েছিল। প্রভাকরেরা সত্যিকারে ভীতু। মুখ ফুটে বলার সাহস তাদের থাকে না। এমন কি মৃত্যুও যদি তার শিয়রে এসে দাঁড়ায় সে কথাও সে পাশের জনেব কাছে মুখ ফুটে বলতে পারে না। এরা এতই ভীতু যে নিজের ভয়ের কথাটাও বলতে সাহাস করে না।

কী চেয়েছিল সে তার কাছে? বসুন্ধরা ভাবতে চেষ্টা করেছিল। প্রভাকর তার প্রতি প্রেম নিবেদন করতে চায় এধারণা তার মনে জায়গা পেল কী ভাবে সেই প্রশ্নই বসুন্ধরা বার বার নিজের মনকে প্রশ্ন করেছে। উত্তরে নিজেই খুশি হয় নি। পালটা যুক্তি দেখিয়েছে। একটা পুরুষও নারীর মধ্যে কি শুধু প্রেমের সম্পর্কের বাইরে আর কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে? একজন পুরুষ কি নারীর দৈহিক উষ্ণতার জন্যই তার সান্নিধ্য কামনা করে?

প্রভাকর তার কাছে কী প্রত্যাশা করতে পারে? সে তো জানত তমালের সাথে তার সম্পর্কের কথা। জানত বলেই তো তমালের খবর নিয়ে সেই ছুটে এসেছিল। তাকে নিয়েই ছুটে গিয়েছিল হাসপাতালে। নিজের রক্ত দিয়ে তাকে বাঁচিয়েছিল। সে তমালকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেনি।

অথচ প্রভাকর সেদিন তাকে যখন বাড়িতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল তখন সে কেন তাকে এভাবে ফিরিয়ে দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল—সেই ভাবনাই তাকে অস্থির করে তুলেছিল।

পুলিশের গাড়িতে সেই তাকে তুলে দিয়েছিল। আর প্রভাকর নক্সাল নেতা হয়ে পুলিসকে আক্রমণ করতে গিয়ে পুলিসের পালটা গুলিতে নিহত হয়েছে এটা যে কত নির্মম মিথ্যা তা তার থেকে আর বেশি কারো জানা নেই। চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে প্রভাকরের সেই নীরব প্রতিবাদের চাউনির দৃশ্য। ও যেতে চায়নি পুলিসের গাড়িতে। যেতে চেয়েছিল তার সাথে।

সে উঠেছিল তমালের ছোটো মামার গাড়িতে। ছোটো মামা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রভাকরকে পুলিস নিরাপদে সন্তোষপুরে পৌঁছে দেবে। খবরটা শুনেই সে ছুটেছিল তমালদের বাড়িতে। প্রিয়তোষ বাবু কলকাতায় ছিলেন না। একটা সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন।

বসুন্ধরাকে দেখেই তমালের ছোটো মামী তাকে হাত ধরে ভিতরেব ঘরে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিরে মেয়ে, এত সকালে আমার কাছে এসেছিস, না কোনো কাজের কথা বলতে এসেছিস?

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা কবেছিল, ছোটোমামা আছেন?

ও তাই বল। ছোটো মামী একটু অভিমানেব সুরে বলেছিলেন, তুই তাহলে তোর ছোট মামার কাছে এসেছি। যা ছোটো মামা ঘরেই আছে। কখন বেরিয়ে যাবে আমিই টের পাব না।

বসুন্ধবাকে দেখেই তমালের ছোটো মামা বলেছিলেন, প্রভাকবেব ব্যাপারটা আমি খোঁজ নিচ্ছি। ওযে নক্সাল আন্দোলনের এত বড় নেতা ছিল তা কিন্তু আমি জানতাম না।

বসুন্ধরা বলেছিল, আপনি ভাল করেই জানেন ছোট মামা, প্রভাকর নক্সাল রাজনীতি করত না। ও পুলিশকে আক্রমণ কবেনি। পুলিশের গাড়িতে ওকে আপনিই তুলে দিয়েছিলেন।

ছোটো মামা পাইপের তামাকে আগুন ধরিয়ে একটা নীলাভ ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, পুলিসকে অনেক অপ্রিয় কাজ বাধ্য হয়ে করতে হয়। আব এসব নিয়ে তোমার সাথে কথা বলার সময় এখন নেই। আমাকে এখনই সি. এম.-এর বাড়িতে যেতে হবে। তমালের ব্যাপারে তোমার সাথে যে কথাগুলি হয়েছে সে গুলি মনে রাখার চেষ্টা করো।

বসুন্ধরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

তমালের ছোটো মামা গাড়িতে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তমালকে তুমি ভালোবাস? বসুন্ধরা চুপ করে ছিল।

ছোটো মামা বলেছিলেন, ওযে নক্সাল রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে গেছে তুমি জান?

—বসুন্ধরা মাথা ঝাঁকিয়ে ছিল, হ্যাঁ।

—তুমি কি ওদের রাজনীতির সাথে যুক্ত?

—না।

—ওকে বাধা দিলে না কেন?

—বড়মা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

—কিন্তু তোমার বড়মার থেকেও এ ক্ষেত্রে তোমার প্রভাব বেশি থাকার কথা।

—তমালদা আমার সাথে রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনা করে না। আমি কিছু বলতে গেলে ও রেগে যাবে এই ভয়ে কিছু বলি না।

ওর সাথে তো তোমার জীবনকে জড়াতে চাইছ?

বসুন্ধরা চুপ করে ছিল।

তমালের ছোটো মামা বলেছিলেন, তমালের জীবনের উপর যে কোনো ধরনের আক্রমণ হতে পারে তার প্রমাণ তো পেলে।

বসুন্ধরা মাথা ঝাঁকিয়েছিল।

শোনো, তমালের ছোটো মামা বলেছিলেন, এবার ও কোনো মতে বেঁচে গেছে। ওর উপর যে শুধু সি. পি. এম.-এর লোকেরাই আক্রমণ করতে পারে তা নয়। ওর নিজেদের লোকেরাই ওকে খুন করতে পারে। ওর দলের মধ্যেই শুরু হয়েছে অন্তর্কলহ। ওকে বোঝাও ও যেন বাইরে চলে যায়। ওর বড়ো মামা ওকে লন্ডনে নিয়ে যেতে চায়। ওর মাকে এখনই এসব কথা বলার দরকার নেই।

বসুন্ধরা বলেছিল, আমি চেষ্টা করব।

তমালের ছোটো মামা আর কোনো কথা বলেন নি।

বাড়িতে আসার পর বলেছিলেন, তুমি কি এখনই তোমার বাড়িতে যেতে চাও?

—হ্যাঁ।

—ঠিকে আছে। তোমাকে ড্রাইভার তোমার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

ছোটোমামা গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন।

ঝড়ের দাপটে দরজার উপরে টোকার শব্দ বুঝতে পারেনি বসুন্ধরা। মনে হয়েছিল ঝড়ের দাপটে দরজায় শব্দ হচ্ছে। বসুন্ধরা বসুন্ধরা ডাকটা প্রথমে শুনতে পেলেও মনে হয়েছিল ঝড়ের শব্দে ভুল শুনছে। এই ঝড়ের মধ্যে কে তাকে ডাকতে আসবে?

কিন্তু আবার সেই ডাক, বসুন্ধরা বসুন্ধরা দরজা খোল। আমি তমাল।

দরজাটা খুলে দিতেই তমাল ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। বৃষ্টির জলে সারা শরীর সপসপে ভিজে।

বসুন্ধরা ভয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল, কী হয়েছে তোমার?

তমাল ওর মুখটা চেপে ধরে বলেছিল, চীৎকার করছ কেন? তোমার তোয়ালে আর একটা কাপড় দাও। এই ভিজে জামা-কাপড়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

বসুন্ধরা ওর একটা শাড়ি এনে দিয়ে বলেছিল, ধর। তোয়ালে এনে দিচ্ছি।

ভিতরের বারান্দা দিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে দেখল দিদার ঘর অন্ধকার। দিদা ঘুমিয়ে আছে। তোয়ালেটা তমালের হাতে দিয়ে বলেছিল এই ঘরেই সব ছেড়ে শরীরটা মুছে নেও।

তমাল তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছে জামা-গেঞ্জি খুলে ফেলে শাড়িতে শরীরটা আড়াল করে প্যান্ট, আণ্ডারওয়ার ছেড়ে বসুন্ধরার বিছানাতে এসে বসেছিল।

বসুন্ধরা ওর পাশে এসে বসে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী হয়েছে তোমার তমাল দা? এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তুমি এভাবে এত রাতে আমার এখানে?

তমাল বলেছিল, বড্ড বিপদে পড়ে তোমার এখানে এসেছি।

কিসের বিপদ? তমালের একেবারে গা ঘেঁসে বসুন্ধরা সরে এসেছিল।

তমাল বলেছিল, পুলিসের হাত থেকে অল্পের জন্য পালাতে পেরেছি।

বসুন্ধরা বলেছিল, পুলিস থেকেও তোমার দলের লোকদের কাছ থেকেই তো তোমার বেশি বিপদ।

তমাল বসুন্ধরার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

বসুন্ধরার পরনে পাতলা নাইট গাউন। বুকের একটা বোতাম খোলা। ভিতরে কোনো অন্তর্বাস নেই। পাতলা গাউনের ভিতর দিয়ে গোলাপি দুটি বৃন্ত অস্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠে আরো আমন্ত্রণীয় হয়ে উঠেছে। মাথার চুল ঝরনার ধারার মতন কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। পেলব মসৃণ স্বর্ণচাঁপার মতন উন্মুক্ত গলায় চেনের লকেটটা বুকের দুই খাঁজের মাঝে দাঁড়িয়ে যেন বসুন্ধরার শরীরটাকে আরো লোভনীয় করে তুলেছিল।

তমাল তাকিয়ে ছিল বসুন্ধরার দিকে। শিরদাঁড়া বেয়ে আগ্নেয়গিরির লাভার মতন একটা উষ্ণ স্রোত তার তলপেট পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছিল।

বসুন্ধরার সারা শরীর কেঁপে উঠেছিল সেই দৃষ্টির লেহনে। তমালের চোখের উপর চোখ পড়তেই কেমন একটা শিহরণ অনুভব করেছিল।

এই সময়ই নেমে এসেছিল ঘর জুড়ে অন্ধকার। লোড-শেডিং। তীব্র একটা বিদ্যুত চমকের সাথে সাথে কাছেই বাজ পড়ার ভয়ঙ্কর আওয়াজে বসুন্ধরা ভয়ে তমালকে দুহাতের বাঁধনে জড়িয়ে ধরেছিল। ওর তপ্ত নিঃশ্বাস তমালের সেই উষ্ণস্রোতকে করে তুলেছিল দুর্বার। ওর মুখটা নেমে এসেছিল বসুন্ধরার ঠোঁটের উপর।

বসুন্ধরা ওব ঠোঁট দুটোকে তমালের ঠোঁটের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু দুহাতের বাঁধনে তার শরীরটাকে তমাল তার শরীরের সাথে একেবারে মিশিয়ে দিতে চাইছিল। একটা দানবীয় শক্তি যেন তার এই কোমল দেহটাকে মত্ত হাতির মতন দলিত মথিত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বসুন্ধরার শরীরের প্রতিরোধ হঠাৎই আত্মসমর্পণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল।

দানবীয় দলনের মধ্যেও যে এমন এক অনাস্বাদিত স্বর্গীয় অনুভূতি লুকিয়ে থাকতে পারে সেই আবিষ্কারের আনন্দে তার স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিরোধের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়েছিল। সমস্ত শরীর এক অপূর্ব শিথিলতার আবেগে কেঁপে উঠেছিল। বসুন্ধরা বুঝতে পারছিল তমালের অস্থির হাত তার শরীরের প্রতি কোষে সেতারের তারের মতন নানা রাগিনীর সুরে বাজিয়ে চলেছে।

বসুন্ধরার স্নাতন্ত্রীগুলি কোনো এক বশীকরণ মন্ত্রে মুগ্ধ আবেগে অবস হয়ে পড়েছিল। নিপীড়নের ব্যথাও যে এত মধুর হয় এ অভিজ্ঞতায় তার প্রতি রোম রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সারা মন রিবংসার দহনে দস্যুর শেষ আঘাতের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করেই ছিল। তমালের দুটি হাত অজগরের মতন পেষণের চাপে তার কোমল মাংস ভেদ করে হাড়ের উপর যতই চেপে বসতে চাইছিল ততই এক অস্ফুট শীৎকারে তার দেহ যেন আরো পিষ্ট হবার আবেদন জানিয়ে চলেছিল।

সুখানুভূতির এই অতলস্পর্শী গভীর খাদ থেকে যখন উঠে এসেছিল, বসুন্ধরা আবিষ্কার করেছিল তার শরীর থেকে শেষ কার্পাসটুকুও সেই দস্যু লুট করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর নিজে পরিতৃপ্তির ক্লান্তিতে ভোজন-তৃপ্ত অজগরের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সেই সুখের সাগরে সাঁতার কাটার সময় টের পায়নি কখন আবার লাইট এসে গেছে। আলোর যে এত কদর্য রূপ হয় নিজের নগ্নদেহ ও তমালের বস্ত্রশূন্য হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে লজ্জা ও আতঙ্কে চোখ ঢেকে ছিল। আলোটাকে নিবিয়ে দিয়ে সেই লজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষার সহজতম উপায়টির কথাও তার মনে পড়েনি।

দিদার কাশির আওয়াজে তার চেতনা ফিরে এসেছিল। নাইট গাউনটা হরিণ-চকিত গতিতে তুলে নিয়ে পরে নিয়েছিল। একটা বেডসীটে তমালের নগ্ন দেহ ঢেকে দিয়ে আলনা থেকে একটা কাপড় টেনে নিয়ে সুইচটা অফ করে দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েছিল। এইটুকু আসতেই তার মনে হয়েছিল সে যেন হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে।

বাথরুমের আলো জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করেই শরীর থেকে নাইট গাউনটাকে খুলে এক কোনায় ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেই বেলজিয়াম গ্লাসের আয়নায় বসুন্ধরা যেন আবার নিজেকে দ্বিতীয় বারের জন্য আবিষ্কার করেছিল।

প্রথম বারের আবিষ্কার ছিল নিজেকে চেনা। সে যে নারী, তার নারীত্বকে লৌহপ্রাচীরের আড়ালে রক্ষিত রাখার দায়িত্বকে বুঝতে শিখেছিল। সে মানুষ হলেও নারী। কস্তুরীমৃগের

ঘ্রাণের মতন তার নারীত্বের ঘ্রাণে বহু তস্কর তার শরীরের সুখ লুট করার জন্য সিঁধ কেটে ঢোকার চেষ্টা করবে।

আজ আবার আবিষ্কার করল, যে নারী তার নারীত্বকে জন্তুর হাত থেকে লুণ্ঠনের আশঙ্কায় নিজের চারিপাশে নিরাপত্তার বলয় রচনা করে, সেই নারীই আবার দয়িতের হাতে তার নারীত্বকে লুণ্ঠনের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

বাথরুমের দেয়ালের আয়নার সামনে আবার সেই আবিষ্কারের দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বসুন্ধরা। প্রথম বারের দৃষ্টিতে ছিল তার শরীরের একের পর এক সম্পদের আবিষ্কারের নেশা। এবারের দৃষ্টিতে সেই সম্পদ লুঠের হিসেবের পালা।

সারা শরীর জুড়ে এক গভীর ক্লান্তির ছাপ। ডালিম-রাঙা উদ্ধত যৌবন দুটি তখনও দ্রুত উঠানামা করছে। তার পেলব নগ্ন বুকে কোনো এক হিংস্র শ্বাপদ যেন উন্মত্ত উল্লাসে তার দংশনের চিহ্নগুলি এঁকে দিয়েছে।

সাওয়ারটা চালিয়ে দিয়েছিল বসুন্ধরা। ঝড়ের শীতলতায় কনকনে ঠাণ্ডা জলকেও সেদিন উষ্ণ মনে হয়েছিল। জলটা আরো ঠাণ্ডা হলে যেন তার শরীরের এই দহন-জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হতো।

বুকে, গলায় ও ঘাড়ে লাঙলের কর্ষণের মতন সোহাগের চিহ্নগুলি সিক্ত দেহ থেকে মুছে ফেলার জন্য বসুন্ধরা দু হাতের আঙ্গুলের চাপে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অহল্যাভূমিতে একবার সুখস্পর্শ ছুঁইয়ে গেলে তাকে আবার পাথরে পরিণত করার বিধি নেই। তাই যতবারই সে সেই চিহ্নগুলির উপর আঙ্গুল ছোঁওয়াচ্ছিল ততবারই সেই মুহূর্তগুলির স্মৃতি তার শরীরে রোমাঞ্চের শিহরণ তুলছিল।

লাল পাতলা ঠোঁটের উপর জমে থাকা রক্তের টিপ তার আত্মনিবেদনের সাক্ষী রূপে মুখ টিপে হেসে চলেছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বসুন্ধরা আবিষ্কার করেছিল তার জীবনের একুশটি বসন্তের ফুল এক নিমেষেই সেই দস্যুর হাতে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। আর সেই দস্যুই তো তার স্বপ্নের দস্যু। তাকে নিবেদন করার জন্যই সে তার যৌবনের ফুলগুলি সাজিয়ে রেখেছিল।

সারা শরীর জুড়ে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে দু চোখ বেয়ে বাঁধনহারা চোখের জল নেমে এসেছিল। বসুন্ধরা বুঝতে পারছিল না এটা সবহারানোর যন্ত্রণার কান্না, না দয়িতকে সব দিতে পারার আনন্দ-ধারা। সেদিন শাওয়ারের জলের ধারার সঙ্গে চোখের নোনা জল মিশে গিয়েছিল।

খোলা সাওয়ারের নীচে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে চেতনা ছিল না বসুন্ধরার। এক সময় মনে হয়েছিল তার শরীরের উত্তাপ বলে কিছু নেই। অবিশ্রান্ত জলের ধারা শরীরের সমস্ত উষ্ণতাকে শুষে নিয়েছে। মনে হয়েছিল ফ্যাকাসে চামড়া তার শরীর থেকে যে কোনো মুহূর্তে খসে পড়বে। চোখ দুটো জবা ফুলের মতন রক্তবর্ণ। দাঁতগুলি অবাধ্য বালকের মতন ক্রমাগত উপর-নীচে ঠোকাঠুকি শুরু করেছিল।

তোয়ালেটা অনেক আগেই ব্যবহার করে আলনার উপর রেখে দিয়েছিল তমাল। বাথরুমে আসার সময় সেই তোয়ালেটাই নিয়ে এসেছিল বসুন্ধরা। একটা পুরুষালি গন্ধ তোয়ালেটার গায়ে লেগে আছে, যে গন্ধের আবেশে সে ঘণ্টা খানেক আগেও সুখের আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলেছিল। তোয়ালেটা দিয়ে মাথা মুছতেই সেই গন্ধটাই তার গা গুলিয়ে দিয়েছিল। একে বারে নাভিমূল থেকেই বমিটা উঠে এসেছিল বসুন্ধরার গলায়। হড় হড় করে বেসিনে বমি করে ফেলেছিল।

বাইরে বৃষ্টির বেগ থেমে এসেছিল। বেসিনের কলটা চালিয়ে দিতেই কল কল শব্দ বেরিয়ে

এসেছিল। বমির শব্দে পাছে দিদা জেগে উঠে বাথরুম পর্যন্ত চলে আসে সেই ভয়ে খালি বালতির উপর কলটাও চালিয়ে দিয়েছিল। ভিজে শরীরের উপর শাড়িটাকে চাপিয়ে দিয়ে বসুন্ধরা যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল ততক্ষণে পূর্বের আকাশে আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে।

ঘরে তমাল নেই। তার দেওয়া শাড়িটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে। বারান্দার দিকের দরজাটা হাট করে খোলা। এই দিক দিয়েই কাল রাতে তমাল এসেছিল। বৃষ্টির ছাটে ঘরের মেঝে ভিজে গেছে। আলনার কাপড় এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। তমাল অনেক আগেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে।

বসুন্ধরা বুঝতে পেরেছিল তার শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শীত তাকে আলিঙ্গন করে হিমায়িত করতে এগিয়ে এসেছিল। হাঁটু দুটি মুড়ে আসছিল। কোনো মতে শাড়িটাকে গায়ে পেঁচিয়ে বেডকভারটা গায়ে দিয়ে নিজের শরীরটাকে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়েছিল।

[৩৬]

বসুন্ধরা জানে না কেন অমিয়া দেবীর কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল সে স্কুলে গিয়ে তার সাথে দেখা করবে। দিদার মৃত্যুর কয়েক দিন পর তমালের কাছ থেকে চিঠিটা পেয়েছিল বসুন্ধরা। প্রথমে মনে হয়েছিল তমাল হয়তো তাকে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিতে চিঠিটা লিখেছে। দিদার মৃত্যু তাকে ক্লিনিকের ভাবনা থেকে ঠেলে দিলেও মনের অস্থিরতাকে আরো তীব্র করে তুলেছিল। সে জানত মামারা এবার তার প্রশ্নটিকে মীমাংসা করতে চাইবে। তমালের সাথে তার সম্পর্কের একটা স্পষ্ট পরিণতিতে উপনীত হবার কথা বলবেন।

অমিয়া দেবীর উপর একটা অভিমান মনের কোণে গুমরে চলেছিল। বড়োমাকেই তো এগিয়ে আসার কথা ছিল। তমালের ক্ষেত্রে বড়মার প্রশ্রয়ই তার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। অথচ বড়োমা তমালের প্রসঙ্গে যদি নির্লিপ্ত থাকেন তা যে তার প্রতিই অবহেলা একথা কেন বড়ো মা বুঝতে পারছেন না। সে যে তমালের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করছে তার দায়িত্ব কেন সে একা বহন করবে? তমালের জন্মদাত্রী রূপে বড়মারও দায়িত্ব আছে সে কথা কেন বড় মা নিজের থেকে এগিয়ে এসে নেবে না? সে দিন তার অস্থির চিত্ত অবশ্য ভাবতে চায়নি, বড়োমার কাছ থেকে সেই এতদিন এড়িয়ে থেকেছে।

সেদিন ট্রেনেই অমিয়া দেবীর সারা শরীর কেঁপে যে জ্বর এসেছিল, সে জ্বর যে টাইফয়েডের জ্বর সে কথা বসুন্ধরার কাছে পৌঁছেছিল অনেক পরে। স্বর্ণপ্রভার মৃত্যু সংবাদটিও জ্বরে বেহুঁশ অমিয়া দেবীর কাছে পৌঁছেছিল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পর। ডাক্তারই খবরটা দিতে বারণ করেছিলেন।

নিভা কলকাতায় খবর পাঠাতে চেয়েছিল। অমিয়া দেবীই বারণ করেছিলেন। ছোড়দার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। বাবা ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবেন সেটা চান নি। তবে জ্বরের ঘোরেও বার বার জানতে চেয়েছেন স্বর্ণপ্রভার কথা। জ্বরের বিকারে বার বার ডেকেছেন বসুন্ধরাকে। তমালকে বলতে চেয়েছেন বসুন্ধরার প্রতি এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা সে যেন না করে।

দিন-রাত্রি একাকার হয়ে গিয়েছিল নিভাদির। বার্দ্ধক্য যে তার শরীরে বাসা বেঁধে নিয়েছে সেদিন পলে পলে অনুভব করেছিল। তবু একা হাতে সব সামলিয়েছিল। স্কুলের শিক্ষকরা অবশ্য আন্তরিকভাবেই পাশে দাঁড়িয়েছিল। রাত জাগা, মালদা থেকে ডাক্তার আনার দায়িত্ব তারাই কাঁধে তুলে নিয়েছিল।

দিদা নেই। সে কলকাতায়। অথচ বড়োমা আসেনি। সেই অচিন্তনীয় ঘটনা বসুন্ধরাকে

করে তুলেছিল অভিমানিনী। সে নিজের হাতে দিদার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছে অথচ বড়োমার কাছ থেকে সে কোনো উত্তর পেল না। একবার ভেবেছিল সে নিজেই চলে আসবে। বড়োমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবে—

বড়োমা, তুমি আমার কাছে না গিয়ে পারলে? মামাদের বাধার থেকেও তার গর্ভে তমালের সন্তানের প্রশ্নটিই সেদিন তার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রাদ্ধের পরের দিনই বড়ো মামা যখন দিল্লিতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বসুন্ধরা কোনো আপত্তি করেনি।

বড়োমামা প্রায় তিনমাস ধরেই কলকাতায় ছুটি নিয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি আর অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর টাইফয়েডের খবর পেয়েছিল শ্রাদ্ধের দিনটিতে। বুলবুল চণ্ডি থেকে কয়েকজন এসেছিলেন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তাদের কাছেই জেনেছিল অমিয়া দেবীর অসুখের কথা।

বুলবুল চণ্ডিতে ছুটে আসতে চেয়েও আসতে পারেনি বসুন্ধরা। তার আগে তমালের সাথে তার দেখা করাটা ছিল অনেক জরুরি। প্রতিদিন অপেক্ষা করেছে তমালের চিঠির জন্য; ভেবেছে চিঠি না এলেও তমাল নিজেই আসবে। মনে মনে আশায় বুক বেঁধেছে। ও প্রবঞ্চক নয়। দায়িত্ব নিতে পিছু হটে যাবে না।

খবর পেয়েছিল তমাল ভালো আছে। বড়ো মামা মাঝখানে দিল্লি গিয়েছিলেন। তিনি তমালকে মার্কিন কন্‌সিউলেটের ভিসা দপ্তর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। ওকে ডাকার আগেই সে লিফটে উঠে পড়েছিল।

দিল্লিতে তমালের বড়ো মামা বিদেশ দপ্তরের বড় আমলার পদে আছেন। ঠিকানা বসুন্ধরার কাছে আছে। বুলবুল চণ্ডিতে যাবার আগে তমালের সঙ্গে তার বোঝাপড়াটা করে নিতে চেয়েছিল। সে তমালের অনুকম্পার ভিক্ষা-প্রার্থী নয়। তমাল তাকে সমমর্যাদা দানের মাধ্যমে তারই দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করতে কতখানি রাজি আছে তা বড়মার কাছে যাবার আগে জেনে নিতে চেয়েছিল বসুন্ধরা।

দিল্লিতে গিয়ে খবরটা পেতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

তমালের বড়োমামার সাথে দেখা হয়নি। তিনি বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে কমনওয়েলথ সম্মেলনে কানাডায় গেছেন।

বসুন্ধরাকে দেখে বড়ো মামী বলেছিলেন, এসো বসুন্ধরা। কবে এলে?

বসুন্ধরা বড়ো মামীকে প্রণাম করে বলেছিল, পরশু।

বড়োমামী বলেছিলেন, তোমার দিদামার মৃত্যুতে আমরাও প্রচণ্ড শোক পেয়েছি। তোমার বড়ো মামাকে বাইরে যেতে না হলে আমি শ্রাদ্ধে যেতাম।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তমালদার কোনো খবর পেয়েছেন?

তমালের বড়ো মামীর দৃষ্টিটা মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, ওরা এখন ওয়াশিংটনে ভালোই আছে।

বসুন্ধরা অবাক হয়ে বলেছিল, ওরা ওয়াশিংটনে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না বড়োমামী।

বড়োমামী বলেছিলেন, তুমি বুঝি খবর পাওনি?

কোন খবর?

তমাল বিয়ে করে ওয়াশিংটনে চলে গেছে।

তমালদা বিয়ে করেছে? এখন ওয়াশিংটনে আছে? বসুন্ধরার চোখে সেদিন সব কিছু ঘোলা দেখাচ্ছিল। কোনো মতে সোফায় বসে বসুন্ধরা বলেছিল, আমি তো কোনো কিছুই জানি না।

বড়ো মামী বলেছিলেন, সমস্ত ব্যাপারটা আমরা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। ওর পিছনে রাজনৈতিক ছাপটা মুছতে এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, বড়ো মা জানেন?

বড়োমা? ও, তমালেব মা?

হ্যাঁ।

তাকে সব জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মা তো সবাব আগে তার সন্তানের ভবিষ্যত দেখবেন।

বসুন্ধরা তমালের বড়ো মামার বাড়ি থেকে কি ভাবে নিজের মামার বাড়িতে ফিরে এসেছিল তা নিজেই ভাবতে পারে না। বাড়িতে পৌঁছেই ভেঙ্গে পড়েছিল বসুন্ধরা। এত বড়ো এক প্রবঞ্চকের কাছে সে তার জীবনের সব বিশ্বাসকে অর্পণ করে বসেছিল। তার থেকেও অনেক বেশি যন্ত্রণা পেয়েছিল—বড়োমা এ খবর পেয়েছেন। সন্তানের সোনালি ভবিষ্যত গড়ার বাসনায় সে খবর তার কাছে পৌঁছে দেন নি।

দিল্লিতে বসেই চিঠি লিখেছিল অমিয়া দেবীকে। জানিয়েছিলেন সে সন্তান সম্ভবা। অমিয়া দেবীর সঙ্গে সে স্কুলে দেখা করেই শিক্ষিকার পদ থেকে পদত্যাগ পত্র দিতে চায়।

কলকাতায় ফিরে এসে সল্টলেকের বাড়ির ঠিকানায় তমালের সেই চিঠিটা পেয়েছিল বসুন্ধরা। তমাল তাকে লিখেছে ওয়াশিংটন থেকে।

বসুন্ধরা,

ওয়াশিংটন থেকে তোমাকে চিঠিটা লিখছি। তোমার মুখোমুখি হবার সাহস নেই। আমি জানি আমি তোমার চোখে এক বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত হয়ে আছি। সেদিন গুলির হাত থেকে বেঁচে যাবার পর আবিষ্কার করেছিলাম আমি আমার জীবনকে কতখানি ভালোবাসি। বুঝেছিলাম আমি বাঁচতে চাই। ভীষণ ভাবে বাঁচতে চাই। মনে হয়েছিল আমি দেশকে ভালোবাসি, দেশের মানুষের জন্য মরতে পারি। কিন্তু মৃত্যু যখন সত্যিসত্যিই মৃত্যুর পরোয়ানা ধরিয়ে দিতে এসে সামান্য একটুকুর জন্য ধরাতে পারেনি তখন বুঝলাম আমি আমাকেই ভালবাসি।

আমার ছোটো মামা আমাকে এরাজ্যের পুলিশের বুলেটের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন সে কথা আমি জানি। পুলিসের মধ্যেও দুটো ভাগ আছে। এক পক্ষ সরাসরি শাসক দলের সাথে হাত মিলিয়ে নক্সালপন্থীদের একেবারে নির্মূল করার অভিযানে নেমে পড়েছে। পুলিসের এই গোষ্ঠীই সেদিন আমাকে গুলি করার পেছনে ছিল। প্রভাকরের মৃত্যুর কারণ সে পুলিস অফিসারটির কাছে এক পুলিস কর্মীর নাম বলে ফেলেছিল। তাই তার সরলতার সুযোগে শীর্ষস্থানীয় নক্সাল নেতাদের গ্রেপ্তার করার কৃতিত্ব অর্জন করেও পুলিস প্রভাকরকে হত্যা করে তাকে নক্সালপন্থী বলে প্রচার করল। প্রভাকরকে হত্যা করে পুলিস সেই খুনী পুলিস কর্মীকেই বাঁচাতে চেয়েছে। ছোটো মামা প্রভাকরকে সত্যি সত্যিই নিরাপদে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল।

আমাদের দলের মধ্যে একটা অংশের ধারণা আমিই নাকি আমার ছোটোমামার কাছে দলের গোপন খবর ফাঁস করে দিচ্ছি। ওরাও আমাকে মারতে চায়।

আমি জানি, আমার মা তোমাকে নিয়ে গভীর স্বপ্ন দেখে। পুত্রবধূ রূপে মা তোমাকে ছাড়া আর কারো কথা মনের কোণে জায়গা দিতে পারবে না। আমি তোমাকে ভালোবাসি একথা বলার অধিকার আমার নেই। আমি জানি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করে এদেশ থেকে গোপনে চলে যাবার পাসপোর্ট জোগাড় করার খবরে অন্য অনেক মা স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেললেও আমার মা অন্য ধাতুতে গড়া। প্রয়োজন হলে তিনি আমার বুলেট-বিদ্ধ মৃতদেহ দেখতে রাজি আছেন, কিন্তু তোমাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে তার পুত্রবধূ রূপে মেনে নিতে রাজি হবেন না। অথচ আমি বাঁচার জন্য এদেশ থেকে পালাতে চাই। তাই দাদুব কাছে প্লেনে ওঠার আগে মার নামে চিঠি পোষ্ট করেছি। তাছাড়া মা আমার মধ্যে তার নিজস্ব ভাবনার যে প্রতিফলন দেখতে চান তা আমার সেই সিদ্ধান্তে ধূলিসাৎ হয়ে পড়বে এটা মা মেনে নিতে পারবে না। আমার মামা, এমন কি দাদুও মার এই জিদকে ভয় পান। তারা জানেন মা আমার এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারলে তা বানচাল করার জন্য সবরকম চেষ্টা করবে। এতে শুধু আমার নয়, মামাদের অসুবিধায় পড়তে হতো।

তোমার প্রতি আমি বিশ্বাসঘাকতা করলাম। ক্ষমা চাইবার অধিকারও আমার নেই। পারলে ক্ষমা করো।

ইতি—
তমাল

পুঃ—আমার স্ত্রীর নাম সাগরিকা।

চিঠিটা বারবার পড়েছিল বসুন্ধরা। তমাল তাকে ক্ষমা করতে বলেছে। চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে চোখে মুখে জল দিযে সোফায় এসে বসেছিল। মাথাটা সোফায় হেলিয়ে দিয়ে তমালের উদ্দেশ্যে বলেছিল,—

তমলাদা, তুমি ক্ষমা চেয়েছ? তোমার মতো ভীরু, স্বার্থপরকে ক্ষমা করা যায় না। তোমার মতো কাপুরুষের কাছে আমি আমার নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই ভুলের ক্ষমা আমায় কে করবে তমালদা? তোমাকে আমি কোনো দিন প্রশ্ন করব না। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এদেশে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তবে তোমাকে প্রশ্ন করার জন্য একজনকে রেখে যাব। সে তোমাকে প্রশ্ন করবে।

'আমার মার সাথে তুমি এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা কেন করলে?'

আজকের কৈফিয়তটা তুমি তার জন্য মজুত রেখে দিও।

সেদিন হঠাৎই যেন বসুন্ধরার হৃদয়ের বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির মুষল ধারার মত চোখ বেয়ে নেমে এসেছিল। যার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার বিষ তার সারা শরীর জুড়ে দংশন করে চলেছিল, তাকে হারানোর ব্যথায় চোখের জলের কথা এই মুহূর্তের আগে কল্পনাতেও জায়গা পায়নি। বরং আগুন-জ্বালা শুষ্ক চোখে বারবার জল দিয়ে তাকে ভিজিয়ে রাখতে হয়েছিল।

[৩৭]

বসুন্ধরা বলেছিল, তমালদা তুমি আমার কাছে মৃত। বড়ো মা বলেছিলেন, সে যদি তার কাছে মৃত হয় তবে সে বড়োমার কাছেও মৃত হবে।

কিন্তু বড়োমা, সে তো তোমার ছেলে। ছেলে কখনও কি মার কাছে মৃত হয়?

হ্যাঁ হয়, সে আমার কাছে মৃত। তুই আমার সন্তান, তুই আমার বংশের পবিত্র ধারা।

বড়োমা তুমি? বসুন্ধরা উঠে বসেছিল।

হ্যাঁরে মা, আমি। তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা গুলি বলছিলি। আমি অনেকক্ষণ ধরে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। তোকে জাগাই নি।

বড়োমা, অমিয়াদেবীর কোলে মুখ গুঁজেছিল বসুন্ধরা।

বসুন্ধরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ওকে পশু বলব না, পশু বললে প্রাণী জগতকেই অপমান করা হয়। কারণ পশু জগতে বিশ্বাসঘাতকতার

জায়গা নেই। তবু বলছি আরেকবার ভেবে দেখ, ঐ অমানুষটার উপর রাগ করে নিজের জীবনটাকে কেন এভাবে বিলিয়ে দিবি?

বসুন্ধরা কোনো জবাব না দিয়ে অমিয়া দেবীব কোলে মুখটা আরো বেশি করে গুঁজে দিল।

অমিয়া দেবীর একটা হাত নেমে এসেছিল বসুন্ধরাব পিঠেব উপর। মুখটা নামিয়ে এনে বসুন্ধরার ঘাড়েব উপর রেখে বললেন, একদিনের একটা ভুলে কেন তুই সারাজীবনের বোঝা বইবি? রাস্তায় হাঁটতে গেলে অনেক সময় পায়ে কাঁটা ফুটে যায়। মানুষ সেই কাঁটাকে পা থেকে টেনে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। তুই কেন কাঁটাটাকে শরীরের মধ্যে ধারণ করে হাঁটা বন্ধ করে দিবি? ঐ অমানুষটার জিত তো এখানেই ঘটবে।

বসুন্ধরা উঠে বসে। অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি তো চেষ্টা করেও পারিনি বড়োমা।

—তুই চেষ্টা করিছিলি?

—হ্যাঁ বড়ো মা।

—কী ভাবে?

—কলকাতার এক নামি ক্লিনিকের বিখ্যাত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেই আমি ওকে মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মাতা মেরী আমাকে এই খুন করতে দিল না।

অমিয়া দেবী অবাক হয়ে বললেন, মাতা মেরী? কি বলছিস তুই? তোর কথার কোনো মানেই যে আমি বুঝতে পারছি না।

বসুন্ধরা বলল, বড়ো মা, আমি কোনো দিন গীর্জাতে যাইনি। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবতেও পারি না। তবু মাতা মেরীর কোলে শিশু যীশুকে দেখে আমার কেন জানি মনে হল আমার কোলেও হয়তো এমন আলো করে সে শুয়ে থাকার জন্য আসছে। তাকে আমি হত্যা করতে পারি না। আমি সেদিন ক্লিনিক থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, আমি যে তোর দিদার কাছে কথা দিয়েছিলাম তোর সব দায়িত্ব আমার। তার কাছে আমার এই ব্যর্থতার কৈফিয়ত কী ভাবে দেব? মা বেঁচে থাকলে তার কাছে সোজা গিয়ে বলতাম, তুমি আমাকে যে শাস্তি দেবে আমি সেই শাস্তিই মাথা পেতে নেব। কিন্তু মা নেই তো তার কাছে কৈফিয়ত দেবার দায়িত্বটা আরো বেশি করে আমার ঘাড়ে চেপে আছে।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বড়োমা, দিদার মৃত্যুর আগে আমাকে তার মত জানিয়ে গেছে।

অমিয়া দেবী প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলেন। কী, কী বললি?

হ্যাঁ, বড়োমা। বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর মুখের উপরই থেকে তার দৃষ্টিটাকে নামিয়ে এনে ছিলেন। দিদার মৃত্যুর আগের মুহূর্তে আমি দিদার কাছে একাই বসেছিলাম। দিদা চোখ মেলে তাকিয়েছিল। আমি দিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার গর্ভের সন্তানকে নিয়ে কী করব?

দিদা বলেছিল, তাকে আসতে দে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এটা তোর মনের ভুল।

—ভুল?

—হ্যাঁ, মনের ভুল, আমাদের অবদমিত মনের বাসনা এভাবে আমরা অনেক সময় কল্পনায় শুনতে পাই।

—কিন্তু বড়োমা, এটাই যদি আমার মনের কথা হয়ে থাকে তবে তোমরা তাকে মানতে চাইছ না কেন?

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার মুখটা দুহাতের মাঝখানে তুলে ধরে বলেছিলেন, সেই অমানুষের পাপের বোঝা তুই কেন বয়ে চলবি?

বসুন্ধরা বিছানার উপর টানটান হয়ে বসে বলেছিল, আমার উপর ও জোর করেনি। অবদমিত মনে আমার নিশ্চয়ই সাড়া ছিল, নয়তো বাধা দিতাম। যদি আমার বাধাকে অগ্রাহ্য করে ও আমার দেহকে অধিকার করত তবে আমার গর্ভের সন্তানকে ওর বপন করা বীজ বলে মনে করতাম। আর তাকে উৎপাটিত করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হতো না।

কিন্তু, বড়োমা, বসুন্ধরা বলে চলেছিল, আমি যে এখন আর বলতে পারিনা আমার শরীরের মধ্যে আরেকটি প্রাণের এই উপস্থিতির জন্য আমার সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। আমিও তাকে আমন্ত্রণ করে এনেছি। তাই এই নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলে যে আমি খুনির অপরাধ বোধের যন্ত্রণায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে শেষ পর্যন্ত পাগলা-গারদে জায়গা করে নেব।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার মুখটা চেপে ধরে বলেছিলেন, এমন কথা তুই মুখে আনবি না। আমি স্বামী হারিয়েও বলেছি, তমালের জন্য বাঁচব। আজ তমালকে হারিয়ে তোকে নিয়ে বাঁচব বলেই বেঁচে আছি। তোকে হারালে আমার যে আর কারো জন্য বাঁচার তাগিদ থাকবে না।

বসুন্ধরা বলেছিল, বড়োমা, তুমি তো বলতে আমি আর সাধারণ মেয়ের মতন নই,— তবে তুমি কেন আমাকে সাধারণ মেয়ের মতন সমাজের চোখ-রাঙানীকে ভয় পেতে বলছ? কেন এখন বলতে পারছনা, না এই সন্তান তোর, এই সন্তানকে বাঁচাবার দায়িত্বও তোর।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে এলেন। মাথার উপর নিজের গালটা চেপে ধরে বললেন, আমি যে তোর মা। যে সন্তান কে তুই এখনো দেখিসনি, তার জন্য তুই তোর সারা জীবনটাকে উৎসর্গ করতে চাইছিস। আমি তোকে জন্ম দিইনি এটা সত্যি। কিন্তু যে দিন তোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম সেদিন থেকেই যে তোকে আমার সন্তান বলে মনে করেছি। আমিও যে তাই আমার সন্তানের কথা ভাবছি।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর বুকের ভিতর অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে ছিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসে বলল, বড়োমা, আমি তোমার মেয়ে বলেই তো সমাজের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে আমি আমিই হতে চাই। সেই মানুষটাকে জানাতে চাই, জীবনে যদি একটি বারের জন্যও আমি ভুল করে থাকি তবে সে দায়িত্ব থেকে আমি তার মতন পালিয়ে যাইনি। কারণ আমি বসুন্ধরা। আমি বড়োমার কোলের সন্তান।

বসুন্ধরার চোখ শুষ্ক। সেখানে আর্দ্রতার চিহ্ন নিশ্চিহ্ন। মনে হচ্ছে দুচোখ দিয়ে আগুনের উত্তাপ তার ভবিষ্যতের সংকল্পকে ইস্পাত কঠিন করে তুলতে চাইছে।

অমিয়া দেবীর সামনে ভেসে উঠেছিল শিলিগুড়ির একটি মেয়ের কথা।

শিলিগুড়িতে যে বাড়িতে ছিলেন তার পাশের বাড়িতেই ওরা থাকত। ঘোষ বাড়ি। অপূর্ব সুন্দরী। বয়স খুব বেশি হলেও ষোলো সতেরো হবে। বাপের বাড়িও ধনী ব্যবসায়ী। এত অল্পবয়সে কেন তাকে বিয়ে দিয়েছে সে কথা ভেবে মেয়েটার বাবার উপর তিনি রাগ করতেন। মেয়েটি তার কাছে আসত। কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ত। এই সংসারে দুঃখ থাকতে পারে, কোনো ব্যপারে চিন্তা করার প্রয়োজন হতে পারে, এসব তার মনের কোণে জায়গা পেত না। স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলত, ও ভীষণ অসভ্য।

কেন রে?

আমাকে একা পেলেই জ্বালায়, খালি অসভ্যতা করতে চায়।

মজা পেতেন অমিয়া দেবী। জিজ্ঞাসা করতেন, ও আবার তোর সাথে কি অসভ্যতা করে? মেয়েটা ছুটে পালিয়ে যেত। যাবার সময় দরজা থেকে ঠোঁট উল্টে বলত, নিজে যেন জানে না বররা কী অসভ্যতা করে।

তার থেকে বছর দশকের ছোটো হবে মেয়েটা, তবু ওর সাথে বেশ গাঢ় একটা বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ওর শ্বশুর বাড়ির বিশাল ব্যবসা। দুপুর বেলাটায় ও চলে আসত। তমাল স্কুলে গেলে সারা বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যেত। মেয়েটা এলে নানা গল্প করতেন। ওর নাম ছিল লক্ষ্মী। অমিয়া দেবী বলতেন, তোর বাবা মা তোর সুন্দর চেহারার সাথে মিলিয়ে নাম রেখেছিল না কিরে লক্ষ্মী?

আহা, নিজে যেন কম সুন্দর। লক্ষ্মী পালটা বলত।

লক্ষ্মী একদিন এসে বলেছিল, জানো, আমি মা হব।

তাই নাকি? অমিয়া দেবী খুশিতে লক্ষ্মীকে কাছে টেনে এনে বলেছিলেন, তাহলে তোর বর তোর সাথে একাই অসভ্যতা করত না। তুইও অসভ্যতা করতিস।

লক্ষ্মী লজ্জা পেয়ে অমিয়া দেবীর বুকে মুখ গুঁজেছিল।

দিনটা ছিল দোলের দিন। শিলিগুড়িতে দোল হয় দুদিন। প্রথম দিনটা মোটামুটি আবিরের উপর দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় দিনটিই আতঙ্কের। পোড়া মোবিল থেকে আরম্ভ করে বার্নিশ কোনোটাই বাদ যায় না। সাথে নেশার ফোয়ারা। একজন বা দুজনের মৃত্যু এটা হোলির উপহার বলেই অনেকে মেনে নেয।

লক্ষ্মী সকাল বেলায় পায়ে আবির দিয়ে গিয়েছিল। প্রতুল বাবুকে বলেছিল, বিকেল বেলায় মিষ্টি খেতে আসব জামাই বাবু।

বিকেলেই ঘটেছিল সেই মর্মান্তিক ঘটনা।

লক্ষ্মীর স্বামীর সঙ্গে দুপুরে রঙ দেওয়া নিয়ে বিধান রোডে কিছু ছেলের সাথে কথাকাটাকাটি থেকে সামান্য হাতাহাতি হয়েছিল। তার জের যে বিকেল বেলায় এমন হিংস্র আকার নেবে লক্ষ্মীর স্বামী কল্পনা করতে পারে নি। বিকেল বেলায় তিন বন্ধু বসেছিল পাড়ার মোড়ে। সে সময় হঠাৎ ট্যাক্সি করে দুপুরের ঐ ছেলের দলবল এসে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল লক্ষ্মীর স্বামী ও তার দুই বন্ধুকে।

অমিয়া দেবী ভেবেছিলেন, বাড়ির লোকেরা লক্ষ্মীর এই কচি বয়সের কথা বিবেচনা করে তার গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করে দেবে। যাতে লক্ষ্মীর ভবিষ্যতকে আবার নতুন করে গড়ার কথা উঠলে সন্তান যেন কোনো বাধার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। প্রস্তাবটি নাকি উভয় বাড়ি থেকেই উঠেছিল। অমিয়া দেবীকে অবাক করে দিয়ে লক্ষ্মীই রুখে দাঁড়িয়েছিল।

লক্ষ্মীর সন্তানকে দেখে আসতে পারেননি অমিয়া দেবী। তার আগেই তার জীবনেও নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর দিনটি। অমিয়া দেবী তমালকে নিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়, সেখানে থেকে চলে গিয়েছিলেন বুলবুল চণ্ডিতে।

লক্ষ্মীর সাথে কয়েক বছর আগেই হঠাৎই দেখা হয়েছিল অমিয়া দেবীর।

লক্ষ্মীর ছেলে, তিনটে বিষয়ে লেটার নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে এসেছিল। অমিয়া দেবী কী একটা কাজে গিয়েছিলেন সেখানে। লক্ষ্মীই এগিয়ে এসেছিল।

লক্ষ্মীকে প্রথমে চিনতে পারেন নি, অমিয়া দেবী। প্রায় আঠারো বছর পরে দেখা। সেই ছিপছিপে লক্ষ্মী নেই। এখন বেশ মোটা হয়েছে, তবে এখনও তেমনি সুন্দরী আছে।

লক্ষ্মী বলেছিল, আমায় চিনতে পারছ? আমি শিলিগুড়ির লক্ষ্মী।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে অমিয়া দেবী বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্মীর মুখের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাওয়ার পর তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

লক্ষ্মী বলেছিল, দাঁড়াও, আমার ছেলে বাপীকে ডেকে আমি। তুমি তো ওকে দেখে আসনি।

মায়ের মতন সুন্দর হয়েছে বাপী। সে মায়ের সঙ্গে এসেই প্রণাম করেছিল অমিয়া দেবীকে।

লক্ষ্মী বলেছিল, দিদি ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে এসেছে। ওর ফর্মটা ঠিকমতো ভরা হয়েছে কিনা একটু দেখে দাও তো।

অমিয়া দেবী দেখেছিলেন ফর্মে বাপী তার বাবার নামের আগে মৃত কথাটি লিখতে ভুলে গেছে। তিনি বাপির বাবার নামের আগে মৃত শব্দটি যোগ করেছিলেন।

বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীর ছবিটা মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল।

বসুন্ধরাকে তো তিনি সেই কবে থেকেই তার পুত্রবধূ রূপে মনের কল্পনায় মেনে নিয়েছেন। বসুন্ধরা তমালের উপর সেই বিশ্বাস নিয়েই তার কাছে ক্ষণিকের উত্তেজনায় হলেও আত্মসমর্পণ করেছিল। বসুন্ধরা লক্ষ্মী হতে চাইছে। লক্ষ্মীর বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি আছে। তার স্বামী তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, এগুলি যেমন সত্যি তেমনি সত্যি, লক্ষ্মী তার সারা যৌবনকে তার ভাবাবেগের বাঁধনে বন্দি রেখে ছেলেকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। একে অবশ্য অমিয়া দেবী আত্মপ্রবঞ্চনা বলেই মনে করেন। সামাজিক সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ বলেই মনে হয়েছিল।

এই আত্মসমর্পনের ভাবনা যে কত তীব্র, তার গভীরতা কত গভীর, তার উদাহরণ তো তিনি নিজেই। প্রতুল বাবু যখন দুর্ঘটনায় মারা যান তখন তার বয়সও বা কত? সবে আঠাশ বা উনত্রিশ। জৈবিক তাড়না তো তাকেও অস্থির করে তুলত। একা বাড়িতে মাঝে মধ্যেই শরীরের সেই উত্তাপকে প্রশমিত করতে মাঝ রাতে উঠে মাথায় ও শরীরে মগের পর মগ জল ঢালতেন। মনে হতো শরীরিক চাহিদার এই দহন জ্বালাকে নির্বাপিত করতে তিনি যদি বরফ দিয়ে নিজের দেহটাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারতেন তবে হয়তো কিছুটা শান্তি পেতেন। তবু তিনি নিজের জীবনে নতুন কোনো সঙ্গির কথা মনের কোণে জায়গা দিতে পারেন নি কেন? এটা কি শুধু প্রতুল বাবুর প্রতি তার ভালোবাসার অঙ্গীকার? সামাজিক সংস্কার কি তার মনের চাহিদা ও ইচ্ছাকে গলা টিপে রাখতে কোনো ভূমিকা নেয় নি?

তমাল তার কাছে মৃত অথচ তমালের মৃত্যু যদি সত্যিই ঘটত তবে তিনি বসুন্ধরার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন। সমাজের কাছে জোর গলায় বলতেন আমি বসুন্ধরার শাশুড়ী, তমালের মা। তমালের স্মৃতি রক্ষার তাগিদে বসুন্ধরার জীবনকে বাজি ধরতে রাজি নই। যে চলে যায় সে তার সব কিছুকেই মুছে চলে যায়। তার সন্তানের জন্ম ও মৃত্যুকে সে দেখার জন্য অপেক্ষা করে না। তার জন্য চোখের জলও ফেলে না। তিনি বসুন্ধরাকে তমালের কাছ থেকে পাওয়া এই দায়িত্ব ভার থেকে মুক্তি দিতে নিজে উদ্যোগী হয়ে ঘোষণা করতেন, বসুন্ধরা তার ভবিষ্যত জীবনের নীড় বাঁধতে অতীতের দায় থেকে মুক্ত। কিন্তু তমাল তার কাছে মৃত হলেও সে যে জীবিত। আজ তার সেই উদ্যোগ যে তাই তার পুত্রের কুকর্মকে ঢাকার প্রচেষ্টা বলেই ধিকৃত হবে।

বসুন্ধরাকে বুকের ভিতর টেনে এনে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, যে দায়িত্ব তুই নিতে চাইছিস সে যে বড় ভয়ঙ্কর দায়িত্ব। সারা জীবনের প্রশ্ন।

বসুন্ধরা বলেছিল, বড়মা তুমি আমাকে সাহস দাও। আমাকে দুর্বল করে দিও না। সব মানুষের জীবনেই তো একটা স্বপ্ন, একটা প্রতিজ্ঞা থাকে। এটাই আমার জীবনের স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞা। তুমি তাকে ভেঙে দিও না।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি আছি, তোর পাশেই আছি, তোর কোনো চিন্তা নেই মা।

[৩৮]

গুয়াহাটি-শিলঙ রাস্তার পাশেই উমিয়ামের অর্কিড লেক রিসর্ট। এখানে এর নাম বড়পানি। তিন দিকে পাহাড়, মাঝখানে এই কৃত্রিম হ্রদের পাড়ে বিকেলে এসে বসতে বড্ড ভালো লাগে অমিয়া দেবীর।

সমুদ্রতট থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে সাড়ে চার বর্গমাইল জুড়ে এই কৃত্রিম হ্রদটাব সৌন্দর্য এক কথায অপূর্ব। ভোরেব সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত এই হ্রদের রঙেরও পরিবর্তন ঘটে চলে। সকালের আলোয এর বঙ ধূসর, সূর্য ওঠার পর হয়ে পড়ে পান্না -সবুজ। রোদ বাড়ার সাথে সাথে হয়ে যায় সমুদ্র-নীল। পাহাড়ের ধাপে ধাপে ফুটে থাকে অজস্র ফুল। দেখতে অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মতো। পথের ধারে গাঢ় লাল পনসেটিয়া আর চেরি গাছেব ছায়া অমিয়া দেবীকে এখানে টেনে আনে।

এখানে বসে মনে মনে ধন্যবাদ দেন চার্লশ কোরিয়াকে স্থপতি তো অনেকেই আছেন। চার্লস কোরিরার মতন এমন নান্দনিক দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখার ক্ষমতা কতজন অর্জন করতে পেরেছেন? পাহাড়ের পাথুরে বুক চিরে এমন এক শৈলাবাসের পরিকল্পনাকে চার্লস কোরিরা বাস্তবে রূপ দিযে এই শৈলশহবে অক্ষয় কীর্তি বেখে দিয়েছেন।

অমিয়া দেবী হাঁটতে হাঁটতে চলে যান এখানকার বাগানে। অসংখ্য অর্কিড—এ যেন অর্কিডের স্বর্গরাজ্য। সেই সাথে অজস্র গোলাপ। কাছেই লুম নেহরু পার্ক। শত শত নানা বঙেব পাখি সৃষ্টি করে বেখেছে আর-এক নন্দন কানন।

বসুন্ধবাও আসে তার সাথে। পার্কের লনে যখন কর্ণ প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ায় বসুন্ধরা হাসে। অমিয়া দেবীর মন উড়ে যায় সেই চানক্যপুরীর সবুজ লনের দৃশ্যে। তমালও এভাবে ছুটে বেড়াত। তিনি দূর থেকে দেখতেন।

বুলবুল চণ্ডির মাটি তার মানুষ, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ট্যাঙ্গনকে যে এতখানি ভালোবেসেছিলেন তা বুঝতে পেরেছিলেন বুলবুল চণ্ডি ছেড়ে আসার সময়। তবে তার থেকেও বড় উপলব্ধি হয়েছিল এখানকার মানুষের ভালোবাসার গভীরতাকে আবিষ্কার করে। একটা গ্রামের মানুষের সাথে এমন একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠার পিছনে গ্রামের বৈশিষ্ট্য না তার চারিত্রিক মাধুর্য কোনোটার ভূমিকা বেশি গভীর ছিল সে কথা ভাবার সময় পাননি। বুলবুল, চণ্ডি ছেড়ে আসাব সময় তীব্র ব্যথা তাকে এটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল। এই গ্রামের সাথে আত্মীয়তার শেকড়টাকে তিনিই মনের গভীরে প্রোথিত করেছিলেন।

শিলঙ-এর এই রেসিডেনসিয়াল স্কুলের বিজ্ঞাপনটি স্টেট্সম্যানে দেখে অমিয়া দেবী দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। খবর পেয়েছিলেন মেঘালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের পদটি খালি আছে। বসুন্ধরাকে দিয়ে দরখাস্তটা একই দিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জবাবটা এসেছিল প্রত্যাশা থেকে অনেক দ্রুতগতিতে-স্কুল জানিয়েছে, অমিয়া দেবী যদি তাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন তবে তারা অত্যন্ত গর্বিত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছিল তারা বসুন্ধরাকে নিয়োগ-পত্র দিতে আগ্রহী।

বুলবুল চণ্ডি থেকে আসার সময় টুকিটাকি কিছু জিনিস ছাড়া কোনো জিনিসই আনেন নি অমিয়া দেবী।

বসুন্ধরা বলেছিল, দিদা তো এই বাড়িটা আমার নামে উইল করে গেছে। এটাকে আমি দিদার নামে কিছু করার জন্য দান করে দিতে চাই।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এখন থাক। এটা তোদের মামার বাড়ির সম্পত্তি। মামাদের উপর এর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিস।

বিছানাপত্র সহ থালা-বাসন, চেয়ার-টেবিল সব বিলিয়ে দিয়েই এসেছেন। বুলবুল চণ্ডির স্মৃতিটুকু ছাড়া আর সব কিছুই এখানে রেখে দিতে চেয়েছেন। বলেছিলেন, এই বুলবুল চণ্ডি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমার এই জিনিস গুলি তার তুলনায় অতি সামান্য।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরাকে বলেছিলেন, মনে রাখবি তুই আমার পুত্রবধূ। আমার সন্তান মৃত।

বসুন্ধরা বলেছিল, আমি তোমার মেয়ে, সে কথা বলছনা কেন?

অমিয়া দেবী ম্লান হেসে বলেছিলেন, পুত্রবধূও তো মেয়ে।

বসুন্ধরা বলেছিল, না বড়োমা, পুত্রবধূ মেয়ে নয়। মেয়ের মতন, তাই আমি তোমার যেমন মেয়ে ছিলাম তেমনি থাকতে চাই।

না, অমিয়া দেবী একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, তুই আমার পুত্রবধূ রূপেই থাকবি। সবাই জানবে আমার ছেলের সাথে তোর বিয়ে হয়েছিল। সে এখন মৃত।

কিন্তু বড়োমা, এতো ভয়ঙ্কর মিথ্যা। এত বড়ো একটা মিথ্যে পরিচয়ের বোঝা আমি কেন বইব?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, না এটিই সত্য। তুইতো তমালকে ভালোবেসেছিলিস। সেই ভালোবাসাকে বিশ্বাস করেছিস। জৈবিক চাহিদায় নয় বিশ্বাসের জোরেই ওর কাছে আত্মসমর্পন করেছিলি। এর নামই তো বিয়ে। বিয়ে তো শুধু মন্ত্র পড়া নয়। বিয়ের অর্থ দুটি হৃদয়ের বিশ্বাসের বন্ধন। এই বিশ্বাস ভেঙ্গে গেলে বিয়ের বন্ধনও ভেঙ্গে যায়। একই রকম ভাবে মানুষের বেঁচে থাকাটাই মানুষের বাঁচা নয়। বাঁচার আর-এক নাম আস্থা। যার উপর ন্যস্ত আস্থার অপমৃত্যু ঘটে সেও তো তার কাছে মৃত। তুই আমি তমালের উপর যে আস্থা ন্যস্ত করেছিলাম তার অপমৃত্যু ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তমালও তো আমাদের চোখে মৃত। তার থেকেও বড় কথা এই সন্তান তোর এটা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি, এই সন্তানের জন্ম তমালের ঔরসে। যার পিতৃপরিচয় আছে তার পিতা অজ্ঞাত এটি বলা শুধু যে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া তা নয়। তার সন্তানের প্রতি হবে তা অমার্জনীয় অপরাধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা হতে কয়েক মাস সময় লেগেছিল। তবে চাকরিতে যোগ দিতে গিয়েই বসুন্ধরা বুঝেছিল বড়দির কথাগুলি কত সত্যি। বসুন্ধরা তখন ছয়মাসের গর্ভবতী। শীতের দেশ। গরম চাদরে ঢাকা শরীর ওপর থেকে বোঝা যায় না। তবু কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়েছিল, সে গর্ভবতী। চাকরির শর্তাবলীতে গর্ভবতী মহিলা ছুটি পাবার অধিকারী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সুবিধা হচ্ছে। নিজ বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগের দরকার পড়ে না। পার্বত্য অঞ্চলের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একটা সুবিধা, এখানে বাঙালি অধ্যাপক থাকলেও তার দপ্তরে কোনো বঙ্গভাষী অধ্যাপক ছিল না। সে তার দপ্তরে একমাত্র মহিলা অধ্যাপিকা। ফলে মেয়েলি ও বাঙালি কৌতূহল কোনোটাকেই তার মোকাবিলা করতে হয়নি। তবু বাঙালি অধ্যাপকরা তার সাথে যেচে আলাপ করতে এসেছেন। তাদের মধ্যে একজন তার শরীর জরিপ করে জানতে চেয়েছে তার মিস্টার কোথায়? কী করেন?

বসুন্ধরা চুপ করে ছিল। তাদের এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। এতে বাঙালি মহলে ফিস্‌ফাসের খোরাক হতে গেলেও অমিয়া দেবীর হস্তক্ষেপে তা বেশিদূর এগোতে পারে নি। তিনি নিজেই একদিন তাদের চা-চক্রে আমন্ত্রণ করে এনে তাদের কাছে মৃদ স্বরে বলেছিলেন, আপনাদের সাথে এসেই পরিচিত হবার জন্য আমারই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেতে পারিনি। আমার

পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য। আমার একমাত্র পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় আমরা মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। বিশেষ করে, আমি মা হয়েও পুত্রশোক কিছুটা হয়ত সামলে নিয়েছি কিন্তু আমার পুত্রবধূ বসুন্ধরা সেই শোক থেকে এখনো সামলে উঠতে পারেনি। ও গর্ভবতী। আমার ছেলের প্রসঙ্গ উঠলেই ও আবার মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। আমার পুত্রবধূ যাতে ওর এই ভাগ্য বিপর্যয়কে ভুলে থাকতে পারে তার জন্যই আমরা এতদূর চলে এসেছি। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা কেউ ওকে আমার ছেলের প্রসঙ্গে কিছু বলবেন না।

বসুন্ধরা সে সময় নিভাদির সাথে সাথে ট্রেতে করে চা নিয়ে আসছিল। অমিয়া দেবীর কথাগুলি কানে যেতেই সে চমকে উঠেছিল। হাত থেকে ট্রেটা পড়ে যেতে কাপ প্লেটগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। অমিয়া দেবী ছুটে গিয়ে বসুন্ধরাকে ধরেছিলেন।

—তোর শরীরটা খুব খারাপ লাগছে?

—হঠাৎ হোঁচট খেয়েছিলাম, বড়োমা।

সবাই ভিড় করেছিল। বসুন্ধরার পাশে। অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি বসুন্ধরাকে শুইয়ে দিযে আসি। আপনারা যদি দয়া করে একটু অপেক্ষা করেন তবে কৃতজ্ঞ থাকব।

বসুন্ধরা বলেছিল, আমি ঠিক আছি। আপনারা আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। প্লিজ, আমি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে আসছি।

একজন বলেছিলেন, আমার মনে হয উনি যখন মিসেস মিত্রের স্বামী প্রসঙ্গে আমাদের কাছে বলছিলেন, তা ওনার কানে গেছে।

অমিয়া দেবী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, আমার ছেলের প্রসঙ্গ উঠলেই ও এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

ওরা চলে যেতেই বসুন্ধরা বলেছিল, তুমি ওদেব এসব কথা বলতে গেলে কেন, বড়োমা?

অমিযা দেবী জবাব দিয়েছিলেন, আমি এখানকার খাসিদেব নিয়ে ভাবি না। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া এসেছিল প্রমীলার রাজ্যে। এ রাজ্যের শাসনের মানদণ্ডই শুধু রাণী প্রমীলার হাতে ছিল না, এ রাজ্যেব সেনাবাহিনীও ছিল নারী বাহিনী। অর্জুন প্রমীলার হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। পুরুষ আক্রমণকারীর হাতে কোনো রাজ্য পরাজিত হলে সেই পরাজিত রাজ্য তাদের রাজকন্যাকে জয়ীর হাতে তুলে দেয়। এখানে পুরুষ পরাজিত। নারী বিজয়ী। তাই বলা যায়, প্রমীলাকে বিয়ের মাধ্যমে অর্জুনই আত্মসমর্পণ করেছিল।

মহাভারতে বর্ণিত প্রমীলার রাজ্য কোথায় ছিল তা বলা কঠিন, কিন্তু বসুন্ধরা তুই যখন শিলঙ-এর রাস্তায় হাঁটিস, সেখানকার বাজারে যাস তখন কী মনে হয় না এটাই সেই প্রমীলার রাজ্য? এখানকার মানুষেরা তোকে নিয়ে কৌতূহল দেখাবে না। কিন্তু ভয়তো আমাদের বঙ্গভাষীদের নিয়ে। তারাই তোকে প্রশ্ন করবে, আপনার কবে বিয়ে হয়েছে? কোথায় বিয়ে হয়েছে? স্বামী কেন আসেন না? ছেলের মুখ দেখতেও স্বামী এলেন না কেন?

এসবের জবাব যাতে না দিতে হয় তার জন্যই এদের আজ নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে এগুলি বলে দিলাম।

অমিয়া দেবীর পাশে বসে তার ঘাড়ে মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছিল বসুন্ধরা। ভাবতে চাইছিল কী অসীম ধৈর্য নিয়ে এই মহিলা ডানা মেলে তাকে চারিপাশের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে চলেছেন। এর জন্য তাঁকে কম অপবাদ সইতে হয়নি। বসুন্ধরা জানতেও পারত না বড় মামী তার গর্ভবতী হবার সংবাদ পেয়ে অমিয়া দেবীকে কি তীব্র ভাষায় অপমানজনক চিঠি লেখেছিল।

শিলঙ-এ আসার আগে বসুন্ধরা গিয়েছিল অমিয়া দেবীর কোয়ার্টার্সে। কোনো কিছু নেওয়ার আছে কিনা দেখতে। স্বর্ণপ্রভার মৃত্যুর পর বসুন্ধরা যখন বুলবুল চণ্ডিতে চলে

এসেছিল তখন অমিয়া দেবী নিভাদিকে নিয়ে বসুন্ধরার বাড়িতে চলে এসেছিলেন। আসার আগে বসুন্ধরাকে বলেছিলেন, ঐ বাড়ির কোনো কিছুই আমি নেব না। কয়েকটা ছবি আর কিছু কাগজ-পত্র ছাড়া এই বাড়ি থেকে আমার আর কিছুই নেওয়ার নেই।

তবু বসুন্ধরা নিভাদিকে নিয়ে স্কুলের বাড়িতে গিয়েছিল। ফিরে আসার সময় চোখে পড়েছিল ঘরের এক কোণে একটা ডাইরী পড়ে আছে। তুলবে কি তুলবে না ভেবেও ডাইরীটা নিয়েছিল। তখনই অমিয়া দেবীকে লেখা বড়োমামীর চিঠিটা মাটিতে পড়েছিল।

বড়োমাকে লেখা চিঠি। একটা সঙ্কোচ নিয়েই চিঠিটা খুলে ফেলেছিল বসুন্ধরা। তাকে নিয়েই চিঠি।

সুচরিতাষু অমিয়া দেবী,

আপনার চিঠিতে বসুন্ধরার খবর পেয়ে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। বসুন্ধরার মতন এত ভালো মেয়ের এই করুণ পরিণতির জন্য আমরা আপনাকেই দায়ি করছি। আমার শাশুড়ি আপনার উপর যে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তাকে আমরাও বিশ্বাস করেছিলাম। বসুন্ধরাকে আমরা তাই আপনার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেবেছিলাম।

মাতৃহীনা বসুন্ধরা তার মামাদের কন্যাসমা। তাকে আমরা আমাদের কাছেই রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার উপর আমার শাশুড়িমাতার অন্ধ বিশ্বাসকে অতিক্রম করে আমাদের ইচ্ছাকে রূপায়িত করতে পারিনি। আমরাও অবশ্য আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম।

আপনি লিখেছেন বসুন্ধরাকে আপনি আপনার পুত্রবধূ বলেই মনে করেন। এতেই প্রমাণ হয় আপনি কি সূক্ষ্ম প্রতারক। আপনার পুত্রকে আপনার ভাইদের প্রভাবে শুধু বিদেশেই পাঠাননি, সেই সাথে যাবার আগেই যে সে অন্যখানে বিয়ে করে নিয়েছে সে খবর আপনার বাবা সহ সবাই জানতেন। মা হয়ে আপনি না জানার ভান করেছেন। আজ আমরা বুঝতে পারছি, বসুন্ধরার বড়মামা যেদিন আমার শ্বাশুরীমাতার ইচ্ছের কথা জানিয়ে বসুন্ধরার সাথে আপনার পুত্রের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেদিন কেন আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এটি কিন্তু আজ দিনের মতন পরিষ্কার হয়ে গেছে আপনার অসুস্থ হওয়াটা ছিল আসলে আপনার একটা নিপুন অভিনয়। আপনি জানতেন, আপনার ছেলে বিয়ে করে ইতিমধ্যেই বিদেশে চলে গেছে। তাই অসুস্থ হওয়ার অভিনয় করে আপনি সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনি জানতেন আপনার লম্পট পুত্রের কুকীর্তির কথা। তাই বসুন্ধরা ও আমাদের কাছে অভিনয় করে গেছেন। বসুন্ধরার মনে আপনি মিথ্যা আশ্বাসের বুননী গেঁথে চলেছিলেন, আপনার পুত্রের সাথে তার বিয়ে হবে। আর এই ভাবে আমাদের বিশ্বাস ও বসুন্ধরার সরলতার সুযোগ নিয়ে আপনি অপেক্ষা করেছেন আপনার পুত্র কবে এদেশ থেকে নিরাপদে বিদেশে পাড়ি দেবে।

আপনাদের মতন মহিলাদের শাস্তি আমাদের দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভগবানই দেন। তাই তো এত অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। অবশ্য স্বামী হারানোর যন্ত্রনা আপনার মনে কোনো দাগ কেটেছে বলে মনে হয় না। যদি আপনার স্বামীর মৃত্যুতে আপনি সামান্যতম দুঃখও পেয়ে থাকতেন তবে মাতৃহারা বসুন্ধরার প্রতি আপনি এত বড়ো তঞ্চকতা করতে পারতেন না।

যাই হোক বসুন্ধরার গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাটি আমাদের পারিবারিক সম্মানের প্রশ্ন। আমি সেই সম্মানের ভয়েই এ নিয়ে এখনই কোনো হৈ-চৈ করতে চাই না। তা নাহলে আপনার জায়গা হওয়া উচিত ছিল জেলের গারদের ভিতর। সবার কাছে প্রকাশ পেত একজন প্রধান শিক্ষিকার এই জঘন্যতম চরিত্র।

আমার স্বামী গতকালই অত্যন্ত জরুরি কাজে কাটমুণ্ডুতে গেছেন। তার ফিরে আসতে

দিন পনেরো সময় লাগবে। তাকে এই ঘটনার কথা জানাই নি। এত দূরে একা এই আঘাত সামলাতে পারবেন না। তিনি ফিরে এলেই তাকে নিয়ে আমি বুলবুল চণ্ডিতে যাচ্ছি। আমার ছোটো দেওরকেও খবর দেব। তারপর যা ব্যবস্থা নেবার তা আমরা নেব।

ইতি—

বসুন্ধরার বড়ো মামী,

স্নিগ্ধা

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বসুন্ধরা। কি নির্মম অপমান। তবু এক বারের জন্যও এই চিঠির কথা বড়োমা তাকে বলেনি, বসুন্ধরা, তোদের জন্য আমাকে এত অপমান সইতে হচ্ছে।

বাড়িতে এসেই অমিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বড়োমা, বড়ো মামী আমার জন্য তোমাকে এত অপমানকর চিঠি দিয়েছে তুমি তো সে কথা এক বারের জন্যও বলনি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ওমা, সেই চিঠি আবার তোর হাতে কী ভাবে পড়ল? আমি তো চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি বলে ভেবে বসে আছি।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বড়োমা, বড়ো মামী তোমাকে এত বড় অপমান করল, তুমি তার প্রতিবাদ করবে না।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, পাগলি মেয়ে আমাব। তুই তোর বড়ো মামীর চিঠির ভাষাটাই দেখলি? এর মধ্যে তাব মনের ব্যথা ও তোর জন্য তার চিন্তার বাপারটা একবারের জন্যও ভাবতে চাইলি না? যাকে মানুষ ভালোবাসে তার জন্যই রাগ করে। তার চিন্তায় মানুষ অস্থির হয়। তার জন্য অন্যের সাথে ঝগড়া করে। তোর বদলে অন্য কোনো মেয়ে হলে কি বড়ো মামী এভাবে চিঠি লিখতেন?

বসুন্ধরা মাঝ পথে বলে উঠেছিল, কিন্তু বড়োমা—

অমিয়া দেবী তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, কোনো কিন্তু নয় রে। তোর মামী যদি এরকম চিঠি না লিখে লিখতেন, বসুন্ধরা সাবালিকা, সে তার যা ইচ্ছে তাই করেছে। এর জন্য আমরা কেউ দায়ি নই। আমাদের রাগ করার কারণ নেই। যা হবার তাই হবে তাহলে কি তিনি তোর বড় মামীর মতন কাজ করতেন? আমি কি তাহলে আজকের মতো তাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম?

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলেছিল। আমার জন্য তোমাকে কত কিছু সইতে হচ্ছে বড়োমা।

অমিয়া দেবী কোনো কথা না বলে বসুন্ধরার পিঠে তার হাত বুলিয়ে চলেছিলেন।

[৩৯]

গর্ভযন্ত্রনার ব্যথাটা সন্ধে থাকতেই উঠেছিল। স্কুলের নিজস্ব গাড়ি আছে। নার্সিং হোমে নিতে কোনো অসুবিধা হয় নি। নার্সিং হোমে ভর্তির ফর্মটা ভরাট করতে গিয়ে স্বামীর নামের জায়গায় এসে কিছুক্ষণের জন্য থমকে গিয়েছিলেন। মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন বসুন্ধরাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে কেবিনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লিখতে গিয়ে কলমটাকে একবার ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরেছিলেন তার পর লিখেছিলেন স্বামী মৃত তমাল মিত্র। নিচে সই করে ফর্মটা কাউন্টারে জমা দিয়েছিলেন।

বসুন্ধরার ব্যথাটা থেকে থেকে হচ্ছিল। ডাক্তার বলেছিলেন, আজ রাতে আপনার থাকার দরকার নেই। বাড়িতে চলে যান। কাল সকালে এলেই হবে।

যান নি অমিয়া দেবী। সারারাত নার্সিং হোমেই ছিলেন। কেবিনে অবশ্য তার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। তবে একবারের জন্যও চোখের পাতা বোজান নি। বসুন্ধরার মাথার কাছে বসে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

সকালের দিকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বসুন্ধরাকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন অমিয়া দেবী। সামনেই সোফা অথচ একবারের জন্যও বসতে পারেন নি। শীতের দেশেও বুঝতে পারছিলেন তার শরীর ঘেমে যাচ্ছে।

জীবনে এই প্রথমবার ভাবতে ভালো লাগল ভগবান আছে। এই শৈল শহরে তিনি একা। যে দায়িত্ব তিনি সবার ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে নিজের কাঁধে চাপিয়ে এখানে চলে এসেছেন তার ভার যে কত বিশাল তা আবার যেন নতুন ভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন।

বসুন্ধরার বড়ো মামীর চিঠি তাকে ভীষণ ভাবে আঘাত দিয়েছিল। বিশেষ করে যে অংশে স্বামীর মৃত্যুকে নিয়ে তাকে তীব্র ভাবে কটাক্ষ করেছেন। মনকে বোঝাতে চেয়েছেন এটা তার প্রাপ্য। তমালের তো ক্ষতি হয়নি। তমালের পিতৃ বা মাতৃপরিচয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ার রূপে তাদের কুলমর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে। তমালের শ্বশুর বাড়ির কৌলিন্য তাদের কাছে শ্লাঘার উপকরণ।

হারিয়েছে তো বসুন্ধরা। হারানোর যন্ত্রণা পলে-পলে ভোগ করতে হয়েছে বসুন্ধরার মামা-মামীদের। তারা বসুন্ধরাকে ভালোবাসেন—সাধারণ মামা মামীর থেকে সে ভালোবাসা যে অনেক গভীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সমাজে মেয়েরাই তো হারায়। কাল রাত থেকে বসুন্ধরা গর্ভ-যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এই যন্ত্রণা কোনো ভাবেই তমালকে স্পর্শ করছে না। তমাল হয়তো এই মুহূর্তে তার স্ত্রীর বাহুবন্ধনের উষ্ণতায় সুখের স্বপ্নে সাঁতার কেটে চলেছে। এই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে যদি বসুন্ধরার মৃত্যুও ঘটে তবে তমালের সুখ-সজ্জায় সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটাবে না। তমাল জানেও না তার প্রোথিত বীজ এই পৃথিবীর আলোতে অবগাহনের প্রতিজ্ঞায় এতদিন বসুন্ধরার রক্ত-মাংস ও নিরাপত্তার সজ্জাগৃহে প্রতিপালিত হয়ে তার নাড়ি বন্ধনকে ছিন্ন করতে বসুন্ধরাকেই যন্ত্রণা-কাতর করে তুলেছে।

অথচ বসুন্ধরা নয়, এ সন্তানের পরিচয়ের জন্য প্রয়োজন তমাল মিত্রকে। বসুন্ধরাকে ঘোষণা করতে হবে এ ছেলের পিতৃপরিচয়কে। হাজির করতে হবে তার ঘোষণার অভিজ্ঞান পত্র। নয়তো এ সন্তানের পরিচয় হবে জারজ। বসুন্ধরার এই দশমাস দশ দিনের তিল-তিল করে গড়ে ওঠা প্রতিপালনের মুহূর্তগুলি, তার এই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ কোনোটারই মূল্য নেই। বসুন্ধরা হবে কুলটা, চরিত্রহীনা।

বসুন্ধরার মামাদের প্রমাণ দিতে হবে তাদের ভাগ্নীর এই সন্তানের জন্মে কোনো এক তমাল মিত্রের স্বীকৃতি আছে। শুধু স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, তাদের জানাতে হবে তমাল মিত্রের এই স্বীকৃতি দানের পেছনে সামাজিক বিধানের শিলমোহর আছে। নয়তো তাদের ভাগ্নী হবে তমাল মিত্রের উপপত্নী বা রক্ষিতা, আর এই সন্তান অবৈধ-সন্তানের বিজ্ঞাপন কপালে এঁটে এই পৃথিবীর আস্তাকুড়ে ঘেঁটে চলবে।

সবহারানোর যন্ত্রণায় যদি তাকে তারা এই চিঠি লিখে থাকেন সেটিকে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করেন নি অমিয়া দেবী। বরং এটা তার প্রাপ্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

তিনি মা। তমাল মিত্রের মা। এই তমাল মিত্রই ওই বাড়ির সমস্ত বিশ্বাসকে লোভি দস্যুর মতন ছিন্ন-ভিন্ন করে সে বাড়ির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদকেই লুট করে নিয়ে গেছে। আজ যদি তমাল মিত্র মূল্য দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করত বসুন্ধরাকে আমি ভালোবাসি, তাকে সম্মান জানাতে আমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে আপনাদের অনুমতি চাইতে এসেছি—তবে তমাল মিত্রের জন্মদাত্রী রূপে তিনি নিশ্চয়ই গর্বের ঢেকুর তুলতেন।

অমিয়া দেবী নিজের মনকেই বলেছিলেন, সুপুত্রের গর্ব গ্রহণে যদি কোনো আপত্তি না হয় তবে কুপুত্রের কুকীর্তির দায়ভাগ বহনেই বা দ্বিধা থাকবে কেন?

তার স্বামীর মৃত্যু ঘটেছিল। তাই স্বামীর কাছে তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলতে পারেন নি। তমালের পরিবর্তন তো তার চোখের সামনে ঘটে চলেছিল। প্রতুলবাবু বেঁচে থাকলেও তিনি কি গান্ধারীর মতন প্রতুলবাবুর কাছে তমালের সম্বন্ধে বলতে পারতেন—

"তস্মাদয়ং মদ্‌বচনাৎ ত্যজতাং কুলপাংসনঃ
তথা তে ন কৃতং রাজন্ পুত্রস্নেহান্নরাধিপ,
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরনায় যৎ।"

নিজেকেই উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি পারতেন না, তার স্বামীর কাছে গান্ধারীর মতন বলতে, তুমি এই কুল-কলঙ্ককে ত্যাগ কর। সন্তান স্নেহে তা করতে না পারার জন্য তোমার কুল ধ্বংস হবে।

সেই দাবি করেই কি তিনি আজকের এই লজ্জাজনক ঘটনাকে রক্ষা করতে পারতেন? গান্ধারীও পারেন নি। তিনি তো নিজের দুর্যোধনকে অমোঘ সাবধান বাণী শুনিয়ে বলেছিলেন,

ঐশ্বর্য্যকাম দুষ্টাত্মন বৃদ্ধানং শাসনাতিগ।
ঐশ্বর্যজীবিতে হিত্বা পিতরং মাঞ্চ বালিশ॥
বর্দ্ধয়ন্ দুর্হৃদাং প্রীতিং মাঞ্চ শোকানলে দহন্।
নিহতো ভীমসেনেন স্মর্তাসি বচনং পিতুঃ॥

তিনি অবশ্য গান্ধারীর মতো এমন স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি। 'তুই গুরুজনদের উপদেশ লঙ্ঘনকারী, ঐশ্বর্য অর্থাৎ নিজ সুখের আকাঙ্ক্ষী এক দুরাত্মা। তুই ঐশ্বর্য, জীবন, পিতা ও আমাকেও হারাবি। যাদের (শত্রু) আনন্দ দিতে আমাকে এই শোক দিলি, আগামী প্রজন্মের (ভীম সেন) কাছে (বিবেক) নিহত হবার পর এই কথাগুলি মনে পড়বে।

তিনি গান্ধারীর মতন পুত্রের নানা কাজের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। গান্ধারীর তো তাও হিংসে করার জন্য কুন্তির মতো জা ছিল। কুন্তির অনেক আগেই গর্ভধারণ করেও রাজমাতা না হবার জন্য তার মনে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। এর ফলে তিনি ক্ষোভে বা দুঃখে নিজের পেটে আঘাত করে গর্ভপাতের চেষ্টা করেছিলেন। তবু গান্ধারী অনন্যা।

অমিয়া দেবী নিজের জীবনে গান্ধারীকে বার বার মনে করেছেন। স্বামী প্রতুলবাবু, পিতা প্রিয়তোষ বাবু দাদা-বৌদি এমন কি নিভাদি পর্যন্ত বার বার অনুযোগ করে বলেছে, তুই মা, না অন্য কেউ? মার একমাত্র ভাবনা সন্তানের সুখ। তার সুখী মুখই মায়ের তৃপ্তি। অথচ তুই তমালের সুখকে কামনা করিস না। তমালকে সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে দেখে অন্য যে কোনো মার মন খুশিতে ভরে যেত। অথচ তুই প্রশ্ন তুলিস তমাল কেন তার সহপাঠীদের পাশে দাঁড়িয়ে মার না খেয়ে নিজেকে বাঁচাতে পালিয়ে এল?

তমালের বিদেশ যাত্রার খবর শুনে অমিয়া দেবী ছুটে গিয়েছিলেন কলকাতায় ছোড়দার কাছে। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তমালকে এভাবে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেবার আগে তোরা একবারও আমাকে জানালি না কেন?

ছোড়দা জবাব দিয়েছিলেন, তমাল বেঁচে থাকুক তা তো তুমি চাওনি।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি ওর মা। কোনো মা তার ছেলের মৃত্যু কামনা করতে পারে না।

ছোড়দা বেশ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মা হিসাবে তুই তো স্বাভাবিক মা নোস। তা নাহলে তমাল পুলিসের গুলিতে নিহত হয়নি ও নিরাপদে আছে, খবরটা তোকে এতখানি লজ্জা দিত না।

অমিয়া দেবী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ উদ্ভট খবরটা আবার তোকে কে দিল?

ছোড়দা কোনো কথাতেই উত্তেজিত হন না। সেদিন তার কথার মধ্যে একটা উত্তেজনার ঝাঁজ ছিল।

কেন? বারাসত থানার পুলিস ইন্সপেক্টারকে তুই নিজেই বলেছিলি, এখানে যদি তুই তোর ছেলের বুলেট-বিদ্ধ দেহটাকে দেখতে পেতিস তবে তুই গর্ব অনুভব কবতিস।

ঘটনাটা মনে পড়েছিল অমিয়া দেবীর।

কুহকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি যখন সারি-সারি মৃতদেহগুলির মুখের ঢাকনা খুলে মুখগুলি দেখছিলেন তখন সেই পুলিস অফিসারটি তাকে বলেছিল, আপনি যাকে খুঁজছেন সে এখানে নেই। আপনার ছেলে তমাল অত্যন্ত চালাক ছেলে। সে আমাদের গোপন সংবাদ দিয়েছে। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। তাকে আমরা নিরাপদ জায়গাতেই পৌঁছে দিয়েছি।

পুলিস অফিসারের কথাটা অমিয়া দেবীর কানে তপ্ত সীসার মত প্রবেশ করেছিল। মনে হয়েছিল আশে পাশের সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। সবার চোখেই যেন একটা ধিক্কার দৃষ্টি—ওই যে বিশ্বাসঘাতকের মা।

পুলিস অফিসারের মুখের উপর একটা কঠিন দৃষ্টি হেনে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি এমন ছেলের মা হতে চাইনি। আমার ছেলে যদি তার দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে বুকে বুলেট নিয়ে এদের সাথে এভাবে ধুলোয় পড়ে থাকত তবে আমি অনেক বেশি গর্ব অনুভব করতাম।

ছোড়দার কথায় অমিয়া দেবী বুঝতে পেরেছিলেন, ছোড়দার কাছে তার প্রতিটি কথাই পৌঁছে গেছে। ছোড়দাকে বলেছিলেন, কোনো মা বিশ্বাসঘাতকের মা হতে চায় না।

ছোড়দা বলেছিলেন, খুনীর মা হতে তাহলে তোর আপত্তি ছিল না, বল।

কেন?

তমালরা যখন অন্য মায়ের বুককে খালি করছিল সেটা তাহলে তোর কাছে ছিল গর্বের বস্তু?

না, অমিয়া দেবী শান্ত ভাবে জবাব দিয়েছিলেন, আমি তমালদের এই রাজনীতির তীব্র বিরোধী। শাসক দলের যে প্ররোচনাই থাকুক না কেন, এই রাজনীতি, ব্যক্তি হত্যার কর্মসূচী কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। তাই বলে দলীয় সদস্য তথা দলকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে না দিয়ে এই কর্মসূচী যে ভুল সেই উপলব্ধির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে সে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারত।

ছোড়দা মৃদু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, খুকি তোর কথাটা শুনতে ভালো। তমাল এরকম করলে হয় ও ওদের দলের লোকের হাতে, নয়তো পুলিসের হাতে মারা পড়ত। আর বেঁচে থাকলেও ওর জায়গা হতো জেলখানায়। ওর জন্য যা করেছি মা হয়ে তোর খুশি হবার কথা ছিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কিন্তু ছোড়দা, বসুন্ধরাকে আমি কী বলব?

ছোড়দা বলেছিলেন, বসুন্ধরা মেয়েটা যেমন ভালো তেমনি সুন্দরী। ওর সাথে তমালের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে শুনেছিলাম। তোর বৌদির ওকে খুব পছন্দ ছিল। বাবাও চেয়েছিলেন ওদের বিয়ে হোক। কিন্তু যা চাওয়া যায় তা তো সব সময় হয়না। ওদের বয়স কম। এরকম সম্পর্ক এ বয়সে অনেকের মধ্যেই হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ে হয় না। যে যার মা-বাবার পছন্দকে মেনে নেয়। তমাল তো নিজেই সম্পর্কটাকে ভুলে গেছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ছোড়দা, তোকে একটা কথা জানানো দরকার।
বল।
বসুন্ধরা গর্ভবতী। ওর গর্ভের সন্তানের জন্মদাতা তমাল আমার ছেলে। তোর ভাগ্নে।
পাইপটাকে ধরাতে গিয়েছিলেন ছোড়দা। অমিয়া দেবীর কথাটা শুনে লাইটারটা হাতের মধ্যেই ধরে রেখেছিলেন। জ্বালাবার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।
ছোড়দা। অমিয়া দেবীর ডাকে ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে ছিল।
মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে রেখে ছোড়দা বলেছিলেন, খুকি, তুই আমাকে যা বললি এই কথাটা দ্বিতীয় কাউকে বলবি না। এমন কি তোর বৌদিকেও নয়। এতে যে শুধু আমাদের পারিবাবিক সম্মানই জড়িয়ে আছে তা নয়, তমালের ভবিষ্যতও ভয়ঙ্কর ভাবে বিপন্ন হবে। বসুন্ধরার পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো অভিযোগ করলে আমাদের বিদেশ দপ্তর তমালকে গ্রেপ্তার করার জন্য বলতে পারে। মার্কিন সরকার তাদের ভিসাকে বাতিল করে দিতে পারে।
অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোরা তমালেব ভবিষ্যতেব কথাই ভাবছিস। কিন্তু ফুলের মতন মেয়েটার ভবিষ্যতের কথা তো বলছিস না।
ছোড়দা বলেছিলেন, দেখ খুকি, এটাই নিয়ম। সবাই নিজের নিজের ঘরের কথা ভাবে। আমি ভাবব আমার ভাগ্নের কথা। তোকেও ভাবতে হবে তোর ছেলের কথা।
কিন্তু বসুন্ধরাকে আমি আমার মেয়ে বলেই মেনে নিয়েছি। অমিয়া দেবীর কণ্ঠে ব্যাকুলতা।
ছোড়দা বলেছিলেন, আমার অতি ঘনিষ্ঠ এক ডাক্তারের বিশাল নার্সিং হোম আছে। তুই বসুন্ধরাকে নিয়ে আসবি। আমি নিজে তোদের নিয়ে সেই নার্সিং হোমে যাব। এখন তো এটা কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কেউ জানবে না। এখানে উঠারও দরকার নেই। তোর বৌদি আছে। তোরা কয়েকদিনের জন্য দীঘায় চলে যাবি। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।
অমিয়া দেবী বলেছিলেন, বসুন্ধরা গর্ভপাতে রাজি নয়।
ছোড়দা বলেছিলেন, মেয়েটাকে যত সরল ভেবেছিলাম ও দেখছি তা নয়। এটা তো একেবারে পরিকল্পনা মাফিক ব্যবস্থা।
অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তুই কী বলতে চাইছিস?
ছোড়দা বলেছিলেন, তোর বোঝা দরকার বসুন্ধরা যদি এই সন্তানের জন্ম দেয় তবে এর পিতৃত্বের প্রশ্নে ও তমালকে যে কোনো সময়ে বিপদে ফেলতে পারে। ডাক্তারি পরীক্ষায় এখন সহজেই জানা যায় সন্তানের পিতা কে? এই পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে বসুন্ধরা এখনই এবং ইচ্ছে করলে পরেও তমালকে চূড়ান্ত বিপদে ফেলতে পারে।
অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এক্ষেত্রে আমিও যে বসুন্ধরার পক্ষের প্রধান সাক্ষী হব ছোড়দা।
লেবার রুম থেকে সিস্টার মুখ বাড়াতেই অমিয়া দেবী তার দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলেন।
সিস্টার বলেছিলেন, আপনাকেই খুঁজছি।
অমিয়া দেবীর গলাটা কেঁপে উঠেছিল, কেন?
সিস্টার বলেছিল, বেবির পজিসনটা ঠিক মতো আসছে না। ডাক্তার বাবু আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চান। এর মধ্যে বেবির পজিসন ঠিক মতো না এলে সিজার করতে হবে।
অমিয়া দেবীর গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কোনো মতে বলতে পেরেছিলেন, পেসেন্টের কোনো ভয় নেই তো?
সিস্টার বলেছিল, পেসেন্ট ভালো আছে।
সিস্টার লেবার রুমের দরজাটা বন্ধ করে দিলেও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন অমিয়া দেবী। বসুন্ধরাকে একবার দেখার জন্য মনটা বড়ো ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কাল রাত থেকে মুখ বুজে যন্ত্রণা সয়ে চলেছে মেয়েটা। যে আসছে তাকে কেউ আসতে দিতে চায় নি।

বসুন্ধরার বড়ো মামা, বড়ো মামী দিল্লিতে নার্সিং হোমের সাথে কথা বলেই এসেছিলেন। তারা বসুন্ধরাকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাদের আসার আগের দিন অমিয়া দেবী চলে গিয়েছিলেন স্কুলের বাড়িতে। বসুন্ধরা আপত্তি তুলেছিল।

বড়ো মামারা আসছে বলে তুমি কেন চলে যাবে বড়োমা?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি যাচ্ছি কোথায়? তোর কাছেই তো আছি। দুটো দিন, তোর মামা-মামী তোর সাথে একটু মন খুলে কথা বলুক না। ওরা তোকে সত্যিই ভালোবাসে। আমি তোর বড়মামা-বড়মামীর সাথে এসে দেখা করব।

বসুন্ধরা বলেছিল, বড়োমামী তোমাকে এরকম অপমানকর চিঠি লেখার পরও তার সাথে কথা বলবে?

অমিয়া দেবী হেসে বলেছিলেন, ওটা অপমানের ব্যাপার নয় রে। তোকে ওরা ভালোবাসে। তোর প্রতি দুশ্চিন্তায় এই চিঠিটা লেখা হয়েছে। তমালের মামা-মামীরা তমালকে নিয়ে ভাববে তাকে এই ভাবে লুকিয়ে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে পারবে। আর তোর মামা- মামীরা তোকে নিয়ে ভাবলেই দোষ হবে কেন?

অমিয়া দেবী ভাবতেন, তিনি তার সন্তানের বিজয় চান নি। সন্তানের কাজের বিরোধীতা করেছেন। গান্ধারীর মতন তিনিও বলতে পারেন নি জয়ী হও। বরং বার-বার বলেছেন 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। তবু তার দায়িত্ব এড়াতে পারেননি। সন্তানের জননী রূপে সন্তানের অপকীর্তির জন্য তাকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে।

অমিয়া দেবীর মনে হয়েছিল সব জননীকেই এই অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়। না হলে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে দুর্যোধনের কুকীর্তির ফলের জন্য গান্ধারীকে দায়ি করে বলতে পারেন।

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারি মা চ শোকে মনঃকৃথা,
তবৈবহ্যপরাধেন কুরবো নিধনং গতাঃ।"

কী নিদারুণ অভিযোগ। কৃষ্ণ গান্ধারীকেই বলে বসলেন, তারই (গান্ধারীর) অপরাধে কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছে। কারণ তিনিই দুর্যোধনকে জন্ম দিয়েছেন।

বসুন্ধরার বড়ো মামা ও মামী এসেছেন খবর পেয়ে অমিয়া দেবী নিজেই এসেছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। বসুন্ধরার বড়ো মামা ভদ্রতা করেছিলেন। মামী ছিলেন বেশ উত্তেজিত।

বড়োমামী অমিয়া দেবীকে দেখে প্রথমে বেশ গম্ভীর হয়েছিলেন। কথাবার্তা বলছিলেন বড়োমামা। বসুন্ধরা কোনার সোফাটাতে বসে ছিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি জানি এ ঘটনায় আপনারা কত মর্মাহত ও চিন্তিত। যা ঘটে গেছে তার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।

বসুন্ধরার বড়ো মামী বলেছিলেন, এর জন্য আপনি আপনার দায়িত্বকে এড়াতে পারেন না। ছেলের উপর আপনার একটা কর্তৃত্ব থাকার কথা ছিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি আমার দায়িত্বকে অস্বীকার করতে চাই না অস্বীকার করাও অসম্ভব নয়। তবে একটা সময় আসে যখন সন্তানের উপর কর্তৃত্বের লাগামটা আপন নিয়মেই আলগা হয়ে যায়। মা বুঝতে পারে না সন্তানেরা কোথায় কী করে বসছে।

বড়ো মামী উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে তীব্র স্বরে বলেছিলেন, যে সন্তানের উপর লাগাম পরাতে জানেনা সেই সন্তানের জন্ম দেওয়াটাই তো আপনার অপরাধ হয়েছে।

অমিয়া দেবী ম্লান একটা হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে বসেছিলেন। কোনো কথা বলেন নি।

বসুন্ধরা সোফা থেকে উঠে এসে বড়ো মামীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বড়োমাকে তোমরা এসব কথা বলছ কেন? যা কিছু ঘটেছে এই বাড়িতেই ঘটেছে। এতে আমার সম্মতি ছিল। তোমরা বড়োমাকে দায়ি করতে চাইছ কেন?

বড়োমামী বলেছিলেন, মহৎ কাজ করেছ তুমি। অন্য কোনো মেয়ে হলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে থাকত। আর তুমি চরম বেহায়ার মতো আমার কথার মাঝে কথা বলতে এসেছ?

বসুন্ধরা জবাব দিয়েছিল, যা ঘটেছে তার জন্য আমি লজ্জিত। কিন্তু আমার ভুলের জন্য তোমরা বড়োমাকে দায়ি করলে আমাকে তার প্রতিবাদে কথা বলতেই হবে।

বড়ো মামা দুজনের কথার মাঝে বলেছিলেন, এখন তর্কের সময় নয় যা হবার হয়ে গেছে। ভুল মানুষেরই হয়। বসুন্ধরা এমন একটা ভুল করেছে যার জন্য আমরা লজ্জিত ও চিন্তিত। বসুন্ধরাকে নিয়ে আমরা দিল্লি যাব। এ ঘটনার জন্য অমিয়া দেবীকে দায়ি করে কোনো লাভ নেই। বসুন্ধরার এই ঘটনার জন্য তিনিও চিন্তিত। তাকেও আমি আমাদের সঙ্গে দিল্লিতে যেতে অনুরোধ করব। দিল্লিতে আমার এক ঘনিষ্ঠ ডাক্তার বন্ধু আছে। তার সঙ্গে কথা বলে এসেছি। সে নিজেই তার নার্সিং হোমে অ্যাবর্সন করে দেবে। ব্যাপারটা গোপন থাকবে।

বসুন্ধরা বলেছিল, বড়োমামা, আমি আর বড়োমা এখান থেকে শিলঙ চলে যাচ্ছি। আমার সন্তানকে আমি হত্যা করব না। সে এই পৃথিবীতে আসবে।

বড়ো মামী আবার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বেহায়ার মতন অনেক কথা বলেছিস। আজ রাতের ট্রেনেই আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবি। তারপর দিল্লিতে গিয়ে যা করার আমিই করব।

বসুন্ধরা বলেছিল, বড়ো মামী আমি সাবালিকা। যে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি সেটাই আমি পালন করব। আমি জানি, আমার কথা ভেবেই তোমরা এত উতলা হয়ে দিল্লি থেকে ছুটে এসেছ। তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো। আর যদি পার তবে আশীর্বাদ কর আমি যাতে আমার সংকল্পকে সফল করতে পারি।

[৪০]

লেবার রুম থেকে নবজাতকের তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ দরজা ভেদ করে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এত গুলি মানুষের ভ্রূকুটিকে এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত যে সে এই পৃথিবীর আলোটাকে মুঠির মধ্যে ধরতে পেরেছে তারই বিজয় ঘোষণা তার এই কান্নার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে চলেছে।

অমিয়া দেবী লেবার রুমের দরজায় কান পেতে সেই কান্না শুনছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন খণ্ড-খণ্ড মেঘের উপর ভেসে চলেছেন, আর সেই কান্না বিন্দু-বিন্দু হয়ে শিশির ভেজা শিউলি ফুলের মতন তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

তমালের সন্তান। তার এক মাত্র সন্তানের সন্তান এই শৈল নগরীর নির্জন পরিবেশে তার আগমন-বার্তাকে ঘোষণা করে চলেছে। এখানে তিনি একা সেই ঘোষণার নহবতের সুরকে শুনে চলেছেন। এ সুর তো একা শোনার নয়। আনন্দ বন্টনের জন্য। আনন্দকে যদি বন্টন না করা যায় তবে সেই আনন্দই এনে দেয় নিসঙ্গতার তীব্র জ্বালা। শোককে নিজের বুকে ধরে রাখা যায়। কিন্তু আনন্দ বিদ্যুত চমকের মতন। এ ছড়িয়ে পড়তে চায়। আনন্দের আলোর মধ্যে সবাইকে আমন্ত্রণ জানায়।

মানুষ মানুষের বাগানেই বিচরণ করতে চায়। নন্দন কাননের দেব-ঐশ্বর্য তাকে ক্লান্ত করে তোলে। সুখে আছে একঘেয়েমীর যন্ত্রণা। স্বর্গীয় সুখের সাঁতারে মানুষ দেবতাদের মতন সুখের যন্ত্র হয়ে থাকতে চায় না। সুখ ও দুঃখের বৈচিত্রের সাগরে সে সাঁতার কাটতে চায়। সুখকে দেখতে চায় দুঃখের উজানে সাঁতার কেটে। জীবনকে চিনতে চায় প্রতিকূলতার অট্টহাসির মধ্যে দিয়ে। সে সুরকে চেনে বেসুরে কান পেতে। তাই তো নেমে আসে এই কঠিন পৃথিবীতে। মাতৃ জঠরের অলস সুখ-নিদ্রার বাঁধন কেটে সে পৃথিবীর কর্কশ মাটিতে 'অমৃতস্যা পুত্রার' বিজয় কেতন প্রতিষ্ঠা করতে নেমে আসে। এ কান্না সেই আগমনের ঘোষণা। পৃথিবীকে জয় করার আগাম প্রত্যয়।

তমাল কেঁদেছিল। সব শিশু জন্মেই কাঁদে। আর এই কান্না শোনার জন্য সব জননীই দশমাস দশ দিন ধরে প্রতিটি প্রহর অধীর অপেক্ষায় গুনে চলে। তমালের সেই কান্না তিনি শোনেননি। তিনি ছিলেন অচেতন। তমালকে সিজার করে আনতে হয়েছে। যখন তার জ্ঞান হয়েছিল তখন তমাল তার কান্না থামিয়ে বেবি-কটে ঘুমিয়ে আছে। মা-নাকি পুত্রের প্রথম কান্নার সুরে তার ঘোষণাকে বুঝতে পারেন। নাড়িকাটার পূর্ব মুহূর্তে সন্তান তার দশমাস দশ দিনের সেই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যাওয়ার বিদায়ঘন মুহূর্তে মার কানে তার শেষ ঐশ্বরীক কথাটা বলে যেতে চায়। অচেতন অমিয়া দেবীকে তমাল কিছু বলতে চেয়েছিল কিনা তিনি জানেন না। বললেও তার অচেতন শ্রবণতন্ত্রে তা প্রবেশ করে নি। হয়তো তমাল বলতে চেয়েছিল, আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে দুঃখ পেও না।

ইয়েস, প্রাউড গ্র্যান্ড মাদার—গম্ভীর সেই শব্দ তরঙ্গ অমিয়া দেবীকে শিলিগুড়ির মিত্র নার্সিং হোম থেকে শিলঙয়ের নার্সিং হোমে উড়িয়ে এনেছিল।

ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে সাদা অ্যাপ্রন। মাথায় তখনও টুপি। শান্ত, সৌম্য চেহারা। এসে ছিলেন স্কটল্যান্ড থেকে স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে নিয়ে ভারতের সৌন্দর্যকে সপরিবারে দেখতে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার দেশে তখনও বিশাল নাম-ডাক। পেশার ফাঁকে ফাঁকে নানা দেশকে নিজের চোখে দেখা তার একটা নেশা।

ভারতবর্ষে আসার আগেই শুনেছিলেন এদেশেও নাকি এমন একটা শৈলনগরী আছে যার সাথে স্কটল্যাণ্ডের খুব মিল আছে বলে তাকে বলা হয় 'স্কটল্যান্ড অফ দি ইস্ট'। ম্যাপ দেখে জায়গাটার নাম জেনেছিলেন শিলঙ। এদেশে এসেই খোঁজ করেছিলেন এই বিশাল উপমহাদেশে তার স্বদেশ ভূমির মতন জায়গাটাকে। তাকে ভ্রমণ তালিকার শেষে রেখেছিলেন। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি এড়িয়ে এখানে এসেও যদি স্বদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ পান তবে তার জন্য দুটো দিন আরো বাড়িয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় দিনেই ঘটেছিল ডাক্তারের জীবনের সেই মর্মান্তিক ঘটনা। চেরাপুঞ্জির মোস্‌মাই ফল্‌স দেখে ফিরছিলেন। পথে ঘটেছিল দুর্ঘটনা। জীপটা গড়িয়ে হাজার ফুট নীচে পড়েছিল। ডাক্তার ছিলেন জীপের দরজার ধারে। একটু আগেই দরজাটা খুলে ছিলেন। লাগাতে যাবার সময়ই জীপটা একটা বাঁক ঘুরতে যেতেই খাদের দিকে গড়িয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার খোলা দরজা দিয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে অসহায় দৃষ্টিতে দেখেছিলেন জীপটা তার স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে অতল খাদে খণ্ড-খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

শিলঙ-এর মাটিতেই স্ত্রী ও পুত্রের ছিন্ন-ভিন্ন দেহগুলিকে শুইয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তার। এখানেই গড়ে উঠেছে তার মেটারনিটি ক্লিনিক। সকাল বিকালে সামনের লনে শায়িত স্ত্রী পুত্রের বেদির সামনে দাঁড়ান। আগের দেওয়া সাদা ফুলের তোড়া দুটিকে যত্নের সাথে তুলে নিয়ে দুটি তাজা সাদা ফুলের তোড়া পাশাপাশি দুই বেদিতে রেখে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর পুরানো ফুলের তোড়া দুটি বুকের ভিতর চেপে ধরে নিয়ে এসে কিছুটা দূরে মাটিতে রেখে দেন। সেখানেই এরা মাটিতে মিশে যায়।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরাকে এই ডাক্তারের কাছে প্রথমেই নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তারের নাম কার্সলন। তবে সবাই সাহেব ডাক্তার বলেই ডাকে।

অমিয়া দেবী শুধু বলেছিলেন, আমার পুত্র-বধূ। ওর স্বামী নেই। আপনি ওকে দেখুন ডাক্তার।

ডাক্তার বসুন্ধরার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, সব প্রভুর ইচ্ছে। মাই ডিয়ার ডটার। তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার এই ওল্ড ফাদার তোমার জন্য সব সময় তৈরি থাকবে।

ডাঃ কার্সলন একবারের জন্যও স্বামীর প্রসঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। জিজ্ঞাসা করেন নি, স্বামী নেই অর্থে সে বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা কিনা। কিন্তু এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, মাই চাইল্ড, তোমার স্বামী আমার বোগি নয়। তার কথা আমার জানা দরকার নেই। তোমাকে শুধু প্রভুর কথাই বলি, প্রভু বলেছেন, 'তুমি কী ভাবে চিন্তা কর সে সম্বন্ধে সতর্ক থেকো। তোমার চিন্তা দিয়েই তোমার জীবন গড়ে ওঠে। যা সত্য নয় কখনও তা বলবে না। মিথ্যা এবং ছলনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রেখো না। সৎ আস্থা নিয়ে সোজা সামনের দিকে চাও। যা কিছু কববে তার জন্য সাবধানে সুষ্ঠু পরিকল্পনা কর তাহলে তুমি যাই করনা কেন তা সুসংগত হবে। মন্দকে পরিহার করবে। সোজাপথে সামনে এগিয়ে চলবে। ন্যায্য পথ থেকে এক পাও সরে যেও না।'

বসুন্ধরা নির্বাক হয়ে ডাক্তাবের কথা গুলি শুনেছিল। তারপর বলেছিল, আমি আপনার কথাগুলি মনে রাখব।

ডাঃ কার্সলন হেসে বলেছিলেন, তুমি প্রথমেই ভুল করছ, মাই চাইল্ড। কথা গুলি আমার নয়। প্রভুর ইচ্ছেটাই তোমাকে বললাম। এবার তোমার মাদার ইনলকে ডেকে দাও। তার কতগুলি কথা জানা দরকার।

অমিয়া দেবী আসতেই ডাঃ কার্সলন বসুন্ধরার পাশের চেয়ারটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, বসুন মাদার। আপনার ডটার-ইন-ল সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তবে এসময় টেনশন যত কম হয় ততই ভালো। একটু শারীরিক পরিশ্রম করা ভালো। সকাল বেলায় ঘর মোছার কাজটা ওকে দিন না। এতে ঘরও পরিষ্কার থাকবে, ওর একটা ভাল ব্যায়ামও হবে।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওকে কোনো আয়রন টনিক দেবেন?

হেসেছিলেন ডাক্তার। যে ওষুধ দরকার তা আমি লিখে দিয়েছি। টনিকের বদলে ডাল আর শব্জি দেবেন। সেই সাথে গরুর দুধ। সম্ভব হলে একটা করে ডিম।

ভিজিটের জন্য ব্যাগ খুলতে যেতেই ডাক্তার বলেছিলেন, এখন আমি কোনো ভিজিট নিই না মাদার। আপনার গ্র্যান্ড-চাইল্ডকে আপনার কোলে তুলে দেবার পর ভিজিট দেবেন।

হ্যালো গ্র্যান্ড-মাদার, আপনার গ্র্যান্ড-চাইল্ডকে একবারও কোলে নেন নি। দেখুন হোলি চাইল্ডকে দেখুন। কি সুন্দর গ্র্যান্ড-সন হয়েছে আপনার।

লজ্জা পেয়েছিলেন অমিয়া দেবী। ডাক্তার তার নাতিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অথচ তিনি নিশ্চল হয়ে অতীতকে রোমন্থন করে চলেছেন। দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

সাদা তোয়ালে ঢাকা যেন সেই তমাল। সেই চোখ, সেই চুল, সেই ঠোঁট আর কপাল। তমালের গায়ের রঙ তো এমনই ছিল।

অতীত আবার টানতে চাইছে। এই স্মৃতিকেই তিনি মনের পর্দা থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছেন বলেই তো চলে এসেছেন এই নির্জন শৈলপুরীতে। তমালের প্রতিটি স্মৃতি—তার ছবি, তার পোষাক, তার ছেলে বেলাকার খেলনা, যা নিজে হাতে সাজিয়ে রাখতেন সব কিছুই ফেলে এসেছেন।

বসুন্ধরা তমালের একটা ফটো তার স্যুটকেশের ভিতর রেখেছিল। অমিয়া দেবীর চোখ পড়েছিল ফটোটার দিকে, বসুন্ধরাকে বলেছিলেন জীবনের সব শেকড়কে উপড়ে ফেলেই তো আমরা শিলং-এ চলে যাচ্ছি। এই আগাছার স্মৃতিকে কেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিস?

বসুন্ধরা বলেছিল, আমার সন্তান যদি কোনো দিন তার বাবার খোঁজ চায় তখন তো এই ছবিটা তাকে দেখাতে পারব বড় মা।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, সেটাই হবে তোর সবচেয়ে বড়ো পরাজয়। তুই নিজেই বলেছিলি গর্ভধারিনীই হবে সন্তানের পরিচয়। তবু যে পিতা সন্তানের খোঁজ রাখেনি, সেই সন্তান যদি তার পিতার খোঁজ চায় তবে তো তোর এত বড়ো দাবিটাকেই মিথ্যা বলতে হয়।

বসুন্ধরা কোনো জবাব দেয়নি। স্যুটকেস থেকে তমালের ফটোটা বের করে আলামারির তাকে রেখে দিয়েছিল।

অমিয়া দেবী তোয়ালে ঢাকা সদ্যোজাত শিশুর মুখের দিকে আবার তাকালেন। তার কোলে উঠে কী সুন্দর ঘুমিয়ে আছে।

জ্ঞান ফিরে আসার পর সেদিন ঠিক এমনি ভাবে মিত্র নার্সিং হোমে ডাঃ মিত্র তার কোলে তমালকে শুইয়ে দিয়েছিলেন। তমালকে সে দিন এমনভাবেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন।

মুখটা ওর আরও কাছে এনেছিলেন অমিয়া দেবী। মনে হয়েছিল তমালকেই যেন তিনি কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মনটা উড়ে গিয়েছিল তমালের খোঁজে। তমাল, তার তমাল। দিনের পর দিন এক ভাবে শুয়ে থেকেছেন। যন্ত্রণায় একটা পাশ অবশ হয়ে আসতে চেয়েছে। তবু পাশ ফেরেন নি। পাছে, তার গর্ভের সন্তানের সামান্যতম বিপদ ঘটে। এই মুহূর্তে মনটা ব্যাকুল হয়ে তমালকে খুঁজে চলেছিল। আজ যদি তমাল পাশে থাকতো তবে নিশ্চয়ই তার ঘাড়ে মুখ রেখে তমাল জিজ্ঞাসা করত, আমার ছেলে একেবারে আমারই মতন হয়েছে না?

তমালকে তো তিনি তার জীবন থেকে মুছে দিতে চেয়েছেন। সর্বত্র তিনি ঘোষণা করেছেন তমাল মৃত। নার্সিং হোমের খাতায় তার ঔরস জাত সন্তানের পিতৃপরিচয়ে নিজের হাতে লিখেছেন মৃত তমাল মিত্র।

তোয়ালে জড়ানো বসুন্ধরার পুত্রকে বুকে নিয়ে মনে হয়েছিল তমালকে তিনি কিছুতেই মারতে চাননি বলেই সর্বত্র তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন। আসলে তিনি চেয়েছেন তমাল বেঁচে থাকুক। তমাল তমালের রূপ নিয়েই থাকুক।

অমিয়া দেবীর আবার মনে পড়েছিল গান্ধারীর কথা। মহাভারতের এই চরিত্রটা তাকে বার-বার আকর্ষণ করে। কী বলিষ্ঠ এক চরিত্র এই গান্ধারী। নিজ পুত্রকে জয়ী হবার আশীর্বাদ দেন না। প্রিয় পুত্র দুর্যোধনের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখার পরও শ্রীকৃষ্ণকে কত বলিষ্ঠ ভাবে জানাতে পেরেছিলেন—

উপস্থিতেহস্মিন্ সংগ্রামে জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়ে বিভো।
মাময়ং প্রাহ বার্ষ্ণেয় প্রাঞ্জলিনৃপসত্তমঃ॥
অস্মিনজ্ঞাতি সমুদ্ধর্ষে জয়মম্বা ব্রবীতু মে।
ইত্যুক্তে জানতী সর্ব্বমহং স্বব্যসনাগমম॥
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

অর্থাৎ দুর্যোধন যখন জ্ঞাতিদের সাথে এই সমরে তার জয়ের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এসেছিল তখন তিনি জানতেন এই ঘোর সংগ্রামের ফল তার পক্ষে অত্যন্ত শোকের

কারণ হবে। তবু তিনি দুর্যোধনকে বলেছিলেন, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। গান্ধারী পুত্রকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সে ক্ষত্রিয়ের আকাঙ্ক্ষিত শাস্ত্রজিত লোকপ্রাপ্ত হবে।

সেই গান্ধারীও যে মনে মনে দুর্যোধনের বিজয় কামনা করতেন। তা না হলে পুত্রের মৃত্যুর কারণ যে পুত্র নিজে সেই সত্য জেনেও তিনি পুত্রের শোকে শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিতে গিয়ে বলতে পারতেন না,

পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জ্জিতম।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্র গদাধর।।

অর্থাৎ পতি সেবার ফলে আমি যে তপ অর্জন করেছি সেই দুর্লভ তপোবলে তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।

আরে গ্রান্ড-মাদার, গ্র্যান্ড-সনকে পেয়ে যে আমাদের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন?

ডাঃ কার্সলনের কথায় আবার ফিরে এসেছিলেন অমিয়া দেবী। বলেছিলেন, আমি দুঃখিত ডাক্তার আসলে—

আমি বুঝি গ্র্যান্ড-মাদার। গ্র্যান্ড-চাইল্ডকে কোলে নিয়ে আপনার ছেলের কথা মনে পড়ে গেছে। এটাই তো প্রভুর পরীক্ষা, মাদার। আমার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকেও প্রভু তার কাছে টেনে নিয়েছেন। আর আমাকে বাঁচিয়ে রেখে প্রভু আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন। তুমি মা, ছেলের কথা তো মনে পড়বেই। তবে তুমি তোমাব ডটার-ইন ল-এব কথা ভাব। প্রভুতো ওকেই সবচেয়ে বড় শাস্তি দিয়েছেন। যাও তুমি নিজের হাতে ওর কোলে ওর সন্তানকে তুলে দিয়ে এস। প্রভু ওর স্বামী হারানোর ব্যথাকে সান্ত্বনা দিতেই এই দেবশিশুকে ওর কাছে পাঠিয়েছেন।

লেবার রুম থেকে বসুন্ধবাকে বেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ, তবে দুটি চোখের তারায় একটা আত্মতৃপ্তির দীপ্তি।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বুকের মধ্যে নবজাতককে দুহাতের বাঁধনে ধরে আছেন।

ডাঃ কার্সলন অমিয়া দেবীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আপনার ডটাব-ইন-ল-এর খুব সহ্য শক্তি। গ্র্যান্ড-চাইল্ড বড্ড দুষ্টুমি করেছে আ- 'দের সাথে। আমার মতন বুড়োকে বোধ হয় ওর পছন্দ হচ্ছিল না। তাই কিছুতেই বাইরে আসতে চাইছিল না। যতই ডাকি ততই মাথা বেঁকিয়ে বসে ছিল। একবার তো মনে হয়েছিল দুষ্টুটাকে সিজার করে ধরতে হবে। তবে আমার ডটারেব সহ্যশক্তিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। ও এভাবে সহযোগিতা না করলে নর্মাল ডেলিভারি করানোটা সহজ হতো না।

অমিয়া দেবী ধীরে ধীরে বসুন্ধরার পাশে ওর সন্তানকে শুইয়ে দিয়েছিলেন।

বসুন্ধরার মুখে হাসি অথচ চোখের কোনায় মুক্তোর ফোঁটা টলটল করেছিল। সে আস্তে আস্তে ছেলের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে ওর গায়ে গভীর মমতায় তার হাতটা আলতো ভাবে রেখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

একটা আবেগের ঢেউ তাকে দোলা দিচ্ছিল। সে জায়া নয় কিন্তু জননী। বসুন্ধরা চোখের পাতা দুটিকে নামিয়ে আনতেই সেই স্বর্গীয় ছবিটাকে আবার দেখতে পেয়েছিল। মাতা মেরী শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে বসে আছে। চোখের পাতা দুটোকে মেলে ধরতেই সারা শরীরে এক তীব্র কম্পন অনুভব করেছিল বসুন্ধরা। সে তার সন্তানকে হত্যা করতে গিয়েছিল। সন্তানের প্রতি এত মমতা কোথায় যে লুকিয়ে ছিল তা এই প্রথম আবিষ্কার করেছিল।

অমিয়া দেবীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বড়োমা, তুমি ওকে দেখেছ?
আমি তো ওকে এতক্ষণ দেখে তোর কাছে নিয়ে এলাম।
ও কেমন দেখতে হয়েছে বড় মা?
তুই দেখিস নি?
দেখেছি। তুমি বল বড়ো মা।
অপূর্ব সুন্দর হয়েছে দেখতে।
সত্যি বলছ, বড়োমা?
তুই দেখ।
বসুন্ধরা বালিশে ভর দিয়ে মাথাটাকে উঁচু করে ছেলের মুখের উপর ঝুঁকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করেছিল, ও কার মতো হয়েছে বড়োমা?
অমিয়া দেবী বসুন্ধরার মাথাটাকে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তোর ছেলে তোর মতো না হয়ে আর কার মতো হবে?
বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে নিয়ে বলেছিল, ওতো খুব ফরসা হয়েছে বড়োমা।
অমিয়া দেবী বলেছিলেন, টুকটুকে ফরসা হবে। ঠিক—
বসুন্ধরা আবার মাথাটাকে বালিশ থেকে উঠিয়ে এনে বলেছিল, থামলে কেন? বল না ঠিক—
অমিয়া দেবীর মনে হয়েছিল তিনি ধরা পড়ে যাচ্ছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল ঠিক গোপাল ঠাকুরের মতন ফরসা হবে রে।
বসুন্ধরা ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, গোপাল ঠাকুর তো ফরসা নয়। সে তো শ্যামবর্ণ।
অমিয়া দেবী কথা ঘোরাতে চেয়েছিলেন। আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম ও মহাদেবের মতন ধপ ধপ ফর্সা হবে।
বসুন্ধরা বলেছিল, তুমি তো বললে ও আমার মতো দেখতে হবে। কিন্তু আমি তো ফরসা নই বড়োমা। আমাকে সবাই বলে চাপা রঙ। তবে ও এতো ফরসা হলো কি করে বড়োমা?
অমিয়া দেবী বসুন্ধরার মাথায় হাত রেখেছিলেন। আরেকটা হাত ধরে ওর ছেলের গায়ে রেখে বলেছিলেন, কেন তুই ওর কথা মনে করতে চাইছিস?
বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর হাতটা টেনে এনে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে বলেছিল, আমার ছেলে দেখতে ওর মতনই হয়েছে, তাই না, বড়োমা?
অমিয়া দেবী মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন।
বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার ছেলেও কি আমার ছেলের মতন এত সুন্দর হয়ে জন্মেছিল?
অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তমাল ছোটোবেলায় সত্যি খুব সুন্দর ছিল। তোর ছেলের মুখটাও যেন তমালের সেই ছোটবেলার মুখটা কেটে বসানো।
বড়োমা, বসুন্ধরার মুখে একটা অপূর্ব মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, আমি তাহলে তোমার ছেলের সন্তানের মা হয়েছি।
অমিয়া দেবী কিছু বলতে যাবার আগেই নবজাতকের তীক্ষ্ম চীৎকারে সিস্টার ছুটে এসেছিল। কোলে তুলে নিয়ে বলেছিল, ওর ক্ষিদে পেয়েছে, ওকে আমরা খাইয়ে দিচ্ছি। কাল থেকে কিন্তু ও মায়ের বুকের দুধ খাবে।

বসুন্ধরা বলেছিল, বড়োমা, ওব নাম বাখব কর্ণ।

কর্ণ?

হ্যাঁ, বড়োমা। আমার মন বলছিল, আমাব ছেলে হবে। মনে মনে তখন থেকেই ভেবে এসেছিলাম ওর নাম হবে কর্ণ।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ওকে কেন তুই সেই অভিশপ্ত মানুষটার নামাবলীতে ঢেকে দিবি?

বসুন্ধরা বলেছিল, মনে পড়ে তোমার বড়োমা, সেই স্কুলে ফাংশনের কথা? তুমি হয়েছিলে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে' কুন্তি, আব আমি কর্ণ।

বসুন্ধরা বিছানা থেকে মেঝেতে নেমে এসে জানালার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, শোন বড়োমা, কর্ণের সেই কথাগুলি।

"মাতঃ করিয়ো না ভয।
কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে
ঘোর যুদ্ধ ফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম বিশ্বাস ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
জযহীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোবে করো না আহ্বান
জযী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।
জন্ম রাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে—
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি।
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

ভেবে দেখ বড়োমা, কী দীপ্ত কথা। হোক সে ভাগ্য-বিড়ম্বিত কিন্তু, এমন পুরুষ, এমন নির্মল চরিত্র তুমি কোথায় খুঁজে পাবে?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কর্ণের চরিত্র একেবারে নির্মল একথা বলতে পারিস না। কৌরব রাজ্যসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় কর্ণের ভূমিকা ছিল দুর্যোধনের মতনই নিন্দনীয়। সেই তো দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতন কলঙ্কজনক প্রচেষ্টার ইন্ধন যুগিয়েছিল।

বসুন্ধরা বলেছিল, বড়োমা, কর্ণের বিরুদ্ধে তোমার এই অভিযোগের জবাব দিতে আমি একটু পিছন থেকে শুরু করি।

প্রথমে দেখ, কর্ণ অর্জুনের সমকক্ষ তো বটেই, বরং তার থেকেও বড়ো বীর হওয়া

সত্ত্বেও সে কিন্তু দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় লক্ষভেদ করতে যায়নি। গিয়েছিল দুর্যোধনের সঙ্গি রূপে। কৃষ্ণই তার কাছে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হয়ে তাকে লক্ষভেদে প্ররোচিত করেছিলেন। আবার কর্ণ লক্ষ ভেদ করে দ্রোপদীকে অর্জন করতে সক্ষম দেখে দ্রৌপদীকে দিয়ে বলালেন তিনি সুত পুত্রকে স্বামী রূপে বরণ করতে পারবেন না। অথচ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ংবর সভায় ঘোষণা করেছিলেন, যেই লক্ষভেদ করবে সেই যাজ্ঞসেনীকে লাভ করবে। একবারও বলা হয়নি কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই এই লক্ষভেদের অধিকারী। ভেবে দেখ বড়োমা, কর্ণ কিন্তু একবারের জন্যও পাঞ্চালীর প্রতি প্রশ্ন তোলেনি স্বয়ংবর সভার শর্ত অনুসারে তার এ ঘোষণা করার অধিকার নেই। সেই মহাবীর কৃষ্ণর প্রতি উদার হাস্যে ধনুকের জ্যা মুক্ত করে বেদির উপর অতি যত্নসহকারে নামিয়ে রেখে ধীর পদক্ষেপে মাথা নত করে সভা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এত বড়ো অপমান যে এমন নীরবে সইতে পারে সে কোনো নারীর প্রতি এত নিচ আচরণ কেন করেছিল তা কিন্তু তুমি তলিয়ে দেখতে চাইলে না, বড়োমা।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর এই নিদারুণ ব্যবহার যতই ক্ষমার অযোগ্য হোক না কেন, এক নারীর বস্ত্রহরণেব প্ররোচনাব জন্য তাব চরিত্রকে কোনো ভাবেই নির্মল চরিত্র বলে দাবি করতে পারিস না।

বসুন্ধরা বলেছিল, আপাতদৃষ্টিতে তোমার যুক্তি অকাট্য। কিন্তু তুমি যদি কর্ণের স্বীকারোক্তির কথা মনে না রাখ তবে এই মহান চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করতে পারবে না।

ভেবে দেখ বড়মা যে পঞ্চপাণ্ডবের বীবত্ব ও মহত্ত্বকে নিয়ে এত বড়াই কব তারা যে কত নিচ ও ক্লীব সে প্রশ্নটাকে কত সহজেই এড়িয়ে যেতে পার। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নিয়ে তোমরা নিন্দায় মুখর। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে পাশার দান করে যে ব্যক্তি বিক্রি করে দিতে পারে তাকে ধর্মাত্মা বলতে তোমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ধনঞ্জয় স্ত্রীর লাঞ্ছনা দেখেও মাথা নীচু করে বসে আছে। এক মাত্র ভীম মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভ্রাতৃভক্তিব তথাকথিত পরকাষ্ঠা দেখাতে স্ত্রীব সম্মান রক্ষার্থে তাদের প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছে। আব সেই নমস্য ব্যক্তিরা—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কৌরব-রাজ্যের নুন খেয়েছেন বলে তাদেরই রাজ-কুলবধূর বস্ত্রহরণ দেখেও নুন খাওয়া অর্থাৎ রাজ অনুগ্রহ থেকে পাছে বঞ্চিত হন সে ভযে নিশ্চুপ হযে রইলেন। তবু তারা মহৎ থেকে যান কি করে?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আমিও যে কথা বলতে চাইছি, সে ঘটনার প্রতিবাদ না করার জন্য তুই সবাইকে কাঠগড়ায় তুলেছিস সেই ঘটনা ঘটাতে যে প্ররোচনা দিয়েছিল সেই কর্ণের অপরাধ যে কত জঘন্য তা তো তুই নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছিস।

বসুন্ধরা বলেছিল, তোমার সাথে আমি এক মত নই বড়োমা। অর্জুন যখন ভীমকে শান্ত করতে বলেছিল, 'আমার উপযুক্ত সময়ে এই কর্ণকে বধ করে এই অপমানের প্রতিশোধ নেব' তার উত্তরে কর্ণ যে কথা গুলি বলেছিল সে গুলি মনে করে দেখঃ কর্ণ অর্জুনকে বলেছিল।

'তোমাদের প্রিয়তমা স্ত্রী হাজার মানুষের চোখের সামনে লাঞ্ছিতা হলেন, আর তোমরা তার শোধ নেওয়ার জন্য কোনো এক উত্তরকালের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছ। পিতামাতার মৃত্যু ঘটলে তার সৎকার সাধনের জন্য তো সুযোগ সুবিধার অপেক্ষায় বসে থাকা যায় না। শাস্ত্রমতে তৎক্ষণাৎ তার সৎকার করতে হয়। স্ত্রীর সম্মানও তো পিতামাতর সম্মানের মতনই রক্ষণীয়। তাকে বিক্রি করে দেওয়া অথবা রক্ষার চেষ্টা না করাই অধর্ম।

হে অর্জুন, তোমার সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই ছিল আমার স্বপ্ন। এখন মনে হচ্ছে সেটাই হবে আমার পক্ষে অপমানকর। ধিক্ তোমার শৌর্য, ধিক তোমার বীর্য!'

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এতে তো কর্ণের চরিত্রের চরম সুবিধাবাদির মুখোশটাই প্রকাশ পেয়ে গেছে। একদিকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণেব জন্য দুঃশাসনকে প্ররোচিত করছে। অপর দিকে তাব প্রতিবাদ না করার জন্য অর্জুনকে তিরস্কারের বাণে বিদ্ধ করছে।

বসুন্ধরা বলেছিল, কর্ণের জীবনে এটাই মস্ত ট্র্যাজেডি। কেউ তার মনের ভিতরটা উঁকি মেরে দেখতে চায় নি। পাণ্ডবদের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। অর্জুনের সাথে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল। তার কারণও ছিল। সেও তো দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষার প্রার্থী হয়ে এসেছিল। দ্রোণ তাকে সুত-পুত্র বলে শিক্ষা দানে যে অসম্মতি জানিয়েছিলেন তার প্রকৃত কারণ ছিল তাকে অর্জুনের সমকক্ষ হতে দিতে দ্রোণ রাজি ছিলেন না। একই কারণে দ্রোণ একলব্যের কাছ থেকে তার দক্ষিণ হস্তের বুড়ো আঙ্গুলকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ চেয়ে নিয়েছিলেন।

বসুন্ধরা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থেকে আবার বলেছিল, আসলে কর্ণ এভাবে দ্রৌপদীকে পাশার দান রূপে ব্যবহৃত হওয়াকে সমর্থন করেন নি। পাঞ্চালীর প্রতি কর্ণের মনে একটা গভীর দুর্বল জায়গা ছিল তার প্রমাণ পেয়েছি কুরুসেনাপতি পদে আসীন হবার পরেই পাঞ্চালীর মনের প্রতিক্রিয়া জানতে তার অধীর আগ্রহের মধ্যে। বিচিত্রবীর্যের কাছ থেকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছেন দ্রৌপদী এই সংবাদে কী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষ্ণা প্রতি যদি তার এতই দুর্বলতা থাকে তবে কর্ণ কেন এমন অপমানজনক ব্যবহার করার প্ররোচনা দিয়েছিলেন?

বসুন্ধরা বলেছিল, কর্ণ বীর। সে বীরের মত লড়াই করেই অর্জুনের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। পাশা খেলার মাধ্যমে নয়। তাই দ্রৌপদীর বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করে সে অর্জুনকে উত্তেজিত করে যুধিষ্ঠিরহীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে অর্জুনকে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণায় প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তুই এই ব্যাখ্যা কোথায় পেলি?

বসুন্ধরা উত্তর দিয়েছিল, কর্ণ মিথ্যেবাদী নয়। সেদিন কৌরব সভায় ঐ ঘটনায় কেন তিনি দুঃশাসনকে প্ররোচনা দিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের কাছে স্বয়ং কর্ণই বলেছিলেন।

'আমি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কটু কথা বলেছি তা দুর্যোধনের মনোরঞ্জনের জন্য বলেছি সে কথা ভাবা ঠিক নয়—স্ত্রীকে লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাদের এই লজ্জাজনক নীরবতাকে ভঙ্গ করতে আমাকে এই ধিক্কার-ধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়েছে।'

ভেবে দেখ, কৃষ্ণ কর্ণকে তার জন্ম পরিচয় দিয়ে তাকে পাণ্ডব পক্ষের হয়ে রাজা হবার প্রস্তাব দিলে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেই কর্ণ এই কথাগুলি বলেছিলেন। দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের দুর্বলতা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রস্তাব মেনে নিলে কর্ণ শুধু রাজাই হতেন না, সেই সাথে চির ঈপ্সিতা দ্রৌপদীও প্রতি ষষ্ঠবর্ষে তিন বৎসর কাল তার অঙ্কশায়িনী হতেন।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তুই ওর নাম কর্ণ রেখে ওর পিতৃ-পরিচয়কে সব সময়ের জন্য বিড়ম্বনার মধ্যে রেখে দিতে চাইছিস কেন?

বসুন্ধরা বলেছিল, ভেবে দেখ বড়োমা, কর্ণ পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই পরিচয় পেয়েও কি উদাত্ত-কণ্ঠে কুন্তির কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, আমি জননী রাধা ও সুতশ্রেষ্ঠ অধিরথের পুত্র কর্ণ।

আমার ছেলের সামনেও তো একদিন সেই প্রশ্ন হাজির হতে পারে। তফাৎ অবশ্য একটা আছে। কর্ণকে তার জননী জন্মানোর পর ভাসিয়ে দিয়েছিল। আমার পুত্রের পিতা তার জন্মের

পূর্বেই তার দায়িত্বকে অস্বীকার করে পালিয়ে গেছে। কর্ণের কাছে কুন্তি যেমন তার জন্মপরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়ে তার পালক পিতা-মাতা ও বন্ধুকে অস্বীকার করার বিনিময়ে রাজমুকুটের লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তেমনি আমার ছেলের কাছে সে যদি কোনো দিন হাজির হয়ে আমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে যেতে চায় তবে আমার কর্ণ মহাভারতের কর্ণের মতনই বলবে।

"নবৈ মম হিতং পূর্ববং মাতৃবচ্চেষ্টিতং ত্বয়া,
সা মাং সংবোধয়সবাৎদ্য কেবলাত্ম হিতৈষিণী।"

তবে ও মাতৃবতের পরিবর্তে বলবে,

'পূর্বে আপনি তো কোনোদিন পিতৃবৎ আমার মঙ্গলের চেষ্টা করেন নি। এখন আপনি আপনার নিজের হিতে আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন।'

ভেবে দেখ বড়োমা, এই নামের পিছনে কি বিশাল এক হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছিল। শুধু কুন্তি নয়, স্বয়ং সূর্যদেব এসে কর্ণকে জানিয়ে ছিলেন কী বিশাল তার জন্ম পরিচয়; তবু তো কর্ণ সুত পুত্রের পরিচয় লিপি পরিত্যাগ করে কান্তেয় হতে চান নি।

তোমার কোলের এই শিশুকেও যদি সে তার পিতৃপরিচয় দিয়ে তোমার স্নেহের বাঁধন থেকে ছিন্ন করে নিয়ে যেতে আসে তবে আমার কর্ণ মহাভারতের কর্ণের সেই কথাগুলি বলবে,

"অকরোন্ময়ি যৎ পাপং ভবতী সুমহাত্যয়ম।
অপাকীর্নোহস্মি যন্মাতস্তদ্‌যশঃ কীর্ত্তিনাশনম।।
অহঞ্চেৎ ক্ষত্রিয়ো জাতো ন প্রাপ্তঃ ক্ষত্রসৎক্রিয়াম।
ত্বৎকৃতে কিন্তু পাপীয় শত্রুঃ কুর্য্যান্মমাহিতম।"

অর্থাৎ 'আমাকে ত্যাগ করে আমার প্রতি আপনি যে অবিচার করেছেন, তাতেই আমার জীবন অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে। আমি ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত হয়েও ক্ষত্রিয়চিত সংস্কারে সংস্কৃত হইনি। আপনার অবিচারেই আমার এই দুর্গতি ঘটেছে। এর থেকে আর বেশি কী শত্রুতা হতে পারে? আমার সেই সব সংস্কারের ক্ষেত্রে আপনি সামান্যতম অনুকম্পা দেখান নি, এখন কেন দয়া দেখাচ্ছেন?'

উত্তেজনায় বসুন্ধরার কপালটা পাহাড়ি পরিবেশেও ঘেমে উঠেছিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, মহাভারতে যে দুটি চরিত্র আমারও প্রিয় তারা হলো গান্ধারী ও কর্ণ। দুজনেরই জীবনটা চরম বিষাদঘন। হয়ত এজন্যই এই চরিত্র দুটি আমার মতো অনেকেরই মনকে এমন ভাবে টেনে রাখে। কিন্তু মনে মনে প্রার্থনা করি এদুটি চরিত্র যতই প্রিয় হোক না কেন এদের জীবনের করুণ পরিণতি যেন আপন জনকে স্পর্শ না করে।

বসুন্ধরা এগিয়ে এসে অমিয়া দেবীর কাছে এসে বসেছিল। টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বলেছিল, গান্ধারীর মতন প্রতিবাদী চরিত্রের একটা অধ্যায় ছাড়া আমার সব কিছু ভাল লাগে।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই গান্ধারীর জীবনের কোনো অধ্যায়ের কথা বলছিস?

বসুন্ধরা বলেছিল, গান্ধারী তো আর দ্রৌপদীর মতন স্বয়ংবর সভায় ধৃতরাষ্ট্রকে পছন্দ করেন নি। কুরুবংশের মহাবলী ভীষ্মের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারেন নি বলেই গান্ধার রাজ তার কন্যাকে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সাথে বিয়ের প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ গান্ধারী এক জন্মান্ধকে স্বামী রূপে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রতিবাদী গান্ধারীর চোখে পট্টবস্ত্রের বন্ধন পুরুষশাসিত সমাজের চোখে পতিব্রতার নিদর্শন হলেও এটা নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নে মেনে নিতে আমার আপত্তি আছে। তবে আমার ভাবনা তো আমার ছেলেকে নিয়ে। তুমি

কর্ণের করুণ পরিণতির কথা বলছ বড়োমা? কিন্তু এমন পরিণতি করুণ বলে মনে হবে কেন? এই পরিণতি তো অর্জুনের বীরত্ব আর কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য উভয়কেই ম্লান করে দিয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কিন্তু বসুন্ধরা, কর্ণের মৃত্যু যতই মহান হোক না কেন এমন অভিশপ্ত জীবন কেউ তার প্রিয়জনের জন্য কামনা করে না।

বসুন্ধরা বলেছিল, তুমি ভুল করছ বড়মা। অভিশাপই কর্ণের জীবনে বার বার পরাস্ত হয়েছে। অভিশাপ তো মনের ভিতর ভয় সঞ্চারের জন্য। আর সেই ভয়ের ছায়াই যদি মনকে স্পর্শ করতে না পারে তবে অভিশাপের আর কী মূল্য থাকতে পারে?

কর্ণের অনিচ্ছাকৃত অপবাধের জন্য এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যুদ্ধকালীন পৃথিবীর মাটি তার বথের চাকাকে গ্রাস করবে। আর তার প্রতিপক্ষ তার শিরচ্ছেদ করবে। গুরু পরশুরাম অভূতপূর্ব গুরুসেবায় আশীর্বাদের পবিবর্তে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যুদ্ধকালে সে ব্রহ্মাস্ত্রেব জ্ঞান বিস্মৃত হবে। তবু কিন্তু কর্ণ সামান্যতম ভীত হয়নি। যুদ্ধে কর্ণকে পরাজিত কবতে কোনো অভিশাপই কাজে লাগেনি। তাই দেবরাজ ইন্দ্রকে তার ঔরসজাত পুত্র অর্জুনকে কর্ণের হাত থেকে বাঁচাতে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তার কবচকুণ্ডল ভিক্ষা চেযেছিলেন। দাতা কর্ণ দেবরাজকে চিনতে পেরেছিলেন। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেও তা অম্লান বদনে দান করেছিলেন। অভিশাপই যদি কাজ করত তবে দেববাজকে এই ছলনার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হতো না।

ব্রাহ্মণেব অভিশাপে কর্ণের রথের চাকা মাটিতে প্রোথিত হয়েছিল বটে কিন্তু এর পূর্বেই এই যুদ্ধে তিনি অর্জুনকে অনেক বারই পরাস্ত করেছিলেন। একবার সম্পূর্ণ পরাভূত অবস্থায় অর্জুনকে পেয়েও সূর্যাস্তের আভা দেখে তাকে প্রাণে বধ করেন নি। মৃত্যুকে জয় করার এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? কারণ তিনি জানতেন রণক্ষেত্রে একমাত্র অর্জুন ছাড়া আর কারো হাতে তার মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা নেই। আর অনেক বার কৃষ্ণের দৈব মায়ায় অর্জুন কর্ণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

অমিয়া দেবী এ বসুন্ধরাকে যেন এর আগে দেখেননি। এ যেন এক অচেনা বসুন্ধরা। তিনি নির্বাক হয়ে তার কথা শুনে চলেছেন।

বসুন্ধরা বলে চলেছে, কর্ণের মৃত্যুর দৃশ্যটা কল্পনা কর বড়োমা। কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গেছে। কর্ণ রথের চাকাকে মাটি থেকে উঠিয়ে আনতে চাকায় ঘাড় লাগিয়েছেন। কৃষ্ণের প্ররোচনায় অর্জুন তাকে হত্যা কবতে বাণ নিক্ষেপ করতে চলেছে। গুরু ভার্গবের অভিশাপে তিনি তার কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রগুলি বিস্মৃত হয়েছেন। তবু অর্জুনের প্রতি তিনি যে বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন তার হাত থেকে অর্জুনকে বাঁচাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে তার দৈবশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল।

কর্ণ জানতেন কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করবেন, তবু মাটি থেকে এই শর নিক্ষেপ করেছিলেন অর্জুনকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে। ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে নিরস্ত্রের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করা অন্যায়। অথচ অর্জুন নিরস্ত্র কর্ণের উপর শর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাই কর্ণ তীর নিক্ষেপ করে অর্জুনকে সুযোগ দিলেন ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে তাকে বধ করার। এই স্বেচ্ছামৃত্যু তো ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যু থেকেও অনেক মহান।

মনে মনে কল্পনা কর বড়োমা, কর্ণের সেই মৃত্যুর মুহূর্তটি। সেদিন, অন্তরীক্ষে জলে, স্থলে, সর্বত্র যে হাহাকাবে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল তার কম্পনে স্বয়ং সৃষ্টি কর্তাই কেঁপে উঠেছিলেন। এই মৃত্যুর জ্যোতিতে সূর্যের দীপ্তি ঢেকে গিয়েছিল। ত্রিজগৎ বেদনায় ম্লান হয়ে

পড়েছিল। কর্ণের মৃত্যুতে যে ক্রন্দন ধ্বনী উচ্চারিত হয়েছিল তা সদা আনন্দময় অমৃতলোককেও শোক স্তব্ধ করেছিল।

কৃষ্ণ-সখা অর্জুন মুহূর্তের মধ্যে কাপুরুষ বলে আখ্যাতিতে ভূষিত হয়েছিলেন। গিরিধারী পার্থসারথী নেমে এসেছিলেন শকুনির মতন এক নিচ ছলনাকারীর দলে।

মৃত্যু কর্ণের কাছে এসেছে বিনম্র লজ্জায়। যে মৃত্যু ভয়কে জয় করে বসে আছে তার কাছে মৃত্যু তো আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। যে পাণ্ডব পুত্রের অধিকারকে হেলায় অগ্রাহ্য করে রাধেয় পরিচয়কেই গর্বের সাথে বহন করে তাব কাছে স্বর্গীয় সুখও তো তুচ্ছ।

কর্ণকে শোনানোর প্রয়োজন হয় না শ্রীকৃষ্ণের বাণী। তার জন্য প্রয়োজন নেই গীতার শ্লোক। তাকে প্রলুব্ধ করতে বলতে হয় না। এই যুদ্ধে জিতলে তোমার জন্য আছে পৃথিবীর ঐশ্বর্য আর মৃত্যু হলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে স্বর্গের আনন্দ।

কর্ণ যে নিজেই গীতা। কর্ণের প্রেরণা কর্ণ নিজেই। কর্ণের মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যু। তাই কর্ণই অমর। কর্ণই মহাভারত।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর কোলের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে তার কোলে মাথা রেখে বলেছিল, বড়োমা আমার ছেলে কেন কর্ণ হবে না? জন্মের অভিশাপকে জয় করতে পারে একমাত্র কর্ণ।

অমিয়া দেবী বুকেব ভিতব টেনে এনেছিলেন বসুন্ধবাকে। চোখের জলে এতক্ষণ সব কিছুকে ঝাপসা দেখছিলেন। বসুন্ধরার আঁচলের কোনা দিয়ে চোখ দুটিকে মুছে নিয়ে ওর মুখটা নিজেব চোখের সামনে তুলে ধবে বলেছিলেন, আমাদের কর্ণ যে অনেকক্ষণ ধবে ঘুমিয়ে আছে। চল মা, কর্ণকে তুলে দি। ওর খাবারের সময় হযে গেছে।

| ৪২ |

ঠাম্মা।

স্মৃতির সুতো কেটে যায় অমিয়া দেবীর।

পাহাড় থেকে যে রাস্তাটা সসত্বা রমণীর উদবেব উপব কাপড়ের পাড়ের মতন নেমে এসেছে তারই এক কিনারায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে কর্ণ। পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে কর্ণের মুখে। বুঝতে পারলেন স্কুল থেকে এসেই তাকে দেখতে না পেয়ে স্কুলের পোশাক পরেই তার কাছে ছুটে এসেছে।

বসুন্ধরা বলেছিল, কর্ণকে তোমার স্কুলেই ভর্তি করে নাও বড়োমা।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, সেটা কর্ণের জন্য ভালো হবে না রে। ওর মনেব মধ্যে একটা ভাবনা কাজ করবে আমার ঠাকুমা এই স্কুলের হেডমিসট্রেস। আমি সবার থেকে আলাদা। টিচাররাও হেডমিসট্রেসের নাতির প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব দেখাবে তাও কর্ণের ভবিষ্যতের জন্য ঠিক হবে না।

বসুন্ধরা মেনে নিয়েছিল অমিয়া দেবীর যুক্তি। তুমি ঠিক বলেছ বড়োমা, প্রশ্রয় যেন ওকে কোনো ভাবেই গ্রাস না করে।

বিকেল বেলায় প্রতিদিন কর্ণের হাত ধরে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে এই লেকের ধারে বেড়াতে আসেন অমিয়া দেবী। বসুন্ধরা ইউনিভার্সিটি থেকে তাড়াতাড়ি এলে একই সাথে আসে। কর্ণ এক হাতে ঠাকুমা, আরেক হাতে মার হাত ধরে স্কুলের ছড়া বলতে বলতে চলে। মাঝে মাঝে ছড়া থামিয়ে প্রশ্নের বন্যা বইয়ে দেয়। সে উত্তর দিতে হিমসিম খেয়ে যান দুজনেই।

ঠাম্মা।

কী দাদু ভাই?

আমি দাদু ভাই নই আমি কর্ণ।

আমার ভুল হয়ে গেছে। বলুন কর্ণবাবু।

আমার নাম কর্ণবাবু নয়, কর্ণ।

আবাব ভূল হয়ে গেছে। বল কর্ণ?

আমাকে ঐ সূর্যের কাছে নিযে যাবে ঠান্মা?

সে যে অনেক দূব কর্ণ।

দূর, তুমি কিছু দেখতে পার না ঠান্মা।

কর্ণ তার ছোটো দুটি হাত হ্রদের ওপারের দিগন্তরেখায অস্তমিত সূর্যের দিকে প্রসারিত করে বলে, ঐ তো সূর্য। একটা ছোট্ট নৌকা করেই হ্রদটা পেরোলেই তো সূর্য। চল না, ঠান্মা আমি সূর্যের কোলে পা দুলিয়ে বসব।

আচ্ছা মা।

বসুন্ধরা বলে, বল কর্ণ।

আমার বাবা কে মা?

চমকে উঠে বসুন্ধরা। এই তো প্রতিটি সন্তানের চিরন্তন প্রশ্ন। যে প্রশ্ন সত্যকাম কবে ছিল তার মার কাছে সেই প্রশ্ন কেন বার বাব সন্তানের মুখে ধ্বনিত হবে? কেন সে বলবে না, আমি তো তোমাকেই জানি আর কাউকে জানার প্রয়োজন নেই?

বসুন্ধবাকে চুপ কবে থাকতে দেখে কর্ণ বলে উঠে, তুমি কিছু জাননা মা, ঐ তো আমার বাবা।

কোথায়? অমিযা দেবী ও বসুন্ধরা দুজনে মুখ থেকেই একই সাথে কথাটা বেরিয়ে এসেছিল।

কর্ণ তার হাতের ছোট্ট মুঠিটা সূর্যের দিকে তুলে বলল, তোমরা সত্যিই কিছু জান না। সূর্যই তো আমার বাবা।

তোমাকে এ কথা কে বলেছে কর্ণ? বসুন্ধরা রাস্তার মাঝেই হাঁটু গেড়ে বসে কর্ণকে বুকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

কর্ণ বলে, আমাদের মিস্ আজকে ক্লাসে বলেছে, কর্ণের বাবা সূর্য কর্ণকে তার মার কোলে রেখে আবার আকাশে চলে গেছে। তাই কর্ণ প্রতিদিন সূর্যকে প্রণাম করে। আমিও এবার থেকে প্রতিদিন আমার বাবাকে প্রণাম করব।

বসুন্ধরা কর্ণকে বলেছিল, তোমার ঠাকুমা তোমাকে এত ভালোবাসে, আমি তোমাকে ভালোবাসি তবু তুমি কেন বাবাকে প্রণাম করবে?

কর্ণ তার কচি দুটি হাত দিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তোমরা তো আমার কাছে আছ। বাবা যে অনেক দূরে। তাই তার কাছে আমার যেতে খুব ইচ্ছে করে।

বসুন্ধরা ছেলের হাত দুটি গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কপট রাগে তাকে ঠেলে একটু দূরে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে, সূর্যদেবতাকে বলি তোমার কর্ণের কাছে তুমি চলে আস। আমরা তোমার মতন দূরে চলে যাই।

কর্ণ অমিয়া দেবীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে ফেলেছিল, তার বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল, ঠান্মা তুমি মাকে আমায় ছেড়ে দূরে যেতে না বল। আমি আর কোনোদিন বাবার কাছে যেতে চাইব না।

বসুন্ধরা কর্ণকে অমিয়া দেবীর কোল থেকে নিজের কোলে টেনে তার সারা মুখে চুমু দিতে দিতে বলেছিল, বাবা আমার, সোনা মানিক আমার, তোমাকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।

কর্ণ নেমে পড়েছিল বসুন্ধরার কোল থেকে।

আবার সেই প্রশ্নের স্রোত।

আচ্ছা মা, বাবারা খুব পাজি হয়?

কে বলেছে ও কথা?

মরিসন যে বলে।

মরিসন কে?

তুমি কিচ্ছু জান না, মরিসন আমার বন্ধু। আমার সাথে পড়ে।

মরিসন কি বলেছে কর্ণ?

মরিসন বলে, তোর বাবা নেই, তুই খুব ভালো আছিস কর্ণ। আমার বাবা প্রতিদিন মদ খেয়ে এসে আমার মাকে মারে। আমার মা কাঁদে। আমি ভয়ে লেপের তলায় লুকিয়ে থাকি। মরিসন আমাকে কি বলেছে জানো মা?

তুমি বল।

কাউকে বলবে না বল?

কাউকে বলব না। বসুন্ধরার বুকের ভিরতটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল।

ঠাম্মা, তুমি কাউকে বলবে না তো?

না, দাদুভাই কাউকে বলব না, অমিয়া দেবীর গলার স্বরটাও কেঁপে উঠেছিল।

কর্ণ বলেছিল, ও আমাকে কাল দশ টাকা দিতে বলেছে। আমাকে দেবে ঠাম্মা?

দেব। কিন্তু টাকা দিয়ে কী হবে?

সেটাই তো বলছি তোমাদের কাউকে বলবে না কিন্তু। মরিসনের কাছে পনেরো টাকা আছে। আমরা দুজনে মিলে একটা বন্দুক কিনব।

বন্দুক? দুজনের গলা দিয়ে একই কথা বেরিয়ে এসেছিল। বন্দুক দিয়ে কী করবি?

মরিসন বলেছে, ওর বাবা যখন ওর মাকে মারতে আসবে তখন ও বন্দুক দিয়ে বাবাকে গুলি করবে।

বসুন্ধরা কর্ণকে একটা তীব্র ধমক দিতে গিয়েছিল। অমিয়া দেবী তাকে ইশারায় চুপ করতে বলে কর্ণকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, দাদু ভাই কেউ অন্যায় করলে ভগবান তাকে শাস্তি দেন। তুমি তোমার বন্ধুকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে সব বুঝিয়ে দেব।

কর্ণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একাই সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরাকে বলেছিলেন, ধৈর্য হারাস না। এই তো সবে শুরু। আরো নানা প্রশ্নের জবাব দিতে আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

আচ্ছা বড়োমা, বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল ওর প্রশ্নগুলো কেবল বাবাকে কেন্দ্র করে আসছে কেন?

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, এটাই তো নিয়ম। যে নেই, যা নেই, তার কথাই তো আমাদের বেশি করে মনে হয়। ও ওর বন্ধুদের বাবাকে দেখে, মাকেও দেখে। মাকে ও পাশে পায়। তাই জানে মা সবার কাছেই থাকে। কিন্তু বাবাকে পায়না বলেই সে বাবার সম্পর্কে কৌতূহলী হবে এটাই তো শিশুমনের স্বাভাবিক গতি।

ঠাম্মা, তুমি আমাকে না নিয়ে চলে এলে কেন?

অমিয়া দেবী কর্ণের ডাকে ঘুরে তাকিয়েছিলেন। কর্ণ যে কখন পাহাড়ের ওপরের রাস্তা থেকে নেমে এসেছে বুঝতে পারেন নি। বললেন, না দাদুভাই আর কোনো দিন এরকম ভুল হবে না।

স্যরি বল। কর্ণের মুক্তোর মত দাঁতের সারিতে হাসির ঝিলিক।

স্যারি, স্যারি, স্যারি। আই এম এক্সট্রিমলি স্যারি, মাস্টার কর্ণ।

থ্যাঙ্কু, ম্যাডাম।

মা কোথায় রে?

মা পড়ছে।

বসুন্ধরাকে এখন প্রায়ই ক্লাস নোট তৈরি করতে বই নিয়ে বসতে হয়। অমিয়া দেবী বোঝেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে হলে নিজেরও প্রচুর পড়াশোনার দবকার। তবু বসুন্ধরাকে বলেছেন, ছেলেটাকে সঙ্গ দিতে ভুলিস না। তুই যখন বইতে ডুবে থাকিস তখন ও তোর সামনে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। তুই টেরও পাস না। বেচারি আমার কোলের মধ্যে গুটি মেরে শুয়ে থাকে।

কিন্তু বড়োমা, কর্ণ তো তোমার কাছে থাকতেই ভালোবাসে। তুমি কত সুন্দর করে ওকে গল্প শোনাও। আমি তোমার মতন গল্প শোনাতে পারি না।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, না, তোর ধারণা ঠিক নয়। নাতি-নাতনিরা ঠাকুমার কাছে বসতে ভালোবাসে। তার কথা শুনতে ভালোবাসে, তার কাছে ঘুমোতেও চায়। কারণ ঠাকুমার কাছে সে প্রশ্রয় পায়। কিন্তু মায়ের হৃদয়ের উষ্ণতা যে অন্য জিনিস। যার গর্ভে দশমাস দশ দিন উষ্ণ নিরাপত্তায় কাটিয়েছে সেই উষ্ণতা তার অবচেতন মনে খুঁজে বেড়ায়।

জানো ঠাম্মা, মাকে এত করে বললাম ঠাম্মার কাছে নিয়ে চল, মা বলল, নিভামাসীর সাথে যাও। আমাকে অনেক পড়তে হবে মা এলে যে বেশি ভালো লাগে মা বুঝতে চায় না।

কর্ণের কথাগুলির মধ্যে অভিমানের সুর অমিয়া দেবীর কানে ধরা পড়ে। কর্ণকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, আমি মাকে বকে দিয়ে বলল, বিকেল বেলায় পড়াশোনা বন্ধ। আমরা সবাই কর্ণবাবুর সাথে বিকেল বেলায় বেড়াত বেরোব।

খুশিতে ঝলমল করে উঠে কর্ণের মুখ। বলে, মাকে খুব করে বকে দেবে ঠাম্মা। বলবে, তোমার কর্ণ খুব দুঃখ পেয়েছে। সারা রাস্তায় তার মার জন্য কাঁদতে কাঁদতে এসেছে।

বলব দাদুভাই। বলব। আমার দাদুভাইকে আর কাঁদতে দেব না।

কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতা পাছে কর্ণের কানে ধরা পড়ে সেই ভয়ে আঁচল মুখে দিয়ে অমিয়া দেবী কেশে নিলেন। লেকের ধার দিয়ে ঠাকুমার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে কর্ণ বলে, আচ্ছা ঠাম্মা, সবার বাবাই কি সূর্য হয়?

না দাদু ভাই।

শুধু কর্ণের বাবাই তো সূর্য হয়, তাই না ঠাম্মা?

হ্যাঁ, দাদু ভাই।

জর্জটা কি বোকা ঠাম্মা।

জর্জ কে দাদু ভাই?

কর্ণ অভিমানে অমিয়া দেবীর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, তুমি আর মা দুজনেই খুব দুষ্টু।

অমিয়া দেবী কর্ণের হাতটা আবার নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বলেন, কেন দাদুই ভাই?

অভিমানে কর্ণ তার ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে বলে, আমি তোমাদের সব বন্ধুদের নাম মনে রাখি, তোমরা আমার বন্ধুদের নাম মনে রাখতে পার না।

অমিয়া দেবী কর্ণকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, স্যরি, স্যরি, স্যরি। আর কখনো এমন ভুল হবে না। এবার তোমার জর্জকে চিনতে পেরেছি।

চিনতে পেরেছ? খুশির হাসি কর্ণের মুখ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু অমিয়া দেবী আবাব বিপদকে ডেকে আনলেন। চিনতে পারব না কেন? আমাব বন্ধুদের থেকেও তোর বন্ধুদের আমি বেশি ভালো করে চিনি। তোর ওই ফরসা সুন্দর বন্ধুটা তো।

হঠাৎ কর্ণ আবার তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, জর্জতো খুব কালো। তুমি কিছুই মনে রাখতে পার না। কোনো দিন বলবে তোমার কর্ণও কয়লার মতন কালো।

না, দাদু ভাই আর এরকম ভুল হবে না। ঢোক গেলেন অমিয়া দেবী। এই ফরসার দেশেও যে একজন কালো মানিক আছে তাও আবার জর্জ ওঁ কী করে জানবেন?

—তা তোমার জর্জ বোকা হলো কেন দাদু ভাই?

—বোকার মতন কথা বলে তাই।

—আহা, কোন কথাটা বোকার মতন বলে জর্জ?

—জর্জ বলে, তোর বাবা সূর্য হবে কেন? তোর বাবা তো মরে গেছে। মরে গেলে মানুষ আকাশে তারা হয়।

কর্ণ দাঁড়িয়ে পড়ে।

কী হলো রে?

কর্ণ বলে, আচ্ছা ঠাম্মা আমার বাবা তো বেঁচে আছে, তাই না?

এত বড়ো সত্যটা এত দ্রুত তার সামনে এসে দাঁড়াবে তা অমিয়া দেবী ভাবতে পারেন নি। কী জবাব দেবেন কর্ণকে? তিনি তো নিজে হাতে সর্বত্র তমালকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন। আজ কেন তবে কর্ণের প্রশ্নের জবাবে বলতে পারছেন না, তো বাবা মরে গেছে। এত চেষ্টা করেও তিনি তমালকে মারতে পারছেন না। তমাল বার বার তার কাছে উপস্থিত হচ্ছে।

পাছে তমালের কথা কানে আসে সেই ভয়ে কলকাতার সাথে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। প্রিয়তোষ বাবুর চিঠির জবাবে লিখেছেন, তমাল আমার কাছে মৃত। তমালের স্মৃতি আমি মন থেকে মুছে ফেলেছি। তোমরা সবাই তমালের পরিচয়কে বহন কবছ। তোমাদের দেখলে তমালের ছায়াকেই মনে পড়বে। তাই আমি যেমন তোমাদের ওখানে যেতে চাই না, তোমরাও যদি না আস তবে বোধ হয় আমি বেশি সান্ত্বনা পাব।

প্রিয়তোষ বাবু তার চিঠিতে যে কতখানি আঘাত পেয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বারবার চিঠিটা পড়ে একান্তে হাউ হাউ করে কেঁদেছেন।

প্রিয়তোষ বাবু লিখেছেন,

খুকি, তোর চিঠি পেয়ে যে কত দুঃখ পেয়েছি তা তোকে বোঝাতে পারব না। তবে এই দুঃখ আমার জন্য যতখানি তার থেকেও অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছি তোর কথা ভেবে। অনুভব করতে পারছি তমালের জন্য কি দুঃসহনীয় জ্বালা তুই বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছিস। বসুন্ধরার প্রতি যে ক্ষমাহীন অন্যায় হয়েছে অপ্রত্যক্ষ ভাবে হলেও আমার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। তোকে আসতে বলে, বা তোর ওখানে গিয়ে তোর মানসিক যন্ত্রণাকে আর বাড়াব না। তোকে না দেখার যন্ত্রণা আমাকেই বিদ্ধ করুক। তবে একটা অনুরোধ আমার মৃত্যুশয্যার খবর পেলে অন্তত পক্ষে শেষ বারের জন্য একবার দেখতে আসিস।

বাবা

বাবার কথা ভেবে সত্যি কষ্ট পেয়েছিলেন। মার মৃত্যুর পর এই বাবাই তাকে পাখির ডানার মতন দুহাত দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। তমালের প্রতি তার এই দুর্বলতা তো মেয়ের

প্রতি ভালোবাসার ফসল। স্বামী-হারা কন্যার প্রতি তার অসীম স্নেহই পিতৃহীন তমালকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে।

কর্ণের প্রতি যে টান তা কি বসুন্ধরার গর্ভজাত বলে? তমালের সন্তান না হলে কি কর্ণকে এভাবে নিজের সত্তার সাথে মিশিয়ে দিতে পারতেন?

নিজের কাছে নিজের প্রশ্নে যত ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন ততই কর্ণকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। তমালকে যতই দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছেন, ততই যেন কর্ণকে তমালের পুত্র বলে কাছে পেতে চেয়েছেন।

বাবা মৃত্যুশয্যায়—খবর পেয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন।

বসুন্ধরা বলেছিল, দাদুকে আমারও দেখতে ইচ্ছে করছে বড়োমা।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোব এখন যাওয়ার দবকাব নেই। কর্ণকে এখনই শত জিজ্ঞাসার দৃষ্টির আগুনে নিক্ষেপ করে লাভ কী? আরেকটু সময় নে। কঠিন বাস্তবকে ওই মোকাবিলা করতে পারবে।

প্রিয়তোষ বাবু অমিয়া দেবীকে দেখে চাদরের ভিতর থেকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অমিয়া দেবী বাবার হাতটা নিজের দুহাতের মাঝে তুলে নিয়ে শুধু বলতে পেরেছিলেন, একি অবস্থা হয়েছে তোমার?

প্রিয়তোষ বাবুর কথা জড়িয়ে এলেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি অমিয়া দেবীর।

প্রিযতোষ বাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বসুন্ধরা কেমন আছে?

অমিয়া দেবী জবাব দিয়েছিলেন, ভালো আছে, বাবা।

ওব কী হয়েছে?

ছেলে।

হাত তুলে আশীর্বাদেব ভঙ্গি কবেছিলেন প্রিযতোষ বাবু। অমিয়া দেবীর হাতটা চেপে ধরে চোখের দৃষ্টিতে একটা অনুরোধের আকুতি ফুটিয়ে তুলে জড়ানো কণ্ঠে বলেছিলেন, খুকি, তোব বুড়ো বাবাব একটা অনুরোধ রাখিস মা।

বাবার মুখের উপর ঝুঁকে বলেছিলেন অমিয়া দেবী, তুমি বল বাবা।

প্রিয়তোষ বাবু বলেছিলেন, আলমারিটা খোল, লকারে আমার উইলটা আছে। ওটা পড়। আমার জীবনের শেষ ইচ্ছেটা অস্বীকার করিস না মা।

প্রিয়তোষ বাবুর দুই ছেলেই উপস্থিত ছিলেন। অমিয়া দেবী উইলটা বড়দার হাতে তুলে দিযে ছিলেন। বাবাব ইঙ্গিতে বড়োছেলে উইলটা পড়ে শুনিয়ে ছিলেন। বাড়ির একতলা ছোট ছেলেকে আর দোতলাকে দিয়েছেন বডোছেলেকে। তিন তলাটি পাবে মেয়ে অমিয়া। তার বইয়ের বাবদ রোজগারের টাকা পাবেন দুই পুত্রবধূ ও কন্যা অমিয়া। ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থ নাতিদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। উইলের যে জায়গাটা মোটা কালির টানে বিশেষ ভাবে লেখা হয়েছে তা হল, তমালের ভাগের অর্দ্ধেক অংশ পাবে তমালের ঔরসে বসুন্ধরার গর্ভজাত সন্তান।

উইলটা পড়া শেষ হবার পর প্রিয়তোষ বাবু ইশারায় অমিয়া দেবীকে মুখের কাছে তার কানটা আনতে বলেছিলেন।

অমিয়া দেবী বাবার মুখের কাছে মাথাটা নামিয়ে এনে বলেছিলেন, বল বাবা।

ও যদি আসে ওকে তাড়িয়ে দিস না।

প্রিয়তোষ বাবুর এটাই ছিল শেষ কথা।

ছোড়দা এসে বসুন্ধরার ঘাড়ে হাত রেখেছিলেন। বড়দা পাশে বসেছিলেন। দুই বৌদি

তাকে ঘিরেই দাঁড়িয়েছিল। সে সবার ছোটো বোন, বাবার সবচেয়ে আদরের সন্তান। তার শোকের কথা ভেবে সবাই যেন নিজের শোককে আড়াল করতে চাইছিল।

বড়দা ও ছোড়দার হাতটা নিজের দুহাতের মুঠোতে ধবে বৌদিদের বলেছিলেন, বাবা চন্দনের গন্ধ খুব ভালোবাসতেন বৌদি। চন্দন বেটে আন, বাবাকে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিই।

এ বাড়ির সবার ভালোবাসা পেয়েছেন অমিয়া দেবী। দুই দাদা, দুই বৌদি কারো বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগের কারণ নেই। বরং চেনা-পরিচিত বাড়ির যে পরিচয় তিনি পেয়েছেন সে তুলনায় তাদের ব্যবহার সবার কাছে ঈর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে। বৌদিরা তাকেই সব দিতে চেয়েছেন। সবার আগে তারই মত চেয়েছেন। তমালের জন্য তারা যা করেছেন তা তো তাদের ব্যক্তি স্বার্থের তাগিদে করেন নি। করেছেন তার সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে। অনেক মা এর জন্য তাদের ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেন।

তিনি জননী রূপে অযোগ্যা কিনা, সেই প্রশ্ন নিজেকেই অনেক বার করেছেন। ভাবতে চেয়েছেন পুত্রের সুখবরে যে জননীর আনন্দ হয় না সে জননী স্বাভাবিক কিনা।

বড়দা ও ছোড়দা তাকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন বাবার, শেয কথাটা একটু ভাবিস খুকি।

অমিয়া দেবী তাকিয়ে ছিলেন দাদাদের দিকে। চোখের কোণে জলের ফোঁটাকে লুকোতে পারেন নি। সেটাই বোধ হয় দুই দাদাকে কথাটা বলতে ভরসা যুগিয়েছিল।

বড়দাই কথাটা শুরু করেছিলেন, তমালের ডিভোর্স হয়ে গেছে। মেয়েটাকে বুঝতে পারিনি যে সে—

মাঝপথেই বাধা দিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। আচ্ছা বড়দা, তোদের চোখে সব ব্যাপারের জন্য মেয়েরাই দায়ি হয়? প্রথমেই বলতে শুরু করলি, মেয়েটাকে বুঝতে পারিনি। কেন বলতে পারলি না তমাল যে মেয়েটার সাথে মানিয়ে চলতে পারবে না, তা বুঝতে পারিনি।

বড়দা থমকে গিয়েছিলেন। ছোটো বোনকে ভালোবাসেন আবার তার কথার যুক্তিগুলিকে ভযও করেন। ছোট ভাইকেই ইঙ্গিত করেছিলেন কথা বলতে।

ছোড়দা বলেছিলেন, সাগরিকা মানে তমালের স্ত্রী একজন ডাচের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজে থেকেই ডিভোর্স চেয়েছিল। তমাল আপত্তি করেনি। ওদের একটা ছেলে আছে। সাগরিকাই জানিয়েছে সন্তানের উপব ওর কোনো দাবি নেই। ওর নতুন জীবনে এই সন্তান বোঝা বলেই মনে হবে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোরা এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছিস কেন?

ছোড়দা বলেছিল তমাল ওর ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসছে। এন. এইচ. পি. সি.-র সিনিয়ার ম্যানেজার হয়ে আপাতত দিল্লিতে জয়েন করছে। আগামী পরশু দিল্লিতে ল্যান্ড করবে। তার পরের দিনই ও ওর ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় আসবে। কিছুক্ষণ আগেই ও ফোন করেছিল। তুই তোর বড়ো বৌদিকে নিয়ে তখন বাবার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র দিতে গিয়েছিলি। তুই এখানে এসেছিস শুনে ও তোর সাথে কথা বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাত্রি বেলায় আবার ফোন করবে বলে জানিয়েছে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, ছোড়দা, তোদের একটা কথা বলা হয়নি। আমি আজকের কামরুপে গৌহাটি যাচ্ছি। সেখান থেকে শিলঙ যাব।

দুই দাদাই একসাথে চীৎকার করে উঠেছিলেন, কী বলছিস তুই? বাবার কাজের আগেই তুই চলে যাবি।

অমিয়া দেবী শান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, তোরা তো ভালো করেই জানিস, আমি কোনো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করি না। বাবা তোদের যত্ন পেয়েছেন। চিরদিন নিজের

বিশ্বাসে অটুট থাকতে পেরেছেন। অগনিত মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়ে গেছেন। এর থেকে বড়ো শান্তি বাবা আর কি পাবেন?

আমাদের মনে হচ্ছে তুই রাগ করে চলে যাচ্ছিস।

তোরা আমাকে ভুল বুঝেছিস ছোড়দা। তোদের উপর আমি কেন রাগ করব, বলত? কোনো বোন তার দাদাদের কাছে এত প্রাণ খোলা ভালবাসা পায়? তোরা যা করেছিস তা আমার প্রতি ভালোবাসা থেকে। কিন্তু আমি যে একটা বিশাল দায়িত্ব মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছি বড়দা। বসুন্ধরা একা ওখানে। ছোট্ট শিশুটা পথ চেয়ে বসে আছে। দুদিনের জন্য এসেছিলাম, সাত দিন হয়ে গেছে। তোরা আপত্তি করিস না। বাবা চলে গেল। সেই দুঃখের মধ্যেও তোদের কাছে এসে খুব ভালো লাগল। আমাকে আরেকটু সময় দে। হয়ত আবার তোদের কাছেই আসব।

সেদিন বহুদিন পরে একজনের কথা মনে পড়েছিল। সে কুহক। কেন জানি আইভির সাথে দেখা করার জন্য তার মনটা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। সেদিন শ্মশান-ঘাটে তিনি আইভিকে কথা দিয়েছিলেন তার কাছে তিনি যাবেন। কথা রাখতে পারেননি। কুহককে মনে রাখতে হলে যে তমালকেও মনে রাখতে হয়। তাই হয়ত কুহকের জন্মদাত্রীকেও ভুলতে চেয়েছিলেন। আইভির ঠিকানাটি তিনি তার নিত্যসঙ্গি ডাইরীতে লিখে রেখেছিলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন অমিয়া দেবী। এখনও হাতে আট ঘন্টাবও বেশি সময় আছে। অতি সহজেই আইভির সাথে দেখা করে হাওড়ায় পৌঁছে যেতে পারবেন।

বৌদিরা আপত্তি তুলেছিলেন, এভাবে তুমি কেন চলে যাচ্ছ? অমিয়া দেবী বলেছিলেন, তোমরা বিশ্বাস করো বৌদি, আমি কোনো রাগ বা অভিমান করে যাচ্ছি না। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের কাছে আমি আবার আসব। তোমরা বাধা দিও না। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। সেটা সেরে আমি হাওড়ায় চলে যাব।

যাবার সময় দাদাদের বলেছিলেন, তোদের কাছে একটা অনুরোধ, ওকে বলিস ও যেন আমার ওখানে কোনো যোগাযোগ করার চেষ্টা না করে। আমি শিশুটার উপর কোনো ছায়া পড়তে দিতে চাই না। ও যেন সুখি হয়।

বিশাল কম্পাউন্ড ঘেরা বাড়ি। নম্বরটা মিলিয়ে দেখে নিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। গেটের কাছে এগোতেই দারোয়ান এগিয়ে এসেছিল।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আইভি মেমসাহেবকে বল, তার এক বন্ধু তার সাথে দেখা করতে এসেছে।

মেমসাহেবের সাথে দেখা করবেন? দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

হ্যাঁ, মেমসাহেব নেই?

আপনি মেমসাহেবের বন্ধু?

দারোয়ানের কাছে ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে ভেবে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছিলেন অমিয়া দেবী। বলেছিলেন, তোমাদের মেমসাহেবের সাথে দেখা করতে হলে কি তোমার কাছে ইন্টারভিউ দিতে হয়?

দারোয়ান মুখটা নামিয়ে নিয়েছিল। ওর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল, ও এই বাড়িতে অনেক দিন ধরেই আছে। কথাবার্তার মধ্যে নিছক দারোয়ানী সুর নেই। এই বাড়ির বাসিন্দাদের উপর তার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ছাপ আছে। দারোয়ান বলেছিল, আপনি ভিতরে আসুন মাইজী। তবে আপনি মেমসাহেবেরই সাথে দেখা করতে এসেছেন। না সাহেবের সাথেও দেখা করবেন?

রেগে গিয়েছিলেন অমিয়া দেবী। বলেছিলেন, তুমি বাড়ির দারোয়ান, দারোয়ানের মতো ব্যবহার কর। তোমার মেমসাহেব বাড়িতে থাকলে তাকে গিয়ে খবর দাও।

দারোয়ানের মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। সে বলেছিল, মাপ করবেন মাইজী, দু বছরের মধ্যে মেমসাহেবকে খুঁজতে তো কেউ এবাড়িতে আসেনি। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলেন অমিয়া দেবী, কেন বলত? তোমার মেমসাহেব কি এই বাড়িতে থাকেন না?

মাইজী, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভিতরে এসে বসুন।

না, তোমার মেমসাহেবের সাথেই দেখা করতে এসেছিলাম। তিনি যখন এ বাড়িতে থাকেন না, তখন আর ভিতরে যাব না।

মাইজী?

বল।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মাইজী?

বল।

মেমসাহেবের সাথে কি আপনার অনেক দিনের বন্ধুত্ব?

দারোয়ানের কথায় ছিল একটা বিষাদের সুর। অমিয়া দেবীর মনে হয়েছিল এই মানুষটা হয়তো আইভিব সম্পর্কে তাকে কিছু জানাতে চায়।

দারোয়ানকে বলেছিলেন, আসলে তোমাদের মেমসাহেবের ছেলে কুহকের সাথেই আমাব পরিচয়। কুহক যে দিন মারা যায় সেদিনই তোমার মেমসাহেবের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। উনি আমাকে বার বার করে তোমাদের এই বাড়িতে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি এতদিন আসতে পারিনি।

আপনি আমাদের ছোটো সাহেবকে চিনতেন মাইজী? দারোয়ানের চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছিল।

হ্যাঁ ভাই, ওযে আমার ছেলের মতন ছিল।

মাইজী, হাত দুটো নিজের বুকের উপর চেপে ধরে দারোয়ান বলেছিল, ছোটো সাহেব আমাব এই বুকের উপর ঘুমোত। এই মাঠে আমাকে ওর সাথে কানামাছি খেলতে হতো। আমার বড় গোঁফের জন্য ও আমাকে গোঁফুমামা ডাকত। ছোটো বেলায় আমার গোঁফ ধরে টানত।

অমিয়া দেবী মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। মাথার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু মুখে গোঁফের কোনো চিহ্ন নেই।

দারোয়ান বলেছিল, আর যাতে কেউ আমাকে গোঁফুমামা ডাকতে না পারে তার জন্য আমি গোঁফ কেটে ফেলেছি।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার মেমসাহেব এখন কোথায় আছে?

দারোয়ান বলেছিল, মেমসাহেবের মনে খুব দুঃখ ছিল মাইজী? মেমসাহেব যে এত মদ খেতেন তার কারণ তিনি মদের নেশায় দুঃখকে ভুলতে চাইতেন।

তোমাকে এসব কথা কে বলল?

আমি জানি, মাইজী। মেমসাহেব যে আমাকে বলতেন, রামু এই সব মদে আমার বুকের জ্বালা মেটে না রে। তুই আমাকে আরো কড়া নেশার খোঁজ দিতে পারিস?

তুমি এনে দিতে বুঝি?

না, মাইজী। তবে আমি এনে দিলে বোধহয় মেমসাহেবকে বেইমানরা এভাবে মেরে ফেলতে পারত না।

তোমাদের মেমসাহেব কি মারা গেছেন? দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ছিলেন অমিয়া দেবী।

না, মাইজী। তবে এর থেকে তার মবে যাওযাই ভালো ছিল।

তোমার মেমসাহেব এখন কোথায় আছে, রামু?

পাগলা গারদে।

পাগলা গারদে?

হ্যাঁ, মাইজী। ছোটো সাহেবের মৃত্যুর পর মেমসাহেব বড়ি আর ইনজেকশন নিতে শুরু করেছিলেন। চার বছরের মধ্যেই পাগল হয়ে গেলেন। জানেন মাইজী, আগে সবাই বলত মেমসাহেব মা, না ডাইনী। নিজের ছেলেকে একদিনের জন্যও বুকের দুধ দেননি। অথচ ছোটো সাহেবের মরার পর ছেলের দুঃখে তিনি পাগল হযে গেলেন।

তোমাদের সাহেব?

সাহেব বাড়িতে আছেন। সাহেব একেবাবে পালটে গেছেন। যে সাহেব বিকেল হলেই মদের বোতল নিয়ে বসে থাকতেন সেই সাহেব মদ ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়ির সব মদের বোতল ভেঙে এই লনের ভিতর পুঁতে দিয়েছেন। যাবেন সাহেবের সাথে দেখা করতে?

অযাচিত ভাবে কারো সাথে কথা বলা অমিয়া দেবীর চরিত্র বিরুদ্ধ। আজ কিন্তু না বলতে পাবলেন না। বলেছিলেন, কুহকেব কাছে তোমার বাবুব কথা শুনেছি। তার সাথে তো আমার কোনো পরিচয় নেই রামু।

রামু উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। মাইজী আপনি চলুন, আমি আপনাকে সাহেবের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

অমিয়া দেবী না করতে পারেন নি। বলেছিলেন, চল। বিশাল বসার ঘরে রামু অমিয়া দেবীকে বসিয়ে বলেছিল, মাইজী আপনি বসুন, আমি সাহেবকে খবর দিচ্ছি। ছোটো সাহেবকে আপনি চিনতেন, এখবর পেলে সাহেব এক্ষুনি চলে আসবেন।

এ তিনি কী করতে চাইছেন? ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন অমিয়া দেবী। কুহকের মৃত্যু তাকে ভীষণ ভাবে আঘাত দিয়েছিল। কিন্তু সে ঘটনা তো সেদিন শ্মশান ঘাটেই মিটিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। তিনি কি তবে আইভির পরিণতির মধ্যে নিজের পরিণতির সম্ভাবনা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছেন?

নমস্কার, আপনিই অমিয়া দেবী।

চমকে সামনের দিকে তাকিয়ে যাকে দেখলেন তিনিই যে সীমান্ত জোয়ারদার তাতে কোনো সন্দেহের কারণ নেই। কিন্তু অবাক হয়েছিলেন প্রশ্নকর্তার মুখে তার নাম শুনে। তিনি রামুর সাথে এতক্ষণ কথা বলেছেন, একবারের জন্যও তার নাম বলেন নি।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি নমস্কার করে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?

হেসে বলেছিলেন সীমান্ত জোয়ারদার, কুহকের পরিচিত এই পরিচয দিয়ে কুহকের মাসি অমিয়া দেবী ছাড়া আব কেউ বাড়িতে আসতে পারে না।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাননদি আছেন?

সীমান্ত জোয়ারদার বলেছিলেন, দেখুন আমি কিন্তু আপনার মুখে কাননদির নাম শুনে চমকে উঠলাম না। কুহকের ডাইরী পড়ে জানতে পেরেছি, আমাদের বাড়ি সম্পর্কে আপনার কোনো কিছুই অজানা নেই। শুধু এইটুকু জানেন না, কুহকের মা ছেলেকে বাইরে থেকে যতই অবহেলার ভাব দেখিয়ে এসেছে, আসলে তার থেকে অনেক অনেক বেশি তাকে

ভালোবাসত। এই কথাটা কুহক জানত না। কুহকের বাবা মাতাল, লম্পট, অবৈধ কারবারী এটা জানেন। তার এই পোশাকি পরিচয়ের পেছনে একটা মানুষের মন আছে। সেও মায়ের স্নেহ পেতে চাইত। স্ত্রীর ভালোবাসা চাইত, সন্তানের প্রতি স্নেহ দেখাতে চাইত। এটি আপনি জানতেন না। কারণ কুহক তা জানত না।

কুহকের ডাইরীতে আপনার কথাই লিখে গেছে। আপনি ওর মাসি। আপনার মধ্যে ও মাকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। ওর ডাইরীতে ও লিখেছে, নিজের মায়ের একটু স্পর্শ পেতে শিশু কুহক কি ভাবে রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছে। ঘুমন্ত মায়ের কাছে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেছে। ভয় হয়েছে মা জেগে উঠে তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বকবে। তবু আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মা যদি তাকে একবাঁর কোলের মধ্যে টেনে নেয়।

আইভি পাগল হয়ে গেল তার প্রতি ছেলের এই ভালোবাসার খবর পেয়ে। আর আমি ব্যথায় নীল হয়ে গেলাম আমার প্রতি আমারই সন্তানের ঘৃণার গভীরতা দেখে।

ডাইরীর প্রতি পাতায় পাতায় তার ক্ষোভ ঝরে পড়েছে আমার উপর। আমি স্বীকাব করি আমি বৈধ উপায়ে রোজগার করিনি। তবে সব রোজগাবই আমার অবৈধ নয়। আমি মার মুখে আমার রোজগারের হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম। মা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দেখলাম ছেলের মনেও সেই ঘৃণা জড়ো হয়ে আছে।

আইভির সাথে বিয়েটা তো একটা আকস্মিক ঘটনা। আইভির মার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা যে জন্মেছিল তার কারণ সেও প্রত্যেকের কাছ থেকে ঘৃণা কুড়িয়ে আসছিল। আইভি তার মার প্রতি প্রতিহিংসায় আমাকে বিয়ে করেছিল। আমি কিন্তু আইভিকে ভালোবেসে ফেলেছি। ছেলের ডাইরী পড়ে সে প্রথমে শোকে পাথর হয়ে পড়েছিল। তারপর মদের সাথে ড্রাগ মিশিয়ে নেশায় বেহুঁশ হয়ে নিজের উপর শোধ নিতে শুরু করেছিল। আমি যত চেষ্টা করেছি ওকে বাধা দিতে ততই ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে উন্মাদের চিহ্নগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করল। কোলের ভিতর নানা পুতুল নিয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার মতন গান গাইত। সবার সামনেই বুক খুলে পুতুলকে বুকের দুধ খাওয়াতে চাইত। তার পর ক্রমশ ও উন্মাদ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। জিনিস পত্র ভাঙাটা গায়ে লাগেনি, কিন্তু ও কয়েকবার গ্লাস ভেঙে সেই কাচে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। বাধ্য হয়ে গোববা মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এখন ও অনেকটা শান্ত। পুতুলকেই কুহক মনে করে, গান করে ঘুম পাড়ায়।

স্তব্ধ হয়ে শুনে চলেছিলেন অমিয়া দেবী। সীমান্ত জোয়ারদারের কথা শেষ হবার পর বলেছিলেন, আইভিকে বাড়িতে আনবেন না?

আমি আনতে চাই। ডাক্তার এখনো আনার পক্ষে মত দিচ্ছেন না। যদি ওকে আনতে পারি তবে ও আসবে অন্য সীমান্ত জোয়ারদাবের বাড়িতে, —মানুষ সীমান্ত জোয়ারদারের বাড়িতে। আর সেদিন প্রথমেই যাব আপনার কাছে কুহকের কথা শুনতে।

[৪৩]

ঠাম্মা।

চমক ভাঙে অমিয়া দেবীর। বলেন, বল দাদু ভাই।

তোমরা আমাকে একদম ভালোবাস না। তুমিও না, মাও না।

কেন দাদু ভাই। আমরা সবাই তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাদের সোনা দাদু ভাই। তুমি আমাদের প্রাণের দাদু ভাই।

হাঁটু মুড়ে বসে কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন অমিয়া দেবী।

কর্ণ ঠাকুমার কোলে মুখ গুঁজে দিয়ে বলেছিল, তবে আমি কোনো কথা বললে তুমি আর মা দুজনেই কেন এমন চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক?

—কোথায় দাদু ভাই? আমি তো তোমার সাথে সবসময় কথা বলি।

—মিথ্যে কথা। জাননা মিথ্যে কথা বলা পাপ।

—না, দাদু ভাই, আমি সত্যি কথা বলছি।

কর্ণ ঠাকুমার কোল থেকে মুখটা বের করে বলে, এই যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমার বাবা বেঁচে আছে কিনা ওমনি তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে। আমার সাথে কথা বন্ধ করে দিলে।

না-রে দাদুভাই, আমার যে আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তাই তার কথা ভাবছিলাম।

কর্ণ অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমারও বাবা ছিল ঠাম্মা?

—হ্যাঁ, কর্ণ সবারই তো বাবা থাকে?

—তবে আমার বাবা নেই কেন ঠাম্মা?

—অমিয়া দেবী বুঝতে পারছিলেন, তিনি আবার খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আরেকটা প্রশ্নই তাকে অতল অন্ধকারে ঠেলে দেবে।

কর্ণই তাকে সেই পতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

কর্ণ বলল, জান ঠাম্মা, আমি জর্জকে বলেছি আমার বাবা ওই সূর্য হয়ে আছে। তার জন্যই তো আমার নাম কর্ণ। বল ঠাম্মা, আমি ঠিক বলেছি কিনা।

অমিয়া দেবী বললেন, হ্যাঁ দাদু ভাই, তুমি ঠিক বলেছ। এবার চল আমরা বাড়িতে যাই।

রাস্তায় আসার মুখে দেখা হয়ে গেল ডাঃ কার্সলনের সাথে।

কর্ণই চীৎকার করে উঠেছিল, ডাক্তার দাদু।

হ্যালো মাই গ্র্যান্ডসন। কার্সলন এগিয়ে এসেছিলেন।

কর্ণ আবদার তুলেছিল, ডাক্তার দাদু তুমি আমাদের বাড়িতে আস না। আজকে চল, আমাকে গল্প বলবে।

অমিয়া দেবী বলেছিলেন, আপনার যদি খুব অসুবিধা না হয় তবে চলুন না এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন।

হেসেছিলেন ডাক্তার কার্সলন। সেই প্রাণ খোলা হাসি। গ্র্যান্ড-মাদার এন্ড গ্র্যান্ড-সন মিলে যখন ইউনিয়ান হয়ে গেছে তখন দাবি না মানলে ডাক্তারের নার্সিং হোমই বন্ধ হয়ে যাবে।

রাস্তায় যেতে যেতে ডাক্তার বললেন, গ্র্যান্ড-মাদার, কর্ণকে কিন্তু এই ভিজে আবহাওয়ায় আর রাখা চলবে না। ওকে এবার ড্রাই ওয়েদারে পাঠাতে হবে।

অমিয়া দেবীকে ডাক্তার আগেই বলেছিলেন, কর্ণের সামান্য হাঁপানির টান দেখা দিচ্ছে। তবে এখন একেবারে প্রাথমিক স্তরে আছে। ড্রাই ওয়েদারে গেলে আর কোনো ভয় থাকবে না।

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন অমিয়া দেবী, ওকে আরেকটা বছর কি আমাদের কাছে রাখা যায় না?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, রাখা যায়। তবে স্নেহের থেকে স্বাস্থ্য তো বেশি জরুরি, গ্র্যান্ড মাদার। আমি বলছিনা আরেকটা বছর থাকলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। তবে এখন পাঠাতে পারলে ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে না।

ডাঃ কার্সলনকে দেখে বসুন্ধরা খুশিতে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিল।

গুড ইভিনিং, প্রাউড মাদার।

গুড ইভিনিং, ডাক্তার আঙ্কেল।

বসুন্ধরার টেবিলের উপর খোলা বইগুলির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম প্রাউড মাদার। তোমার ছেলে আমাকে বন্দি করেছে। আর তোমার মাদার ইন-ল আমাকে কফি পানের লোভ দেখিয়েছে। আমি কিন্তু তোমার হাতে বানানো কফি ছাড়া আর কারো হাতের কফি খাব না।

অমিয়া দেবী কপট রাগের ভঙ্গি করে বললেন, আমার হাতের কফি কেন খাবেন না ডাক্তার?

ও ইউ ওল্ড গ্র্যান্ড-মাদার। সারা বাড়ি জুড়ে হাসির ফোয়ারা উঠিয়ে ডাক্তার বলেছিলেন, আমি বুড়ো হয়েছি বলে ইয়ং ডটারের হাতে কফি যে চিনি না দিলেও মিষ্টি লাগে এটা বুঝব না বলে আপনি ভাবলেন কি করে?

ডাক্তার আঙ্কেল, আপনি দিন দিন দুষ্টু হচ্ছেন। বসুন্ধরা কফি বানাতে যেতে যেতে বলল।

কফি নিয়ে এসে দেখল, কর্ণ ডাক্তার দাদুর কোলে বসে গল্প শোনায় মগ্ন।

বসুন্ধরা কফিটা টেবিলের উপর রেখে কর্ণকে বলল, ডাক্তার দাদু আজ সবটা গল্প বলে দিলে কালকে আর আসবে না। তুমি মাসির কাছে দুধ খেয়ে পড়তে বস। আমরা একটু ডাক্তার দাদুর সাথে গল্প করি।

কর্ণ মাথা কাত করে পাশের ঘরে চলে গেল।

কার্সলন বসুন্ধরাকে বললেন, তোমার মাদার-ইন-লকে আমি বলেছি ওকে এক্ষুনি ড্রাই ওয়েদারে পাঠিয়ে দাও। দেরি হলে অসুবিধা হবে।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, ড্রাই-এরিয়া বলতে একটা জায়গার নাম বলে দিন ডাক্তার আঙ্কেল। সেখানকার স্কুল, বোর্ডিং সব খোঁজ করতে হবে।

ডাঃ কার্সলন বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া নয়তো বিহারের দেওঘরে পাঠিয়ে দাও। ওখানে তো রামকৃষ্ণ মিশনের ভালো স্কুল আছে।

বসুন্ধরা বলল, আমি কালকেই ভর্তির ফর্ম আনাব।

ডাক্তার বললেন, তোমার মাদার-ইন-ল কর্ণকে আর একটা বছর কাছে রেখে দিতে চাইছিলেন। আমি বলেছি না রাখাই উচিত।

বসুন্ধরা বলল, ডাক্তার আঙ্কেল, আমি বড়োমাকে বুঝিয়ে বলব। কর্ণকে আমি দেওঘরে ভর্তির চেষ্টা করব।

ডাক্তার কার্সলন চলে গেলে বসুন্ধরা অমিয়া দেবীকে বলল, বড়োমা, কর্ণ আমাদের কাছে না থাকলে আমাদের ভীষণ কষ্ট হবে। কিন্তু ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওকে পাঠাতে হবে।

অমিয়া দেবী বললেন, আমি তো আপত্তি করিনি। কর্ণের ভালোর জন্য এ যন্ত্রণা তো সইতেই হবে।

একটু চুপ করে থেকে অমিয়া দেবী বলেছিলেন, কর্ণ দেওঘরে ভর্তি হলে চল না আমরাও সেখানে যাই।

তোমার স্কুল? আমার ইউনিভার্সিটি?

সব ছেড়ে দিয়েই যাব। যা আছে তাতে আমাদের মোটামুটি চলে যাবে।

বসুন্ধরা বলল, বড়োমা, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তাছাড়া কর্ণকেও তো এখন ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য তৈরি হতে হবে।

অমিয়া দেবী হঠাৎ বসুন্ধরার মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বললেন, ওই নিজের পায়ে দাঁড়াবার কথাটা আর মুখে আনিস না। এই ভাবতে গিয়েই তো তমালকে হারিয়ে বসেছি।

বসুন্ধরার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিল। কান্না-ভেজা কণ্ঠে বলেছিল, এর জন্য আমিই যে দায়ি বড়োমা।

অমিয়া দেবী বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বসুন্ধরার দুর্বলতম জায়গায় আঘাত করে ফেলেছেন। ওকে নিজের দুহাতের বাঁধনে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বললেন, তুই একথা বলিস না বসুন্ধরা। তোর বড়োমা যে শুধু তোকেই চেনে। তুই যদি একথা বলিস তোর বড়োমার যে আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

বসুন্ধরাও অমিয়া দেবীর বুকে মুখ গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদে বলে, তুমি ছাড়া আমারও যে আর কেউ নেই বড়োমা।

দুটি নারীর তৃষিত হৃদয় যখন পরস্পর পরস্পরের হৃদ্‌স্পন্দনকে অনুভব করে চলেছে তখন কর্ণ এসে সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

ঠাকুমার কোলে মাকে মুখ গুঁজে থাকতে দেখে কর্ণ ভাঁা করে কেঁদে ফেলেছিল।

বসুন্ধরা চমকে উঠে মুখ তুলেছিল। অমিয়া দেবী কর্ণকে কোলের কাছে টেনে এনে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে দাদু ভাই?

কর্ণ তখনও ফুঁপিয়ে চলেছে। বলে, মার কি হয়েছে ঠাম্মা? মা কেন তোমার কোলে মাথা গুঁজে কাঁদছিল?

বসুন্ধরা কর্ণকে টেনে নিয়ে তার চোখে-মুখে চুমু দিতে দিতে বলল, আমি কাঁদিনি বাবা, তুমি যেমন তোমার মার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাক আমিও আমার মার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম।

কর্ণের চোখে জলের পরিবর্তে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। খিল-খিল করে হেসে বলল, এত বড়ো মেয়ে মায়ের কোলে শুয়ে থাকে—তোমার বন্ধুদের সবাইকে বলে দেব।

বসুন্ধরা বলে, আমিও কর্ণের বন্ধুদের সব বলে দেব।

কী বলবে? কর্ণের চোখে-মুখে কৌতূহলের ঝিলিক।

আমাদের মিঃ কর্ণ মার জন্য খালি কেঁদে ফেলে।

বারে আমার বুঝি মার জন্য কষ্ট হয় না?

আর ঠাম্মার জন্য? বসুন্ধরার কোল থেকে কর্ণকে টেনে নেন অমিয়া দেবী।

তোমার জন্যও তো কষ্ট হয়, ঠাম্মার গালে একটা দীর্ঘ চুম্বন এঁকে বলে কর্ণ।

বসুন্ধরা বলে, তোমাকে তো মস্ত বড়ো হতে হবে কর্ণ। লেখাপড়া করতে হবে। তোমাকে অনেক বড়ো স্কুলে ভর্তি হতে হবে।

—সে স্কুল কোথায় মা?

—এখান থেকে অনেক দূরে ট্রেনে করে যেতে হবে।

—আমি কোনো দিন ট্রেনে চড়িনি মা। কবে নিয়ে যাবে?

—যাব বাবা, ওখানকার স্কুলে ভর্তি হতে গেলে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

—খুব ভালো করে পরীক্ষা দেব মা। কবে ট্রেনে চড়ব মা?

—তোমার পড়া তৈরি হয়ে গেলেই ঐ স্কুলে বলব আমাদের কর্ণ সোনা এবার ট্রেনে করে কু-ঝিক্ ঝিক্ করে তোমাদের এখানে পরীক্ষা দিতে যাবে।

তবে মা আমি এক্ষুনি পড়তে বসে যাব?

কর্ণের উৎসাহ ফোয়ারার মতন উপচে ওঠে।

অমিয়া দেবী কর্ণকে বুকের ভিতর চেপে ধরে বলেন, কাল থেকে পড়তে বসবে। আজ আমরা শুধু গল্প করব।

কোন গল্পটা বলবে, ঠাম্মা? তুমি ঐ হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্রের গল্পটা শেষ করনি। গল্প বলেন, অমিয়া দেবী। তাই ঠাম্মার কাছেই তার গল্পের আবদার।

কোন গল্পটা দাদুভাই?

তুমি ঠাম্মা কোনো কিছু মনে রাখতে পার না। কর্ণ ঠাম্মার দিকে গোল-গোল চোখে তাকিয়ে বলে, সেদিন যে বললে রাজপুত্র মার উপর রাগ করে ঈগলের পিঠে উড়ে সাত সমুদ্রের ওপারের দেশে চলে গেছে। আর তার মা রাজপুত্রের আসার পথের দিকে তাকিয়ে কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। সেই গল্পটা বলনা ঠাকুমা। রাজপুত্র আবার তার মার কাছে ফিরে এল কি না। তুমি বলেছিলে, রাজপুত্রের ছেলে তার ঠাম্মার কাছে বাবা-বাবা বলে কাঁদছে। এখন তো সে বড়ো হয়ে গেছে। সে তবে তাব বাবার খোঁজে ঈগল পাখির পিঠে চড়ে সে দেশে গিয়ে বলবে, বাবা, তুমি ঠাম্মার কাছে চল। ঠাম্মা যে তোমাকে না দেখতে পেয়ে অন্ধ হয়ে গেছে।

সেই গল্পটা বল না ঠাম্মা।

অমিয়া দেবী মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিলেন বসুন্ধরা তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এক খাটেই তিন জনে ঘুমোন। মাঝখানে কর্ণ, এক পাশে তিনি, অপর পাশে বসুন্ধরা। বসুন্ধরা পাশের ঘরে ক্লাস নোটের জন্য একটু বেশি রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। কর্ণকে গল্প বলে তিনিই ঘুম পাড়ান।

কর্ণের জন্য নিত্য-নতুন গল্প বানাতে হয় তাকে। ঠাকুমার ঝুলিব গল্পতেও পার পাবাব উপায় নেই। কত গল্প তো করেছেন তিনি। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্রের গল্পটা যে তিনি শেষ করতে পারেন নি। রাজপুত্র তার মার কাছে ফিরবে কিনা তা তিনি নিজেই জানেন না।

বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে কেমন একটা কৈফিয়তের সুরে বলেছিলেন, কর্ণকে সেই সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর গল্পটা বলতে গিয়ে দেখি, শেষের দিকটা ভুলে গেছি।

বসুন্ধরা বলে, ভুলে যাওনি বড়োমা। আসলে গল্পের প্রথমটা তুমি জান, কিন্তু শেষটা তোমার জানা নেই।

বসুন্ধরার কাছে ধরা পড়ে যাবার লজ্জায় অমিয়া দেবী মুখটা নামিয়ে নিয়েছিলেন।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর কাছে সরে এসে বলল, বড়োমা, আমি এখন মা। মার জ্বালা বুঝি। কর্ণকে বাইরে পাঠাতে হবে এই কথা ভাবলেই আমার বুকটা কে যেন খামচে ধরে। সমস্ত মন ও শরীর অবস হয়ে আসে। তোমার বুকের ভিতরটাও যে আমি এখন দেখতে পাই। তুমি যদি তাকে কাছে ডাকতে চাও আমি দুঃখ পাব না।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, তুই আমাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছিস বসুন্ধরা।

না, বড়োমা, বসুন্ধরা জবাব দিল, আমি তোমাকে ভুল বুঝতে পারি না। তুমিই আমার। মাকে কেউ চিনতে ভুল করে না বড়োমা। আমি তো তোমাকে মাতৃময়ী রূপেই পেতে চাই। তার উপর ভালোবাসা তোমার গভীর বলেই তো আমাকে তুমি এত ভালোবাসতে পেরেছ।

অমিয়া দেবী চাপা স্বরে বললেন, তোকে একটা কথা বলা হয়নি। মানে বলতে চেয়েও বলতে পারিনি। তমাল দেশে ফিরে এসেছে। ওর স্ত্রীর সাথে ওর ডিভোর্স হয়ে গেছে।

বসুন্ধরা উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে বলল, বড়োমা, কর্ণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে জাগিয়ে খাইয়ে দিয়ে তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। আজকে আমার বেশ রাত হবে। কালকের ক্লাসের নোটগুলি তৈরি করতে হবে।

কর্ণকে দেওঘরে ভর্তি করতে বেগ পেতে হয়নি। শত নিরপেক্ষতার মধ্যে এখানেও ধরাধরিব ছিদ্র আছে। তবে অসাধারণের জায়গা সবখানেই আছে। কর্ণ ভর্তির পরীক্ষাটি চমৎকার ভাবে পার হয়ে গেল।

শিলঙ-এর বাইরে কর্ণ এই প্রথম পা রাখল। শিলঙ থেকে বাসে করে গৌহাটি, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে পাটনা, আবার ট্রেন বদল সব কিছু তার কাছে এক মহা আনন্দ। ট্রেনে বাসে এমন কি হাঁটাতেও পরম উৎসাহ। ক্লাসের কোন বেঞ্চে বসবে, মরিসন আর জর্জকে তার কোন পাশে থাকবে তার কল্পনাও সে করে ফেলেছে।

ট্রেনে চড়ার আনন্দে সে খেয়াল করেনি ট্রেনে তার দুই বন্ধু নেই। তখন সে জানালার পাশে বসে আবিষ্কারের বিস্ময়ে দিশাহারা। তারপর মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়া—সব কিছুই তাকে এত ব্যস্ত করে রেখেছিল যে মরিসন, জর্জ, মনোজদের কথা ভাববার সময় পায় নি।

দেওঘরে পৌঁছে নতুন জায়গা আবিষ্কাবের উত্তেজনাতে দুদিন কাটিয়ে দেবার পর কর্ণ আবিষ্কার করেছিল শিলঙযের কোনো বন্ধুকে সে খুঁজে পাচ্ছে না। তার চেনা রাস্তা, সেই ঝর্না, ফান, পাইন আর মেঘ কোনোটাই নেই এখানে। ঠাম্মার সাথে বিকেল বেলায় লেকে যাওয়া বন্ধ হয়ে আছে অনেক দিন।

ঠাম্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, জর্জ, মরিসন আমার সাথে পড়বে না ঠাম্মা?

না, দাদুভাই ওরা তো শিলঙ এ থাকবে। তুমি যখন ছুটিতে বাড়িতে যাবে তখন ওরা তোমার সাথে খেলা করবে।

কর্ণ মার কাছে গিয়ে বলল, মরিসন, জর্জ না এলে আমি এই স্কুলে পড়ব না।

বসুন্ধরা কর্ণকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, তুমি তো জানো কর্ণ, মরিসন এখানে চলে এলে ওর মাব কত কষ্ট হবে। মরিসন চলে এলে ওর বাবা ওর মাকে মেরে ফেলবে। তুমি কি চাও মরিসনের মা মরে যাক?

কর্ণ বলে, না মা।

—তা হলে জর্জকে আসতে বল মা।

—তবে যে মরিসন একেবারে একা হয়ে যাবে। ওর তো আর কোনো বন্ধু নেই।

কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, তবে চল মা, আমরা শিলঙ চলে যাই। এখানে আমার একদম ভালো লাগছে না।

—কিন্তু কর্ণ তুমি যদি এখানে না পড় তবে যে ঠাম্মা খুব কষ্ট পাবে।

—কেন মা?

—এখানে যারা পড়ে তারা যে খুব বড়ো হতে পারে। তোমার ঠাম্মা চান আমাদের কর্ণ সোনা মস্ত বড়ো হবে। দেশের সবাই তার নাম করবে। তুমি এখানে পড়লে তাই ঠাম্মা খুব খুশি হবে।

—তোমাদের ছেড়ে থাকতে যে আমার খুব কষ্ট হবে মা। রাত্রি বেলায় তোমাদের পাশে না শুলে আমার যে ঘুম হবে না।

—তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমাদেরও তো খুব কষ্ট হবে বাবা। তোমাকে যে খুব বড়ো হতে হবে কর্ণ। আমার যে বড়ো কষ্ট। তুমি বড়ো হলেই আমার কষ্ট দূর হবে বাবা।

কর্ণ মার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার কেন এত কষ্ট মা? বাবা নেই বলে?

কর্ণ, বাবা আমার। বসুন্ধরা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

বসুন্ধরার মনে হয় এতদিন ধরে তিলে-তিলে করে গড়ে উঠা তার ব্যক্তিসত্তার অহং বোধের ভিতটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। বাবা নেই বলে মায়ের এই ব্যথা—শিশুর চোখে রঞ্জন রশ্মির মত ধরা পড়ে গেলে তার এতদিনের প্রতিরোধের প্রাচীরই যে ঠুনকো বলে প্রমাণিত হয়ে যায়।

মনের ভিতর প্রশ্নটা গুমড়ে উঠে। একটা শিশুর সামান্য একটা প্রশ্নেই তার মনের মধ্যে এমন আলোড়ন কেন তোলে? তবে কী তমালের প্রতি তার এই তীব্র ঘৃণার নীচে ফল্গুধারার মতন ভালোবাসার স্রোত তার অজান্তেই বয়ে চলেছে?

কর্ণ ডাকে, মা।

—বল বাবা।

—তোমার কেন এত দুঃখ মা? বাবার কথা বললে তুমি কেমন হয়ে যাও। কথা বলনা। ঠাম্মাকে বাবার কথা বললে ঠাম্মা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার বাবা কী করেছে মা? আমার বাবা কি খুব খারাপ?

—না, কর্ণ তোমার বাবা খুব ভালো। মস্ত বড়ো ইনঞ্জিনিয়ার। তোমাকেও যে বাবার মত বড়ো হতে হবে। তাহলে আমাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

ওকে এসব কী বলছিস?

অমিয়া দেবী যে কখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি। তার কথায় চুপ করে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে বসুন্ধরা।

মনের ভিতর একটা ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। ভাবার চেষ্টা করে বসুন্ধরা।

তমালকে তো সে এতদিন কর্ণ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। রাত-দিন ভয়ে ভয়ে থেকেছে পাছে বেহুলার বাসরঘরের ছিদ্রের মতন পিতার সম্বন্ধে পুত্রের সহজাত কৌতূহলের ফুটো দিয়ে তমালের ছায়া কর্ণের মনের পর্দায় ছোবল না মারে। সে তো এতদিন ভেবে এসেছে কর্ণের মনে তার পিতার প্রতি সঞ্চিত হবে তীব্র ঘৃণা। যদি কোনো দিন সে পথ ক্লান্ত পথিকের মতন ফিরে এসে কর্ণের উপর পিতৃত্বের দাবি তুলে ভাগ বসাতে চায় তবে কর্ণ যেন তার বুকের ভিতর সঞ্চিত বিষ উদগীরণ করে, সেই মহাভারতের কর্ণ যেমন কুন্তি তার জন্মদাত্রী জেনেও বলেছিলেন—

"রাধেয়োহ হমাধিরথি ঃ কর্ণস্ত্বাম ভিবাদযে।
প্রাপ্তা কিমথং ভক্তী সুহি কিং করবানিতে॥"

তার কর্ণও পিতাকে বলবে, বসুন্ধরার পুত্র কর্ণ আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আপনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে এসেছেন?

তমাল যদি পিতৃত্বের দাবি উপস্থিত করতে চায় তার কর্ণ মহাভারতের কর্ণের মতনই বলবে, "আপনি আমার জন্মদাতা হতে পারেন কিন্তু পিতার মর্যাদা পেতে পাবেন না। আপনি নিজেকে উচ্চবংশীয়, শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে দাবি করেন—কিন্তু আপনি আমার যে অনিষ্ট করেছেন এমন অনিষ্ট সমাজের নিচ কুল বলে পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারাও সম্ভব হত না। আপনি নিজের সুখি ভবিষ্যত গড়ে তুলতে আমার অসহায় জননীকে গর্ভবতী অবস্থায় কুন্তির সন্তানের মতন নিষ্ঠুর সামজিক ঘূর্ণীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বিচারে আপনার চোখে আমি মৃত। আমার মা ও ঠাকুমা আমাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে স্বেচ্ছা নির্বাসনকে বেছে নিয়েছে। তাই তারাই আমার জন্মদাত্রী ও পালিকা। আমি মহাভারতের কর্ণের মতনই বসুন্ধরার কর্ণ, নবজন্ম লাভ করেছি। আমার উপর তাই পিতৃত্বের দাবি করতে পারেন না।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকিয়েই আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল। কর্ণের সেই প্রশ্নের জবাবে তো সে বলতে পারল না, তোমার বাবা বিশ্বাসঘাতক। বরং তাকে বলল, তোমাকে তোমার বাবার মতন বড়ো হতে হবে।

এতো সেই কর্ণের অস্ত্রশস্ত্রের বিস্মৃত হওয়ার ঘটনার মতন। মহাভারতের কর্ণ না হয় তার গুরু, পরশুরামের অভিশাপে এতদিন ধরে অধীত অস্ত্রগুলি প্রয়োজন মুহূর্তে ব্যবহার করতে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে তো কেউ অভিশাপ দেয়নি। তবে কেন সে তার অমোঘ অস্ত্রকে ব্যবহার করতে ভুলে গেল? যে অস্ত্র কর্ণের তূণে তমালের পিতৃত্বের দাবির বিরুদ্ধে পাশুপত অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হতে পারত সেই অস্ত্রকেই কিসের তাড়নায় বরণডালায় রূপান্তরিত করে তার হাতে তুলে দিতে চাইল?

অমিয়া দেবী বসুন্ধরাব পাশে এসে দাঁড়িয়ে ওর মাথায় নিজের হাতটা তুলে দিয়ে বললেন, বসুন্ধরা আমরা নিজেদের কাছ থেকেই নিজেরাই পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যুদ্ধে আমরা নেমেছি বটে কিন্তু স্বজনের বিরুদ্ধে যখন সত্যি সত্যি যুদ্ধেব সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন সেই স্বজনের জন্য অর্জুনের মত বিমর্ষ হয়ে গাণ্ডীবকে হাত থেকে রেখে দিয়েছি। আমাদের এই যুদ্ধ-বথে কোনো কৃষ্ণ নেই। তাই আমরা মনের এই বিমর্ষতাকে অতিক্রম করে অর্জুনের মতো বলতে পারছি না,

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

অর্থাৎ তোমার দয়ায় আমি মোহমুক্ত হয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছি। তোমার উপদেশে আমার সংশয় কেটে গেছে। তোমার কথা পালন করব।

আমরা দুটি অতি সাধারণ মেয়ে। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইতে যখন আমরা নেমেছিলাম তখন তো সবাই অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল এই দুটো মেয়ের দৌড় আর কতদূব! মাথা নিচু করে ফিরে এসে বলবে, আমাদের ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা কবে দিও। আমরা আমাদের ক্ষমতার সীমা দেখে এসেছি। তোমরাই আমাদের অভিভাবক।

বসুন্ধরা বলল, বড়োমা, আমরা তো হারিনি। কর্ণের কথা ভেবে একটা জায়গায় আপোস করেছি। ওর পিতার নাম ব্যবহার করেছি। সেটা তো মিথ্যা নয়। ওরা হয়তো বলবে এত যে দেমাক, কই পারল ওর বাবার নাম ব্যবহার না করে?

অমিয়া দেবী বললেন, আমরা তো ওর বাবার নামকে অস্বীকার করতে চাইনি। ভয় পেয়েছিল ওরা। তাই আমাকে বার বার বলেছে ওকে জন্মাতে দিও না। ওদের ভয় ছিল, তুই হয়তো তমালের কাছে তোর ছেলের পরিচয়দানের ভিক্ষা নিয়ে হাজির হবি।

বসুন্ধরা বলল, কাছে যদি ও কোনো দিন তার পিতার পরিচয় নিয়ে হাজির হয়, বড়োমা?

অমিয়া দেবী উত্তর দিলেন, সেটাই হবে তোর জিৎ।

কেন বড়োমা?

তুই তো তার কাছে যাসনি। কেউ ভিক্ষা চাইতে এলে ভিক্ষা দেব কিনা তা নির্ভর করে আমার উপর। ভিক্ষা না দিলে বলবে কৃপণ, ভিক্ষা দিলে বলবে দয়ালু। ভিক্ষুক তো দাবি করতে পারে না।

আমার ভয় হয় বড়োমা, কর্ণ আমাদের ভুল বুঝবে না তো?

না, কর্ণ চেনে তোকে। কর্ণ চেনে আমাকে। কর্ণের কাছে তার বাবা একটা কৌতূহলের বস্তু। বন্ধুদের কাছে তাদের বাবার কথা শোনে, বাব্যদের দেখে। তাই সে তার বাবাকে নিয়ে একটা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। কিন্তু যে মুহূর্তেই তার রক্ত-মাংসের বাবার সাথে দেখা হবে সেই মুহূর্তে তার কল্পনার রাজ্য বুদবুদের মতন মিলিয়ে যাবে। তুলনা করবে তার বন্ধুদের

বাবার সাথে। অভিযোগের পর অভিযোগ উঠে আসবে তার বাবার বিরুদ্ধে। প্রশ্ন করবে, তুমি কে? তুমি আমার বাবা হতে পার না? তুমি কী করেছ আমার জন্য? আর তখনই আসবে তোর দয়া করার ভূমিকা।

তুমি বলেছিলে, ওর ডিভোর্স হয়ে গেছে। ও দিল্লিতে ফিরে এসেছে।

হ্যাঁ, খবরটা এর আগে তোকে দিই নি। বাবার মৃত্যুর পর আমি কলকাতায় আছি জেনে আমেরিকা থেকে আমার সাথে ফোনে কথা বলতে চেয়েছিল। আমি কথা বলব না বলে চলে এসেছিলাম।

—কেন কথা বলতে চাইলে না বড়োমা?

—ওকে আরো পুড়তে দিতে হবে। ওর চবিত্রের খাদগুলি না পুড়লে ওর মনুষত্বকে চেনা যাবে না।

অমিয়া দেবী প্রসঙ্গ পালটে বসুন্ধরাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কুহকের কথা মনে পড়ে?

বসুন্ধরা বলল, সেই কালো রোগা ছেলেটা তো? বারাসাতের রাস্তায় পুলিস গুলি করে মেরে রেখেছিল।

অমিয়া দেবী বললেন, কুহকেব ধারণা ছিল ওর মা ওকে ভালোবাসে না। কুহকের মা মনে করত ওর সন্তান ওর কাছে অবাঞ্ছিত। কুহকের মৃত্যুর পর দেখা গেল ওর মায়ের অবচেতন মনে সন্তানের প্রতি এত গভীর ভালোবাসা ছিল যে কুহকের মা আইভি এখন পাগলা গারদে একটা পুতুলকে কুহক ভেবে দিন কাটাচ্ছে। কুহকের বাবা সীমান্ত জোয়ারদাব পুত্রের ঘৃণার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে এখন চিনতে চাইছে। অবৈধ উপায়ে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন তা অকাতরে খরচ করে চলেছেন নানা সেবামূলক কাজে।

ঠাম্মা। কর্ণের ডাকে দুজনেই বারান্দার দিকে তাকালেন।

কর্ণ বারান্দা থেকেই বলছে, দেখ এখানকার সূর্যটা কত সুন্দব।

অমিয়া দেবী ও বসুন্ধরা দুজনেই বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শালবনের মাথার উপর পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়া সূর্যকে এক বিশাল লাল টিপের মতন মনে হচ্ছিল।

[৪৫]

আজকে কোনো ক্লাস ছিল না। গতকালই বিভাগীয় প্রধানকে জানিয়ে এসেছিল বসুন্ধরা, শুধু শুধু ইউনিভার্সিটিতে আসব না।

অমিয়া দেবী স্কুলে গেছেন। বসুন্ধরা নিভাদিকে বলেছে, আজকে ওর তাড়া নেই। ওর কাজ মিটে গেলে একসাথে খাবে।

নিভাদির শরীরে যে বয়সের ছোবল পড়েছে তার ছাপ এখন স্পষ্ট। চুলের রঙে পাক অনেক দিন আগে থাকতেই ধরেছিল। এখন কানেও কম শুনতে শুরু করেছে।

অমিয়া দেবী, নিভাদি ডাকতেন বলে ছোটোবেলা থেকে বসুন্ধরাও নিভাদি ডাকত। সেই ডাকটা এখনও ডাকে। নিভাদি এক সময় বলত, আমি তোর বড়োমারও নিভাদি, তোরও নিভাদি। কী মজা বলত?

ইদানিং নিভাদির স্বভাবের আরো একটা পরিবর্তন হয়েছে। একটা কথা নিয়ে বার-বার বক্ বক্ করা।

কর্ণকে দেওঘরে পাঠানোর ব্যাপারে তার ছিল তীব্র আপত্তি। ওকে যে ডাক্তার শুকনো হাওয়ায় পাঠাতে বলেছে কে শোনে সে কথা। নিভাদির একই কথা, বড়ো বড়ো বই পড়ে

মা হলে ছেলেকে আর কাছে রাখা যায় না। খোকার বেলায় এত করে বললাম বাপ-মরা ছেলেটাকে আঁচল ছাড়া কোরো না বাপু, কে শোনে গরীবের কথা? নিজের ছেলেটাকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে একবারে তাড়িয়েই ছাড়ল। এখন দুধের নাতিটাকেও ঘর ছাড়া করল।

বসুন্ধরা বলত, কী এত বক বক করছ নিভাদি? ফুটন্ত তেলে যেন জল পড়ত।

বক্ বক্ই তো বলবে। তুমিও তো মোটা মোটা বই পড়। ছেলেকে আর কাছে রাখবে কেন?

এরপরই ঠাণ্ডা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে বলত আহারে, দুধের ছেলেটা। এই বয়েসে ছেলেরা মায়ের বুকের বোঁটা চুষে, আর তাকেই কিনা পাঠিয়ে দিল সাত-সমুদ্দের পারে।

কথার সুর পাল্টাত নিভাদি। ছেলেটা এঘর ওঘর ঘুর-ঘুর করত। আমার কোল ঘেঁসে দাঁড়াত। আজ সারা বাড়িটা যেন একটা প্রেতপুরী। একটা কথা বলার লোক নেই। কত বলি আমি এই সব প্রেতপুরী সামলাতে পারব না। আমাকে বিদায় দাও। কে শোনে আমার কথা?

নিভাদির কথার জবাব দিলেই বিপদ। একই কথা আবার প্রথম থেকে শুরু হবে। চুপ করে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ সে কথাও বলা চলে না। মুখের সামনে এসে দাঁড়াবে। একই কথা বলতে থাকবে। কোনো কথা না বললে বলবে, তোমরা কি সব বোবা হয়ে গেলে নাকি? আমি যে এতক্ষণ ধরে বক্ বক্ করছি তার কি একটা জবাব দিতে নেই? আমাকে কি তোমরা মানুষ বলেই ভাবনা?

অমিয়া দেবী হয়তো কোনো দিন বলে বসেন, নিভাদি তোর এই বকবকানি আর ভাল লাগে না। তুই কলকাতার বাড়িতে চলে যা। কালকেই তোর যাবার টিকিট কেটে দেব।

—কী বললি? আমি চলে যাব?

—চলে যাবি।

—চলে যাব?

—বললাম তো চলে যাবি।

—আবার বল।

—চলে যা, চলে যা, চলে যা।

এবার আবার পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়ার পালা। নিভাদি চীৎকার করে বলে, তাড়িয়ে তো দেবেই। কোলে পিঠে মানুষ করলাম, আমার কাপড়ে তোর হিসির দাগ এখনো লেগে আছে। সেই খুকি বড় হয়েছিস। এখন তাড়িয়ে দিবি না তো আর কি করবি?

বসুন্ধরা চোখ টিপে হেসে বলে, নিভাদি তুমি যদি সেই হিসির দাগটা দেখাতে পার তবে তোমাকে তার বদলে এক্ষুণি একটা বেনারসী শাড়ি কিনে দেব।

নিভাদি আরো জ্বলে উঠে বলত, মাসিকে নিয়ে ঠাট্টা করবি না তো আর কাকে নিয়ে করবি?

বসুন্ধরা নিভাদিকে আরো রাগাত, তুমিই তো বললে বড়োমার ইয়ের দাগ তোমার কাপড়ে এখনো লেগে আছে।

আমার আবার কথার দাম আছে নাকি; আমি তো এ বাড়ির ঝি। নিভাদি তার শেষ অস্ত্রটা নিক্ষেপ করত।

অমিয়া দেবী নেমে আসতেন বিছানা থেকে। নিভাদির দুটো হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসাতেন। বলতেন, শোন নিভাদি, আজ থেকে তুই রান্না-ঘরে ঢুকবি না।

—খাবে কী?

—আমরা রান্না করব। বাসন মাজব। তুই কোনো কিছু করবি না।

—ও, আমাকে তাহলে সত্যি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

—না, কিন্তু তুই এত বড়ো কথা বলতে পারলি, নিভাদি?

—আমি আবার তোকে কোন বড়ো কথাটা বললাম?

—বললি তো। এই মাত্র বলেছিস।

কোন বড় কথাটা সে বলেছে তা খুঁজে না পেয়ে বসুন্ধরাব শরণাপন্ন হয় নিভাদি। তুই বল, আমি আবার কখন বড়ো কথা বললাম? কটা আর কথা বলেছি, তুই বল? দাদু ভাই ঘরে নেই, শুধু তো এই দুটো কথাই বললাম।

বসুন্ধরাও বুঝতে পারে না, বড়োদি এবার নিভাদিকে কোন কথায় ঘায়েল করবেন। তাই বলে, তোমার সব কথা আমি শুনিনি।

অমিয়া দেবী চোখের ইশারায় বসুন্ধবাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তোর কোলে তোর দাদা বাবু আমাকে তুলে দিয়ে বলেছিল, তুই ওকে মার মতন দেখা-শোনা করবি, ও তোর মেয়ে। আর তুই এখন বসুন্ধরার সামনে আমাকে খোঁটা দিচ্ছিস আমি ছোটো বেলায় তোর কোলে হিসি করেছিলাম। তার থেকেও বড়ো কথা বলেছিস, তুই বাড়ির ঝি। তোকে তো আমি আমার মাসি বলে জানতাম। আর তুই কিনা বললি, তুই এ বাড়ির ঝি?

এই দেখ, খুকি আমার সেই ছোটো খুকিই আছে। নিভাদির দুই চোখ ছাপিয়ে জলেব ধারা। কোনো মতে কান্না চেপে বলে, আমি কি তোদের ছেড়ে থাকতে পারি?

অমিয়া দেবী নিজের আঁচলে ওর মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুই আর এত নিষ্ঠুর কথা কখনো বলবি না।

ওমা দেখ, কোনো কিছুই উনানে চাপানো হয়নি। নিভাদি প্রায় ছুটে রান্না-ঘরে চলে গেল।

বসুন্ধরা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় এসে বসল। দুপুর বেলায় দক্ষিণ কোণ দিয়ে বারান্দায় সূর্যের আলো এসে পড়ে। কাছ দিয়েই পাহাড়ি রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। এই রাস্তা দিয়েই আসে পিয়ান।

কর্ণের চিঠি গত সপ্তাহেও আসেনি। অথচ প্রতি রবিবারেই ওদের চিঠি লেখার দিন। ওদের স্কুলে এটা একটা সুন্দর নিয়ম। প্রত্যেক ছাত্রকে রবিবারে বাড়িতে চিঠি লিখতেই হবে। সবার হাতে মহারাজ বাড়ির ঠিকানা লেখা খাম দিয়ে যান। ছেলেরা চিঠি লিখে মহারাজের কাছে বিকেলে জমা দেয়। সোমবার সেগুলি পোষ্ট হয়। একই ব্যবস্থা অভিভাবকদের জন্য। ভর্তির সময় অভিভাবকদের হাতে স্কুলের ঠিকানা যুক্ত খাম দিয়ে দেওয়া হয়। অভিভাবকদের কাছে বলা হয় তারা যেন প্রতি সোমবার চিঠিটা পোষ্ট করেন। খুব জরুরি কোনো খবর না থাকলে তারা যেন তাদের ছেলেদের কাছে সপ্তাহে একটার বেশি চিঠি না লেখেন। ছেলেরা যেমন বাড়ির চিঠি নিয়মিত না পেলে বাড়ির প্রতি অভিমানি হয়ে পড়ে তেমনি বাড়ি থেকে অতিরিক্ত উদ্বেগ দেখালে তাদের মন আবার গৃহমুখী হয়ে পড়ে।

হিমালয়ের হিমেল হাওয়ায় রোদ চিরকালই মহার্ঘ। এই আছে এই নেই। গায়ে চাদরটা দিয়ে বেতের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় ওই রোদের বৃত্তে বসেছিল বসুন্ধরা। গত কাল রোদ ছিল না। তবু অনেকক্ষণ বসেছিল পিয়ানের আসার অপেক্ষায়। পিয়ান এসেছিল, অনেকগুলি চিঠিও দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কর্ণের কোনো চিঠি ছিল না। দুটো সেমিনারে যোগদানের চিঠি। দুটো ছিল ব্যাঙ্ক থেকে টার্ম ডিপোজিট ম্যাচিওর হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত চিঠি।

একটা ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলির গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নোটিশ আর কয়েকটা পত্রিকা। বেশ কয়েকটা নামি পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সেখান থেকে লেখা পাঠাবার আমন্ত্রণ-পত্র।

বড়োমা এসেই জিজ্ঞাসা করবে, কর্ণের চিঠি এসেছে? আজ চিঠি না এলে মহারাজকে ট্রাঙ্কল করবেন বলে জানিয়েছেন। ইদানিং ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। একদিন চিঠি আসতে দেরি হলেই ছটফট করতে শুরু করেন। ভুলে যান আশেপাশের কথা, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পিয়ান আসার সময়ে অনেকদিন স্কুল থেকে চলে আসেন। পিয়ানের দেওয়া চিঠিগুলিতে কর্ণের চিঠি না থাকলে গজগজ করতে থাকেন।

আমড়া গাছে কি আর আম হবে? আমড়াই হয়। দেবীর মতন মায়ের পেটে জন্মালে কী হবে, শরীরে বইছে তো বদমাশ বাপের রক্ত। মায়ের কথা ভাববে কেন? ঠাম্মা তার কে? বদরক্তের ছেলে বদ হবে না তো কি হবে? চিঠি লিখবে কেন? দেখ গিয়ে বাপের মতন আবার কোনো মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছে কিনা। কালকে গিয়েই কান ধরে নিয়ে আসব।

বসুন্ধরার চোখাচোখি হতেই একটা অপরাধ বোধের যন্ত্রণায় মাথাটা নিচু করে ফেলে বলেন, দাদু ভাইয়ের চিঠি না পেলে মাথাটা ঠিক রাখতে পারি না-রে। ঘর-পোড়া গরু, ভয়েই মাথাটা খারাপ হয়ে যায়।

এগারোটা থেকে বারোটাব মধ্যে ডাকে পিয়ান আসে। ঘড়ির দিকে তাকায় বসুন্ধরা। এগারোটা বাজতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। সময় যে কখনো কখনো জগদ্দল পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকে তা বোঝা যায় এই সময়ে। অথচ কত দ্রুত পার হয়ে গেল এই সাতটা বছর। সেদিনের সেই ঝড়ের রাত থেকে আজ পর্যন্ত এত গুলি বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতে পারেনি। এমন কি মায়ের মৃত্যু থেকে দিদার মৃত্যু পর্যন্ত বছর গুলিকেও মনে হয় সেদিনকার ঘটনা।

সেই ঝড়ের রাতে তমালের কাছে আত্মসমর্পণ করার মুহূর্তেও নারীর সেই সহজাত নিরাপত্তার তাগিদে সে যখন তমালের প্রতিশ্রুতি চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি আমাকে ছেড়ে কোনো দিন চলে যাবে না তো?

তমাল উত্তর দিয়েছিল তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমার সব কিছু আমার। আমি তোমাকে ছেড়ে কোনো দিন কোথাও যাব না।

আট বছরের ব্যবধানেও সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে হয় সেদিনের ঘটনা।

হিসেব করে বসুন্ধরা, কর্ণ যাবার পরের দিনের রাত্রিগুলি কেমন জানি অলস হয়ে পড়েছে। দিনের থেকে রাত্রি যেন প্রতিদিনই লম্বা হয়ে চলেছে। রাত্রি শেষ হলেই কর্ণের আসার দিনের অপেক্ষা একটা দিন কমে যায়। তাই রাত্রিটা শেষ হতে চায় না। বসুন্ধরা বুঝতে পারে বড়োমাও ঘুমের অপেক্ষায় ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে। একটা সময় দুজন দুজনের কাছে ধরা পড়ে যায় যে তারা দুজনেই কালকের দিনটার জন্য অপেক্ষা করছেন।

অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করেন, ঘুমোস নি?

ঘুম আসছে না, বড়মা। তুমি ঘুমোও নি?

ঘুম পাচ্ছে না।

আজকে কত তারিখ বড়মা?

বাইশ, রাত কাটলেই তেইশ হবে। কর্ণের আসার একদিন সময় কমবে।

ঘড়ির কাঁটাটা এগারোটার ঘর ছুঁইয়ে যেতে এত সময় কেন নিচ্ছে ভেবে অস্থির হচ্ছিল বসুন্ধরা। দূরের বাঁকে মনে হল পিয়োন আসছে। পাহাড়ি রাস্তার এই হচ্ছে মুশকিল। এই আছে তো ওই নেই। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে হারিয়ে যায়।

বারান্দা থেকে নেমে এসে রাস্তার উপর দাঁড়ায় বসুন্ধরা পিয়োন আসছে বসুন্ধরাও এগিয়ে যেতে থাকে। বসুন্ধরার মনে হচ্ছিল দুজনের মধ্যে ব্যবধান যেন কিছুতেই কমে আসতে চাইছে না। অবশেষে পিয়োনের হাতে ধরা চিঠিটা বসুন্ধরার দিকে এগিয়ে এল। একটাই চিঠি। হাতে নেওয়ার আগেই খামের উপর চোখ পড়েছিল। কর্ণের চিঠি। খামের গায়ে কর্ণের স্কুলের ছাপানো ঠিকানা।

খামটা হাতে নিয়েই ঠোঁটে ছোঁয়াল বসুন্ধরা। মনে হচ্ছিল এই খামটার গায়ে যেন সে কর্ণের হাতের ঘ্রাণকে স্পষ্ট অনুভব কবতে পারছে। বারান্দাব দিকে এগোতে এগোতে বার বার খাম থেকে কর্ণের ঘ্রাণ নিতে চাইছিল।

বারান্দার কোণে রোদটা তখনও .খলা করছিল। বসুন্ধবা গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিযে চেয়ারটা টেনে নিয়ে রোদের দিকে পিঠ দিয়ে বসল। আজকের দিনটা মনে হচ্ছিল তারই জন্যই হাসছে। খামটা খোলার আগে আরেক বার সেটা নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে কর্ণের স্পর্শকে অনুভব করতে চাইল। তারপর খামটা খুলে কর্ণেব চিঠিটা বের করল। বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে নিভাদিকে বলল, নিভাদি কর্ণের চিঠি এসেছে। বড়মাকে খববটা দিয়ে এস।

[৪৬]

শ্রীচরণেষু মা,

শ্রীচরণেষু ঠাম্মা,

· প্রথমেই তুমি আর ঠাম্মা আমাব প্রণাম নিও। গত রবিবাব আমরা স্কুলের সবাই নালন্দায বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাই আমরা কেউ বাড়িতে চিঠি লিখতে পারিনি। এর জন্য মহারাজ তোমাদের সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আমাদের কোয়ার্টার্লি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। তোমাদের কর্ণ সবার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে। যে সেকেণ্ড হয়েছে তার নাম অর্জুন। তাই সবাই বলছে মহাভারতেব কর্ণ অর্জুনের কাছে হেরে গেলেও আমাদের কর্ণ অর্জুনকে হারিয়ে দিয়েছে। এরকম বিশ্রি কথা শুনলে আমার খুব লজ্জা করে। মরিসন, জর্জ আমার থেকে কম নম্বর পেত বলে তোমরাই তো আমাকে বলেছিলে পড়াশোনায় হারজিত নেই। আমি ওদের একথা বলেছি বলে সবাই ঠাট্টা করে আমাকে ডাকে দাতা কর্ণ। বল মা, বল ঠাম্মা, আমি কি আমাব বন্ধুদের কোনো খারাপ কথা বলেছি?

তোমাদের ছেড়ে থাকতে আমার খুব খারাপ লাগে। তোমাদের উপর খুব রাগ হয়। মনে হয় তোমরা আমাকে একটুকুও ভালোবাস না। আমাকে ছেড়ে তোমরা কী সুন্দর আছ। শুধু চিঠিতেই লেখ আমাকে তোমরা ভালোবাস। ভালোবাসলে তোমরা তোমাদের আদরের কর্ণকে এত দূরে পাঠাতে পারতে?

জান মা, জান ঠাম্মা, আমাদের একটা ভুলু হয়েছে। ভাবছ তোমাদের কর্ণের আবার ভুলু এল কোথা থেকে?

আমাদের হোস্টেল থেকে স্কুলে যাবার পথে একটা বাঁশ বাগান আছে। ওখানে ভুলু পড়েছিল। ওর মা নেই। কেউ নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছে। তোমরাই তো বলতে কোনো মা

ছেলেকে ছেড়ে কোথাও যায় না। ভুলুর মা বেঁচে থাকলে কি আর এভাবে ভুলুকে ছেড়ে চলে যেতে পারত? ভুলু মার দুধের জন্য কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আমি আর সাগর এক সাথে ফিরছিলাম। ভুলুর কথা বলার পর তোমাকে সাগরের কথা বলব। তার আগে তুমি যেমন তোমার বইগুলি মন দিয়ে পড় তেমনি ভুলুর কথাগুলিও মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিও।

ভুলু আমাকে দেখেই কুঁই-কুঁই করতে করতে আমার দুপায়ের ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। জান ঠাম্মা, জান মা, ভুলুর শরীরটা কুচকুচে কালো হলে কি হবে, ওর কপালে চাঁদ মামার মতন সুন্দর সাদা টিপ আছে। গলার নিচের দিকটাও সাদা। মনে হয় কে যেন ওকে একটা সাদা লকেট পরিয়ে দিয়েছে।

ভুলুর খুব খিদে পেয়েছিল। ওকে কোলে তুলে নিতেই ও আমার সোয়েটারের ভিতর দিয়ে ওর মুখটা আমার বুকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কী তুলতুলে ওর শরীর। আমার খুব সুড়সুড়ি লাগছিল। সাগরটা খুব অসভ্য। ও কী বলে জান? ও বলে ভুলু নাকি আমার বুকের দুধ খেতে চাইছিল। কী বোকা বোকা কথা, বল মা? মা ছাড়া কারো বুকের দুধ থাকে?

আমাদের হোস্টেলের কাছে মুজিবর চাচার চায়ের দোকান আছে। আমাকে তুমি কোনো পয়সা দাওনা। মহারাজ বলেন, আমাদের যা লাগবে সুপারকে বললেই দিয়ে দেবেন। ভুলুর জন্য তো আর দুধ চাওয়া যাবে না। তাহলে সব জেনে যাবে। সাগর বলেছিল, মুজিবর চাচার কাছে আমাদের সোয়েটার দুটো বিক্রি করে দিলে টাকা পাওয়া যাবে। আমরা সেই টাকা দিয়ে ভুলুর জন্য দুধ কিনে খাওয়াতে পারব।

জান ঠাম্মা, মুজিবর চাচা খুব ভালো। আমরা এত করে বললাম, মুজিবর চাচা আমাদের কাছে পয়সা নেই। তুমি আমাদের সোয়েটার দুটো কিনে নাও।

মুজিবর চাচা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা পয়সা নিয়ে কী করবে?

আমরা বললাম, পয়সা দিয়ে তোমার কাছ থেকে দুধ কিনে ভুলুকে দুধ খাওয়াব।

মুজিবর কাকা ভেবেছিল, ভুলু বুঝি কোনো লোকের নাম। তাই আমাদের জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের ভুলু কোথায় থাকে? কী করে?

আমরা বললাম, আমাদের ভুলুকে তাড়িয়ে দেবে না তো?

মুজিবর চাচা বলল, না।

আমরা বললাম, ভুলুকে মারবে না তো?

মুজিবর চাচা বলল, না।

ভুলু আমার স্কুল ব্যাগের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে বের করে মুজিবর চাচাকে দেখিয়ে বললাম, এই দেখ আমাদের ভুলু। ওর মা নেই। ও না খেতে পেয়ে খিদেয় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মুজিবর চাচা ভীষণ ভালো। বলেছে, আমাদের সোয়েটার বিক্রি করতে হবে না। মুজিবর চাচা পয়সা না নিয়েই ভুলুকে দুধ খেতে দিয়েছিল। ভুলু চুকচুক করে দুধ খেয়ে আবার আমার কোলে উঠে পড়েছিল।

জান মা, মুজিবর চাচা বলেছে মহারাজ যদি ভুলুকে তাড়িয়ে দেন তবে মুজিবর চাচা ভুলুকে প্রতিদিন দুধ খেতে দেবে।

ভুলু খুব চালাক। ওকে নিয়ে আমার বিছানায় লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিতেই ও একেবারে

চুপ করে শুয়ে পড়েছিল। আমি আর সাগর একটা সুন্দর কায়দা করেছিলাম। আমাদের তো খাবার টেবিলে সবাইকে এক গ্লাস দুধ খেতে হয়। আমরা একটা গ্লাস ঘরের বাইরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। সাগর আর আমি মুখের ভিতর অনেকটা দুধ রেখে বাইরে এসে গ্লাসের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম। সুপার কিছু টের পায় নি। রাত্রি বেলায় ভুলুকে দুধ দিতেই ও সবটা দুধ খেয়ে নিল।

বুঝলে ঠাম্মা, ভুলুকে তো চালাক বললাম, আসলে ও একটু বোকাই। না হলে কি আর রাত্রি বেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে হিসু করে দেয়। তবে আমিও তো ছোটো বেলায় বিছানায় হিসু করতাম। তাই না ঠাম্মা?

আমাদের ঘরে থাকে অশোক। কেন যে ওর নাম অশোক হয়েছিল কে জানে? সম্রাট অশোক প্রাণীদের কত ভালোবাসতেন, তাদের জন্য হাসপাতাল করে দিয়েছিলেন। আর আমাদের ঘরের অশোক কিনা মহারাজের কাছে গিয়ে ভুলুর কথা জানিয়ে দিয়ে এল! এমন কি ভুলু যে আমার বিছানায় হিসু করেছে, আমরা মুখে করে দুধ চুরি করেছি—সব মহারাজকে বলে দিয়েছে। আসলে সাগরটাই বোকা। ও কোনো কথা লুকোতে জানে না। সব বলে দেয়। অশোককেও ভুলুর কথা বলে দিয়েছিল।

মহারাজ আমাকে আর সাগরকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা মুখের ভিতর দুধ চুরি করে নিয়ে গেছ? ঠাম্মা, তুমি আর মা, দুজনেই তো বলেছ মিথ্যে কথা বলতে নেই। তাই বললাম হ্যাঁ।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন দুধ চুরি করেছিলে?

আমি বললাম, ভুলুর ক্ষিধে পেয়েছিল। ওকে খাওয়াব বলে।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ভুলু কোথায়?

আমি বললাম, আমার ঘরে।

মহারাজ বললেন, ওকে নিয়ে এস।

আমি ঘরের দিকে যেতে গেলে মহারাজ নিজের থেকেই বললেন, চল আমিও ভুলুকে দেখতে যাব।

ভুলু আমার লেপের পাশে শুয়েছিল। আমাকে দেখেই ও কুঁই কুঁই করে আমার কোলে উঠতে চাইল।

জান মা, মহারাজ নিজেই ভুলুকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। ভুলু মহারাজকে আদর করে গাল চেটে দিয়েছিল। মহারাজ বললেন, ভুলু আমাদের হোস্টেলে থাকবে। তবে ও আমাদের ঘরে থাকবে না। ওর জন্য মহারাজ সুন্দর ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ওর জন্য দুধ চুরি করতে হবে না। মহারাজই ভুলুকে দুধ খেতে দেবেন।

অশোক এখন বলে বেড়াচ্ছে, ওর জন্যই নাকি ভুলু এত ভালো জায়গা পেয়েছে।

তুমিই বল ঠাম্মা, কর্ণ যদি ভুলুকে এখানে না নিয়ে আসত তবে, অশোক তো ভুলুর কথা জানতই না। মহারাজকে তাহলে কি করে ভুলুর কথা বলত?

মা, তোমাকে এবার সাগরের কথা বলি। তুমি আমার চিঠিটা পড়ছ তো? না বলছ, কর্ণের চিঠি পরে পড়ব। আগে আমার নোট তৈরি করি?

সাগর আমার নতুন বন্ধু। ও খুব ভালো ছেলে। ও নাকি দেখতে আমার মতন। অনেকেই জিজ্ঞাসা করে ও আমার ভাই কিনা। আমি বলি আমার কোনো ভাই নেই। সাগর আমার বন্ধু।

জান মা, সাগরের খুব দুঃখ। ওর মা ওদের বাড়িতে চলে গেছে। সেখানে ওর একটা বোন হয়েছে। ও ওর মাকে আর বোনকে খুব দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর বাবা ওকে নিয়ে যায়নি।

সাগর বলে, কর্ণ তুই আর আমি এক। আমার মা চলে গেছে বাবা আছে, তোর বাবা নেই মা আছে।

আমি সাগরকে বলি, না, তুই আর আমি এক নই। আমার বাবা তো আর তোর মার মতো আমাকে ছেড়ে চলে যায়নি। আমার বাবা সূর্য হয়ে আছে।

আচ্ছা ঠাম্মা কোনো মা কি তার ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারে?

আমি তোমাদের কথা সাগরকে প্রতিদিন বলি। আমাব মা আমাকে কত ভালোবাসে, আমার ঠাম্মা আমাকে কত আদর করে সব কথা আমি বলি। আমি যে রাত্রি বেলায় এক হাত আমাব মার কোলে, আর এক হাত আমার ঠাম্মার কোলে রেখে ঘুমোই তাও ওকে বলেছি। সাগর বলেছে ওরও একটা ঠাম্মা আছে কিন্তু ও ওর ঠাম্মাকে কোনো দিন দেখেনি। ও বলে, ওর বাবা ছোটো বেলায় দুষ্টুমি করেছিল বলে তার ঠাম্মা রাগ করে চলে গেছে। সাগর বলেছে, ও ওর ঠাম্মাকে বলবে, সাগর তো দুষ্টুমি করেনি, তবে তুমি কেন সাগরের কাছে আসবে না?

জান ঠাম্মা, সাগরটা একটা মস্ত বড়ো হাঁদা, ও বলে, কর্ণ তোর তো মা আছে। আমার মা নেই। ঠাকুমাও নেই। তুই তোর ঠাম্মাকে আমায় দিয়ে দে। আমি ঠাম্মার পাশে শুয়ে গল্প শুনব আর তুই অ্যান্টির পাশে শুয়ে ঘুমোবি।

আমি বলেছি আমার ঠাম্মা কি বিস্কুট যে তোকে দিয়ে দেব? ঠিক বলিনি, ঠাম্মা?

কিন্তু ঠাম্মা, সাগরকে যতটা হাঁদা বললাম মনে হচ্ছে ও ততটা হাঁদা নয়। ও বোধ হয় জানে দাতা কর্ণের কথা। তবে ওকে বলিনি, আমি যখন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে আমার বাবা সূর্যকে প্রণাম করি তখন কেউ আমাব কাছে কিছু চাইলে আমি তা দিয়ে দেব। আচ্ছা ঠাম্মা, সাগর তা জেনে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের মতন যদি তোমাকেই চেয়ে বসে তবে তো আমি না করতে পারব না। তোমাকে চুপি চুপি একটা কায়দা শিখিয়ে দি। এই কায়দায় তুমি তোমার দাতা কর্ণকে তার প্রতিজ্ঞা পালন থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারবে। তুমি বলবে আমাদের দাতা কর্ণ যখন তার ঠাম্মাকে দিয়ে দিয়েছে তখন তো সে আর ঠাম্মাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু কর্ণ তার ঠাম্মাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেনি। তাই কর্ণের ঠাম্মাকে নিতে হলে সাগরকেই কর্ণের বাড়িতে আসতে হবে।

মাকে জিজ্ঞাসা করবে তার মাথায় কি এমন কায়দার কথা আসত? মাকে বলে দিও তার কর্ণ কুন্তীর কর্ণের মতন হাঁদা নয়। সে এখন কৃষ্ণের মতন চালাক হয়ে গেছে।

জান মা, এই শনিবার সাগরের বাবা সাগরের সাথে দেখা করতে এসেছিল। সাগর ওর বাবার কাছে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। সাগরের বাবা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। আমার এক দম ভাল লাগেনি। ওরকম হ্যাংলার মতন কেউ তাকিয়ে থাকে নাকি? আমি কি দ্রৌপদী? আমার দিকে এমন ভাবে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকানো কেন বাপু!

সাগর ওর বাবাকে বলেছিল, জান বাবা ওর বাবা সূর্য।

সাগরের বাবা সাগরকে বকে দিয়ে বলেছিল, ছিঃ সাগর ভদ্রতা জান না? সূর্য নয়, বল সূর্য আঙ্কেল।

আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। আমি যতই মার গল্প বলি ততই-ও বাবার গল্প বলবে। বাবা কখনো মার মতো হতে পারে? আমার মা কি কোনো দিন তার কর্ণকে এভাবে তার

বন্ধুদের সামনে বকতে পারত? বলত, উনি তোমার আঙ্কেল হন বাবা। এবার থেকে বলবে সূর্য আঙ্কেল।

আমি তাই বলিনি। সূর্য আবার আঙ্কেল হয় নাকি? সূর্য তো মামা, সূর্যি মামা। আমার বাবা মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার তমাল মিত্র। আমার মা, আমার ঠাম্মা আমাকে এখানে বাবার মতন বড়ো হতে পাঠিয়েছে এসব কথা কিছুই বলিনি। তোমরাই তো বলে দিয়েছিলে এসব কাউকে বলতে নেই। লোকে বলবে ছেলেটা বড্ড অহংকারী। তোমাদের কর্ণ তোমাদের কথা কেমন মনে রেখেছে বল?

জান মা, সাগরের বাবা সাগরের জন্য একটা খুব সুন্দর মিনি টকিং কমপিউটার এনে দিয়েছে। সেটা আমাদের সাথে হ্যালো গুডমর্নিং বলে কথা বলে। আমাদের ম্যাথসের অনেক প্রবলেম বলে দেয়।

সাগরের বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার এটা ভালো লেগেছে কর্ণ?

কারো জিনিসকে খারাপ বলা উচিত নয়। ওটা সত্যিই তো সুন্দর। তোমরা আবার মনে করে বসো না, তোমাদের কর্ণ লোভী হয়ে পড়েছে। আমি তাই বলেছি, খুব সুন্দর হয়েছে। আমার খুব ভালো লেগেছে।

সাগরের বাবা বলেছে, আমি দিল্লিতে গিয়েই তোমার জন্য এরকম একটা কমপিউটার পাঠিয়ে দেব।

এরকম একটা সুন্দর কমপিউটার নিতে কার না ইচ্ছে করে বল? জান ঠাম্মা, আমি না প্রায় হ্যাঁ করে ফেলেছিলাম। তখনই মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের কথা। মা বলেছিল, ঠাকুর মা কালীর কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কালী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি টাকার বদলে ভক্তি চেয়েছিলেন।

আমারও কমপিউটারটা চাইতে গিয়ে মার কথাই মনে পড়ে গেল। আমি তাই সাগরের বাবাকে বললাম, আমি কমপিউটারের বদলে আপনার ভালোবাসা চাই। আমার মা, আমার ঠাম্মা বলে দিয়েছে কারো কাছ থেকে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নিতে নেই।

জান মা, সাগরের বাবা আমাকে তার কোলে তুলে নিয়ে আমার কপালে চুমু খেয়ে বলেছে, এবার তোমার স্কুলে ছুটি হলে তোমার মা, ঠাকুমা যখন তোমাকে নিতে আসবেন তখন তাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিও।

সাগরের বাবার কথাগুলি ভালো লেগেছে। কিন্তু ওই আদরটা একদম ভালো লাগেনি। এ আবার কিরকম অসভ্যতা বল মা? এত বড়ো ছেলেকে এরকম ভাবে কি কেউ কোলে তুলে চুমু খায়? আর তোমাদের ছেলে তো সাধারণ ছেলে নয়। সে কর্ণ। মা আর ঠাম্মা ছাড়া কারো কোলে উঠতে চায় না। কারো চুমুও পছন্দ করে না।

ঠাম্মা, তোমাদের কথা মনে পড়লে আমার আর কিছু ভালো লাগে না। রাত্রিবেলায় মনে হয় তুমি আর মা আমার পাশে শুয়ে আছ। খালি ভাবি এবার তুমি আমাকে গল্প বলবে। আমি তোমার কোলে আমার পাটা তুলে ঘুমিয়ে পড়ব আর সকালে উঠে দেখব মার কোলে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে আছি। ঘুম হতে চায় না। চোখ বুজলেই যে তোমাদের দেখতে পাই।

মা, আমি বড়ো হব। ঠাম্মা বলেছে আমাকে বাবার মতন বড়ো হতে হবে। এই স্কুলে সবাই ভালো। মহারাজ ভালো। ভুলু ভালো। বন্ধুরা ভালো। সাগর আমার বন্ধু। তবু তোমাদের ছেড়ে থাকতে একদম ভালো লাগে না। মরিসন আর জর্জকে বলবে ওদের কথাও আমার খুব মনে পড়ে। আমি বড়ো হবে বলেই তোমাদের ছেড়ে থাকার এত কষ্ট সহ্য করে চলেছি।

তুমি আমাকে খুব বড়ো করে চিঠি লিখবে। এত বড় যে আমার যেন সারা দিন পড়তে লেগে যায়।

আমাদের স্কুল ছুটি হতে এখান তেত্রিশ দিন বাকি আছে। আমি নিজে হাতে একটা ক্যালেন্ডার বানিয়েছি। সেখানে প্রতিদিন দাগ কেটে রাখছি। তোমাদের আসতে আর কতদিন বাকি আছে।

আমার জন্য চিন্তা করবে না। তোমরা আমার প্রণাম নিও। নিভামাসীকে আমার ভালোবাসা জানিও।

তোমাদের কর্ণ।

চিঠিটা কতবার পড়েছে বসুন্ধরা নিজেই জানে না। যতবারই পড়েছে ততবারই মনে হয়েছে এবারই বুঝি চিঠিটা প্রথম পড়ল। কর্ণের চিঠির প্রতিটি অক্ষর চোখ বুজে বলে দিতে পারলেও মনে হচ্ছিল চিঠিটা আবার পড়ি। চোখের জলের ফোঁটায় অনেক অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে গেলেও পড়ার এই তৃষ্ণা যেন তার কাছে অতৃপ্ত পিপাসা নিয়েই বার বার হাজির হচ্ছিল।

কর্ণের চিঠিটা এবার আমাকে দে।

অমিয়া দেবী যে কখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি বসুন্ধরা।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর কথায় চমকে উঠে বলল, তুমি কখন এলে বড়োমা?

অমিয়া দেবী বললেন, অনেকক্ষণ। তোর হাতে ধরা চিঠিটা আমি তোর মতোই অনেক বার পড়ে ফেলেছি। কিন্তু দাদু ভাইয়ের চিঠিটা নিজের হাতে না পড়লে সেটা পড়েছি বলে মনে হয় না।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর হাতে কর্ণের চিঠিটা তুলে দিয়ে বলেছিল, বড়োমা আমার যে খুব ভয় করছে।

অমিয়া দেবী বসুন্ধরার মাথাটা নিজের বুকে টেনে এনে বললেন, কিসের ভয়। কর্ণকে নিয়ে আর আমাদের ভয় নেই।

কিন্তু বড়োমা, এই টুকু ছেলে সবার কাছেই যে ভাবে চলে যায় কেউ আবার ওকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে না তো?

পাগলি মেয়ে, অমিয়া দেবী বসুন্ধরার কপালে একটা স্নেহের চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, প্রথম প্রথম আমারও এমন ভয় হত। কর্ণের চিঠি পড়ে আমার সে ভয় কেটে গেছে। কোনো অভিশাপই আমাদের কর্ণের বিজয় রথের চাকাকে গ্রাস করতে পারবে না।

[৪৭]

এক মাস আগে থাকতে রেলের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। শিলঙ-এর জন্য পৃথক কোটা থাকে। এবার তিনটে সিট রিজার্ভেশন করে রেখেছিলেন অমিয়া দেবী। নিভাদি নিজের থেকেই বলেছিল, দাদু ভাইকে আনতে এবার আমিও যাব। এই ফাঁকা বাড়িতে তোমাদের আসার দিন গুনে অপেক্ষা করতে পারব না।

অমিয়া দেবী এক কথায় রাজি হয়ে বলেছিলেন, তোকে আমার নিজের থেকেই যেতে বলা উচিত ছিল। আসলে তুই যে কোথাও যেতে চাস না নিভাদি। যতবার তোকে বলেছি, চল আমাদের সঙ্গে ততবার তুই বলেছিস বাইরে যেতে তোর ভালো লাগে না। তুই যে কর্ণকে কত ভালোবাসিস তা কি আমি জানি না।

বসুন্ধরা শুনে নিভাদিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুই তাহলে সত্যি যাবি নিভাদি? আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, কি বলব।

এক মাস আগে থাকতেই গোছানো শুরু হয়ে ছিল নিভাদির। নিজে চলে গিয়েছিল বাজারে। বড়বড় ছটা নারকেল কিনে এনেছিল।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেছিল, এতগুলি নারকেল এনে কী করবি নিভাদি?

অন্য সময় হলে এই জিজ্ঞাসাটাকেই তার কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছে মনে করে এই বাড়িতে যে তার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই সেই দুঃখের কথা পাক্কা দুঘন্টা ধরে বলে যেত। কিন্তু আজকে নিভাদির মেজাজই ভিন্ন।

বসুন্ধরার প্রশ্নের জবাবে একটা সরল হাসিব রেখা মুখে ফুটিয়ে বলল, ছেলেটাকে শুধু পেটেই ধরেছিস। ওব কি খেতে ভালো লাগে তাব তো আর খোঁজ রাখিস না।

আচ্ছা নিভাদি, তুই আমাকে এত বকিস কেন রে? বসুন্ধরা কাঁদো-কাঁদো ভঙ্গি করে জিজ্ঞাসা করে।

আজকের নিভাদির কাছে সব মাপ। সে হেসে বলে, ধিঙ্গি মেয়ের শখ দেখনা। উনি ভাবেন উনাকে এখনো আমি আদর করব।

হাসিতে মুখটা ভরিয়ে নিভাদি প্রসঙ্গ পালটায় বলে, দাদু ভাই নারকেলের নাড়ু খেতে কী ভালোবাসে বলত! তোর মনে নেই, ও আমাকে বলত মাসি আমাকে স্কুলে যাবাব সময নাবকেলের নাড়ু দিয়ে দিও। ছেলে তো আমার একা খেতে জানে না। সবাইকে দিয়ে খেতে হবে। আমি ঠোঙা বোঝাই করে নাবকেলের নাড়ু দিয়ে দিতাম। রাতদিন বইতে মুখ গুঁজে থাকিস। এগুলি জানবি কি করে?

নিভাদি আবার নিভাদিতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে দেখে বসুন্ধরা তাড়াতাড়ি নিভাদির কাছে চলে এসে বলে, আসলে তোর এত পরিশ্রম হবে বলে ভাবছিলাম, তা না হলে কি আমি জানি না, কর্ণ তোর হাতের নাড়ু খেতে কত ভালোবাসে।

এই কথাটিই যে নিভাদির কথাব বারুদে অগ্নি সংযোগ করবে তা বসুন্ধরা বুঝতে পারে নি।

নিভাদির কথাব তুবড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওমা, মেয়ের কথা শোন। দুধের ছেলেটা হাজার হাজার মাইল দূরে কোণে মাঠে পড়ে আছে। কেউ খেতে দিচ্ছে কিনা ঠিক নেই। সাবা রাত মশারি ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়ছে। মা মাসি করে কেঁদে-কেঁদে মরছে। কেউ দেখার নেই। তার জন্য কটা নাড়ু বানাব তাতে নাকি আমার পরিশ্রম হবে। বড়ো বড়ো পুঁথি পড়লে এরকমই হয়। ধন্যি মা বটে তুই। ছেলেটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলি। তাব জন্য দুটো নাড়ু করতে পর্যন্ত আলসেমি।

বসুন্ধরা পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বড়োমার পাশে ধপ করে বসে বলে, বড়োমা কথার ঝড়ে ওই ঘরের সব লণ্ড ভণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

অমিয়া দেবী বলেন, খুঁচিয়ে যখন ফেলেছিস তখন ওকে সামলায় কার এত ক্ষমতা! তার থেকে চুপি চুপি ঘর থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আয়। এই ফাঁকে চল কর্ণের জন্য জিনিস গুলি কিনে নিয়ে আসি। ফাঁকা বাড়িতে ঝড় এক সময় ক্লান্ত হয়ে যাবে।

পা টিপে টিপে যে ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে ভাবেই ঘরের ভিতর ঢুকেছিল বসুন্ধরা। নারকোল কোরানোর সঙ্গে সঙ্গে নিভাদির কথার ঝড় বয়ে চলেছে। বসুন্ধরা সাবধানে টেবিলের উপর থেকে পার্সটা নিয়ে আসতেই দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

আজকেই চিঠি এসেছে কর্ণের। কর্ণ লিখেছে, তোমাদের আসার আর সাত দিন বাকি আছে। মনে হচ্ছে এই সাত দিন আব শেষ হবে না। তোমরা আসার সময় সাগরের জন্য লাল চাদর আর একটা কোট নিয়ে আসবে। ও আর আমি এখন পাশাপাশি বিছানায় থাকি। সবাই বলে আমার, দুজন ভাই।

আমরা যখন খাই তখন ভুলুকেও খেতে দেওযা হয়। ও দুধ খায়, তবে মাংস খেতে বেশি ভালোবাসে। আমি আর সাগর মুখের ভিতর মাংস বেখে দি। মুখ ধুতে যাবার সময় মুখ থেকে বেব করে ভুলুকে খেতে দি। সাগব আব আগের মতন এসব কথা অশোককে বলে দেয না।

ভুলু আমাদেব সাথে সাথে স্কুল পর্যন্ত যায। ওখানে একটা কোণে চুপটি করে বসে থাকে। তখন ওকে কেউ দেখতে পায না। আমি আব সাগব যখন টিফিনেব সময় ঐ জাযগাতে আসি তখন ও বেবিয়ে আসে। আমাদের সাথে ও টিফিন খায। আবার লুকিয়ে পড়ে। যখন স্কুল থেকে ফিবি তখন ও কোথা থেকে ছুটে আসে। এখন সবাই ভুলুকে ভালোবাসে। এমন কি অশোকও ভুলুব সাথে ভাব করতে আসে।

স্কুল ছুটি হলে আমি তোমাব কাছে চলে আসব। তখন ভুলুর কি হবে ভাবলে আমার কান্না পায। মুজিবব চাচা বলেছে ভুলুকে খেতে দেবে। কিন্তু আমাদেব স্কুল ছুটি হয়ে গেলে মুজিবব চাচাও দেশে চলে যায়। তখন ভুলুকে কে খেতে দেবে মা?

আমাদেব হোস্টেলে রামদীন চাচা স্কুল ছুটি হলেও থাকে। বামদীন চাচা আমাদের হোস্টেলেব দাদাদেব কাছ থেকে চুপি চুপি পয়সা নেয। সাগর বলেছে, ও ওর বাবাকে বলবে বামদীন চাচাকে টাকা দিতে। তাহলে বামদীন চাচা ভুলুকে খেতে দেবে। তোমরাও ভুলুব জন্য রামদীন চাচাকে টাকা দিয়ে যেও।

অমিয়া দেবী খুব ভালো চাদর আর একটা কোট কিনে বললেন, দাদু ভাই ওর বন্ধুকে উপহাব দেবে। ভালো জিনিসটাই কিনলাম। বন্ধুর বাড়ির লোকেরা বলবে কর্ণ ওর বন্ধুকে সত্যিকারের ভালো জিনিসই দিয়েছে।

বসুন্ধরা হেসে বলেছিল, তুমি কি কর্ণের বিজ্ঞাপন দিতে চাইছ বড়োমা?

লজ্জা পেলেন অমিয়া দেবী। বলেন, এমন করে বলিস না। আসলে আমি বলতে চাইছি কর্ণ যখন তার প্রাণের বন্ধুকে একটা উপহার দিতে চাইছে তখন ভালো জিনিসই দিক।

বাড়িতে ফিরেই অমিয়া দেবী নিভাদির হাতে প্যাকেট দুটো তুলে দিয়ে বললেন, নিভাদি দেখ তো কর্ণের বন্ধুর জন্য কিনলাম, কেমন হয়েছে?

নিভাদি প্যাকেটটা খুলে চাদর আর কোটটা দেখে বলল, তা দাদু ভাইয়েরটা কোথায়?

অমিয়া দেবী ভেবেছিলেন নিভাদির মেজাজের আগুনের উপর জল ঢালবেন। দেখলেন সেই জলই আগুন হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন।

দাদু ভাই তো এখানেই আসছে। ওরটা ও পছন্দ করে কিনে নেবে।

নিভাদির স্বরযন্ত্র তখন চালু হয়ে গেছে।

দুজনে মিলে চাকরি করিস। সাতটা না পাঁচটা একটা মাত্র ছেলে সারা বাড়িতে। তাও তোদের এত হিসাব। টাকায় তোদের ছাতা পড়বে। কি হতো দাদু ভাইয়ের জন্যও আরেকটা নিলে? দুধের ছেলেটা দেখবে তোরা তার বন্ধুর জন্য এত কিছু নিয়ে যাচ্ছিস, আর তার জন্য শূন্য।

অভিজ্ঞ দমকল কর্মীর মতন অমিয়া দেবী আগুন নিভাতে চেয়ে বললেন, তোকে যে

রাগাবার জন্য কথাটা বললাম তুই তো বুঝলি না। আসলে এ দুটো তোর পছন্দ কি না তাই দেখাতে নিয়ে এলাম। তোর পছন্দ হলেই আরো দুটো নেব। দাদু ভাইকে বাদ দিয়ে শুধু ওর বন্ধুর জন্য নেব একথা তুই বিশ্বাস করলি কী ভাবে?

নিভাদির সারা মুখ খুশির হাসিতে ভরে গিয়েছিল। বলল, তাই বল, তোকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। তুই যে এমন ভুল করতে পারিস না তা তো আমি জানি।

রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে অমিয়া দেবী বলছিলেন, আর দুটো রাত্রি। তার পরেই গাড়িতে, সেখানেও দু রাত্রি। চারদিন পরেই দাদু ভাইয়ের মুখটা দেখতে পাব। কত রোগা হয়েছে কে জানে?

বসুন্ধরা বলে, তাড়াতাড়ি ঘুমোলে তাড়াতাড়ি রাতগুলি কেটে যাবে। চল ঘুমোতে চেষ্টা করি।

বসুন্ধরা, তার কথার উত্তরে একটা গোঙানীর আওয়াজ পেযে পাশ ফিরে ডাকল, বড়োমা।

সেই একই গোঙানির আওয়াজ, বেড সুইচটা অন করে বসুন্ধরা উঠে বসে অমিয়া দেবীর মুখের দিকে তাকাল।

অমিয়া দেবীর চোখ দুটি বোজা। সারা মুখে ব্যথার চিহ্ন স্পষ্ট।

বড়োমা।

সাড়া পেল না বসুন্ধরা।

নিভাদি তাড়াতাড়ি আয়, বড়োমা অজ্ঞান হয়ে গেছে। বসুন্ধরার চীৎকারে নিভাদির ঘুম ভাঙতে সময় নেয় নি। নিভাদি আসার সাথে সাথেই বসুন্ধরা বলল, তুই বড়োমার কাছে বস, নিভাদি। আমি ডাক্তার আঙ্কেলের কাছে খবর পাঠিয়ে আসছি।

ডাক্তার কার্সলন খবর পেয়েই চলে এসেছিলেন। তবে একা আসেননি। আসার পথে তুলে নিয়ে এসেছিলে হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ চক্রবর্তীকে।

ডাক্তার চক্রবর্তী দেখেই বললেন, স্ট্রোক। তবে কতটা ড্যামেজ হয়েছে ই. সি. জি. রিপোর্ট না দেখলে বোঝা যাবে না। উনাকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে।

কার্সলন বললেন, মিসেস মিত্রকে আমার ওখানে ভর্তি করে নিচ্ছি। আপনাকে আমার ওখানেই আজ রাতটা কাটাতে হবে।

ধাক্কাটা খুব মারাত্মক না হলেও একেবারে শান্ত ধাক্কা নয়।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, তোমার শাশুড়ি এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন বললেও বিপদ কেটে গেছে বলা যায় না। তবে এখন নার্সিং হোমে একে বারে বেডরেস্ট-এ থাকতে হবে। কোনো রকম টেনশন চলবে না। মনে রাখবেন, উনি এখন নানা নিয়মের বন্দি হয়ে থাকবেন।

পরের দিন সকাল বেলাতে জ্ঞান ফিরে এসেছিল অমিয়া দেবীর। নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে থাকতে দেখে অমিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কী হয়েছে? আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কেন?

বসুন্ধরার পাশে ডাঃ কার্সলন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিই সেই পরিচিত হাসি মুখে বললেন, আপনি যে বিশাল হৃদয়ের অধিশ্বরী তা প্রমাণ করার জন্য কাল রাতে আপনার হৃদয় একটু হৃদয়হীনতার কাজ করতে চেয়েছিল। আমরা তা হতে দিই নি। তার জন্য অবশ্য আপনাকে কয়েকটা দিন আমার বাড়িতে আপনাকে শান্ত মেয়ের মতন অতিথি হয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু কর্মা? ওকে আনতে তো আমাকে কালকেই রওনা দিতে হবে। উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসতে চেয়েছিলেন অমিয়া দেবী।

ডাঃ কার্সলন তাকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, একে বারে নড়াচড়া করা চলবে না মাদার-ইন-ল। গ্র্যান্ড-সন কে আপনার ডটার-ইন-ল নিয়ে আসবে। আপনার কোনো চিন্তা নেই।

বসুন্ধরাকে ডাঃ কার্সলন বললেন, তোমার ছেলেকে তো তোমাদের ছাড়া আর কারো হাতে ওরা দেবে না।

বসুন্ধরা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। কোনো মতে কান্না চেপে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়েছিল যে, কার্সলনের কথা ঠিক।

ডাক্তার বসুন্ধরার মাথায় হাত বেখে বললেন, তুমি এত ভেঙে পড়েছ কেন মাই চাইল্ড? ডাঃ চক্রবর্তীর সাথে আমার কথা হয়েছে। উনি বলেছেন অল্পের উপর দিয়েই বিপদটা কেটে গেছে। ঠিক সময়ে তুমি খববটা দিয়েছ বলে উনি এবারের মতন রক্ষা পেয়ে গেলেন। তবে অনেক দিন বেড-বেস্টে থাকতে হবে।

বসুন্ধরা বলল, আমি কী কবব ডাক্তার আঙ্কেল?

ডাক্তার কার্সলন বললেন, আমি তো আছি, তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমার মাদার ইন-ল-এব দায়িত্ব আমার। তুমি নিশ্চিন্তে তোমার ছেলেকে আনতে চলে যাও।

বসুন্ধরা বলল, বড়োমাব কিছু হবে না তো ডাক্তার আঙ্কেল? বড়োমা ছাড়া আমার যে আব কেউ নেই আঙ্কেল।

ডাক্তার বললেন, তোমার প্রভু আছেন, তোমার ছেলে আছে আমবা আছি। আমি ডাক্তার, আমি বলছি তুমি শক্ত থাকলে তোমার মাদার-ইন-ল সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারবেন। আর তুমি যদি ভেঙে পড় তবে উনি ভাববেন উনার এমন অসুখ করেছে যে উনি আর ভালো হবেন না। এটাই হবে উনার সবচেয়ে বিপদের কারণ। এবার তুমি ঠিক কর তুমি কী করবে?

বসুন্ধরা বলল, ডাক্তার আঙ্কেল, আমি শক্ত হব। আপনি যখন বড়োমার দায়িত্ব নিয়েছেন তখন আবার আমার ভয় কী? আমি আমাব ছেলেকে নিয়ে আসতে যাব।

ডাক্তার বললেন, তোমার সাথে আমি কাউকে দিয়ে দিতে পারি। এতে তোমার ভয়টা থেকেই যাবে। একা চলার অভ্যাস কোনো দিনই হবে না। মনে রেখো ভয় এমন একটা জিনিস, ভয় পেলেই সে চেপে বসে। একবার সাহস করে একা বেরিয়ে পড় দেখবে আর একা বেরোতে ভয় করবে না।

বসুন্ধরা অমিয়া দেবীর মাথার কাছে বসে বলল, বড়োমা, আমি কর্ণকে নিয়ে আসব। তুমি একদম চিন্তা কববে না।

অমিয়া দেবী বললেন, এতটা পথ তুই কি করে একা যাবি মা? নিভাদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।

বসুন্ধবা বলল, আমি তো তোমার মেয়ে। তুমি তোমার মেয়ের উপর ভরসা করে দেখ, আমি কর্ণকে তোমার কাছে নিয়ে আসব। নিভাদি এখন তোমার কাছে থাক।

ঠিক আছে মা। সাবধানে যাস। ছেলেটা পথ চেয়ে বসে থাকবে।

অমিয়া দেবীর কথায় একটা অসহায় আত্মসমর্পনের ভঙ্গি ফুটে উঠেছিল।

[৪৮]

বসুন্ধরা খোঁজ করেছিল গৌহাটি থেকে প্লেনে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না। যা খোঁজ পেল তাতে ট্রেনে করেই আগে চলে যেতে পারবে।

মালদা পর্যন্ত তিনসুকিয়া মেল খুব ভালোই এল। এভাবে চললে রাইট টাইমেই পাটনা পৌঁছে যেতে পারবে। সেখান থেকে বাসে করে দেওঘরে পৌঁছে কর্ণকে নিয়ে ডাউন তিনসুকিয়া মেলে সেদিনই রওনা দিতে পারবে।

ফারাক্কা পার হতেই ট্রেনটা যেন গোরুর গাড়ির সাথে পাল্লা দিতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়েই থেমে যায়। সামনের কোথায় মাল গাড়ি উল্টে গেছে, তাই এ লাইনের সমস্ত ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। পাটনা স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাল প্রায় দশ ঘন্টা লেটে।

জীবনের হিসেব যে কত দ্রুত পাল্টায় তা বোঝার চেষ্টা করে বসুন্ধরা। এন. জি. পি. স্টেশনে ট্রেনটা এসেছিল রাত্রি বেলায়। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন নাম শুনে স্টেশনে নেমেছিল। এই নামটা তার স্মৃতির কোঠায় এখনও নাড়া দেয়। আবছা স্মৃতির পর্দায় দেখতে পায় সে ভোরবেলায় মার হাত ধরে ট্রেন থেকে নামছে। সেই সাথে আরেকটা মানুষ, যার চেহারাটা এখনও মাঝে মাঝে এক বীভৎস রাক্ষসের মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়। সে তার বাবা।

এই এন. জি. পি. স্টেশনে নেমেই রিক্সা করে যেত শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে বাসে চড়ে তাদের বাগান। সেদিনকার সেই এন. জি. পি. কে সে মনে করতে পারে না। চোখ বুজে মায়ের হাত ধরে ট্রেন থেকে নামার দৃশ্যটা যতবারই কল্পনা করতে চাইছিল ততবারই সেই মানুষটা তার রাক্ষুসে মূর্তি নিয়ে তার কল্পনার ছবিতে মাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। সারা শরীরে কেমন একটা ছমছমে আতঙ্কের শিহরণ অনুভব করেছিল বসুন্ধরা। ভয় পেয়েছিল, পাছে সেই বীভৎস মানুষটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, কিরে চিনতে পারছিস না? আমি তোর বাবা।

ভাবনাটা মনের কোণে উঁকি দিতেই বসুন্ধরা তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে পড়েছিল। লেডিস কুপের লোয়ার বার্থ পেয়েছিল। আপার বার্থে ছিল বাচ্চা সহ একজন নেপালি বউ। তার স্বামী সি. আর. পি. এফে. চাকরি করে। একাই যাচ্ছে। পাটনা স্টেশনে ওর স্বামী অপেক্ষা করবে। বসুন্ধরা নেপালি বৌটাকে নিজে থেকেই লোয়ার বার্থটা ছেড়ে দিয়েছিল।

কুপে ঢুকে দেখল বৌটা তার ছেলেকে বুকের দুধ দিচ্ছে। তাকে দেখে লজ্জার একটা হাসি তার মুখে ফুটে উঠেছিল। ও উঠতে যেতেই তাকে ইশারায় শুয়ে থাকতে বলে বসুন্ধরা আপার বার্থে উঠে গেল।

ঘুম আসছিল না। চোখ বুজলেই ভেসে উঠছিল বড়োমার মুখটাকে। বড়োমার যদি কিছু হয় এই ভাবনা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদু আর বড়োমা, এই তো ছিল তার জীবনের বৃত্ত। দিদু নেই, বড়োমাই তাকে বট গাছের ছায়ার মতন তার উপর তার দুটো হাত প্রসারিত করে রেখেছে। বড়োমা নার্সিং হোমে। তাকে একা রেখে সে শুয়ে আছে এন. জি. পি. স্টেশনে দাঁড়ানো তিনসুকিয়া মেলের এই আপার বার্থে। আসার সময় বড়োমাকে দেখতে গিয়েছিল।

অমিয়া দেবী ঘুমের ওষুধে ঘুমিয়ে ছিলেন। তবু বসুন্ধরার মৃদু পায়ের শব্দ টের পেয়েছিলেন। বসুন্ধরার মাথাটা নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বলেছিলেন, খুব সাবধানে যাস। আমার জন্য চিন্তা করবি না। দাদু ভাই আসছে। এই আনন্দেই আমি ভালো হয়ে যাব। দাদু ভাইকে কিন্তু বলবি না আমার অসুখের কথা। বলবি, দাদুভাই আসছে তাই তার ঠাম্মা ঘর সাজিয়ে রাখবে বলে আসেনি।

বসুন্ধরা চলে আসার সময় অমিয়া দেবী আবার হাতের ইশারায় কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সাগরের জিনিসগুলি নিয়েছিস তো?

—নিয়েছি বড়োমা, তুমি চিন্তা করো না। কর্ণ এলেই তুমি ওর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে যাবে।

বসুন্ধরা আর কথা বলতে পারেনি। দরজার বাইরে এসে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল।

ট্রেনটা আবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল। নিচের বার্থের বৌটা ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। লাইটের সুইচটা অফ্ করে দিতেই অন্ধকার নেমে এল। এখন শুধু ট্রেনের সেই চলরে চল—একটানা ধাতব শব্দ।

নার্সিং হোমে পর পর দু-রাত্রি এক বারের জন্যও চোখের পাতা দুটিকে এক জায়গায় আনেনি বসুন্ধরা। ট্রেনের দোলানীতে দু চোখে ভর দিয়ে নেমে এসেছিল তন্দ্রা। সেই তন্দ্রার বাজত্বে হাজির হয়েছিল তমাল। তার জীবনের ভয়ঙ্কব শত্রু অথচ মন থেকে তাকে হত্যা করতে পারছে না।

তমাল পাটনা স্টেশনে দাঁড়িযে আছে। তাকে দেখেই এগিয়ে এসে বলল, এই যে বসুন্ধরা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।

—আমি আপনাকে চিনি না।

—ভালো করে তাকিযে দেখ. বসুন্ধবা আমি তমাল।

—চিনতে পারছি না। চিনতেও চাই না।

বিদ্রূপেব হাসি তমালের মুখে। না চিনলে চলবে কি করে বসুন্ধরা? তোমার সারা শরীরেই যে আমি আমার চিহ্ন এঁকে রেখেছি। ভেব দেখ সেই ঝড়ের রাতের কথা। তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত প্রতিটি বিন্দুতে যখন আমার স্পর্শের চিহ্নগুলিকে এঁকে দিয়ে চলেছিলাম সেই মুহূর্তেব কথা মনে কব। আমার কথা মনে পড়বে। আমাকে চিনতে পারবে।

—তুমি দস্যু। তুমি ডাকাত। তোমার কথা আমি ভুলে যেতে চাই।

—তুমি সত্যি কথা বলছ না বসুন্ধবা। তুমি যখন স্নানের ঘরে নিজেকে উন্মুক্ত করে স্নান কর তখন তোমার শরীরের সেই বিন্দুগুলিতে হাত পড়লে তুমি কি সেই রাতের ঘটনা রোমন্থন করে রোমাঞ্চ অনুভব কর না?

—না, সেদিন এক দস্যু আমার শরীরের এত দিনের গচ্ছিত সম্পদকে লুঠ করেছিল।

—তুমিই তো তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলে।

—মিথ্যে কথা।

—মিথ্যেই যদি হয় তবে সেই দস্যু যদি আমি না হয়ে অন্য কেউ হতো তবে তাকেও কি তুমি এভাবে তোমার সব সম্পদ লুঠ হতে দেখেও বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করতে?

—কে বলেছে আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম? সেই দস্যুতারপাশবিক শক্তিতে আমাকে লুঠ করেছিল।

—তুমি সত্যি কথা বলছ না বসুন্ধরা। মনে করে দেখ, সেই দস্যু অস্থির ছিল সন্দেহ নেই, তবে তুমি নিজের হাতে তোমার সায়ার গিঁট খুলে দিয়েছিলে।

তোমাকে সেদিন বিশ্বাস করেছিলাম। তুমি বিশ্বাসঘাতক। তোমাকে ঘৃণা করি।

যাকে তুমি এত ঘৃণা কর, তার আমানতকে তুমি নিজের কাছে রেখে দিতে পার না। তাকে ফিরিয়ে দাও।

তোমার কোনো কিছুই আমার কাছে নেই।

আমার সবচেয়ে বড় সম্পদই তোমার কাছে গচ্ছিত আছে। আমার ছেলে আমার পরিচয়।

ও আমার ছেলে, শুধু আমার ছেলে।

সমাজ তোমার কথা মানবে না। দেশের আইন তোমার কথা শুনবে না। আমি বাবা, সন্তানের উপর অধিকার আমার—এটাই সমাজের বিধান এটাই আইনের অনুশাসন।

কর্ণ যে তোমার ছেলে তার প্রমাণ নেই।

আছে। আর সেই প্রমাণ তুমি ইচ্ছে করেই সর্বত্র রেখে চলেছ।

মিথ্যে কথা।

কর্ণের বার্থ সার্টিফিকেটে কর্ণের বাবার নাম লিখেছ তমাল মিত্র। স্কুলের খাতায় ওর বাবার নাম লিখেছ তমাল মিত্র। আদালত যখন জিজ্ঞাসা করবে এই তমাল মিত্রকে যখন চেনেন না তখন কর্ণের পিতা তমাল মিত্র কে? জবাব দিতে পারবে?

তোমার কাছে তো আমি আর কিছু চাইনি। শুধু তোমার নামটা ধার চেয়েছি।

তুমি আমার জীবন থেকে আরো একটা মহা মূল্যবান সম্পদ চুরি করেছ?

তুমি আর কি সম্পদের কথা বলছ?

আমার মা।

বড়োমা?

হ্যাঁ, আমার মা তোমার জন্যই আমাকে এত তীব্র ঘৃণা করে মনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি বড়োমাকে তোমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিনি।

সব কথা তো বলতে হয় না, বসুন্ধরা। বুঝতে হয়। এই যে কর্ণ তোমার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, তুমি কি কখনও ভেবেছ অমিয়া দেবীর পুত্র তমালও তার মায়ের কাছে যাবার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে? তোমার কর্ণ যদি কোনো অন্যায় করে ফেলে তুমি কি তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে?

ওগো তুমি এমন কথা মুখে এনো না। কর্ণ সম্পর্কে এমন কথা বলবে না।

ভেবে দেখো আমার মাও তো আমার সম্পর্কেও এমনি ভালোবাসা তার মনের মধ্যে রেখে দিয়েছে। তার জন্যই তার নাতিকে নিয়ে সবাইকে ছেড়ে এমন নির্জন জায়গায় চলে গেছে। যাতে কেউ আমার ছেলেকে দেখিয়ে আমার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না করতে পারে। আসলে আমার মা আমাকে ভালোবাসে বলেই তো সবার প্রশ্নবানের আক্রমণ থেকে আমায় বাঁচাতে এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের যন্ত্রণাকে বেছে নিয়েছে।

—কিন্তু এর মধ্যে আমার কী ভূমিকা আছে?

—তুমিই তো মা ও ছেলের মধ্যে প্রাচীর হয়ে আছ।

—তোমার এই অভিযোগ ঠিক নয়।

—তুমি চাওনা মা ও ছেলের মধ্যে মিল ঘটুক। যদি চাইতে তবে আমার মার এত বড় অসুখের খবর তুমি আমাকে জানাতে।

—আমি তোমার ঠিকানা জানি না।

—আমার মামার বাড়ির ঠিকানা জান না?

—জানি।

—সেখানে জানাতে পারতে।

—বড়োমা জানাতে বলেন নি।

—মার মৃত্যুর পর মুখাগ্নি কে করে?

—ছেলে?

—আমার মার মৃত্যু হলে তুমি কি আমায় মার চিতায় অগ্নি সংযোগের সুযোগ দিতে মৃত্যু-সংবাদ দিতে না?

—দিতাম।

আমার মার স্ট্রোক হয়েছে। যে কোনো সময় মারা যেতে পারেন। তার মৃত্যু হলে যে খরবটা তুমি দেবে বলে জানালে মৃত্যুর আগে সে খবর পেলে ছেলে তার মার কাছে তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইবার সুযোগ পেত। তুমি এই কয়মাসের মধ্যেই তোমার ছেলেকে না দেখতে পেয়ে পাগলের মতন ছুটে যাচ্ছ। কই একবারও ভাবলে না আমার মা একা ওই নির্জন জায়গায় পড়ে আছে।

আমার ছেলে যে একদম ছোটো।

সব মায়ের কাছেই তার সন্তান ছোটো থাকে। তাই সন্তান যখন মার অমতে কিছু করে বসে তখন মার মন অভিমানে ভরে উঠে। কর্ণ যদি তোমাকে না জানিয়ে কিছু করে বসে, তবে তোমার মনে এখন যেমন অভিমান হবে, কর্ণ বড়ো হলেও সে একই অভিমান তোমার মনের কোণে বাসা বাঁধবে। ভেবে দেখ বসুন্ধরা, কর্ণ যখন বিছানায় হিসু করত তখন সে ছিল তোমার কাছে ছোটো শিশু। এখন কর্ণ একা হোস্টেলে থাকে। তবু সে তোমার কাছে সেই শিশু কর্ণই আছে। কী হোত কর্ণ যদি মহারাজের কাছে আর দুদিন বেশি থাকত?

—আমি তোমার সাথে পেরে উঠব না। সেদিন ঝড়ের রাতেও পারিনি। আজও পারব না। তুমি আমার সামনে এসে আমাকে দুর্বল করে দিও না।

—তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

—না।

—তুমি আমার মাকে ফিরিয়ে দাও।

—আমি তবে কার ছায়ার তলায় থাকব?

—তবে আমায় ফিরিয়ে নাও।

ট্রেনটা সেই মুহূর্তেই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গিয়েছিল। বসুন্ধরার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে বেশ উত্তেজিত কথাবার্তা। আপার বার্থ থেকে নেমে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বসুন্ধরা। চারিপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একজন রেলের কর্মী লাইট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। বসুন্ধরা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, সামনে কিছু হয়েছে নাকি ভাই?

মালগাড়ি পড়ে গেছে। রেল কর্মীটি যেতে যেতে বলে গেল।

আবার পরীক্ষা। ধৈর্য ও উদ্বেগের পরীক্ষা। সময় যে কত ধীর গতি হতে পারে আর এক বার বুঝেছিল বসুন্ধরা। মাঝে মাঝে কানের উপর ঘড়িটা রেখে দেখছিল সেটা চলছে কিনা। সেটার টিক্ টিক্ শব্দ জানান দিচ্ছে, কালের গতি তার নিয়মেই চলেছে। শুধু যেন বসুন্ধরার সময়টাকেই গলা টিপে ধরে আছে।

সকালের মধ্যেই তার দেওঘরে পৌঁছে যাবার কথা। সেদিন বিকেলেই সে তিনসুকিয়া মেল ধরে গৌহাটিতে রওনা দেবে। ট্রেন লেট হবার অর্থ কর্ণের করুণ কান্না আর বড়োমার উদ্বেগের পারা বৃদ্ধি।

বসুন্ধরার ভাগ্য চিরকালই তো তার সাথে লুকোচুরি খেলে চলেছে। অথচ সূচনা দেখে কিন্তু মনে অতো ভাগ্য-দেবী তাকে দুহাত ভরে দেবার জন্য তার ঝাঁপি খুলে রেখেছে। সে যখন হাত পেতে নিতে চেয়েছে তখন দুর্বাশার অভিশাপে মৃত শোল মাছও রান্না করার সময় জীবন্ত হয়ে জলে পালিয়ে যাবার মতন বার বার ভাগ্য তাকে প্রতারিত করেছে।

বসুন্ধরা পাটনায় যখন নামল তখন দেওঘরের বাসটা সবে স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে। দূর থেকে চিৎকার করে বাসটাকে থামিয়ে যখন উঠে একটা জায়গাও পেয়ে গেল তখন মনে হয়েছিল ভাগ্য দেবী বুঝি তাকে ছলনা করতে করতে এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এই অনুকম্পাটুকু দেখাতে অস্বীকার করেন নি।

দেওঘরে যখন বাসটা পৌঁছাল তখন দুপুর। সারা হোস্টেল ফাঁকা। দারোয়ান জানাল কর্ণ ও তার বন্ধু এখনো যায়নি। তারা মহারাজের ঘরে আছে।

বসুন্ধরা যেন উড়ে গিয়েছিল হোস্টেলের গেট পেরিয়ে মহারাজের ঘরের দিকে। দূর থেকে দেখতে পেল জানালার শিকে মাথা রেখে কর্ণ তার দিকে পিঠ দিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। ও ভাবছে মা ওই রাস্তা দিয়েই তাকে নিতে আসবে।

কর্ণ। বসুন্ধরার ডাকটা হাওয়ায় ভেসে কর্ণের কানে পৌঁছানো মাত্রই সে বিদ্যুত গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। মা, শব্দটা কানে আসতেই বসুন্ধরা দেখতে পেল কর্ণ তার হাত দুটোকে পাখির ডানার মতন দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে আসছে। কর্ণ, তার কর্ণ। পাখি হয়ে বাতাসে ভর দিয়ে তার কাছে উড়ে আসছে, অথচ বসুন্ধরা স্তব্ধ আবেগে যেন এগোতে ভুলে গেছে। এই তো কর্ণ। হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়ে চোখের দৃষ্টি উষ্ণ অশ্রুর চাদরে সব কিছুকে ঝাপসা করে দিল। বসুন্ধরার মনে হল সে এক ভরশূন্য অবস্থায় কোনো দেবলোকের সুরবন্দনা শুনছে। হাঁটু দুটি মুড়ে বসে পড়ল। আর তখনই কর্ণ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের উপর।

বসুন্ধরা শুধু একটা শব্দই শুনতে পেল। মা, আমাব মা।

দুটো হৃদয় যখন একের স্পন্দনকে অপরের স্পন্দন দিয়ে শুষে নেওয়ার জন্য সেই মাঠে স্বর্গীয় বৃত্ত রচনায় ব্যস্ত ছিল তখন যে আরেকটি হৃদয় তার জীবনে মাতৃস্নেহের মরুভূমিতে এই মরূদ্যানের একটু স্পর্শ পেতে তৃষিত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তা তারা লক্ষ্য করেনি।

কর্ণই বলে উঠেছিল মা, এই সাগর।

বসুন্ধরা উঠে এসে সাগবের মুখের দিকে তাকাল। মনে হল কর্ণই যেন তাব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল, এ তার মনের ভুল। আজ সারা রাত ধরে তো শুধু কর্ণের কথাই ভাবছে। একেই বলে বোধ হয় দৃষ্টিবিভ্রম? এই ভাবনাতেই তো মানুষ প্রিয়জনের ছবি সর্বত্র দেখে বেড়ায়। সেই নাক। সেই মুখ।

তুমিই সাগর?

বসুন্ধরা সাগরকে এক হাতে নিজের কোলেব কাছে টেনে নেয়।

সাগর তাকায় কর্ণের দিকে।

কর্ণ বলে, আমার মা।

সাগর বসুন্ধরার ঘাড়ে তার কচি হাতটা তুলে দিয়ে বলে, তুমি আমার অ্যান্টি?

বসুন্ধরা সাগরকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার কপালে একটা চুমু একে বলল, হ্যাঁ বাবা, আমি কর্ণের মা, আমি তোমারও মা। সব অ্যান্টিই তো মা সোনা।

সাগর বলল, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে অ্যান্টি?

নেব, নিশ্চয়ই নেব বাবা।

সামনের ছুটিতে তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।

তোমার পাশে আমাকে শুতে দেবে?

দেব সোনা। তুমি এক পাশে শোবে আরেক পাশে কর্ণ। আমি তোমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেব। গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব।

ঠাম্মা, আমাকে ভালোবাসবে অ্যান্টি?

হ্যাঁ বাবা, ঠাম্মা তোমার জন্য খুব সুন্দর দুটো জিনিস পাঠিয়েছে সাগর।

কর্ণ বলল, মা, ঠাম্মা কোথায়? ঠাম্মা কি আমার সাথে দুষ্টুমি করে লুকিয়ে আছে?

বসুন্ধরা ভুলে গিয়েছিল সে বড়োমাকে একা রেখে এসেছে। এখনই যদি রওনা দিতে পারে তবে রাতের কোনো ট্রেন পেলেও পেয়ে যেতে পারে।

কর্ণকে বলে, ঠাম্মা তোমার ঘর সাজাবে বলে আসতে পারেনি। আমাকে বলতে বলেছে, কর্ণবাবু এতদিন পরে বাড়িতে আসবে তার ঘরটা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যে।

—ইস্! সাগরকে বলেছিলাম, আমার ঠাম্মা আসবে, দেখবি ঠাম্মা তোর জন্য কত সুন্দর জিনিস আনবে।

বসুন্ধরা কর্ণের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার ঠাম্মা সাগরের জন্য কোট আর চাদর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি সাগরকে পরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাগর, সবাই চলে গেছে, তুমি এখনও যাওনি কেন বাবা? তোমার বাবা আসেননি?

সাগর বলল, আমাদের ট্রেন তো রাত্রিতে অ্যান্টি। বাবা বলেছে, কর্ণ একা থাকবে। তাই আমরা কর্ণের মা, ঠাকুমা এলে এক সঙ্গে যাব। তাই তো আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

সাগরের জন্য আনা কোটটা পরিযে দিতে দিতে বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কোথায় সাগর?

বাবার এক বন্ধু আছেন এখানে। কোটের বোতামগুলি দেখতে দেখতে সাগর বলল, বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ আগে সেই আঙ্কেলের সাথে দেখা করে আসতে গেছে।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করল, তুমি বাবার সঙ্গে গেলে না কেন সাগর?

সাগর বলল, বারে, আমি চলে গেলে কর্ণকে একা থাকতে হতো না? বাবাই তো বলল, তুমি তোমার বন্ধুর কাছে থাক। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসব।

বসুন্ধরার একটা হাত দুহাতে জড়িয়ে ধরে সাগর আবদারের সুর তুলল, অ্যান্টি, বাবা তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। আমরা এক সঙ্গে স্টেশনে যাব।

বসুন্ধরা সাগরকে কিছু বলার আগেই মহারাজ সেখানে এসে তাকে দেখে বললে, এই যে বসুন্ধরা, বড্ড চিন্তায় ছিলাম। নিশ্চিন্ত হলাম তুমি পৌঁছে গেছ? তোমার দেরি দেখে আমি শিলঙ-এ ফোন করেছিলাম। তোমার শাশুড়ির স্কুল থেকে তোমার শাশুড়ির খবর পেয়ে ডাঃ কার্সলনকে ফোন করে জানতে পারলাম তুমি রওনা দিয়ে দিয়েছো। তোমার তো আজকেই চলে যাওয়া দরকার।

বসুন্ধরার বুকটা অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল। মহারাজকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, ডাঃ কার্সলন আমার শাশুড়ির অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন?

মহারাজ বললেন, এখন উনি একটু ভালো আছেন। তবে তোমার জন্য খুব চিন্তা করছেন। এই সময় যে কোনো টেনশনই মারাত্মক বিপদের কারণ হতে পারে। তাই ডাঃ কার্সলন আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমি যেন তোমাকে আজকেই পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

বড়োমার কথা ভেবে বসুন্ধরার গলার ভিতর দিয়ে একটা কান্না উঠে আসতে চাইল। বসুন্ধরা কোনো মতে কান্নাটাকে দমিয়ে কর্ণকে দেখতে চাইল। কর্ণ আর সাগর বারান্দার এককোণে দুজন দুজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের সামনে একটা কুকুরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে চলেছে। বসুন্ধরা বুঝতে পারল এই ভুলু। ওর ব্যবস্থা করতেই হয়তো ওরা পরিকল্পনায় মগ্ন হয়ে রয়েছে।

মহারাজ, কথাটা বলতে গিয়েই বসুন্ধরার গলাটা ধরে এসেছিল। দুবার কেশে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে বসুন্ধরা বলল, আপনি তো বুঝতেই পারছেন আমার আজকেই যাওয়াটা

কত জরুরি। তিনসুকিয়া মেলে আমাদের ফিরে যাবার টিকিট কাটা আছে। কিন্তু সে ত্রে এতক্ষণে চলে গেছে। আপনি স্টেশনে যদি ফোন করে একটু জেনে নেন, আজকে আর কোনো গাড়ি গৌহাটিতে যাবার জন্য আছে কিনা তবে খুব উপকার হয়।

মহারাজ বললেন, তুমি আমার অফিসে এসে বসো। আমি স্টেশনে ফোন করে জে৺ তোমায় বলছি।

মহারাজ ফোন করে এসে বললেন, বসুন্ধরা আর একমিনিটও নয়। এক্ষুনি তোমাদের রওনা দিতে হবে। আসার সময় গাড়ি লেট করে যেমন তোমায় ভুগিয়েছে যাবার সময় সেই লেটই আবার তোমার সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৌহাটি যাবার তিনসুকিয়া মেল প্রায় পাঁচ ঘন্টা লেটে চলছে। তুমি যদি এক্ষুনি বেরিয়ে পড় তবে ট্রেন স্টেশনে ঢোকার মিনিট পনেরও আগেই ঢুকে যেতে পারবে। আমি স্টেশন মাস্টারকে বলে দিয়েছি। উনি তোমাকে যে ভাবেই হোক বার্থে জায়গা করে দেবেন। তুমি স্টেশনে নেমেই সোজা প্ল্যাটফর্মে চলে যাবে। আমাদের স্কুলের গাড়ি তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। গাড়ির ড্রাইভার সব চেনে। ও সব কিছু ঠিক করে দেবে।

মহারাজের কথা শেষ হতে না হতেই স্কুলের গাড়ি এসে অফিসের সামনে দাঁড়াল।

মহারাজ বললেন, আর দেরি করো না। বসুন্ধরা। উঠে পড় নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না।

বসুন্ধরা মহারাজকে প্রণাম করে সাগরের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে কোলে টেনে নিয়ে বলল, তোমার বাবাকে বলবে, এই ভাবে চলে যেতে হচ্ছে বলে তোমার বাবার কাছে অ্যান্টি ক্ষমা চেয়েছে। সামনের ছুটিতে তোমার বাবাকে বলে আমি তোমায় আমার সাথে নিয়ে যাব।

মহারাজ তাড়া দেন, বসুন্ধরা আর এক মিনিটও দেরি নয়।

কর্ণের হাত ধরে গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখে তাব মালপত্র ইতিমধ্যেই উঠে গেছে।

কর্ণ গাড়ি থেকে মুখ বের করে বলে, সাগর গিয়েই তোকে চিঠি দেব। আর আঙ্কেলকে বলিস ভুলুর কথা যেন মহারাজকে বলে যায়।

ঝড়ের বেগে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এসেছিল ড্রাইভার। স্টেশনে এসে শুনতে পেল, তিনসুকিয়া মেল স্টেশনে ঢুকে গেছে ঠিকই কিন্তু গাড়ি ছাড়তে অনেক দেরি হবে। লাইনে কাজ চলছে।

আসার পথে বসুন্ধরা মনে মনে প্রার্থনা করে আসছিল ট্রেনটা যেন আরো কিছুক্ষণ লেট করে। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে সেই লেটের খবর পেয়ে তার মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল মনে মনে ভাবল এর জন্যই দেশে জরুরি শাসনের প্রয়োজন।

স্কুলের গাড়ির ড্রাইভারই তাদের টিকিট কেটে একেবারে সিটে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এবারও লোয়ার বার্থ। যদিও দুটো বার্থ পেয়েছে। বসুন্ধরার ইচ্ছে কর্ণকে তারপাশে নিয়েই শোবে। এতদিন বাদে কর্ণকে কাছে পেয়ে তার শরীরের ঘ্রাণটুকুকে সারা রাত ধরে শুষে নেবে।

ড্রাইভার নমস্কার করে চলে গেল। ওর হাতে বসুন্ধরা একটা একশটাকার নোট গুঁজে দিতে গিয়ে বলেছিল ড্রাইভার দাদা, তোমার ছেলে-মেয়েদের মিষ্টি খেতে দিও।

ড্রাইভার হাত জোড় করে বলেছিল, ও কথা বলবেন না দিদিভাই। এরা আমার ছেলে মেয়ের মতন। এই টাকা নিলে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না।

সিটের উপর একটা চাদর পেতে নিল বসুন্ধরা। তাড়াহুড়োতে নিজের খাবারের কথা মনেই ছিল না। নিজের জন্য না ভাবলেও কর্ণের জন্য কিছু খাবার কিনতে হবে। প্ল্যাটফর্ম থেকে রুটি, কেক, বিস্কুট, আপেল সেই সাথে দুটো মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনল। ফেরার পথে হুইলার থেকে গোটা কয়েক ম্যাগজিন কিনে সিটে এসে বসে দেখল পাশের ফাঁকা লাইনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে ওপাশ থেকে হাওয়াটা আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

ম্যাগাজিনের পাতাগুলি উল্টাতে গিয়ে ভালো লাগল না বসুন্ধরার। সাগরের মুখটা বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। কর্ণের সাথে কী অদ্ভুত মিল। সাগরের বাবার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা বোধ তার সারা মন জুড়ে রাজত্ব করতে শুরু করল।

এই ভদ্রলোক সারা দিন কর্ণের সাথে তার ছেলেকে রেখে দিয়েছেন। তার জন্য অপেক্ষা করেছেন। ছেলেকে বার বার বলেছেন, তিনি সবাইকে স্টেশনে পৌঁছে দেবেন। অথচ কর্ণকে নিয়ে এমন ভাবে চলে আসতে হয়েছে, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তাকে অভদ্র ও অকৃতজ্ঞ ভাবছেন।

ভাবতে ভাবতে জানালার শিকে মাথা দিয়ে বসুন্ধরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। হঠাৎ কর্ণের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল বসুন্ধরার।

কর্ণ ডাকছে, মা, মা ওই দেখ সাগর। ওরা ওই ট্রেনে যাচ্ছে।

বসুন্ধরা তাকিয়ে দেখল ওপাশের ট্রেনের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শিকের ভিতর থেকে সাগর হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে।

বসুন্ধরাও তার হাতটা জানালার ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিয়ে সাগরের বাড়ানো হাতটা ছুঁতে চাইল। কিন্তু পারল না। দুটি হাতের ব্যবধান অনেক খানি।

বসুন্ধরা জানালায় মুখ চেপে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এই ট্রেনে যাচ্ছ?

সাগর তার ছোট্ট মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ অ্যান্টি, এই গাড়িটাই তো দিল্লি যাবে।

কর্ণ হেসে বলল, কী মজা বলত? আমাদের গাড়িটা দিল্লি থেকে আসছে, আর তোদের গাড়িটা দিল্লিতে যাচ্ছে। অথচ আমরা একটু আগেই এক জায়গায় ছিলাম।

বসুন্ধরা সাগরকে জিজ্ঞাসা করে তোমার বাবা কোথায় সাগর?

সাগর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে জবাব দিল বাবা সিগারেট কিনতে নিচে গেছে। দাঁড়াও বাবাকে ডাকছি।

বসুন্ধরা শুনতে পেল, সাগর ডাকছে, বাবা ও বাবা, দেখ ওই ট্রেনে কর্ণ আছে। অ্যান্টি তোমার সাথে কথা বলবে। তুমি তাড়াতাড়ি উঠে এসো।

বসুন্ধরার মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে আসে। সে ভাবতে পারেনি সাগরদের সঙ্গে এভাবে তার আবার দেখা হয়ে যাবে। এ ভাবে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে বলে সাগরের বাবার কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাবে।

বসুন্ধরা শুনতে পেল, সাগর তার বাবাকে ডেকে বলছে, এই জানালার কাছে এস, বাবা, ওই দেখ কর্ণ। এই যে অ্যান্টি।

জানালার কাছে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল সাগরের বাবা।

বসুন্ধরা মুখ বাড়িয়ে কথা বলতে গিয়েই নির্বাক হয়ে গেল। কাকে দেখছে সে?

এই তো তার জীবনের শনি। যাকে ঘৃণা করেও মনের কোনে বাসা বাঁধতে দেয়। যে মানুষটাকে অস্বীকার করতে মিথ্যা বৈধব্যের পরিচয়কে বহন করার যন্ত্রণাকে তিল তিল ভোগ করে চলেছে সেই মানুষটাই এতক্ষণ তার মনের কৃতজ্ঞতার বর্ষণে সিক্ত হচ্ছিল। এই মানুষটাকে দেখা ও তার সাথে কথা বলার জন্যই মন উন্মুখ হয়েছিল।

এই সেই তমাল মিত্র।

তার জীবনের প্রথম বিশ্বাস ও বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতীক।

এই তো সেই তমাল মিত্র। একেই কর্ণ আজ সকাল পর্যন্ত সূর্য বানিয়ে প্রণাম করেছে

সেই তমাল মিত্র এসে দাঁড়িয়েছে কর্ণের সামনে।

বসুন্ধরার একটা হাত অবচেতন ভাবেই কর্ণকে জড়িয়ে ধরে।

কিন্তু যে মানুষটাকে দেখে তার দু চোখ দিয়ে অগ্নি বর্ষণ হওয়ার কথা সে মানুষটাকে এত কাছে পেয়ে তাকে ভস্মীভূত করার পরিবর্তে তার দৃষ্টি ঝাপসা হ যাচ্ছে কেন?

আগুন তো কখনও বর্ষণে রূপান্তরিত হয় না। তবু তার দু চোখের আগুন শীতল অশ্রু ফোঁটায় তার গাল বেয়ে নেমে আসছে কেন?

যে কর্ণকে এই মানুষটাকে ছায়া থেকে দূরে রাখতে এতদিন প্রাচীর রচনা করে চলেছিল, আজ কেন তার মন ঘোষণা করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে? এই তোমার কর্ণ। তোমার প্রেমের প্রথম অমৃত ফসল।

কোনো কথাই বলতে পারে না বসুন্ধরা।

বসুন্ধরা নীরব। নিষ্পলক।

তমাল নিথর। নিষ্পন্দ।

সাগর ডাকে, বাবা, তুমি অ্যান্টির সাথে কথা বল।

কর্ণ বলে, আঙ্কেল তোমার সাথে কথা বলতে এসেছে মা।

তমাল এগিয়ে আসে কিছু বলবে বলে।

বসুন্ধবা মুখটা বাড়িয়ে দিতে চায় কিছু শোনার প্রত্যাশায়।

সেই মুহূর্তে দুটি ট্রেন বিপবীত মুখে চলতে শুরু করে। দুটো ট্রেনেরই সিটি বেজে ওঠে সেই তীক্ষ্ম সিটির শব্দে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না।

দু-জোড়া নীরব চোখের দৃষ্টি দুটি হৃদয়ের ভাষা হতে গিয়ে একই সরল রেখায় এসে দুটি বিপরীত গতির টানে মিলিয়ে যায়।